হাদীসের নামে জালিয়াতিঃ
প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com

الوضع في الحديث والأحاديث الموضوعة المشتهرة

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
أستاذ قسم الحديث بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلادش

হাদীসের নামে জালিয়াতি :
প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮;
মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪, ????????????????

প্রপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ: মে ২০০৬ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী
চতুর্থ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী

"HADISER NAME JALIATI (Fabrication in the name of Hadith)" by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. May 2006. Price TK 250.00 only.

**আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ
মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার
সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের**

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ

কুরআন কারীমের পরে দ্বীন ইসলামের মূলভিত্তি হলো হাদীস। এজন্য হাদীস বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা করতে, মুখস্থ রাখতে ও প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। একই সাথে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তাঁর নামে মিথ্যা বলতে। মিথ্যা হতে পারে এরূপ সন্দেহজনক কোনো কথা তাঁর নামে যে বলবে সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রচেষ্টা সেই প্রাচীন যুগ থেকেই অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে সাহাবীগণের যুগ থেকেই মুসলমানগণ হাদীসের নামে সকল প্রকার মিথ্যা ও জালিয়াতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সকল জাল হাদীস চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ক সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক আলিম বা নেককার মানুষও না জেনে অনেক জাল হাদীস বলেন, প্রচার করেন বা লিখেন। এভাবে সমাজে অনেক জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা অনেকেই গাফলতির কারণে এই কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি।

জাল হাদীসের উপর আমল করেও আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) যা করতে বলেন নি তা করে আমরা পণ্ডশ্রম করছি। উপরন্তু আমরা সহীহ হাদীসের উপর আমল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের উপর অর্পিত একটি ফরয দায়িত্ব হলো সমাজে প্রচলিত জাল হাদীসগুলি চিহ্নিত করা এবং এগুলির খপ্পর থেকে সমাজকে রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করার এ হলো অন্যতম পদক্ষেপ।

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করছি। আল্লাহ পাকের রহমতে এতদিনে সে এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমি আমার মুহিব্বীন, মুরীদীন ও দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। যে সকল কথাকে 'জাল হাদীস' বলে জানতে পারবেন সেগুলিকে কোনো অজুহাতেই আর বলবেন না বা পালন করবেন না। তাহকীক করুন। কিন্তু 'অমুক বলেছেন', 'তমুক লিখেছেন', 'সহীহ না হলে কি তিনি বলতেন বা লিখতেন' ইত্যাদ্দি কোনো অজুহাতেই সেগুলি বলবেন না বা পালন করবেন না। আমাদের প্রত্যেককে আল্লাহর দরবারে তার নিজের কর্মের হিসাব দিতে হবে, অন্যের কর্মের নয়।

কেউ হয়ত না জেনে বা ভুলে জাল হাদীস বলেছেন, সে কারণে কি আমি জেনে-শুনে একটি জাল হাদীস বলব? কারো হয়ত অনেক নেক আমল আছে, যেগুলির কারণে আল্লহ তার এইরূপ দু'-চারটি ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার এই ইচ্ছাকৃত কঠিন পাপের ক্ষমা মিলবে কিভাবে?

কোনো হাদীস জাল বলে জানার পরে মুমিনের দায়িত্ব হলো তা বলা বা পালন স্থগিত করা। প্রয়োজনে সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে নিশ্চিত হতে হবে। কোনো বিষয়ে এই গ্রন্থের লেখকের ভুল হয়েছে বলে মনে হলে আপনারা আরো 'ইলমী তাহকীক' বা গবেষণা করবেন এবং মুহাদ্দিসগণের মতামত বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবেন। ভুল প্রমাণিত হলে তাকে বা আমাকে জানাবেন। তবে গায়ের জোরে বা মুহাদ্দিসগণের সুস্পষ্ট মতামতের বাইরে কিছু বলবেন না। মনে রাখবেন যে, কোনো মুসলিম যদি জীবনে একটিও 'হাদীস' না বলেন তবে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওয়ায, দাওয়াত, ইবাদত বা অন্য যে কোনো নেক উদ্দেশ্যে যদি তিনি একটিও মিথ্যা বা জাল হাদীস বলেন তবে তা হবে কঠিনতম একটি পাপ।

মুসলিম উম্মাহ একমত যে, জাল হাদীস বলা বা রেওয়ায়াত করাও কঠিনতম হারাম। পেশাক-আশাক, পানাহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে হারাম হালাল বিষয়ে যেমন সতর্ক থাকতে হয়, কথাবার্তার ক্ষেত্রেও তেমনি হারাম-হালাল বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি তা তাঁর নামে বলা হলো সবচেয়ে কঠিন হারাম কথা। এ বিষয়ে সতর্কতা অতীব জরুরী।

মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন এই গ্রন্থখানা কবুল করেন এবং লেখককে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। এই গ্রন্থখানি প্রকাশে যারা সহায়তা করেছেন এবং যারা গ্রন্থটি পড়বেন বা প্রচার করবেন তাদের সকলকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, বরকত, কল্যাণ ও উন্নতি দান করুন। আমীন!

আহ্কারুল ইবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين

কুরআন কারীমের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি। মুমিনের জীবন আবর্তিত হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসকে কেন্দ্র করে। হাদীস ছাড়া কুরাআন বুঝা ও বাস্তাবায়ন করাও সম্ভব নয়। হাদীসের প্রতি এই স্বভাবজাত ভালবাসা ও নির্ভরতার সুযোগে অনেক জালিয়াত বিভিন্ন প্রকারের বানোয়াট কথা 'হাদীস' নামে সমাজে প্রচার করেছে। সকল যুগে আলিমগণ এসকল জাল ও বানোয়াট কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করে মুসলমানদেরকে সচেতন করেছেন।

আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে হাদীসের পঠন, পাঠন ও চর্চা থাকলেও সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের বাছাইয়ের বিষয়ে বিশেষ অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। যুগ যুগ ধরে অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা হাদীস নামে আমাদের সমাজে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। এতে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি। এছাড়াও দুইভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। প্রথমত, এ সকল বানোয়াট হাদীস আমাদেরকে সহীহ হাদীসের শিক্ষা, চর্চা ও আমল থেকে বিরত রাখছে। দ্বিতীয়ত, এগুলির উপর আমল করে আমরা আল্লাহর কাছে পুরস্কারের বদলে শাস্তি পাওনা করে নিচ্ছি।

১৯৯৮ সাল থেকে আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবুল আনসার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন সমাজে প্রচলিত বানোয়াট ও জাল হাদীস সম্পর্কে বই লিখতে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে কিছু বিষয় লিখে জমা করেছিলাম। ২০০২-২০০৩ সালে নেদায়ে ইসলামের কয়েক সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু লিখেছিলাম। কিন্তু যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণে বিষয়টি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আর হয়ে উঠছিল না। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে তাঁর দরবারে অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

জাল হাদীসের বিষয়ে দুই প্রকারের বিভ্রান্তি বিরাজমান। অনেকেই মনে করেন 'হাদীস' মানেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী, কাজেই কোনো হাদীসকে দুর্বল বলে মনে করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা বাণীকে অবজ্ঞা করা। কেউবা মনে করেন, যত দুর্বল বা যয়ীফই হোক, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কাজেই তাকে গ্রহণ ও পালন করতে হবে।

এই ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। তবে এর বিপরীতে এর চেয়েও মারাত্মক বিভ্রান্তি অনেকের মধ্যে বিরাজমান। অনেক অজ্ঞ 'পণ্ডিত' মনে করেন, হাদীস যেহেতু মৌখিকভাবে সনদ বা বর্ণনাকারীদের পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কয়েকশত বৎসর পরে লিখিত ও সংকলিত, কাজেই তার মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। এজন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না। কেউবা ভাবেন, হাদীসের মধ্যে অনেক জাল কথা আছে, কাজেই আমরা আমাদের বুদ্ধি বিবেক অনুসারে কোনোটি মানবো এবং কোনোটি মানবো না।

এ সকল বিভ্রান্তির কারণ হলো, হাদীসের সনদ বিচার ও হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এজন্য এই পুস্তকের প্রথম পর্বে হাদীসের পরিচয়, হাদীসের নামে মিথ্যার বিধান, ইতিহাস, হাদীসের নির্ভুলতা নির্ণয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতি, নিরীক্ষার ফলাফল, মিথ্যার প্রকারভেদ, মিথ্যাবাদী রাবীগণের শ্রেণীভাগ, জাল হাদীস নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা করি এই আলোচনা পাঠকের মনের দ্বিধা ও অস্পষ্টতা দূর করবে এবং হাদীসের নির্ভুলতা রক্ষায় মুসলিম উম্মাহর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে।

দ্বিতীয় পর্বে আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জাল হাদীসের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য যে, জাল হাদীসের বিষয়ে আমি মূলত নিজের কোনো মতামত উল্লেখ করিনি। দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী ও তাবে- তাবেয়ী ইমামগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের অগণিত মুহাদ্দিস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত সকল হাদীস সংকলন করে, গভীর নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সে সকল হাদীস ও রাবীদের বিষয়ে যে সকল মতামত প্রদান করেছেন আমি মূলত সেগুলির উপরেই নির্ভর করেছি এবং তাঁদের মতামতই উল্লেখ করেছি। যে সকল হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন সেগুলির ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

দুই একটি ক্ষেত্রে দেখেছি যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু গ্রন্থে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যা সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো প্রকারের সনদেই কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি বাহ্যত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এই প্রকারের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি নিজের মতামত প্রকাশ করেছি। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এই প্রকারের হাদীস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরণের অনেক কথা সরাসরি হাদীস নামে বলা হয়। আবার অনেক কথা সাওয়াব, ফযীলত, বরকত বা ক্ষতির কারণ হিসাবে সাধারণ ভাবে বলা হয়, কিন্তু পাঠক বা শ্রোতা কথাটিকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কথা বলেই বোঝেন। এই জাতীয় অনেক কথা আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলি সম্পর্কেও মাঝে মাঝে আলোচনা করেছি।

প্রচলন বুঝাতে কখনো কখনো প্রচলিত বই-পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছি। এ সকল ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য কথাটির প্রচলন বুঝানো। উক্ত বই বা লেখকের সমালোচনা বা অবমূল্যায়ন আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং তাঁদের খেদমতের স্বীকৃতির সাথে সাথে হাদীসের নামে প্রচলিত বানোয়াট কথাগুলির বিষয়ে পাঠকদেরকে সতর্ক করাই আমার উদ্দেশ্য। সকল লেখকই তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবেন। আমরা এ সকল লেখকের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি এদের মহান খেদমত কবুল করুন, এদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাদের ও তাঁদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির একটি কারণ হলো, প্রায় সকল বিষয়ে বানোয়াট হাদীসগুলি আলোচনার সময় সে বিষয়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলির বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে হয়েছে। দুইটি কারণে তা করতে হয়েছে।

প্রথমত, অনেক সময় জালিয়াতগণ জাল হাদীস তৈরি করার সময় সহীহ হাদীসের কিছু শব্দ ও বাক্য তার সাথে জুড়ে দেয়। এছাড়া অনুবাদের কারণে অনেক সময় জাল ও সহীহ হাদীসের অর্থ কাছাকাছি মনে হয়। এজন্য শুধু জাল হাদীসটি উল্লেখ করলে সাধারণ পাঠকের

মনে হতে পারে যে, এ বিষয়ে সকল হাদীসই বুঝি জাল। অথবা, এই অর্থের একটি হাদীস অমুক গ্রন্থে রয়েছে, কাজেই তা জাল হয় কিভাবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু জাল হাদীস চিহ্নিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসে ও কর্মে জাল হাদীস বর্জন করে সহীহ হাদীসের উপর আমল করে নিজেদের নাজাতের জন্য চেষ্টা করা। এজন্য জাল হাদীস উল্লেখের সময় সে বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও কিছু বলেছি।

সম্মানিত পাঠককে একটি বিষয়ে সাবধান করতে চাই। আমরা জানি যে, নিজে কর্ম করার চেয়ে অন্যের সমালোচনা করা অনেক বেশি সহজ ও মানবীয় প্রবৃত্তির কাছে আনন্দদায়ক। এজন্য অনেক সময় আমরা একটি নতুন বিষয় জানতে পারলে সেই নতুন জ্ঞানকে অন্যের দোষ ধরার জন্য ব্যবহার করি।

আমাকে একজন বললেন, "অমুকেরা যয়ীফ বা জাল হাদীস দিয়ে মানুষদের আল্লাহর পথে ডাকেন। কত বলি যে, আপনারা সহীহ হাদীসের কিতাব পড়ুন, কিন্তু তাঁরা শুনেন না।" আমি বললাম, "তাঁরা তো যয়ীফ হাদীস দিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে যেয়ে ডাকছেন, আপনি সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলি নিয়ে ক'জনের দ্বারে গিয়েছেন?" শুধু সমালোচনা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

এই বই থেকে আমরা অনেক জাল হাদীসের কথা জানতে পারব। এ জ্ঞান আমাদেরকে সহজেই শয়তানের ক্ষপ্পরে ফেলে দিতে পারে। আমরা চায়ের দোকানে, মসজিদে, ওয়াযে, আলোচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলকে সমালোচনা করে বলতে পারব যে, তারা অমুক জাল হাদীসটি বলেন বা পালন করেন।

এই কর্মের দ্বারা আমরা সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ অর্জন করব। এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য তা নয়। এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য হলো আমরা অনির্ভরযোগ্য, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট 'হাদীসে'র পরিবর্তে সহীহ হাদীসগুলির উপর নির্ভর করে নিজেদের কর্ম ও বিশ্বাসকে আরো উন্নত করব। যে সকল সহীহ হাদীস আমরা জানতে পারব সেগুলি ব্যক্তিগতভাবে পালন করব এবং অন্যদেরকে পালন করতে উৎসাহ দেব। যে সকল জাল হাদীসের বিষয়ে জানতে পারব সেগুলি কখনোই আর হাদীস হিসেবে বলব না বা পালন করব না। কেউ তা করলে সম্ভব হলে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করব। সর্বাবস্থায় মহিমাময় করুণাময় আল্লাহর কাছে তার ও আমাদের নিজেদের ক্ষমা ও কবুলিয়তের জন্য দোয়া করব।

সম্মানিত পাঠক, আমার যোগ্যতার কমতির বিষয়ে আমি সচেতন। আমি জানি এ বিষয়ে লেখালেখি করার যোগ্যতা মূলত আমার নেই। যা কিছু লিখেছি সবই মূলত ধার করা বিদ্যা। আর এতে ভুল ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই যে কোনো বিষয়ে যদি আপনি আমার ভুল ধরে দেন তবে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং আপনাকে উস্তাদের সম্মান প্রদান করব।

আগেই বলেছি, এই পুস্তকটি লিখতে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর ফুরফুরার পীর মাওলানা আবুল আনসার সিদ্দিকী। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁকে, তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দকে হেফাযত করেন। এ ছাড়া অনেক বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ী আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বন্ধুবর ড. মো. আবু সিনা, ড. মো. অলি উল্যাহ, জনাব আ. শ. ম. শুআইব আহমদ ও জনাব মো. আব্দুল মালেক বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে অনেক গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

বানানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বাংলা একাডেমী মতামত অনুসরণ করা হয়েছে। তবে আরবী-ফারসী শব্দের ক্ষেত্রে মূল উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। বিষয়টি কঠিন। অগণিত আরবী শব্দ ফারসী-উর্দুর প্রভাবে ভুল উচ্চারণে ও ভুল প্রতিবর্ণে বাংলা ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে। এগুলি অনেক ক্ষেত্রে সেভাবেই রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের খেদমতে একটি অতি নগন্য প্রচেষ্টা এই গ্রন্থ। আমার কর্মের মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি দয়া করে ভুলত্রুটি ক্ষমা করে এই নগন্য খেদমতটুকু কবুল করেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়, বন্ধুগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর। ২০০৫ সালে এ বইটি প্রকাশের পর প্রশংসা ও নিন্দা অনেক হলেও তথ্যগত সংশোধন বা সংযোজন করতে তেমন কেউ এগিয়ে আসেন নি। যে কজন তথ্যগত সহযোগিতা করেছেন তাদের অন্যতম যশোর জেলার মনিরামপুরের মুহাতারাম ভাই আসাদুল্লাহ। 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' বইটি পড়ার পর তিনি আমাকে বললেন, "ফুরফুরা শরীফ থেকে ইতোপূর্বে উর্দু ভাষায় জাল হাদীস বিষয়ক যে বইটি লেখা হয়েছিল সে বইয়ের সাথে আপনার এ বইয়ের অনেক মিল রয়েছে। আমার আব্বা ফুরফুরার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি বইটি কিনেছিলেন এবং আমার নিকট তা রয়েছে।" অতীব আগ্রহের সাথে আমি বইটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করলাম। পরবর্তীতে ফুরফুরায় যোগাযোগ করে জানতে পারলাম যে, বইটি তথায় পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবু বকর সিদ্দীকীর (রাহ) জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আল্লামা আবু জাফর সিদ্দীকী (রাহ) ১৩৪৮ হিজরীতে (১৯২৯খৃ) উর্দু ভাষায় 'আল-মাউযূআত' নামে জাল হাদীস বিষয়ক এ বইটি লিখেন এবং ১৩৫২ হি. (১৯৩৩ খৃ) তিনি বইটি প্রকাশ করেন।

গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ থেকে কিছু ভিত্তিহীন বা জাল হাদীস সংকলন করেছেন তিনি, যেন সাধারণ ও অসাধারণ সকলেই জানতে পারেন যে, এগুলি বানোয়াট। কারণ অনেকেই তাদের ওয়ায-নসীহত, কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে তাহকীক বা অনুসন্ধান না করে অনেক জাল হাদীস ও বানোয়াট গল্প-কাহিনী উল্লেখ করেন। তা সহীহ না জাল তা তারা চিন্তা করেন না। জাল হাদীস বর্ণনার ভয়াবহ পরিণতি সকলেরই জানা দরকার। তিনি আরো লিখেছেন যে, অতীতে অনেক মানুষ প্রকৃতই কামেল ও মুকাম্মাল ছিলেন। তবে ইলম হাদীসের ময়দান অনেক বড়। সেখানে তারা ঢিলেমি করেছেন এবং মাউযূ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জাল হাদীস বিষয়ক কিছু ঘটনা এবং মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এরপর অভিধান পদ্ধতিতে প্রায় ৫০০ জাল হাদীস সংকলন করেছেন। পৃথক পরিচ্ছেদে তিনি অনেক ভিত্তিহীন কাহিনী, বিশ্বাস, কুসংস্কার ও জনশ্রুতি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সংকলিত এ সকল জাল হাদীস ও মূলনীতি অধিকাংশই আমার এ পুস্তকে এসে গিয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের শেষে হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, তাসাউফ, ফাতওয়া, ওয়াজ ও গল্প-কাহিনী বিষয়ক যে সকল গ্রন্থে জাল হাদীসের সংখ্যা বেশি সেগুলির একটি তালিকা প্রদান করে সেগুলি পাঠ না করতে বা সাবধানে পাঠ করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর গ্রন্থের কোনো হাদীস জাল নয় বলে যদি কারো সন্দেহ হয় তবে তিনি যেন, অনুগ্রহপূর্বক সনদসহ হাদীসটি তার কাছে লিখে পাঠান, যেন ইলমুর রিজালের গ্রন্থাদির আলোকে সনদটি বিচার করা যায়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারে শুধু গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া বা হাদীসটি অমুক কিতাবে উল্লেখ আছে বলা যথেষ্ট নয়, তবে যদি হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ হয় তবে ভিন্ন কথা।

জাল হাদীসের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় আল্লামা আবু জাফর লিখিত এ গ্রন্থ। আমার গ্রন্থের ১৩১-১৩২ পৃষ্ঠায় জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলির যে তালিকা লিখেছি তার শেষে সংযুক্ত হবে এ গ্রন্থ। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ গ্রন্থের মূল্য অনেক। বাঙালী লেখকের রচিত ও বঙ্গদেশে প্রকাশিত জাল হাদীস বিষয়ক এটি প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা করছি এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

বইটি প্রমাণ করে যে, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও জাল হাদীস প্রতিরোধ খুব কঠিন কাজ। বাংলাদেশের অগণিত আলিম-উলামা ও পীর-বুজুর্গ ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী ও তাঁর সন্তানদেরকে অতীব ভক্তি করেন। কিন্তু জাল হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত তাঁরা গ্রহণ করেন নি। এ গ্রন্থটি ফুরফুরার ভক্ত-খলীফাগণ পড়েও দেখেন না। ফুরফুরার পীর যে সকল কথা বা হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন, উপরন্তু এগুলির প্রচারকরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, ফুরফুরার অগণিত খলীফা ও ভক্ত নিজেদের কথাবার্তায় বা লেখায় সেগুলি উল্লেখ করছেন এবং সেগুলিকেই নিজেদের আকীদার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জাল হাদীস নির্ভর হওয়ার কারণে যে সকল পুস্তক পাঠ করতে তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলি তাঁরা মূল পাঠ্য ও দলিল হিসেবে গ্রহণ করছেন!!

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে পাঠক জানবেন যে, ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহা. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ) তাঁর পিতা-পিতামহের সুযোগ্য ও প্রকৃত উত্তরসূরী হিসেবে জাল হাদীসের বিরুদ্ধে এ বইটি লিখতে আমাকে নির্দেশ দান করেন। ২০০৬-এর ডিসেম্বরে তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাঁকে মাগফিরাত, রহমত ও সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁর সন্তানগ-সহ আমাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাতের খেদমতে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদেরকে পুনরায় একত্রিত করেন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহাববিহী ও আতবায়িহী আজমাঈন।

২০০৮ সালে বইটির তৃতীয় সংস্করণে পাঠকদেরকে ফুরফুরার পীর আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত ও ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত "আল-মাউযূআত" বইটির কথা জানিয়েছিলাম। বস্তুত এ বইটি বঙ্গদেশীয় কোনো আলিমের লেখা ও বঙ্গদেশে প্রকাশিত জাল হাদীস বিষয়ক প্রাচীনতম গ্রন্থ। সম্ভববত উর্দভাষাতেও এটি জালহাদীস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফীকে পরের বৎসর ২০০৯ সালে উক্ত বইটির বাংলা অনুবাদ বিস্তারিত পর্যালোচনা-সহ প্রকাশ করতে সক্ষম হই। সম্মানিত পাঠককে বইটি পাঠ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

প্রথম পর্বের শেষে/ দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে/ বইয়ের শেষে-পরিশিষ্ট
জাল-হাদীস প্রতিরোধে বঙ্গীয় আলিমগণ
ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী ও তাঁর অনুসারীগণ
আল্লামা আবু জাফর সিদ্দিকী
(১) জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি
(২) যে সকল হাদীসকে জাল বলেছেন
(৩) যে সকল কথা ভিত্তিহীন বলেছেন
(৪) যে সকল পুস্তক পাঠ করতে নিষেধ করেছেন
আল্লামা মুহাম্মাদ রুহুল আমিন

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আযমী
মাওলানা মু. আব্দুর রহীম
মাওলানা আব্দুল মালিক

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব
হাদীস ও হাদীসের নামে জালিয়াতি

১. ১. ওহী ও হাদীস

১. ১. ১. ওহী এবং মানবতার সংরক্ষণে তার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টির সেরা হিসাবে তৈরি করেছেন। তাকে দান করেছেন জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি যা তাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও কল্যানের পথে পরিচালিত করে। মানুষের এই জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ তার জ্ঞান, বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে তার পার্থিব জগতের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারে এবং নিজেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়ের বাইরের কিছু সে জানতে পারে না। এজন্য ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বিষয়ে মানুষ জ্ঞান, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে সঠিক সমাধানে পৌছাতে অনুরূপভাবে সক্ষম হয় না। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি।

জাগতিক বিষয়গুলি মানুষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারে। কিভাবে চাষ করলে বেশি ফল ফসল হবে, কিভাবে বাড়ি বানালে বেশি টেকসই হবে, কিভাবে গাড়ি বানালে দ্রুত চলবে, কিভাবে রান্না করলে খাদ্যমানের বেশি সাশ্রয় হবে, কিভাবে ব্যবসা করলে লাভ বেশি হবে বা পুঁজির নিরাপত্তা বাড়বে, কিভাবে চিকিৎসা করলে আরোগ্যের সম্ভাবনা, নিশ্চয়তা বা হার বাড়বে ইত্যাদি বিষয় মানবীয় অভিজ্ঞতা, গবেষণা, যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে জানা যায়।

কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম ও আচার আচরণ বিষয়ক জ্ঞান কখনো অভিজ্ঞতা বা ঐন্দ্রিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় না। আল্লাহর সম্পর্কে বিশ্বাস কিরূপ হতে হবে, কিভাবে নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, পরকালের সঠিক বিশ্বাস কী, কিভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে, কোন্ কর্ম করলে তাঁর রহমত ও বরকত বেশি পাওয়া যাবে, কিভাবে চললে আখেরাতে মুক্তির সম্ভাবনা বাড়বে, কোন্ পদ্ধতিতে চললে দ্রুত আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করা যাবে, কোন্ কাজ করলে বেশি সাওয়াব অর্জন করা যাবে, কোন্ কর্মে পাপের ক্ষমালাভ হয় ইত্যাদি অধিকাংশ ধর্মীয় ও বিশ্বাসীয় বিষয় কখনোই অভিজ্ঞতা বা গবেষণার মাধ্যমে চূড়ান্তরূপে জানা যায় না বা এ বিষয়ক কোনো সমস্যা গবেষণা বা অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে চূড়ান্ত সমাধান করা যায় না।

এ জন্য আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা রূপে সৃষ্টি করার পরেও তার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী, ওহী বা প্রত্যাদেশ (revelation) প্রেরণ করেছেন। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক,গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সকল বিষয় জানতে পারে না বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে সকল বিষয় ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এ ছাড়া মানুষ বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে যে সকল বিষয় ভাল বা মন্দ বলে বুঝতে পারে সে সকল বিষয়েও ভাল-মন্দের পর্যায়, গুরুত্ব, পালনের উপায় ইত্যাদি তিনি ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন।

ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের সংরক্ষণ ও তার অনুসরণ ব্যতীত মানব জাতি ও মানব সভ্যতার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। স্বার্থের সংঘাত, হানাহানি ও স্বার্থপরতা দূর করে প্রকৃত ভালবাসা, সেবা ও মানবীয় মূল্যবোধগুলির বিকাশ করতে ওহীর জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করতে হবে। বিশ্বাস, সততা, পাপ, পূণ্য, স্রষ্টা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে ওহীর বাইরে মানবীয় বিবেক, অভিজ্ঞতা বা গবেষণার আলোকে যা কিছু বলা হয় সবই বিতর্ক, সংঘাত ও বিভক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সত্য কখনোই ওহী ছাড়া মানবীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জানা যায় না। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের বিকৃতি বা বিলুপ্তির কারণেই বিভিন্ন জাতি বিভ্রান্ত হয়েছে।

১. ১. ২. ওহীর বিকৃতি বা বিলুপ্তির কারণ

কুরআন-হাদীসের বর্ণনা এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ দুটি:

১. অবহেলা, মুখস্থ না রাখা বা অসংরক্ষণের ফলে ওহীলব্ধ জ্ঞান বা গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়া বা বিনষ্ট হওয়া।
২. মানবীয় কথাকে ওহীর নামে চালানো বা ওহীর সাথে মানবীয় কথা বা জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো।[১]

প্রথম পর্যায়ে 'ওহী'-র জ্ঞান একেবারে হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ওহী' নামে কিছু 'জ্ঞান' সংরক্ষিত থাকে, যার মধ্যে 'মানবীয় জ্ঞান ভিত্তিক' কথাও সংমিশ্রিত থাকে। কোন কথাটি ওহী এবং কোন কথাটি মানবীয় তা জানার বা পৃথক করার কোনো উপায় থাকে না। ফলে 'ওহী' নামে সংরক্ষিত গ্রন্থ বা জ্ঞান মূল্যহীন হয়ে যায়। পূর্ববর্তী অধিকাংশ জাতি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ওহীর জ্ঞানকে বিকৃত করেছে। ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য অধিকাংশ ধর্মাবলম্বীদের নিকট 'ধর্মগ্রন্থ', Divine scripture ইত্যাদি নামে কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। যেগুলির মধ্যে অগণিত মানবীয় কথা, বর্ণনা ও মতামত সংমিশ্রিত রয়েছে। ওহী ও মানবীয় কথাকে পৃথক করার কোনো পথ নেই এবং সেগুলি থেকে ওহীর শিক্ষা নির্ভেজালভাবে উদ্ধার করার কোনো পথ নেই।

১. ১. ৩. দুই প্রকার ওহী: কুরআন ও হাদীস

কুরআন কারীমে বারংবার এরশাদ করা হয়েছে যে, মহিমাময় আল্লাহ তাঁর মহান রাসূলকে (ﷺ) দুইটি বিষয় প্রদান করেছেন: একটি 'কিতাব' বা 'পুস্তক' এবং দ্বিতীয়টি 'হিকমাহ' বা 'প্রজ্ঞা'।[২] এই পুস্তক বা 'কিতাব' হলো কুরআন কারীম, যা হুবহু ওহীর শব্দে ও বাক্যে সংকলিত হয়েছে। আর 'হিকমাহ' বা প্রজ্ঞা হলো ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রায়োগিক জ্ঞান যা 'হাদীস' নামে সংকলিত হয়েছে। কাজেই ইসলামে ওহী দুই প্রকার: কুরআন ও হাদীস। ইসলামের এই দুই মুল উৎসকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ওহীর জ্ঞানকে হুবহু নির্ভেজালভাবে সংরক্ষণের জন্য একদিকে কুরআন ও হাদীসকে হুবহু শাব্দিকভাবে মুখস্থ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনো কথাকে মহান আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

১. ১. ৪. হাদীসের ব্যবহারিক সংজ্ঞা

হাদীস বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম বা অনুমোদনকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে হাদীস বলা হয়।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় "যে কথা, কর্ম, অনুমোদন বা বিবরণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বলে প্রচার করা হয়েছে বা দাবী করা হয়েছে" তাই "হাদীস" বলে পরিচিত। এছাড়া সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মারফূ' হাদীস" বলা হয। সাহাবীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে "মাউকূফ হাদীস" বলা হয়। আর তাবেয়ীগণের কর্ম, কথা বা অনুমোদন হিসেবে বর্ণিত হাদীসে "মাকতূ' হাদীস" বলা হয়।[৩]

লক্ষণীয় যে, যে কথা, কাজ, অনুমোদন বা বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বলে দাবী করা হয়েছে বা বলা হয়েছে তাকেই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'হাদীস' বলে গণ্য করা হয়। তা সত্যই রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কথা কিনা তা যাচাই করে নির্ভরতার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় সেগুলি ব্যাখ্যা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ১. ৫. ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্বের বিষয়টি আলোচনা বাহ্যত নিস্প্রয়োজনীয়। কুরআন কারীমের অনেক নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অগণিত নির্দেশ ও সাহাবীগণের কর্ম-পদ্ধতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, 'হাদীস' ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস ও ভিত্তি। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর সকল যুগের সকল মানুষ এ বিষয়ে একমত। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগে হাদীস শিক্ষা, সংকলন, ব্যাখ্যা এবং হাদীসের আলোকে মানব জীবন পরিচালিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে গড়ে উঠেছে হাদীস বিষয়ক সুবিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার।

তবে কতিপয় ইহূদী-খৃস্টান 'প্রাচ্যবিদ' পণ্ডিত ও মুসলিম উম্মাহর কোনো কোনো 'পণ্ডিত' বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাবে হাদীসের গুরুত্ব অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে উপস্থাপিত 'দলিল'-সমূহকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি:

(১) কুরআন কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে দাবি করা যে, 'কুরআনেই সব কিছুর বর্ণনা' রয়েছে, কাজেই 'হাদীস' নিস্প্রয়োজনীয়।

(২) হাদীসের বর্ণনা ও সংকলন বিষয়ক কিছু আপত্তি উত্থাপন করে দাবি করা যে, হাদীসের মধ্যে অনেক জালিয়াতি প্রবেশ করেছে, কাজেই তার উপর নির্ভর করা যায় না।

(৩) কিছু হাদীস উল্লেখ করে হাদীসের মধ্যে বিজ্ঞান বা জ্ঞান বিরোধী কথাবার্তা বা বৈপরীত্য আছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা।

(৪) কিছু হাদীস থেকে তাঁরা প্রমাণ (!) পেশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ হাদীসের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমাদের গ্রন্থের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে আমরা আমাদের এ গ্রন্থে হাদীসের জালিয়াতি ও সহীহ হাদীস থেকে জাল হাদীসকে পৃথক করার বিষয়ে আলোচনা করছি। আমাদের সকল আলোচনা এবং সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর সকল শ্রমের মূল ভিত্তিটিই হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের অনুসরণ ছাড়া কুরআন পালন, ইসলাম পালন বা মুসলমান হওয়া যায় না। আমাদের জীবন চলার অন্যতম পাথেয় হাদীসে রাসূল (ﷺ)। তবে আমাদের অবশ্যই বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

হাদীস বাদ দিলে আর কোনোভাবেই কুরআন মানা বা ইসলাম পালন করা যায় না। হাদীসের বিরুদ্ধে এ সকল মানুষের উত্থাপিত যুক্তিগুলির মধ্যে প্রথম যুক্তিটি আমরা আলোচনা করতে পারি। আমরা দেখতে পাব যে, কুরআন মানতে হলে হাদীস মানা আবশ্যক। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

(১) 'ওহী'র মাধ্যমে যে নির্দেশনা মানব জাতি লাভ করে তার বাস্তব প্রয়োগ ও পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ হন 'ওহী-প্রাপ্ত নবীগণ' ও তাঁদের সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্য বা সঙ্গীগণ। তাঁদের জীবনাদর্শই মূলত অন্যদের জন্য 'ওহী'র অনুসরণ ও পালনের একমাত্র চালিকা শক্তি। এ জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্ম-প্রচারক ও তাঁর শিষ্য, প্রেরিত বা সহচরদের জীবন, কর্ম ও আদর্শকে 'ধর্ম' পালনের মূল

উৎসরূপে সংরক্ষণ ও শিক্ষা দান করেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ, ধৈর্য, মানবপ্রেম, আল্লাহর ভয়, সত্যের পথে আপোষহীনতা... ইত্যাদি 'হাদীস' ছাড়া জানা সম্ভব নয়। একজন মুসলমানকে হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অতি সহজেই তাঁকে কুরআন থেকে এবং ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হয়।

(২) হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআন'-এর পরিচয় লাভ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবন, পরিচয়, বিশ্বস্ততা, সততা, নবুয়ত ইত্যাদি কোনো তথ্যই হাদীসের মাধ্যমে ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তিনি কিভাবে কুরআন লাভ করলেন, শিক্ষা দিলেন, সংকলন করলেন... ইত্যাদি কোনো কিছুই হাদীসের তথ্যাদি ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

(৩) হাদীসের উপর নির্ভর না করলে 'কুরআন' মানাও সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে 'সকল কিছুর' বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তা সবই শুধুমাত্র 'মূলনীতি' বা 'প্রাথমিক নির্দেশনা' রূপে। কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই 'প্রাথমিক নির্দেশ', ব্যাখ্যা ছাড়া যেগুলি পালন করা অসম্ভব। ইসলামের সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম 'সালাত' বা নামায। কুরআন কারীমে শতাধিক স্থানে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সালাতের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয় নি। বিভিন্ন স্থানে রুকু করার ও সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'যেভাবে তোমাদেরকে সালাত শিখিয়েছি সেভাবে সালাত আদায় কর'। কিন্তু কুরআন কারীমে কোথাও সালাতের এই পদ্ধতিটি শেখানো হয় নি। 'সালাত' বা 'নামায' কী, কখন তা আদায় করতে হবে, কখন কত রাক'আত আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আত কী পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, প্রত্যেক রাক'আতে কুরআন পাঠ কিভাবে হবে, রুকু কয়টি হবে, সাজদা কয়টি হবে, কিভাবে রুকু ও সাজদা আদায় করতে হবে.... ইত্যাদি কোনো কিছুই কুরআনে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশকে আমরা কোনোভাবেই হাদীসের উপর নির্ভর না করে আদায় করতে পারছি না। এভাবে কুরআন কারীমের অধিকাংশ নির্দেশই হাদীসের ব্যাখ্যা ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়।

(৪) কুরআন কারীমে কিছু নির্দেশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। যেমন কোথাও মদ, জুয়া ইত্যাদিকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও তা অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কাফির ও অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও সকল প্রকার বিরোধিতা ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসের নির্দেশনা ছাড়া এ সকল নির্দেশের কোনটি আগে, কোন্‌টি পরে এবং কিভাবে সেগুলি পালন করতে হবে তা জানা যায় না। এজন্য হাদীস বাদ দিলে এ সকল আয়াতের ইচ্ছামত ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ হয়ে যায়।

মূলত এজন্যই ইহূদী, খৃস্টান, কাদিয়ানী, বাহাঈ প্রমুখ সম্প্রদায় হাদীসের বিরুদ্ধে ঢালাও অপপ্রচার চালান। তাঁদের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। তাঁরাও জানেন যে, হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোনোভবেই কুরআন মানা যায় না। শুধুমাত্র সরলপ্রাণ মুসলিমকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তারা মূলত 'কুরআনের' নাম নেন।

(৫) আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে দুটি বিষয় প্রদান করেছেন: 'কিতাব' (পুস্তক) ও 'হিকমাহ' (প্রজ্ঞা)। স্বভাবতই কুরআনও প্রজ্ঞা ও হিকমাহ। তবে বারংবার পৃথকভাবে উল্লেখ করা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কুরআনের অতিরিক্ত 'প্রজ্ঞা' বা জ্ঞান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে (ﷺ) প্রদান করেছিলেন এবং তিনি কুরআন ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক শিক্ষা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন এই 'প্রজ্ঞা' থেকে। আমরা জানি যে, কুরআনের অতিরিক্ত যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেছিলেন তাই 'হাদীস'-রূপে সংকলিত। 'হাদীস' ছাড়া তাঁর 'প্রজ্ঞা' জানার ও মানার আর কোনো উপায় নেই। কাজেই কুরআনের নির্দেশ অনুসারেই আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের অনুসরণে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

(৬) কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে 'অনুসরণ' করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।"[৪]

আমরা জানি যে, আনুগত্য অর্থ আদেশ-নিষেধ পালন করা। আর কারো অনুসরণের অর্থ অবিকল তাঁর কর্মের মত কর্ম করা। হাদীসের উপর নির্ভর না করলে কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কুরআন কারীমে আদেশ নিষেধ উল্লেখ করা হলেও কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম ও জীবনরীতি আলোচিত হয় নি। এজন্য কুরআন দেখে রাসূলুল্লাহর 'অনুসরণ' করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। কাজেই 'কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর প্রেম ও ক্ষমা লাভ করতে হলে অবশ্যই হাদীসের বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে হবে।

(৭) কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে যে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে...।"[৫]

ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাস্তব জীবনরীতি কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআনের নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

(৮) কুরআন কারীমের এরশাদ করা হয়েছে যে,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।"[৬]

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সুদীর্ঘ নবুওয়তি জীবনে অনেক অনেক শিক্ষা প্রদান করেছেন তাঁর সাহাবীগণকে। জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে খুটিনাটি অনেক দিকনির্দেশনা তিনি প্রদান করেছেন। এ সকল শিক্ষা ও নির্দেশনাও 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন'-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'রাসূল যা দিয়েছেন' সবকিছু গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।

হাদীস সংকলন, লিখন, বর্ণনা ও জালিয়াতি বিষয়ক তাঁদের অন্যান্য আপত্তির বিষয় আমরা এই পুস্তকের অন্যান্য আলোচনা থেকে জানতে পারব। তবে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে, কুরআনের নির্দেশনা অনুসারেই আমাদেরকে হাদীসের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে, হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণ করতে হবে, হাদীসের আলোকে রাসূলের (ﷺ) আদর্শে জীবন গড়তে হবে এবং হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশাবলি পালন করতে হবে। আমরা আরো দেখছি যে, হাদীস ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কুরআন পালন বা ইসলামী জীবন গঠন সম্ভব নয়।

হাদীসের গুরুত্বের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ মূলত একমত। আর এজন্যই হাদীসের নামে জালিয়াতি ও মিথ্যা প্রতিরোধের সর্বোত্তম নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাঁরা। তাঁদের নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতির আলোচনার আগে আমরা মিথ্যার পরিচয় ও ওহীর নামে মিথ্যার বিধান আলোচনা করব। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. ২. মিথ্যা ও ওহীর নামে মিথ্যা

১. ২. ১. মিথ্যার সংজ্ঞা

প্রসিদ্ধ ও পরিজ্ঞাত বিষয় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। মিথ্যার সংজ্ঞা কি? সত্যের বিপরীতই মিথ্যা। যা সত্য নয় তাই মিথ্যা। এমন কিছু বলা, যা প্রকৃত পক্ষে ঠিক নয় বা সত্য নয় তাই মিথ্যা।

১. ২. ১. ১. ইচ্ছাকৃত বনাম অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা

বিষয়টি স্পষ্ট। তবে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার বিষয়ে মুসলিম আলিমদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আলেমগণ মনে করতেন যে, ভুলবশত যদি কেউ কোনো কিছু বলেন যা প্রকৃত অবস্থার বিপরীত তবে তা শরীয়তের পরিভাষায় মিথ্যা বলে গণ্য হবে না। শুধুমাত্র জেনেশুনে মিথ্যা বললেই তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ এই ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের মতে, না-জেনে বা ভুলে মিথ্যা বললেও তা শরীয়তের পরিভাষায় মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) বলেন: "হক্ক-পন্থী আলিমদের মত হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে, অনিচ্ছায়, ভুলে বা অজ্ঞতার কারণে প্রকৃত অবস্থার বিপরীত কোনো কথা বলাই মিথ্যা।"[৭]

তিনি আরো বলেন: "আমাদের আহলুস সুন্নাহ-পন্থী আলিমগণের মতে মিথ্যা হলো প্রকৃত অবস্থার বিপরীত কোনো কথা বলা, তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলে হোক। মু'তাযিলাগণের মতে শুধু ইচ্ছাকৃত মিথ্যাই মিথ্যা বলে গণ্য হবে।"[৮]

১. ২. ১. ২. হাদীসের আলোকে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা

হাদীসের ব্যবহার থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে, অনিচ্ছাকৃতভাবে, অজ্ঞতার কারণে বা যে কোনো কারণে বাস্তবের বিপরীত যে কোনো কথা বলাই মিথ্যা বলে গণ্য। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেখুন :

১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন,

إِنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَذَبْتَ، لاَ يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ».

হাতিবের (রা) একজন দাস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলে: হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয় হাতিব জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তুমি মিথ্যা বলেছ। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না; কারণ সে বদর ও হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিল।[৯]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতিবের এ দাসের কথাকে 'মিথ্যা' বলে গণ্য করেছেন। সে অতীতের কোনো বিষয়ে ইচ্ছাকৃত

কোনো মিথ্যা বলেনি। মূলত সে ভবিষ্যতের বিষয়ে তার একটি ধারণা বলেছে। সে যা বিশ্বাস করেছে তাই বলেছে। তবে যেহেতু তার ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবের বিপরীত সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অতীত বা ভবিষ্যতের যে কোনো সংবাদ যদি সত্য বা বাস্তবের বিপরীত হয় তাহলে তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে, সংবাদদাতার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অজ্ঞতা বা অন্য কোনো বিষয় এখানে ধর্তব্য নয়। তবে মিথ্যার পাপ বা অপরাধ ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত।

২. তাবিয়ী সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে (রা) বলতে শুনেছি:

بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى ذَا الْحُلَيْفَةِ

এ হলো তোমাদের বাইদা প্রান্তর, যে প্রান্তরের বিষয়ে তোমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বল (তিনি এই স্থান থেকে হজ্জের এহরাম শুরু করেছিলেন বলে তোমরা বল।) অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুল হুলাইফার মসজিদের নিকট থেকে হজ্জের এহরাম করেছিলেন।[১০]

স্বভাবতই ইবনু উমার (রা) এসকল ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলার অভিযোগ করছেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে 'যুল হুলাইফা' প্রান্তরে রাত্রি যাপন করেন এবং পরদিন সকালে সেখান থেকে হজ্জের এহরাম করেন। যুল হুলাইফা প্রান্তরের সংলগ্ন 'বাইদা' প্রান্তর। যে সকল সাহাবী কিছু দূরে ছিলেন তাঁরা তাঁকে যুল হুলাইফা থেকে এহরাম বলতে শুনেন নি, বরং বাইদা প্রান্তরে তাঁকে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তাঁরা মনে করেন যে, তিনি বাইদা থেকেই এহরাম শুরু করেন। একারণে অনেকের মধ্যে প্রচারিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাইদা প্রান্তর থেকে এহরাম শুরু করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার যেহেতু কাছেই ছিলেন, সেহেতু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইদা থেকে এহরাম করার তথ্যটি ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল। যারা তথ্যটি প্রদান করেছেন তারা তাদের জ্ঞাতসারে সত্যই বলেছেন। কিন্তু তথ্যটি যেহেতু বাস্তবের বিপরীত এজন্য ইবনু উমর তকে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন।

১. ২. ১. ৩. মিথ্যা বনাম 'মাউদূ' (মাউযূ)[১১] ও 'বাতিল'

হাদীসের পরিভাষায় ও ১ম শতকে সাহাবী-তাবিয়ীগণের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত মিথ্যাকে حديث كذب বা 'মিথ্যা হাদীস' বলে অভিহিত করা হতো। আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثاً كَذِباً مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে 'মিথ্যা হাদীস' বলবে তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।[১২]

যে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নি তা তাঁর নামে বলা হলে সাহাবী ও তাবিয়িগণ বলতেন: 'هذا الحديث كذب' এই হাদীসটি মিথ্যা, 'حديث كذب' মিথ্যা হাদীস বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করতেন। এই ধরনের মানুষদের সম্পর্কে 'মিথ্যাবাদী' (كذاب), 'সে মিথ্যা বলে' (يكذب) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন।[১৩]

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীসের নামে মিথ্যার প্রসারের সাথে সাথে এ সকল মিথ্যাবাদীদের চিহ্নিত করতে মুহাদ্দিসগণ 'মিথ্যা'-র সমার্থক আরেকটি শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। শব্দটি 'الوضع'। শব্দটির মূল অর্থ নামানো, ফেলে দেওয়া, জন্ম দেওয়া। বানোয়াটি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১৪] ইংরেজিতে: To lay, lay off, lay on, lay down, put down, set up... give birth, produce ...humiliate, to be low, humble...[১৫]

পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এ শব্দের ব্যবহারই ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁদের পরিভাষায় হাদীসের নামে মিথ্যা বলাকে 'ওয়াদউ' (وضع) এবং এধরণের মিথ্যা হাদীসকে 'মাউদূ' (موضوع) বলা হয়। ফার্সী-উর্দু প্রভাবিত বাংলা উচ্চারণে আমরা সাধারণত বলি 'মাউযূ'।

অনেক মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বা ভুল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উভয় প্রকার মিথ্যা হাদীসকেই তাঁরা মাউদূ (موضوع) হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] বাংলায় আমরা মাউদূ অর্থ বানোয়াট বা জাল বলতে পারি।

মুহাদ্দিসগণ মাউযূ (মাউদূ) হাদীসের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন দুইভাবে: অনেক মুহাদ্দিস মাউযূ হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন: 'المختلق المصنوع' "বানোয়াট জাল হাদীসকে মাউযূ হাদীস বলা হয়।" এখানে তাঁরা হাদীসের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[১৭]

অন্যান্য মুহাদ্দিস মাউযূ হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেন: (ما تفرد بروايته كذاب) "যে হাদীস শুধুমাত্র কোনো মিথ্যাবাদী রাবী বর্ণনা করেছে তা মাউযূ হাদীস।"[১৮] এখানে তাঁরা মাউযূ বা জাল হাদীসের সাধারণ পরিচয়ের দিকে লক্ষ্য করেছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, মুহাদ্দিসগণ মূলত তুলনামূলক নিরীক্ষার (Cross Examine) মাধ্যমে রাবীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করতেন। নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোনো একটি হাদীস একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করছেন না তবে তাঁরা হাদীসটিকে মিথ্যা বা মাউযূ বলে গণ্য করতেন।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাকে 'বাতিল' (باطل) ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যাকে 'মাউযূ' বা 'মাউদূ' (موضوع) বলে অভিহিত করেছেন। মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, এই বাক্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি, কিন্তু ভুল করে তাঁর নামে বলা হয়েছে, তাহলে তাঁরা সেই হাদীসটিকে 'বাতিল' বলে অভিহিত করেন। আর যদি নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে, বর্ণনাকারী ইচ্ছাপূর্বক বা জ্ঞাতসারে এই কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলেছে, তাহলে তাঁরা একে 'মাউযূ' নামে আখ্যায়িত করেন।[১৯]

মিথ্যা হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রথম পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছেন। তাঁরা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার মিথ্যাকেই 'মাউযূ' (موضوع) বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, যে কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন নি বা যে কর্ম তিনি করেন নি, অথচ তাঁর নামে কথিত বা প্রচারিত হয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করে ওহীর নামে জালিয়াতি রোধ করা। বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাটি বলেছেন, না ভুলক্রমে তা বলেছেন সে বিষয় তাঁদের বিবেচ্য নয়। এ বিষয় বিবেচনার জন্য রিজাল ও জারহ ওয়াত্ তা'দীল শাস্ত্রে পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।[২০]

১. ২. ২. মিথ্যার বিধান

ওহী বা হাদীসের নামে মিথ্যা বলার বিধান আলোচনার আগে আমরা সাধারণভাবে মিথ্যার বিধান আলোচনা করতে চাই। মিথ্যাকে ঘৃণা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। এজন্য সকল মানব সমাজে মিথ্যাকে পাপ, অন্যায় ও ঘৃণিত মনে করা হয়। কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে মিথ্যাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদিগক সর্বাবস্থায় সত্যপরায়ণ হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে মিথ্যাকে ঘৃণিত পাপ ও কঠিন শাস্তির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সার্বক্ষণিক সত্যবাদিতার নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হও।[২১]

মিথ্যার ভয়ানক শাস্তির বিষয়ে বলা হয়েছে:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলত।[২২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

পরিণামে তিনি (আল্লাহ) তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করলেন আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত, কারণ তারা আল্লাহর নিকট যে অংগীকার করেছিল তা ভংগ করেছিল এবং তারা ছিল মিথ্যাচারী।[২৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[২৪]

অগণিত হাদীসে মিথ্যাকে ভয়ঙ্কর পাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ (الصِّدْقُ بِرٌّ) وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ)

حَتَّى يُكْتَبَ (عِنْدَ اللهِ) صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (الْكَذِبُ فُجُورٌ) وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ (لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ) حَتَّى يُكْتَبَ (عِنْدَ اللَّهِ) كَذَّابًا

সত্য পুণ্য। সত্য পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যে মানুষটি সদা সর্বদা সত্য বলতে সচেষ্ট থাকেন তিনি একপর্যায়ে আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' বা মহা-সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ হন। আর মিথ্যা পাপ। মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। যে মানুষটি মিথ্যা বলে বা মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে সে এক পর্যায়ে মহা-মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।[২৫]

হাদীস শরীফে মিথ্যা বলাকে মুনাফিকীর অন্যতম চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে যে, মুমিন অনেক অন্যায় করতে পারে, কিন্তু কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

মুমিনের প্রকৃতিতে সব অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা থাকতে পারে না।[২৬]

১. ২. ৩. ওহীর নামে মিথ্যা

মিথ্যা সর্বদা ঘৃণিত। তবে তা যদি ওহীর নামে হয় তাহলে তা আরো বেশি ঘৃণিত ও ক্ষতিকর। সাধারণভাবে মিথ্যা ব্যক্তিমানুষের বা মানব সমাজের জন্য জাগতিক ক্ষতি বয়ে আনে। আর ওহীর নামে মিথ্যা মানব সমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক স্থায়ী ধ্বংস ও ক্ষতি করে। মানুষ তখন ধর্মের নামে মানবীয় বুদ্ধি প্রসূত বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হয়ে জাগতিক ও পারলৌকিক ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়।

পূর্ববর্তী ধর্মগুলির দিকে তাকালে আমরা বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমরা আগেই বলেছি যে, মানবীয় জ্ঞান প্রসূত কথাকে ওহীর নামে চালানোই ধর্মের বিকৃতি ও বিলুপ্তির কারণ। সাধারণভাবে এ সকল ধর্মের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্মের কল্যাণেই এ সকল কথা ওহীর নামে চালিয়েছেন। তারা মনে করেছেন যে, তাদের এ সকল কথা, ব্যাখ্যা, মতামত ওহীর নামে চালালে মানুষের মধ্যে 'ধার্মিকতা', 'ভক্তি' ইত্যাদি বাড়বে এবং আল্লাহ খুশি হবেন। আর এভাবে তারা তাদের ধর্মকে বিকৃত ও ধর্মাবলম্বীদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু তারা বুঝেন নি যে, মানুষ যদি মানবীয় প্রজ্ঞায় এ সকল বিষয় বুঝতে পারতো তাহলে ওহীর প্রয়োজন হতো না।

এর অত্যন্ত পরিচিত উদাহরণ খৃস্টধর্ম। প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী 'যীশুখৃস্ট' তাঁর অনুসারীদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, ইহুদী ধর্মের ১০ মূলনির্দেশ পালন করতে, খাতনা করতে, তাওরাতের সকল বিধান পালন করতে, শূকরের মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে ও অনরূপ অন্যান্য কর্মের নির্দেশ প্রদান করেন। সাধু শৌল পৌল নাম ধারণ করে 'খৃস্টধর্মের প্রচার ও মানুষের মধ্যে ভক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে' প্রচার করতে থাকেন যে, শুধুমাত্র 'যীশুখৃস্টকে' বিশ্বাস ও ভক্তি করলেই চলবে, এ সকল কর্ম না করলেও চলবে। প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের বিভিন্ন স্থানে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছেন যে, আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের পছন্দ মত মিথ্যা বলি, যেন ঈশ্বরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এক স্থানে তিনি লিখেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[২৭]।

এভাবে তিনি মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ক্রমান্বয়ে এই পৌলীয় কর্মহীন ভক্তিধর্মই খৃস্টানদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানব সন্তান শিরক-কুফর ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু বিশ্বাসেই স্বর্গ, সেহেতু কোনোভাবেই ধর্মোপদেশ দিয়ে খৃস্টান সমাজগুলি থেকে মানবতা বিধ্বংসী পাপ, অনাচার ও অপরাধ কমানো যায় না।

ওহীর নামে মিথ্যা সবচেয়ে কঠিন মিথ্যা হওয়ার কারণে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে ওহীর নামে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে মিথ্যা বলতে, সন্দেহ জনক কিছু বলতে বা আন্দাজে কিছু বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ উভয় প্রকারের ওহী যেন কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকে সেজন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১. ২. ৪. মিথ্যা থেকে ওহী রক্ষার কুরআনী নির্দেশনা

'ওহী'র নামে মিথ্যা প্রচারের দুটি পর্যায়: প্রথমত, নিজে ওহীর নামে মিথ্যা বলা ও দ্বিতীয়ত, অন্যের বলা মিথ্যা গ্রহণ ও প্রচার করা। উভয় পথ রুদ্ধ করার জন্য কুরআন কারীমে একদিকে আল্লাহর নামে মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে কারো প্রচারিত কোনো তথ্য বিচার ও যাচাই ছাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১. ২. ৪. ১. আল্লাহর নামে মিথ্যা ও অনুমান নির্ভর কথার নিষেধাজ্ঞা

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বারংবার আল্লাহর নামে মিথ্যা বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে না-জেনে,

আন্দাজে, ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে আল্লাহর নামে কিছু বলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকেই কথা বলেন। কুরআনের মত হাদীসও আল্লাহর ওহী। কুরআন ও হাদীস, উভয় প্রকারের ওহীই একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী পেয়েছে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কোনো প্রকারের মিথ্যা, বানোয়াট, আন্দাজ বা অনুমান নির্ভর কথা বলার অর্থই আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা বা না-জেনে আল্লাহর নামে কিছু বলা। কুরআন কারীমে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২৮] এখানে কয়েকটি বাণী উল্লেখ করছি।

১. কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

"আল্লাহর নামে বা আল্লাহর সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?"[২৯]

২. অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى

"দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে।"[৩০]

৩. কুরআন কারীমে বারংবার না-জেনে, আন্দাজে বা অনুমান নির্ভর করে আল্লাহ, আল্লাহর দ্বীন, বিধান ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পাবিত্র খাদ্যবস্ত রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।[৩১]

৪. অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

"বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা- যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেন নি, এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।"[৩২]

এভাবে কুরআন কারীমে ওহীর জ্ঞানকে সকল ভেজাল ও মিথ্যা থেকে রক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহিমাময় আল্লাহ, তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর দ্বীন, তাঁর বিধান ইত্যাদি কোনো বিষয়ে মিথ্যা, বানোয়াট, আন্দাজ বা অনুমান নির্ভর কথা বলা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

১. ২. ৪. ২. যে কোনো তথ্য গ্রহণের পূর্বে যাচাইয়ের নির্দেশ

নিজে আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের কোনো অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যা বা অনুমান নির্ভর বর্ণনা বা বক্তব্য গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। যে কোনো সংবাদ বা বক্তব্য গ্রহণে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না কর, এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"[৩৩]

এই নির্দেশের আলোকে, কেউ কোনো সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদান করলে তা গ্রহণের পূর্বে সেই ব্যক্তির ব্যক্তিগত সততা ও তথ্য

প্রদানে তার নির্ভুলতা যাচাই করা মুসলিমের জন্য ফরয। জাগতিক সকল বিষয়ের চেয়েও বেশি সতর্কতা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিষয়ক বার্তা বা বাণী গ্রহণের ক্ষেত্রে। কারণ জাগতিক বিষয়ে ভুল তথ্য বা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে মানুষের সম্পদ, সম্ভ্রম বা জীবনের ক্ষতি হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বা ওহীর জ্ঞানের বিষয়ে অসতর্কতার পরিণতি ঈমানের ক্ষতি ও আখিরাতের অনন্ত জীবনের ধ্বংস। এজন্য মুসলিম উম্মাহ সর্বদা সকল তথ্য, হাদীস ও বর্ণনা পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন।

১. ২. ৫. মিথ্যা থেকে ওহী রক্ষায় হাদীসের নির্দেশনা

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার বিকৃতি, ভুল বা মিথ্যা থেকে তাঁর বাণী বা হাদীসকে রক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. ২. ৫. ১. বিশুদ্ধরূপে হাদীস মুখস্থ রাখার ও প্রচারের নির্দেশনা

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীস বা বাণী হুবহু বিশুদ্ধরূপে মুখস্থ করে তা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

نَضَّرَ اللهُ عَبْداً (وَجْهَ عَبْدٍ) سَمِعَ مَقَالَتِيْ (مِنَّا حَدِيْثاً) فَوَعَاهَا (وَحَفِظَهَا) ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

"মহান আল্লাহ সমুজ্জল করুন সেই ব্যক্তির চেহারা যে আমার কোনো কথা শুনল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করল ও মুখস্থ করল এবং যে তা শুনেনি তার কাছে তা পৌঁছে দিল।" এই অর্থে আরো অনেক হাদীস অন্যান্য অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত ও সংকলিত হয়েছে।[৩৪]

১. ২. ৫. ২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞা

অপরদিকে কোনো মানবীয় কথা যেন তাঁর নামে প্রচারিত হতে না পারে সেজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নামে মিথ্যা বা অতিরিক্ত কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ [يَكْذِبْ] عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.

"তোমরা আমার নামে মিথ্যা বলবে না; কারণ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।"[৩৫]

যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৩৬]

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমি যা বলিনি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৩৭]

এভাবে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ'-সহ প্রায় ১০০ জন সাহাবী এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাবধান বাণী বর্ণনা করেছেন। আর কোনো হাদীস এত বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি।[৩৮]

১. ২. ৫. ৩. বেশি হাদীস বলা ও মুখস্থ ছাড়া হাদীস বলার নিষেধাজ্ঞা

বেশি হাদীস বলতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। বিশুদ্ধ মুখস্থ ও নির্ভুলতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বলেন,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّيْ! فَمَنْ قَالَ عني فَلْيَقُلْ حَقًّا وَصِدْقًا (فلا يقل إلا حقا) وَمَنْ تَقَوَّلَ (قال) عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"খবরদার! তোমরা আমার নামে বেশি বেশি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকবে। যে আমার নামে কিছু বলবে, সে যেন সঠিক কথা বলে। আর যে আমার নামে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি তাকে জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৩৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلا مَا عَلِمْتُمْ.

"তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা পরিহার করবে, শুধুমাত্র যা তোমরা জান তা ছাড়া।"[৪০]

আবু মূসা মালিক ইবনু উবাদাহ আল-গাফিকী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সর্বশেষ ওসীয়ত ও নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَسَتَرْجِعُوْنَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ- أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا- فَمَنْ حَفِظَ شَيْئاً فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"তোমরা আল্লাহর কিতাব সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে ও অনুসরণ করবে। আর অচিরেই তোমরা এমন সম্প্রদায়ের নিকট গমন করবে যারা আমার নামে হাদীস বলতে ভালবাসবে। যদি কারো কোনো কিছু মুখস্থ থাকে তাহলে সে তা বলতে পারে। আর যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কিছু বলবে যা আমি বলিনি তাকে জাহান্নামে তার আবাসস্থল গ্রহণ করতে হবে।"[৪১]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে তাঁর হাদীস হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ রাখতে ও এইরূপ মুখস্থ হাদীস প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে বা সামান্য দ্বিধা থাকলে সে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তিনি যা বলেন নি সে কথা তাঁর নামে বলা নিষিদ্ধ ও কঠিনতম পাপ। ভুলক্রমেও যাতে তাঁর হাদীসের মধ্যে হেরফের না হয় এজন্য তিনি পরিপূর্ণ মুখস্থ ছাড়া হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন। আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন।

১. ২. ৫. ৪. মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের থেকে সতর্ক করা

নিজের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের বানোনো মিথ্যা গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের উদ্ভব হবে বলে তিনি উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুননি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দুরে থাকবে।"[৪২]

ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوْفَ إِبْلِيْسُ فِيْ الأَسْوَاقِ، يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِكَذَا وَكَذَا.

"কেয়ামতের পূর্বেই শয়তান বাজারে-সমাবেশে ঘুরে ঘুরে হাদীস বর্ণনা করে বলবে: আমাকে অমুকের ছেলে অমুক এই এই বিষয়ে এই হাদীস বলেছে।"[৪৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

"শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষদের মধ্যে আগমন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এরপর মিথ্যা হাদীসগুলি শুনে সমবেত মানুষ সমাবেশ ভেঙ্গে চলে যায়। অতঃপর তারা সে সকল মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে বলে: আমি একব্যক্তিকে হাদীসটি বলতে শুনেছি যার চেহারা আমি চিনি তবে তার নাম জানি না।"[৪৪]

১. ২. ৫. ৫. সন্দেহযুক্ত বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচাই না করে কোনো হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ যাচাই না করে যা শুনে তাই হাদীস বলে গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে তাহলে হাদীস যাচাইয়ে তার অবহেলার জন্য সে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হবে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীস বানানোর জন্য নয়, শুধুমাত্র সত্যমিথ্যা যাচাই না করে হাদীস গ্রহণ করাই তার মিথ্যাবাদী বানানোর জন্য যথেষ্ট বলে হাদীসে বলা হয়েছে। উপরন্তু, যদি কোনো হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নিভুলতা সম্পর্কে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি সেই হাদীস বর্ণনা করে তাহলে সেও মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে ও মিথ্য হাদীস বলার পাপে পাপী হবে।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[৪৫]

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) ও মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[৪৬]

১. ২. ৬. হাদীসের নামে মিথ্যা বলার বিধান

১. ২. ৬. ১. হাদীসের নামে মিথ্যা বলা কঠিনতম কবীরা গোনাহ

উপরে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বা মানুষের কথাকে হাদীস বলে চালানো জঘন্যতম পাপ ও অপরাধ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনোরূপ সংশয় বা দ্বিধা নেই। আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ সামান্যতম অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতামূলক ভুলের ভয়ে হাদীস বলা থেকে বিরত থাকতেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলকেও তারা ভয়ানক পাপ মনে করে সতর্কতার সাথে পরিহার করতেন। এছাড়া অন্যের বানোনো মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করাকেও তাঁরা মিথ্যা হাদীস বানানোর মত অপরাধ বলে মনে করতেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) বলেন: এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্য বলা কঠিনতম হারাম, ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ এবং তা জঘন্যতম ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে এই অপরাধের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে না। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কোনো মিথ্যা বলবে সে যদি তার এই মিথ্যা বলাকে হালাল মনে না করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। সে পাপী মুসলিম। আর যদি সে এই কঠিনতম পাপকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। আবু মুহাম্মাদ আল-জুআইনী ও অন্যান্য কতিপয় ইমাম এই অপরাধকে কুফুরী বলে গণ্য করেছেন। জুআইনী বলতেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলবে সে কাফির বলে গণ্য হবে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।

এ সকল হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যে কোনো মিথ্যাই সমভাবে হারাম, তা যে বিষয়েই হোক। শরীয়তের বিধিবিধান, ফযীলত, ওয়ায, নেককাজে উৎসাহ প্রদান, পাপের ভীতি বা অন্য যে কোনো বিষয়ে তাঁর নামে কোনো মিথ্যা বলা কঠিনতম হারাম ও ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে। যাঁরা মতামত প্রকাশ করতে পারেন এবং যাঁদের মতামত গ্রহণ করা যায় তাঁদের সকলেই এ বিষয়ে একমত।[৪৭]

১. ২. ৬. ২. মাউযূ হাদীস উল্লেখ বা প্রচার করাও কঠিনতম হারাম

ইমাম নববী আরো বলেন: জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করাও হারাম, তা যে অর্থেই হোক না কেন। তবে মিথ্যা হাদীসকে মিথ্যা হিসাবে জানানোর জন্য তার বর্ণনা জায়েয।[৪৮]

অন্যত্র তিনি বলেন: যদি কেউ জানতে পারেন যে, হাদীসটি মাউযূ অর্থাৎ মিথ্যা বা জাল, অথবা তার মনে জোরালো ধারণা হয় যে, হাদীসটি জাল তাহলে তা বর্ণনা করা তার জন্য হারাম। যদি কেউ জানতে পারেন অথবা ধারণা করেন যে, হাদীসটি মিথ্যা এবং তারপরও তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন, কিন্তু হাদীসটির বানোয়াট হওয়ার বিষয় উল্লেখ না করেন, তবে তিনিও হাদীস বানোয়াটকারী বলে গণ্য হবেন এবং এ সকল হাদীসে উল্লিখিত ভয়ানক শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন।[৪৯]

ইমাম যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি) বলেন: মাউযূ বা জাল হাদীস যে বিষয়ে বা যে অর্থেই হোক্, তা বলা হারাম। আহকাম, গল্প-কাহিনী, ফযীলত, নেককর্মে উৎসাহ, পাপ থেকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন, যে ব্যক্তি তাকে মাউযূ বলে জানতে পারবে তার জন্য তা বর্ণনা করা, প্রচার করা, তার দ্বারা দলীল দেওয়া বা তার দ্বারা ওয়ায করা জায়েয নয়। তবে হাদীসটি যে জাল ও বানোয়াট সেকথা উল্লেখ করে তা বলা যায়।[৫০]

১. ২. ৬. ৩. হাদীস বানোয়াটকারীর তাওবার বিধান

হাদীসের নামে মিথ্যা বলা ও অন্যান্য বিষয়ে মিথ্যা বলার মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য হলো, হাদীসের নামে মিথ্যাবাদীর তাওবা মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কোনো ব্যক্তির বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোনো কথাকে মিথ্যাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে উল্লেখ করেছেন বা প্রচার করেছেন এবং এরপর তিনি তাওবা করেছেন, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতেও পারেন, তবে মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি তাওবার কারণে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পাবেন না। মুহাদ্দিসগণ আর কখনোই ঐ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সত্য ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করবেন না।

পঞ্চম শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আহমদ ইবনু সাবিত খাতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) বলেন: যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সে যদি তাওবা করে এবং তাঁর সততা প্রমাণিত হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে বলে ইমাম মালিক উল্লেখ করেছেন। আর যদি কেউ হাদীস জাল করে, হাদীসের মধ্যে কোনো মিথ্যা বলে বা যা শোনেনি তা শুনেছে বলে দাবী করে তাহলে তার বর্ণিত হাদীস কখনোই সত্য বা সঠিক বলে গণ্য করা যাবে না। আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সে যদি পরে তাওবা করে তাহলেও তার বর্ণিত কোনো হাদীস সত্য বলে গণ্য করা যাবে না। ইমাম আহমদ (২৪১ হি)-কে প্রশ্ন করা হয়: একব্যক্তি একটিমাত্র হাদীসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছিল, এরপর সে তাওবা করেছে এবং মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করেছে, তার বিষয়ে কী করণীয়? তিনি বলেন: তার তাওবা তার ও আল্লাহর মাঝে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কবুল করতে পারেন। তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীস আর কখনোই সঠিক বলে গ্রহণ করা যাবে না বা কখনোই তার বর্ণনার উপর নির্ভর করা যাবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি), আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (১৮১ হি) ও অন্যান্য ইমামও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম বুখারীর অন্যতম উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল-হুমাইদী (২১৯ হি) বলেন, যদি কেউ হাদীস বর্ণনা করতে যেয়ে বলে: আমি অমুকের কাছে হাদীসটি শুনেছি, এরপর প্রমাণিত হয় যে, সে উক্ত ব্যক্তি থেকে হাদীসটি শোনেনি, বা অন্য কোনোভাবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তার মিথ্যা ধরা পড়ে তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীসই আর সঠিক বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যাবে না। খতীব বাগদাদী বলেন, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ধরা পড়লে সেক্ষেত্রে এই বিধান।[৫১]

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (১০৫২ হি) বলেন: যদি কোনো ব্যক্তির বিষয়ে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জীবনে একবারও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার কথা প্রমাণিত হয় তবে তার বর্ণিত কোনো হাদীস সঠিক বা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে না, যদিও সে তাওবা করে।[৫২]

১. ২. ৭. হাদীসের নামে মিথ্যা বলার উন্মেষ

আমরা জানি যে, সকল সমাজ, জাতি ও ধর্মে মিথ্যা ও মিথ্যাবাদী ঘৃণিত। সত্যবাদীতা সর্বদা ও সর্বত্র প্রশংসিত ও নন্দিত। এজন্যই আরবের জাহিলী সমাজেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতুলনীয় সত্যবাদিতা প্রশংসিত হয়েছে। তিনি 'আল-আমীন' ও 'আস-সাদিক': বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহচর সাহাবীগণকে অনুপম অতুলনীয় সত্যবাদিতার উপর গড়ে তুলেছেন। তাঁদের সত্যবাদিতা ছিল আপোষহীন। কোনো কষ্ট বা বিপদের কারণেই তাঁরা সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। উপরন্তু তিনি ওহীর নামে ও হাদীসের নামে মিথ্যা বলতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন এবং এর কঠিন শাস্তির কথা বারংবার বলেছেন।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে ইচ্ছাকৃত কোনো মিথ্যা তো দূরের কথা, সামান্যতম অনিচ্ছাকৃত ভুল বা বিকৃতিকেও তাঁরা কঠিনতম পাপ বলে গণ্য করে তা পরিহার করতেন।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কখনোই কোনো অবস্থায় তাঁর নামে মিথ্যা বলার কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ সাহাবী অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কোনো হাদীসই বলতেন না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মদীনার সমাজে কতিপয় মুনাফিক বাস করত। এদের মধ্যে মিথ্যা বলার প্রচলন ছিল। তবে এরা সংখ্যায় ছিল অতি সামান্য ও সমাজে এদের মিথ্যাবাদিতা জ্ঞাত ছিল। এজন্য তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতেন না এবং তারাও কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার সাহস বা সুযোগ পাননি।

একটি ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, এক যুবক এক যুবতীর পাণিপ্রার্থী হয়। যুবতীর আত্মীয়গণ তার কাছে তাদের মেয়ে বিবাহ দিতে অসম্মত হয়। পরবর্তী সময়ে ঐ যুবক তাদের কাছে গমন করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তোমাদের বংশের যে কোনো মেয়ে বেছে নিয়ে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যুবকটি সেখানে অবস্থান করে। ইত্যবসরে তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে এসে বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন, যুবকটি মিথ্যা বলেছে। তোমরা তাকে জীবিত পেলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। ... তবে তাকে জীবিত পাবে বলে মনে হয় না। ... তারা ফিরে যেয়ে দেখেন যে, সাপের কামড়ে যুবকটির মৃত্যু হয়েছে।..[৫৩]

এই বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য হলে এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলার একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এই বর্ণনাটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কয়েকজন মিথ্যায় অভিযুক্ত ও অত্যন্ত দুর্বল রাবীর মাধ্যমে ঘটনাটি বর্ণিত।[৫৪]

সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে যতদিন মুসলিম সমাজে সাহাবীগণের আধিক্য ছিল ততদিন তাঁর নামে মিথ্যা বলার কোনো ঘটনা ঘটে নি।

সময়ের আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ

সময়ে অনেক সাহাবী মৃত্যুবরণ করেন। অগণিত নও-মুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। ক্রমান্বয়ে তা প্রসার লাভ করতে থাকে।

২৩ হিজরী সালে যুন্নুরাইন উসমান ইবনু আফফান (রা) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৩৫ হিজরী পর্যন্ত প্রায় ১২ বৎসর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে ইসলামী বিজয়ের সাথে সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রসার ঘটে। অগণিত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনা থেকে বহুদূরে মিশর, কাইরোয়ান, কুফা, বাসরা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, খোরাসান ইত্যাদি এলাকায় বসবাস করতেন। সাহাবীগণের সাহচার্য থেকেও তারা বঞ্চিত ছিলেন।

তাঁদের অনেকের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে নি। এদের অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, ইসলাম ধর্ম বা আরবদের প্রতি আক্রোশ ইত্যাদির ফলে এদের মধ্যে বিভিন্ন মিথ্যা ও অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইসলামের অনেক শত্রু সামরিক ময়দানে ইসলামের পরাজয় ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামের ধ্বংসের চেষ্টা করতে থাকে। আর সবচেয়ে কঠিন ও স্থায়ী মিথ্যা যে মিথ্যা ওহী বা হাদীসের নামে প্রচারিত হয়। ইসলামের শত্রুরা সেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে।

এসময়ে এ সকল মানুষ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরদের মর্যাদা, ক্ষমতা, বিশেষত আলী (রা)-এর মর্যাদা, বিশেষ জ্ঞান, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিকত্ব, তাকে ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে ও উসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিন্দায় অগণিত কথা বলতে থাকে। এ সব বিষয়ে অধিকাংশ কথা তারা বলতো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। আবার কিছু কথা তারা আকারে-ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামেও বানিয়ে বলতে থাকে। যদিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে সরাসরি মিথ্যা বলার দুঃসাহস তখনো এ সকল পাপাত্মাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। তখনো অগণিত সাহাবী জীবিত রয়েছেন। মিথ্যা ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তবে মিথ্যার প্রবণতা গড়ে উঠতে থাকে।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম ফকীহ, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) ৩৫ হিজরীর ঘটনা আলোচনা কালে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা ইয়ামানের ইহুদী ছিল। উসমান (রা) এর সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর বিভিন্ন শহরে ও জনপদে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করতে থাকে। হিজাজ, বসরা, কূফা ও সিরিয়ায় তেমন সুবিধা করতে পারে না। তখন সে মিশরে গমন করে। সে প্রচার করতে থাকে: অবাক লাগে তার কথা ভাবতে যে ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে, অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন বলে বিশ্বাস করে না। ঈসার পুনরাগমনের কথা সে সত্য বলে মানে, আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পুনরাগমণের কথা বলতে তা মিথ্য বলে মনে করে।.... হাজারো নবী চলে গিয়েছেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের একজনকে ওসীয়তের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করে গিয়েছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রদত্ত ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি আলী ইবনু আবী তালিব। ... মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী এবং আলী শেষ ওসীয়ত প্রাপ্ত দায়িত্বশীল।... যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীয়ত ও দায়িত্ব প্রদানকে মেনে নিল না, বরং নিজেই ক্ষমতা নিয়ে নিল, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে। ...[৫৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নিজের বিভ্রান্তিগুলিকে যুক্তির আবরণে পেশ করার পাশাপাশি কিছু কথা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলছে। আলী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাকে দায়িত্ব প্রদান না করা যুলুম ইত্যাদি কথা সে বলছে।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে, এই সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে সত্যপরায়ণতার ক্ষেত্রে এই ধরণের দুর্বলতা দেখা দেওয়ায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের নামে মিথ্যা বলা প্রতিরোধের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন।

প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিকে নিজ নিজ বিভ্রান্ত মত প্রমাণের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট হাদীস তৈরি করার প্রবণতা বাড়তে থাকে। সাহাবীগণের নামেও মিথ্যা বলার প্রবণতা বাড়তে থাকে। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুখতার ইবনু আবু উবাইদ সাকাফী (১-৬৭ হি) সাহাবীগণের সমসাময়িক একজন তাবিয়ী। ৬০ হিজরীতে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা) -এর শাহাদতের পরে তিনি ৬৪-৬৫ হিজরীতে মক্কার শাসক আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (১-৭৩ হি) পক্ষ থেকে কুফায় গমন করেন। কুফায় তিনি ইমাম হুসাইনের হত্যায় জড়িতদেরর ধরে হত্যা করতে থাকেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজেকে আলীর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যার প্রতিনিধি বলে দাবী করেন। এরপর তিনি নিজেকে ওহী-ইলহাম প্রাপ্ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিশেষ প্রতিনিধি, খলীফা ইত্যাদি দাবী করতে থাকেন। অবশেষে ৬৭ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

তার এ সকল দাবীদাওয়ার সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য তিনি একাধিক ব্যক্তিকে তার পক্ষে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলার জন্য আদেশ, অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করেন। আবু আনাস হাররানী বলেন, মুখতার ইবনু আবু উবাইদ সাকাফী একজন হাদীস বর্ণনাকারীকে বলেন, আপনি আমার পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে একটি হাদীস তৈরি করুন, যাতে থাকবে যে, আমি তাঁর পরে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করব এবং তাঁর সন্তানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এজন্য আমি আপনাকে দশহাজার দিরহাম, যানবাহন, ক্রীতদাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রদান করব। ঐ হাদীস বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কোনো

হাদীস বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কোনো একজন সাহাবীর নামে কোনো কথা বানানো যেতে পারে। এজন্য আপনি আপনার উপঢৌকন ইচ্ছামত কম করে দিতে পারেন। মুখতার বলেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কিছু হলে তার গুরুত্ব বেশি হবে। ঐ ব্যক্তি বলেনঃ তার শাস্তিও বেশি কঠিন হবে।[৫৬]

মুখতার অনেককেই এভাবে অনুরোধ করে। প্রয়োজনে ভীতি প্রদর্শন বা হত্যাও করেছেন। সালামাহ ইবনু কাসীর বলেন, ইবনু রাব'য়া খুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার কুফায় গমন করি। আমাকে মুখতার সাকাফীর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আমার সাথে একাকী বসে বলেন, জনাব, আপনি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ পেয়েছেন। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কোনো কথা বলেন তা মানুষেরা বিশ্বাস করবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে একটি হাদীস বলে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। এই ৭০০ স্বর্ণমুদ্রা আপনার জন্য। আমি বললামঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার নিশ্চিত পরিণতি জাহান্নাম। আমি তা বলতে পারব না।[৫৭]

সাহাবী আম্মার ইবনু ইয়াসারের (রা) পুত্র মুহাম্মাদ ইবনু আম্মারকেও মুখতার তার পক্ষে তাঁর পিতা আম্মারের সূত্রে মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার করতে নির্দেশ দেয়। তিনি অস্বীকার করলে মুখতার তাকে হত্যা করে।[৫৮]

প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিক থেকে প্রখ্যাত সাহাবীগণের নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা দেখা দেয়। বিশেষত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-এর নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা তার কিছু অনুসারীর মধ্যে দেখা দেয়। তিনি আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) -কে মনে মনে অপছন্দ করতেন বা নিন্দা করতেন, তিনি অলৌকিক সব কাজ করতেন, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বানোয়াট কথা তারা বলতে শুরু করে।

প্রখ্যাত তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ (১১৭ হি) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের (৬৮ হি) নিকট পত্র লিখে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন আমাকে কিছু নির্বাচিত প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে দেন। তখন তিনি বলেনঃ

وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ

"বিশ্বস্ত ও কল্যাণকামী যুবক। আমি তার জন্য কিছু বিষয় বিশেষ করে পছন্দ করে লিখব এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিব। তখন তিনি আলী (রা) এর বিচারের লিখিত পাণ্ডুলিপি চেয়ে নেন। তিনি তা থেকে কিছু বিষয় লিখেন। আর কিছু কিছু বিষয় পড়ে তিনি বলেনঃ আল্লাহর কসম, আলী এই বিচার কখনোই করতে পারেন না। বিভ্রান্ত না হলে কেউ এই বিচার করতে পারে না।"[৫৯]

অর্থাৎ আলীর কিছু অতি-উৎসাহী ও অতি-ভক্ত সহচর তাঁর নামে এমন কিছু মিথ্যা কথা এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে লিখেছে যা তাঁর মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে, যদিও তারা তার মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এগুলি বাড়িয়েছে।

এ বিষয়ে অন্য তাবিয়ী তাউস ইবনু কাইসান (১০৬ হি) বলেনঃ

أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إِلا قَدْرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ

"ইবনু আব্বাস (রা) এর নিকট আলী (রা) এর বিচারের পাণ্ডুলিপি আনয়ন করা হয়। তিনি এক হাত পরিমাণ বাদে সেই পাণ্ডুলিপির সব কিছু মুছে ফেলেন।"[৬০]

প্রখ্যাত তাবিয়ী আবু ইসহাক আস-সাবীয়ী (১২৯ হি) বলেন, যখন আলী (রা)-এর এ সকল অতিভক্ত অনুসারী তাঁর ইন্তেকালের পরে এ সকল নতুন বানোয়াট কথার উদ্ভাবন ঘটালো তখন আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলেনঃ আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! কত বড় ইলম এরা নষ্ট করল![৬১]

তাবিয়ী মুগীরাহ ইবনু মিকসাম আদ-দাব্বী (১৩৬ হি) বলেন,

لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.

(আলীর (রা) অনুসারীদের মধ্যে মিথ্যাচার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে,) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের সাহচর্য লাভ করেছে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আলী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করলে তা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হতো না।[৬২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রথম হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার প্রবণতা দেখা দেয়। যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে এই প্রবণতা বাড়তে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতক

থেকে ক্রমেই মিথ্যাবাদীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং মিথ্যার প্রকার ও পদ্ধতিও বাড়তে থাকে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে মিথ্যাচারী জালিয়াতদের পরিচয়, শ্রেণীভাগ ও জালিয়াতির কারণসমূহ আলোচনা করব। তবে তার আগেই আমরা মিথ্যা প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহর কর্মপন্থা আলোচনা করতে চাই।

সাহাবীগণ ও তাঁদের পরবর্তী যুগগুলির আলিমগণ সকল প্রকার মিথ্যা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে পৃথক রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। আমরা এখানে তাঁদের কর্মধারা আলোচনা করতে চাই।

১. ৩. মিথ্যা প্রতিরোধে সাহাবীগণ

ওহীর জ্ঞানের নির্ভুল সংরক্ষণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক নির্দেশ, ওহীর নামে মিথ্যা বা আন্দাজে কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি, হাদীসের নির্ভুল সংরক্ষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ নির্দেশ ও হাদীসের নামে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞার আলোকে সাহাবীগণ হাদীসে রাসূল (ﷺ)-কে সকল প্রকার অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা ইচ্ছাকৃত ভুল, বিকৃতি বা মিথ্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। **প্রথমত:** তাঁরা নিজেরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পরিপূর্ণ ও নির্ভুল মুখস্থ সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত না হলে তাঁরা হাদীস বলতেন না। **দ্বিতীয়ত:** তাঁরা সবাইকে এভাবে পূর্ণরূপে হুবহু ও নির্ভুলভাবে মুখস্থ করে হাদীস বর্ণনা করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। **তৃতীয়ত:** তাঁরা সাহাবী ও তাবিয়ী যে কোনো হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সামান্যতম দ্বিধা হলে তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করার পরে গ্রহণ করতেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁদের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোনো প্রকার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের জাগতিক কথাবার্তা ও লেনদেনেও কেউ মিথ্যা বলতেন না। সততা ও বিশ্বস্ততা ছিলই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা অসাবধানতাজনিত সামান্যতম ভুল থেকে হাদীসে রাসূল (ﷺ) এর রক্ষায় তাঁদের কর্মধারা দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

১. ৩. ১. অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা থেকে আত্মরক্ষা

আমরা দেখেছি যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলও মিথ্যা বলে গণ্য। সাহাবীগণ নিজে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 'মিথ্যা' থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্ভুলভাবে ও আক্ষরিকভাবে হাদীস বলার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতার অগণিত ঘটনা হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

তাবিয়ী আম্র ইবনু মাইমূন আল-আযদী (৭৪ হি) বলেন,

مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَكَسَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً أَزْرَارُ قَمِيصِهِ قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، قَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ.

আমি প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) এর নিকট আগমন করতাম। তিনি তাঁর কথাবার্তার মধ্যে 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন' একথা কখনো বলতেন না। এক বিকালে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন', এরপর তিনি মাথা নিচু করে ফেলেন। আমি তাঁর দিকে তাঁকিয়ে দেখি, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর জামার বোতামগুলি খোলা। তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে গিয়েছে এবং গলার শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। তিনি বললেন: অথবা এর কম, অথবা এর বেশি, অথবা এর মত, অথবা এর কাছাকাছি কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।[৬৩]

তাবিয়ী মাসরূক ইবনুল আজদা' আবু আইশা (৬১ হি) বলেন,

إن عبد الله حَدَّثَ يَوْماً عَنْ رَسُولِ اللهِ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَتْ ثِيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি কেঁপে উঠেন এমনকি তাঁর পোশাকেও কম্পন পরিলক্ষিত হয়। এরপর তিনি বলেন: অথবা অনুরূপ কথা তিনি বলেছেন।[৬৪]

তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন:

كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

আনাস ইবনু মালিক (রা) যখন হাদীস বলতেন তখন হাদীস বর্ণনা শেষ করে বলতেন: অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন (আমার বর্ণনায় ভুল হতে পারে)।"[৬৫]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ জ্ঞাতসারে একটি শব্দেরও পরিবর্তন করতেন না। আক্ষরিকভাবে হুবহু বর্ণনা করতেন তাঁরা। তাবিয়ী সা'দ ইবনু উবাইদাহ সুলামী (১০৩ হি) বলেন: সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (৭৩ হি) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ. قَالَ: لاَ، «صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ»، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

"পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বা তাওহীদ, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানের সিয়াম পালন এবং হজ্জ।" তখন একব্যক্তি বলে: "হজ্জ ও রামাদানের সিয়াম"। তিনি বলেন: না, "রামাদানের সিয়াম ও হজ্জ।" এভাবেই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।[৬৬]

ইয়াফুর ইবনু রূযী নামক তাবিয়ী বলেন, আমি শুনলাম, উবাইদ ইবনু উমাইর (৭২ হি) নামক প্রখ্যাত তাবিয়ী ও মক্কার সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়িয একদিন ওয়াযের মধ্যে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ».

"মুনাফিকের উদাহরণ হলো দুইটি ছাগলের পালের মধ্যে **অবস্থানরত** ছাগীর ন্যায়।"

একথা শুনে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (৭৩ হি) বলেন:

وَيْلَكُمْ لاَ تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ»

"দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন: "মুনাফিকের উদাহরণ হলো দুইটি ছাগলের পালের মধ্যে **যাতায়াতরত** (wandering, roaming) ছাগীর ন্যায়।"[৬৭]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও পরিপূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। শুধুমাত্র যে কথাগুলি বা ঘটনাগুলি তাঁরা পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে মুখস্থ রেখেছেন বলে নিশ্চিত থাকতেন সেগুলিই বলতেন। অনেকে কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে কিছু বলতেন না। সাহাবীগণের সংখ্যা ও হাদীস-বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যার মধ্যে তুলনা করলেই আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কমবেশি সাহচর্য লাভ করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা লক্ষাধিক। নাম পরিচয় সহ প্রসিদ্ধ সাহাবীর সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। অথচ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা মাত্র দেড় হাজার।

সাহাবীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত প্রসিদ্ধ সর্ববৃহৎ হাদীস গ্রন্থ মুসনাদ আহমদ। ইমাম আহমদ এতে মোটামুটি গ্রহণ করার মত সকল সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলিত করেছেন। এতে ৯০৪ জন সাহাবীর হাদীস সংকলিত হয়েছে। পরিচিত, অপরিচিত, নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য সকল হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা একত্রিত করলে ১৫৬৫ হয়।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, হাদীস বর্ণনাকারী সহস্রাধিক সাহাবীর মধ্যে অধিকাংশ সাহাবী মাত্র ১ টি থেকে ২০/৩০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১০০ টির অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা মাত্র ৩৮ জন। এঁদের মধ্যে মাত্র ৭ জন সাহাবী থেকে ১০০০ (এক হাজারের) অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বাকী ৩১ জন সাহাবী থেকে একশত থেকে কয়েকশত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬৮]

অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকার অনেক ঘটনা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সাইব ইবনু ইয়াযিদ (৯১ হি) একজন সাহাবী ছিলেন। ছোট বয়সে তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সাহাবীগণের সাহচর্যে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি বলেন,

صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، إلاَّ أَنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَتَحَدَّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ.

"আমি আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা), তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা), মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) প্রমূখ সাহাবীর সাহচর্যে সময় কাটিয়েছি। তাঁদের কাউকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বলতে শুনিনি। তবে শুধুমাত্র তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহকে আমি উহদ যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে শুনেছি।"[৬৯]

তিনি আরো বলেন: "আমি সা'দ ইবনু মালিক (রা) এর সাহচর্যে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত গিয়েছি।

فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ

এই দীর্ঘ পথে দীর্ঘ সময়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে একটি হাদীসও বলতে শুনিনি।"[৭০]

হিজরী প্রথম শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী শা'বী (২০৪ হি) বলেন:

جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا.

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) সাথে একটি বৎসর থেকেছি, অথচ তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কিছুই বলতে শুনিনি।"[৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন:

قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا (حديثاً واحداً).

"আমি দুই বৎসর বা দেড় বৎসর আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের (রা) কাছে বসেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে মাত্র একটি হাদীস বলতে শুনেছি... ।"[৭২]

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) বলেন, আমি আমার পিতা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে বললাম, কোনো কোনো সাহাবী যেমন হাদীস বর্ণনা করেন আপনাকে তদ্রূপ হাদীস বলতে শুনিনা কেন? তিনি বলেন:

أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (مُتَعَمِّداً) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"(ইসলাম গ্রহণের পর থেকে) আমি কখনই তাঁর সাহচর্য থেকে দূরে যাই নি। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, আমার নামে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যে ব্যক্তি মিথ্যা বলবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৭৩]

তাহলে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (৩৬ হি)-এর হাদীস না বলার কারণ অজ্ঞতা নয়। তিনি নবুয়তের প্রথম পর্যায়ে কিশোর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর বেঁচে ছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪০ টিরও কম। মুসনাদ আহমদে তাঁর থেকে ৩৬ টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইবনু হাযাম উল্লেখ করেছেন যে, নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সনদে তাঁর নামে বর্ণিত সকল হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৩৮ টি।[৭৪]

আমরা দেখছি যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে তিনি হাদীস বলা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার শাস্তি জাহান্নাম। আর অনিচ্ছাকৃত ভুল বা শব্দগত পরিবর্তন ও তাঁর নামে মিথ্যা বলা হতে পারে। এজন্য তিনি হাদীস বর্ণনা থেকে অধিকাংশ সময় বিরত থাকতেন।

অন্যান্য সাহাবীও এভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা (৮৩ হি) বলেন,

قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَدِيدٌ.

"আমরা সাহাবী যাইদ ইবনু আরকাম (৬৮ হি) কে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন: আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এবং বিস্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাদীস বলা খুবই কঠিন দায়িত্ব।"[৭৫]

সাহাবী সুহাইব ইবনু সিনান (রা) বলতেন:

هَلُمُّوا أُحَدِّثْكُمْ مِنْ مَغَازِينَا، فَأَمَّا أَنْ أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلاَ

"তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে আমাদের যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা করব। তবে কোনো অবস্থাতেই আমি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' একথা বলব না।"[৭৬]

তাবিয়ী হাশিম হুরমুযী বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলতেন:

لَوْلا أَنْ أَخْشَى أَنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَكِنَّهُ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"আমার ভয় হয় যে, আমি অনিচ্ছাকৃত ভুল করে ফেলব। এই ভয় না থাকলে আমি অনেক কিছু তোমাদেরকে বলতাম যা আমি তাঁকে বলতে শুনেছি। কিন্তু তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা বলবে তাকে জাহান্নামে বসবাস করতেই হবে।"[৭৭]

তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (৯৮ হি) বলেন: আমি আবু কাতাদাহ (রা) কে বললাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে যা শুনেছেন সেসব হাদীস থেকে কিছু আমাকে বলুন। তিনি বলেন:

إني أَخْشَى أَنْ يَزِلَّ لِسَانِي بِشَيْءٍ لَمْ يَقُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، إِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّي، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"আমার ভয় হয় যে, আমার জিহ্বা পিছলে এমন কিছু বলবে যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি। আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, সাবধান, তোমরা আমার নামে বেশি হাদীস বলা পরিহার করবে। যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।"[৭৮]

এভাবে সাহাবীগণ অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন। এখানে লক্ষণীয় যে, আনাস ইবনু মালিক ও আবু কাতাদাহ দুজনেই বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলার শাস্তি বর্ণনা করেছেন।' কিন্তু তাঁরা অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে হাদীস বর্ণনা পরিহার করছেন। কারণ ভুল হতে পারে জেনেও সাবধান না হওয়ার অর্থ 'ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃত ভুলের সুযোগ দেওয়া।' অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে সর্বাত্মক সতর্ক না হওয়ার অর্থ ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া। কাজেই যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে সতর্ক না হওয়ার কারণে ভুল করল, সে ইচ্ছাকৃতভাবেই রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে মিথ্যা বলল। কোনো মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের বিষয়ে অসতর্ক হতে পারেন না।

১. ৩. ২. অন্যের বলা হাদীস যাচাই পূর্বক গ্রহণ করা

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ নিজেরা হাদীস বর্ণনার সময় আক্ষরিকভাবে নির্ভুল বলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন এবং কোনো প্রকারের দ্বিধা বা সন্দেহ হলে হাদীস বলতেন না। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁদের দ্বিতীয় কর্মধারা ছিল অন্যের বর্ণিত হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা। অন্য কোনো সাহাবী বা তাঁদের সমকালীন তাবিয়ীর বর্ণিত হাদীসের আক্ষরিক নির্ভুলতা বা যথার্থতা (অপপঁৎধপু) সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহ হলে তাঁরা তা যাচাই না করে গ্রহণ করতেন না।

অর্থাৎ তাঁরা নিজে হাদীস বলার সময় যেমন 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা' থেকে আত্মরক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন, তদ্রূপভাবে অন্যের বর্ণিত হাদীস সঠিক বলে গণ্য করার পূর্বে তাতে কোনো মিথ্যা বা ভুল আছে কিনা তা যাচাই করতেন। এই সুক্ষ্ম যাচাই ও নিরীক্ষাকে তাঁরা হাদীসের বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করতেন। এজন্য এতে কেউ কখনো আপত্তি করেন নি বা অসম্মান বোধ করেন নি।

১. ৩. ২. ১. নির্ভুলতা নির্ণয়ে তুলনামূলক নিরীক্ষা

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, মিথ্যা ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকারের হতে পারে। উভয় ধরনের মিথ্যা বা ভুল থেকে হাদীসকে রক্ষার জন্য সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তাঁদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না এবং নির্ভুলভাবে হাদীস বলার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করতেন না। তবুও তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁর বর্ণনাকে তুলনামূলক নিরীক্ষার (معارضة ومقابلة وموازنة) মাধ্যমে যাচাই করে তা গ্রহণ করতেন। তুলনামূলক নিরীক্ষার প্রক্রিয়া ছিল বিভিন্ন ধরনের:

১. বর্ণিত হাদীস অর্থাৎ বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনাকে মূল নির্দেশদাতার নিকট পেশ করে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা (Accuracy) নির্ণয় করা।

২. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদীস)-কে অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনার সাথে মিলিয়ে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।

৩. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা বর্ণনা (হাদীস) -কে বর্ণনাকারীর বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে তার যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয় করা।

৪. বর্ণিত হাদীসটির বিষয়ে বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বা শপথ করিয়ে বর্ণনাটির যথার্থতা বা নির্ভুলতা নির্ধারণ করা।

৫. বর্ণিত বাণী, নির্দেশ বা হাদীসটির অর্থ কুরআন ও হাদীসের প্রসিদ্ধ অর্থ ও নির্দেশের সাথে মিলিয়ে দেখা।

এ সকল নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারী হাদীসটি সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে ও বর্ণনা করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করতেন। হাদীসের পরিভাষায় একে 'ضبط' বিচার বলা হয়। বাংলায় আমরা (ضبط) অর্থ 'বর্ণনার নির্ভুলতা' বা 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' বলতে পারি।

সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে হাদীসের 'বর্ণনার নির্ভুলতা' ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণে এ সকল পদ্ধতিতে নিরীক্ষাই ছিল মুহাদ্দিসগণের মুল পদ্ধতি। আমরা জানি যে, বিশ্বের সকল দেশের সকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্যের যর্থার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্যও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কোনো বর্ণনা বা সাক্ষ্যের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য এটিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আমরা এখানে সাহাবীগণের যুগের কিছু উদাহরণ আলোচনা করব।

১. ৩. ২. ২. মুল বক্তব্যদাতাকে প্রশ্ন করা

কোনো সাক্ষ্য বা বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের সর্বোত্তম উপায় বক্তব্যদাতার নিকট প্রশ্ন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কোনো

সাহাবী অন্য কেনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দীহান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ক অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বিদায় হজ্জের বর্ণনার মধ্যে বলেন:

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ... فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ".

(বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী (রা) কে ইয়ামানের প্রশাসক রূপে প্রেরণ করেন। ফলে) আলী (রা) ইয়ামান থেকে মক্কায় হজ্জে আগমন করেন। তিনি মক্কায় এসে দেখেন যে, ফাতিমা (রা) উমরা পালন করে 'হালাল' হয়ে গিয়েছেন। তিনি রঙিন সুগন্ধময় কাপড় পরিধান করেছেন এবং সুরমা ব্যবহার করেছেন। আলী এতে আপত্তি করলে তিনি বলেন: আমার আব্বা আমাকে এভাবে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলী বলেন: আমি ফাতিমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম, সে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের কথা বলেছে তাও বললাম এবং আমার আপত্তির কথাও বললাম। ... তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সে ঠিকই বলেছে, সে সত্যই বলেছে।"[৭৯]

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, আলী (রা) ফাতেমার (রা) বর্ণনার যথার্থতার বিষয়ে সন্দীহান হন। তিনি তাঁর সত্যবাদীতায় সন্দেহ করেন নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা ও বর্ণনা করার বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হয়। অর্থাৎ তিনি 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার' বিষয়ে সন্দীহান হন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা যাচাই করেন।

২. উবাই ইবনু কা'ব বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ؟ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلا الآنَ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبَيٌّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاتِكَ الْيَوْمَ إِلا مَا لَغَوْتَ. فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَدَقَ أُبَيٌّ".

একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমু'আর দিনে খুতবায় দাঁড়িয়ে সূরা তাবারাকা (সূরা ২৫- আল-ফুরকান) পাঠ করেন এবং আমাদেরকে আল্লাহর নেয়ামত ও শাস্তি সম্পর্কে ওয়ায করেন। এমতাবস্থায় আবু দারদা বা আবু যার আমার দেহে মৃদু চাপ দিয়ে বলেন: এই সূরা কবে নাযিল হলো, আমি তো এখনই প্রথম সূরাটি শুনছি। তখন উবাই তাকে ইশারায় চুপ করতে বলেন। সালাত শেষ হলে তিনি (আবু যার বা আবু দারদা) বলেন: আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে, অথচ আপনি আমাকে কিছুই বললেন না! তখন উবাই বলেন: আপনি আজ আপনার সালাতের কোনোই সাওয়াব লাভ করেন নি, শুধুমাত্র যে কথাটুকু বলেছেন সেটুকুই আপনার (কারণ খুতবার সময়ে কথা বললে সালাতের সাওয়াব নষ্ট হয়।) তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যেয়ে বিষয়টি বলেন: তিনি বলেন: "উবাই সত্য বলেছে।"[৮০]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

"আমাকে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোনো ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধেক সালাত হবে। তখন আমি তাঁর নিকট গমন করলাম। আমি দেখলাম যে, তিনি বসে সালাত আদায় করছেন। তখন আমি তাঁর মাথার উপর আমার হাত রাখলাম। তিনি বললেন: হে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, তোমার বিষয় কি? আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে তা অর্ধ-সালাত হবে, আর আপনি বসে সালাত আদায় করছেন। তিনি বললেন: হ্যাঁ, (আমি তা বলেছি), তবে আমি তোমাদের মত নই।"[৮১]

এভাবে অনেক ঘটনায় আমরা হাদীসে দেখতে পাই যে, কারো বর্ণিত হাদীসের যথার্থতা বা নির্ভুলতার বিষয়ে সন্দেহ হলে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে যথার্থতা যাচাই করতেন। তাঁরা বর্ণনাকারীর সততার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেন না। মুলত তিনি

বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন কিনা তা তাঁরা যাচাই করতেন। এভাবে তাঁরা হাদীসের নামে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা' বা ভুলক্রমে বিকৃতি প্রতিরোধ করতেন।

১. ৩. ২. ৩. অন্যদেরকে প্রশ্ন করা

সাক্ষ্য বা বক্ত্যব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় পদ্ধতি বক্তব্যটি অন্য কেউ শুনেছেন কিনা এবং কিভাবে শুনেছেন তা খোঁজ করা। যে কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য তা সর্বজনীন পদ্ধতি। সকল বিচারালয়ে বিচারপতিগণ একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমেই রায় প্রদান করেন। একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্যের মিল বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত করে এবং অমিল প্রামাণ্যতা নষ্ট করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। কোনো সাহাবীর বর্ণিত কোনো হাদীসের যথার্থতা বা নির্ভুলতা বিষয়ে তাঁদের কারো দ্বিধা হলে তাঁরা অন্যান্য সাহাবীকে প্রশ্ন করতেন বা বর্ণনাকারীকে সাক্ষী আনতে বলতেন। যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি বলতেন যে, তাঁরাও ঐ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে শুনেছেন, তখন তাঁরা হাদীসটি গ্রহণ করতেন। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) এই পদ্ধতির শুরু করেন। পরবর্তী খলীফাগণ ও সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ তা অনুসরণ করেন। এখানে সাহাবীগণের যুগের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. সাহাবী কাবীসাহ ইবনু যুআইব (৮৪ হি) বলেন:

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.

"এক দাদী আবু বাকর (রা) এর নিকট এসে মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকার দাবী করেন। আবু বাকর (রা) তাকে বলেন: আল্লাহর কিতাবে আপনার জন্য (দাদীর উত্তরাধিকার বিষয়ে) কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতেও আমি আপনার জন্য কিছু আছে বলে জানি না। আপনি পরে আসবেন, যেন আমি এ বিষয়ে অন্যান্য মানুষকে প্রশ্ন করে জানতে পারি। তিনি এ বিষয়ে মানুষদের প্রশ্ন করেন। তখন সাহাবী মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন: আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাদীকে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন। তখন আবু বাকর (রা) বলেন: আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছেন? তখন অন্য সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ আনসারী (রা) উঠে দাঁড়ান এবং মুগীরার অনুরূপ কথা বলেন। তখন আবু বাকর সিদ্দীক (রা) দাদীর জন্য ১/৬ অংশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।"[৮২]

এখানে আমরা দেখছি যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা শিক্ষা দিলেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বার একার বর্ণনার উপরেই তিনি নির্ভর করতে পারতেন। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং কুরাইশ বংশের অত্যন্ত সম্মানিত নেতা ছিলেন। সমাজের যে কোনো পর্যায়ে তাঁর একার সাক্ষ্যই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু বাকর (রা) সাবধানতা অবলম্বন করলেন। মুগীরাহর (রা) বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত হলেও তাঁর স্মৃতি বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে বা তাঁর অনুধাবনে ভুল হতে পারে। এজন্য তিনি দ্বিতীয় আর কেউ হাদীসটি জানেন কিনা তা প্রশ্ন করেন। দুই জনের বিবরণের উপর নির্ভর করে তিনি হাদীসটি গ্রহণ করেন।

এজন্য মুহাদ্দিসগণ আবু বাকর (রা)-কে হাদীস সমালোচনার জনক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি) বলেন:

أَوَّلُ مَنْ وَقَى الْكَذِبَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"তিনিই (আবূ বকর সিদ্দীকই) সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।"[৮৩]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) সিদ্দীকে আকবারের জীবনী আলোচনা কালে বলেন:

وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ احْتَاطَ فِيْ قَبُوْلِ الأَخْبَارِ.

"তিনিই সর্বপ্রথম হাদীস গ্রহণ করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন।"[৮৪]

২. দ্বিতীয় খলীফ উমার (রা) এ বিষয়ে তাঁর সিদ্দীকে আকবারের অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন ঘটনায় তিনি সাহাবীগণকে বর্ণিত হাদীসের জন্য দ্বিতীয় কোনো সাহাবীকে সাক্ষী হিসাবে আনয়ন করতে বলতেন। এই জাতীয় কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ". فَقَالَ: "وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ"! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ

"আমি আনসারদের এক মাজলিসে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় আবু মূসা আশআরী (রা) সেখানে আগমন করেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত। তিনি বলেন: আমি উমার (রা) এর ঘরে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করি। অনুমতি না দেওয়ায় আমি ফিরে আসছিলাম। উমার (রা) আমাকে ডেকে বলেন: আপনার ফিরে যাওয়ার কারণ কি? আমি বললাম: আমি তিনবার অনুমতি প্রাথনা করি, কিন্তু অনুমতি জানানো হয় নি। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি তোমরা তিনবার অনুমতি প্রার্থনা কর এবং অনুমতি না দেওয়া হয় তাহলে তোমরা ফিরে যাবে।" তখন উমার (রা) বলেন: আল্লাহর শপথ, এই বর্ণনার উপর আপনাকে অবশ্যই সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (আবু মুসা বলেন): আপনাদের মধ্যে কেউ কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রা) বলেন: আমাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে কম সেই আপনার সাথে যাবে। (আবু সাঈদ খুদরী বলেন) আমি উপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়স্ক ছিলাম। আমি আবু মুসার (রা) সাথে যেয়ে উমারকে (রা) বললাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা বলেছেন।"[৮৫]

৩. তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর (৯৪ হি) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মানুষদের কাছে জানতে চান, আঘাতের ফলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হলে তার দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী বিধান দিয়েছেন তা কেউ জানে কিনা? তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা) বলেন: আমি তাঁকে এ বিষয়ে একজন দাস বা দাসী প্রদানের বিধান প্রদান করতে শুনেছি। উমার (রা) বলেন: আপনার সাথে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কাউকে আনয়ন করুন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ বলেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুরূপ বিধান দিয়েছেন।"[৮৬]

৪. সাহাবী আম্র ইবনু উমাইয়াহ আদ-দামরী (রা) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَأَتَصَدَّقَ بِهِ. فَاشْتَرَاهُ فَدَفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَأَتَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَامَ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَمْرٌو. قَالَت: مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ». قَالَتْ: نَعَمْ.

"তিনি একটি চাদর ক্রয়ের জন্য তা দাম করছিলেন। এমতাবস্থায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার বলেন: এটি কি? তিনি বলেন: আমি এই চাদরটি ক্রয় করে দান করতে চাই। এরপর তিনি তা ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীকে প্রদান করেন এবং বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি: 'তোমরা স্ত্রীগণকে যা প্রদান করবে তাও দান বলে গণ্য হবে।' তখন উমার বলেন: আপনার সাথে সাক্ষী কে আছে? তখন তিনি আয়েশা (রা) এর নিকট গমন করেন এবং দরজার বাইরে দাঁড়ান। আয়েশা (রা) বলেন? কে? তিনি বলেন: আমি আম্র। আয়েশা বলেন: কি জন্য আপনি এসেছেন? তিনি বলেন: আপনি কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা স্ত্রীগণকে যা প্রদান করবে তা দান? আয়েশা বলেন: হ্যাঁ।"[৮৭]

৫. ওয়ালীদ ইবনু আব্দুর রাহমান আল-জুরাশী নামক তাবিয়ী বলেন:

إن عبد الله بن عمر مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَبَا هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ

تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

"সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) অন্য সাহাবী আবু হুরাইরা (রা) এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। সে সময় আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। হাদীস বর্ণনার মধ্যে তিনি বলেন: 'কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফনে (কবরস্থ করায়) উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে। এক কীরাত উহদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন: আবু হুরাইরা, আপনি ভেবে দেখুন তো আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কি বলছেন! তখন আবু হুরাইরা (রা) তাকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁকে বলেন: হে উম্মুল মুমিনীন, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম করে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'কেউ যদি কারো জানাযার অনুগমন করে ও সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফনে উপস্থিত থাকে তাহলে সে দুই কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে।' তিনি বলেন: হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি।"[৮৮]

১. ৩. ২. ৪. বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করা

কোনো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা নির্ণয়ের জন্য অন্য একটি পদ্ধতি হলো তাকে একই বিষয়ে একাধিক সময়ে প্রশ্ন করা। যদি দ্বিতীয় বারের উত্তর প্রথম বারের উত্তরের সাথে হুবহু মিলে যায় তবে তার নির্ভুলতা প্রমাণিত হয়। আর উভয়ের বৈপরীত্য অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করে। সাহাবীগণ হাদীসের নির্ভুলতা নির্ণয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একটি উদাহরণ দেখুন।

তাবিয়ী উরওয়া ইবনু যুবাইর বলেন:

قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي، بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كَثِيرًا. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَاءَ لْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟! قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَاءَ لْتُهُ فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى. قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ: "مَا أَحْسَبُهُ إِلا قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

"আমার খালাম্মা আয়েশা (রা) আমাকে বলেন: ভাগ্নে,শুনেছি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র ইবনুল আস (রা) আমাদের এলাকা দিয়ে হজ্জে গমন করবেন। তুমি তাঁর সাথে দেখা কর এবং তার থেকে প্রশ্ন করে শিখ। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। উরওয়া বলেন: আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করি। তিনি সে সব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি যে সকল কথা বলেন, তার মধ্যে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানীদের কব্জা করবেন (মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের গ্রহণ করবেন), ফলে তাদের সাথে জ্ঞানও উঠে যাবে। মানুষের মধ্যে মুর্খ নেতৃবৃন্দ অবশিষ্ট থাকবে, যারা ইলম ছাড়াই ফাতওয়া প্রদান করবে এবং এভাবে নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করবে।" উরওয়া বলেন: আমি যখন আয়েশাকে (রা) একথা বললাম তখন তিনি তা গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন। তিনি বলেন: তিনি কি তোমাকে বলেছেন যে, একথা তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন?

উরওয়া বলেন: পরের বছর আয়েশা (রা) আমাকে বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর আগমন করেছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর সাথে কথাবার্তা বল। কথার ফাঁকে ইলম উঠে যাওয়ার হাদীসটির বিষয়েও কথা তুলবে। উরওয়া বলেন: আমি তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকে প্রশ্ন করি। তিনি তখন আগের বার যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই হাদীসটি বললেন। উরওয়া বলেন: আমি যখন আয়েশা (রা) কে বিষয়টি জানালাম তখন তিনি বলেন: আমি বুঝতে পারলাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র ঠিকই বলেছেন। আমি দেখছি যে, তিনি একটুও বাড়িয়ে বলেন নি বা কমিয়ে বলেন নি।[৮৯]

এখানেও আমরা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অকল্পনীয় সাবধানতার নমুনা দেখতে পাই। আয়েশা (রা) আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের সততা বা সত্যবাদিতায় সন্দেহ করেন নি। কিন্তু সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তিরও ভুল হতে পারে। কাজেই বিনা নিরীক্ষায় তাঁরা কিছুই গ্রহণ করতে চাইতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কথিত কোনো হাদীস তারা নিরীক্ষার আগেই ভক্তিভরে হৃদয়ে স্থান দিতেন না।

১. ৩. ২. ৫. বর্ণনাকারীকে শপথ করানো

বর্ণনা বা সাক্ষ্যের নির্ভুলতা যাচাইএর জন্য প্রয়োজনে বর্ণনাকারী বা সাক্ষীকে শপথ করানো হয়। সত্যপরায়ণ ও আল্লাহভীরু

মানুষ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলেন না। তবে তাঁর স্মৃতি তাকে ধোঁকা দিতে পারে বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে তিনি নিপতিত হতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করতে হলে তিনি কখনো পরিপূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলবেন না। এজন্য সত্যপরায়ণ ব্যক্তির জন্য শপথ করানো সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য কার্যকর পদ্ধতি। তবে মিথ্যাবাদীর জন্য শপথ যথেষ্ট নয়। তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন (cross interrogation)-এর মাধ্যমে তার বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই করতে হয়।

সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন সত্যপরায়ণ অত্যন্ত আল্লাহভীরু মানুষ। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য সাহাবীগণ কখনো কখনো হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীকে শপথ করাতেন। আলী (রা) বলেন:

إِنِّي كُنْتُ رَجُلا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ.

"আমি এমন একজন মানুষ ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো কথা নিজে শুনলে আল্লাহ আমাকে তা থেকে তাঁর মর্জিমত উপকৃত হওয়ার তাওফীক প্রদান করতেন। আর যদি তাঁর কোনো সাহাবী আমাকে কোনো হাদীস শুনাতেন তবে আমি তাকে শপথ করাতাম। তিনি শপথ করলে আমি তার বর্ণিত হাদীস সত্য বলে গ্রহণ করতাম।"[৯০]

১. ৩. ২. ৬. অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা

'ওহী'র জ্ঞান সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের অতিরিক্ত, কিন্তু কখনোই মানবীয় জ্ঞানের বিপরীত বা বিরুদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ওহী' কুরআনের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'ওহী'র ব্যাখ্যা, সম্পূরণ বা অতিরিক্ত সংযোজন হতে পারে, কিন্তু কখনোই তা কুরআনের বিপরীত বা বিরুদ্ধ হতে পারে না।

সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা এই মূলনীতির ভিত্তিতে বর্ণিত হাদীসের অর্থগত নিরীক্ষা করতেন। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে তাঁরা কুরআনের অতিরিক্ত ও সম্পূরক অর্থের জন্যই হাদীসের সন্ধান করতেন। কুরআন কারীমে যে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই তা হাদীসে আছে কিনা তা জানতে চাইতেন। পাশাপাশি তাঁরা প্রদত্ত তথ্যের অর্থগত নিরীক্ষা করতেন। তাঁদের অর্থ নিরীক্ষা পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ:

(১) হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হলো, তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে প্রমাণিত কিনা। যদি বর্ণনকারীরর বর্ণনা, শপথ বা অন্যান্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের নীতি ছিল তাকে কুরআনের সম্পূরক নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করা এবং তারই আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। ইতোপূর্বে দাদীর উত্তরাধিকার ও গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার বিষয়ে আমরা তা দেখতে পেয়েছি। দাদীর বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয় নি। এক্ষেত্রে হাদীসের বিবরণটি অতিরিক্ত সংযোজন। অনুমতি প্রার্থনার ক্ষেত্রে কুরআনে বলা হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার পরে "যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, 'তোমরা ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে।"[৯১] এক্ষেত্রে হাদীসের নির্দেশনাটি বাহ্যত এই কুরআনী নির্দেশনার 'বিরুদ্ধ'। কারণ তা কুরআনী নির্দেশনাকে আংশিক পরিবর্তন করে বলছে যে, তিন বার অনুমতি প্রার্থনার পরে 'তোমরা ফিরে যাও' বলা না হলেও ফিরে যেতে হবে।

সাহাবীগণ উভয় হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা কখনোই চিন্তা করেন নি যে, এগুলি কুরআনের নির্দেশের বিপরীত, বিরুদ্ধ বা অতিরিক্ত কাজেই তা গ্রহণ করা যাবে না।

(২) কোনো কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন নি বলে প্রমাণিত হলে বা গভীর সন্দেহ হলে, কোনোরূপ অর্থ বিবেচনা না করেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা দেখেছি যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় ও নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ হলে তাঁরা কোনোরূপ অর্থ বিবেচনা ছাড়াই সেই বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করতেন।

(৩) কখনো দেখা গিয়েছে যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার কারণে বর্ণিত হাদীস বাহ্যত গ্রহণযোগ্য। তবে বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জোরালো সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁরা সে হাদীসের অর্থ কুরআন কারীম ও তাঁদের জানা হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করেছেন এবং হাদীসটির অর্থ কুরআন ও প্রসিদ্ধ সুন্নাতের সুস্পষ্ট বিপরীত হলে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এইরূপ অর্থ বিচার ও নিরীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

১. আবু হাস্‌সান আল-আ'রাজ নামক তাবিয়ী বলেন:

إِنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ. قَالَ: فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الأَرْضِ!– وفي رواية: فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا فَطَارَتْ شُقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشُقَّةٌ فِي الأَرْضِ!– فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ مَا هَكَذَا كَانَ يَقُولُ، وَلَكِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ"، ثُمَّ قَرَأَتْ عَائِشَةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ﴾.

"দুই ব্যক্তি আয়েশা (রা) -এর নিকট গমন করে বলেনঃ আবু হুরাইরা (রা) বলছেন যে, নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ নারী, পশু বা বাহন ও বাড়ি-ঘরের মধ্যে অযাত্রা ও অশুভত্ব আছে। একথা শুনে আয়েশা (রা) এত বেশি রাগন্বিত হন যে, মনে হলো তাঁর দেহ ক্রোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলেনঃ যিনি আবুল কাসিম (ﷺ) উপর যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর কসম, তিনি এভাবে বলতেন না। নাবীউল্লাহ (ﷺ) বলতেনঃ "জাহিলিয়্যাতের যুগের মানুষেরা বলতঃ নারী, বাড়ি ও পশু বা বাহনে অশুভত্ব আছে। এরপর আয়েশা (রা) কুরআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ[৯২] "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে।"[৯৩]

এখানে আয়েশা (রা) আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ননা গ্রহণ করেন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে যা শুনেছেন এবং কুরআনের যে আয়াত পাঠ করেছেন তার আলোকে এই বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. উমরাহ বিনতু আব্দুর রাহমান বলেনঃ

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (سمعت رسول الله ﷺ يقول) إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ (وفي رواية لمسلم: وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ) (وفي رواية للترمذي: وَلَكِنَّهُ وَهِمَ)؛ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" (لا تزر وازرة وزر أخرى).

আয়েশা (রা) -এর নিকট উল্লেখ করা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, 'জীবিতের ক্রন্দনে মৃতব্যক্তি শাস্তি পায়।' তখন আয়েশা (রা) বলেনঃ আল্লাহ ইবনু উমারকে ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেন নি। তবে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন বা ভুল করেছেন (দ্বিতীয় বর্ণনায়ঃ শুনতে অনেক সময় ভুল হয়)। প্রকৃত কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদী মহিলার (কবরের) নিকট দিয়ে গমন করেন, যার জন্য তার পরিজনেরা ক্রন্দন করছিল। তিনি তখন বলেনঃ 'এরা তার জন্য ক্রন্দন করছে এবং সে তার কবরে শাস্তি পাচ্ছে।' আল্লাহ বলেছেন[৯৪]: 'এক আত্মা অন্য আত্মার পাপের বোঝা বহন করবে না।'"[৯৫]

৩. ফাতিমা বিনতু কাইস (রা) নামক একজন মহিলা সাহাবী বলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যে, তিনি (ঐ মহিলা) ইদ্দত-কালীন আবাসন ও ভরণপোষণের খরচ পাবেন না। তাঁর এই কথা শুনে খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেনঃ

لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ (لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ)، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"আমরা আল্লাহর গ্রন্থ ও আমাদের নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত একজন মহিলার কথায় ছেড়ে দিতে পারি না; আমরা বুঝতে পারছি না যে, তিনি বিষয়টি মুখস্থ রেখেছেন না ভুলে গিয়েছেন। তিন-তালাক প্রাপ্ত মহিলাও ইদ্দত-কালীন আবাসন ও খোরপোশ পাবেন। আল্লাহ বলেছেন[৯৬]: "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়।"[৯৭]

৪. অর্থগত নিরীক্ষার আরেকটি উদাহরণ আমরা ইতোপূর্বে দেখতে পেয়েছি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস যখন তাবিয়ী ইবনু আবী মুলাইকার জন্য 'আলীর বিচার' পুস্তিকা থেকে কিছু বিবরণ নির্বাচন করেন, তখন তিনি কিছু কিছু বিচারের বিষয়ে বলেন: "আল্লাহর কসম, আলী এই বিচার কখনোই করতে পারেন না। বিভ্রান্ত না হলে কেউ এই বিচার করতে পারে না।"

এখানেও আমরা দেখছি যে, ইবনু আব্বাস অর্থ বিচার করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এগুলি আলী (রা)-এর নামে বানোয়াট কথা; কারণ কোনো বিভ্রান্ত মানুষ ছাড়া এইরূপ বিচার কেউ করতে পারে না।

১. ৩. ৩. ইচ্ছাকৃত মিথ্যার সম্ভাবনা রোধ করা

সাহাবীগণের যুগের প্রথম দিকে সাহাবীগণই হাদীস বর্ণনা করতেন। এক সাহাবী অন্য সাহাবীকে অথবা পরবর্তী প্রজন্ম তাবিয়ীগণকে হাদীস শুনাতেন ও শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ২০/২৫ বছরের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক সাহাবী ইন্তেকাল করেন, তেমনি অপরদিকে অনেক তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষাদান শুরু করেন। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এ সময় থেকে কোনো কোনো নও মুসলিম তাবিয়ীর মধ্যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যার প্রবণতা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণ হাদীস

গ্রহণের বিষয়ে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।

এক সাহাবী অন্য সাহাবীকে হাদীস বর্ণনা করলে শ্রোতা বা শিক্ষার্থী সাহাবী বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সততা ও সত্যপরায়ণতায় কোনো সন্দেহ করতেন না বা তিনি নিজ কর্ণে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন না অন্য কেউ তাকে বলেছেন সে বিষয়েও প্রশ্ন করতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য প্রাপ্ত সকল মানুষই ছিলেন তাঁরই আলোয় আলোকিত মহান মানুষ এবং সত্যবাদিতায় আপোষহীন। তবে বিস্মৃতি, অনিচ্ছাকৃত ভুল বা হৃদয়ঙ্গমের অপূর্ণতা জনিত ভুল হতে পারে বিধায় উপরোক্ত বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁরা বর্ণিত হাদীসের নির্ভুলতা যাচাই করতেন।

তাবিয়ী বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা উপরোক্ত নিরীক্ষার পাশাপাশি অতিরিক্ত দুইটি বিষয় যুক্ত করেন। **প্রথমত,** তাঁরা বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেন এবং **দ্বিতীয়ত,** তাঁরা বর্ণনাকারী কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন তা (reference) জানতে চাইতেন। প্রথম বিষয়টিকে হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'عدالة' যাচাই করা বলা হয়। আমরা বাংলায় একে 'ব্যক্তিগত সততা ও সত্যপরায়নতা' যাচাই বলে অভিহিত করতে পারি। দ্বিতীয় বিষয়টিকে হাদীসের পরিভাষায় 'سند' বর্ণনা বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'সূত্র (reference) উল্লেখ করা' বলতে পারি।

তৃতীয় খলীফায়ে রাশিদ হযরত উসমানের খেলাফতের যুগে (২৩-৩৫ হি) মদীনার কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত নও-মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি ও হানাহানি ঘটে এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে সত্যপরায়ণতার কমতি দেখা দেয়। তখন থেকেই সাহাবীগণ উপরের দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। প্রথম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (১১০ হি) বলেন:

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

"তাঁরা (সাহাবীগণ) সনদ বা তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করতেন না। যখন (উসমানের খেলাফতের শেষদিকে: ৩০-৩৫ হি) ফিতনা-ফাসাদ ঘটে গেল তখন তাঁরা বললেন: তোমাদেরকে যারা হাদীস বলেছেন তাদের নাম উল্লেখ কর। কারণ দেখতে হবে, তারা যদি আহলুস সুন্নাত বা সুন্নাত-পন্থী হন তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর তারা যদি আহলুল বিদ'আত বা বিদ'আত-পন্থী হন তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৯৮]

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮ হি) বলেন:

إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ.

"আমরা তো হাদীস মুখস্থ করতাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস (যে কোনো বর্ণনাকারী থেকে) মুখস্থ করা হতো। কিন্তু তোমরা যেহেতু খানাখন্দক ও ভালমন্দ সব পথেই চলে গেলে সেহেতু এখন (বর্ণনাকারীর বিচার-নিরীক্ষা ছাড়া) কোনো কিছু গ্রহণ করার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।"[৯৯]

তাবিয়ী মুজাহিদ (১০৪ হি) বলেন:

جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَالِي لا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلا تَسْمَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلا مَا نَعْرِفُ.

"(তাবিয়ী) বাশীর ইবনু কা'ব আল-আদাবী ইবনু আব্বাসের (রা) নিকট আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস (রা) তার দিকে কর্ণপাত ও দৃষ্টিপাত করলেন না। তখন বাশীর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আপনি আমার হাদীস শুনছেন কি? আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করছি অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না!? তখন ইবনু আব্বাস বলেন: একসময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলি তার প্রতি আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার প্রতি কর্ণপাত করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না, শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতিরেকে।[১০০]

১. ৩. ৪. হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণে সতর্কতার নির্দেশ

এভাবে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। পাশাপাশি তাঁরা অন্য সবাইকে এভাবে

সতর্কতা অবলম্বন করতে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা বা ঢিলেমি তাঁরা সহ্য করতেন না। তাঁরা বিনা যাচাইয়ে হাদীস গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন। অনেক সময় কারো হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা শ্রোতাদের মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাঁকে হাদীস বলতে নিষেধ করতেন। এখানে কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

১. আবু উসমান আন-নাহদী বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন,

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে সবই বর্ণনা করবে।"[১০১]

২. আবুল আহওয়াস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেনঃ

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে সবই বর্ণনা করবে।"[১০২]

৩. সাহাবী আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) এর পুত্র মদীনার প্রখ্যাত আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনু আব্দুর রাহমান (৯৫ হি) বলেনঃ

بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَإِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَإِلَى أَبِي مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيْثُ الَّذِيْ تُكْثِرُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আবু দারদা (রা) ও আবু মাসঊদ (রা) কে ডেকে পাঠান। তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশি হাদীস বলছেন কেন? এরপর তিনি তাঁদেরকে মদীনাতেই অবস্থানের নির্দেশ দেন। তাঁর শাহাদত পর্যন্ত তাঁরা মদীনাতেই ছিলেন।"[১০৩]

এ তিনজন সাহাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁদের নির্ভুল হাদীস বলার ক্ষমতা বা যোগ্যতার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি। কিন্তু বেশি হাদীস বললে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। বিশেষত, কূফা বা সিরিয়ার মত প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে ইসলামী বিজয়ের সেই প্রথম দিনগুলিতে অধিকাংশ নও মুসলিম অনারব বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে বেশি হাদীস বর্ণনা করলে অনেক শ্রোতা তা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্থ করতে পারবেন না বলে আশঙ্কা থাকে। এজন্য হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁদেরকে মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন।

অন্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নিজে কুরআন ও হাদীসের কিছু বিষয় হজ্জ মাওসূমে মক্কায় জনসমক্ষে আলোচনা করতে চান। কিন্তু সাহাবী আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) তাঁকে বলেন যে, মক্কায় উপস্থিত অগণিত অনারব ও নওমুসলিম হজ্জ-পালনকারী হয়ত আপনার কথা ঠিকমত বুঝতে পারবেন না। এতে ভুল বুঝা ও অপব্যাখ্যার সুযোগ এসে যাবে। কাজেই আপনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পরে বিষয়গুলি আলোচনা করবেন। উমার (রা) এই পরামর্শ অনুসারে মক্কায় বিষয়গুলি আলোচনার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন।[১০৪]

১. ৪. জালিয়াতি প্রতিরোধে মুসলিম উম্মাহ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পাই যে, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, অনুধাবনগত বা অসাবধানতাজনিত সকল প্রকার মিথ্যা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে নির্ভেজালভাবে সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা একদিকে যেমন যৌক্তিক, প্রায়গিক, বৈজ্ঞানিক ও সুক্ষ্ম, অন্যদিকে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একক ও অনন্য। অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীগণ তাঁদের ধর্মের মূল শিক্ষা বা ওহী সংরক্ষণের জন্য এরূপ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। যা প্রচারিত হয়েছে তাই সংকলিত করা হয়েছে। অবশেষে ওহীর সাথে মানবীয় জ্ঞানের মিশ্রণের মাধ্যমে ওহীর বিকৃতি ও অবলুপ্তি ঘটেছে।

তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আপোষহীন ছিলেন। তাঁরা হাদীসের সংরক্ষণ এবং বানোয়াট কথা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসের বাছাই-এর জন্য তাঁদের জীবনের সকল আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করেছেন। এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাঁদের মূলনীতিগুলি আলোচনা করব।

১. ৪. ১. হাদীস শিক্ষা ও সংরক্ষণ

মহান আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রথম যুগের মানুষদেরকে তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস সংরক্ষণের বিষয়ে একটি সঠিক ও সময়োপযোগী কর্মের তাওফীক প্রদান করেন। প্রথম হিজরী শতক থেকে সাহাবী, তাবিয়ী ও তৎপরবর্তী যুগের আলিমগণ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গ্রামগঞ্জ, শহর ও জনপদ ঘুরে ঘুরে সকল হাদীস ও বর্ণনাকারীগণের তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন। হাদীস শিক্ষা, লিখে রাখা, শেখানো ও হাদীস কেন্দ্রিক আলোচনাই ছিল ইসলামের প্রথম তিন-চার শতকের মানুষদের অন্যতম কর্ম, পেশা, নেশা ও আনন্দ।

তাবিয়ীগণের যুগ থেকে বা হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে আমরা

দেখতে পাই যে, হাদীস বর্ণনাকারীগণ দুই প্রকারের :

অনেকে নিজ এলাকার 'রাবী' বা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে এবং সম্ভব হলে অন্যান্য কিছু দেশের কিছু মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন। এরপর তিনি হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষায় রত থেকেছেন। তার নিকট যে শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছে তাকে সেই হাদীসগুলি শিক্ষা দিয়েছেন। এরা সাধারণভাবে 'রাবী' বা বর্ণনাকারী নামে পরিচিত।

অপরদিকে এ যুগগুলিতে অনেক মুহাদ্দিস নিজ এলাকার সকল 'রাবী'র নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা ও লিপিবদ্ধ করার পরে বেরিয়ে পড়েছেন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদ সফর করতে। তাঁরা প্রত্যেকে দীর্ঘ কয়েক বছর বা কয়েক যুগ এভাবে প্রতিটি জনপদে গমন করে সকল জনপদের সকল 'রাবী' বা মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন সাহাবীর বা একজন তাবিয়ীর একটিমাত্র হাদীস বিভিন্ন 'রাবী'র মুখ থেকে শুনতে ও সংগ্রহ করতে তাঁরা মক্কা, মদীনা, খোরাসান, সমরকন্দ, মারভ, ওয়াসিত, বাসরা, কূফা, বাগদাদ, দামেশক, হালাব, কায়রো, সান'আ... ইত্যাদি অগণিত শহরে সফর করেছেন। একটি হাদীসই তাঁরা শত শত সনদে সংগ্রহ করে তুলনার মাধ্যমে নির্ভুল ও ভুল বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

একটি নমুনা দেখুন। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবরাহীম ইবনু সাঈদ আল-জাউহারী আল-বাগদাদী (২৪৭ হি)। তার সমসাময়িক মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার ইবনু খাকান বলেন: আমি ইবরাহীম ইবনু সাঈদকে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি তার খাদেমকে বললেন: গ্রন্থাগারে ঢুকে আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-এর হাদীস-সংকলনের ২৩তম খণ্ডটি নিয়ে এস। আমি বললাম: আবু বাকর (রা) থেকে ২০টি হাদীসও সহীহ সনদে পাওয়া যায় না, আপনি কিভাবে তাঁর হাদীস ২৩ খণ্ডে সংকলন করলেন? তিনি উত্তরে বলেন: কোনো একটি হাদীস যদি আমি কমপক্ষে ১০০ টি সনদে সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে আমি সেই হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেকে এতিম বলে মনে করি।[১০৫]

হাদীস গ্রহণের সময় তাঁরা সংশ্লিষ্ট 'রাবী'-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার বর্ণনার যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে তার ব্যক্তিগত সততা (عدالة), তার শিক্ষকগণ এবং এলাকার অন্যান্য রাবীগণের বিষয়ে সেই এলাকার প্রসিদ্ধ আলিম, মুহাদ্দিস ও শিক্ষার্থীগণকে প্রশ্ন করেছেন। এভাবে সংগৃহীত সকল তথ্য তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা সকল 'রাবী' ও তাদের বর্ণিত সকল হাদীসের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করেছেন। এ সকল নিরীক্ষক ও সমালোচক হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ একদিকে 'রাবী' বা হাদীস বর্ণনাকারী এবং সাথে সাথে 'নাকিদ' বা হাদীস সমালোচক ও হাদীসের ইমাম বলে পরিচিত। ইসলামের প্রথম ৪ শতাব্দীতে এই ধরনের শতাধিক 'ইমাম' ও 'নাকিদ' আমরা দেখতে পাই। হাদীসে রাসূলের খেদমতে এদের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে নযিরবিহীন। জ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে এর সামান্যতম নযির নেই। এদের কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্যও শত শত পৃষ্ঠার গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন।

এ সকল নাকিদ মুহাদ্দিস বা ইমাম এভাবে সকল হাদীস ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা চিহ্নিত করেছেন, মিথ্যাবাদীদেরকে চিহ্নিত করেছেন, বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা ও সন্দেহজনক বর্ণনা থেকে পৃথক করেছেন। তাঁরা নিম্নের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছেন।

১. সকল হাদীসের সনদ অর্থাৎ সূত্র বা reference সংরক্ষণ।
২. সনদের সকল 'রাবী'-র ব্যক্তিগত পরিচয়, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, উস্তাদ, ছাত্র, কর্ম, সফর ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ।
৩. 'রাবী'গণের ব্যক্তিগত সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যপরায়ণতা যাচাই করা।
৪. বর্ণিত হাদীসের অর্থগত নিরীক্ষা ও যাচাই করা।
৫. সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক 'রাবী' তার উর্ধ্বতন 'রাবী'-র নিকট থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন কিনা তা যাচাই করা।
৬. সংগৃহীত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা থেকে নির্ভুল বর্ণনাগুলি পৃথক করা।
৭. সংগৃহীত তথ্যাদি ও তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল 'রাবী'র মিথ্যাচার ধরা পড়েছে তাদের মিথ্যাচার উম্মাহর সামনে তুলে ধরা।
৮. সংগৃহীত সকল হাদীস সনদসহ গ্রন্থায়িত করা।
৯. রাবীদের নির্ভুলতা বা মিথ্যাচার বিষয়ক তথ্যাদি গ্রন্থায়িত করা।
১০. পৃথক গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস সংকলিত করা।
১১. পৃথক গ্রন্থে মিথ্যা ও জাল হাদীসগুলি সংকলিত করা।
১২. জাল বা মিথ্যা হাদীস সহজে চেনার নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করা।

নিম্নে আমরা এ সকল বিষয়ে আলোচনা করব।

১. ৪. ২. সনদ সংরক্ষণ

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ হাদীসের সনদ বা তথ্য-সূত্র বলার রীতি চালু করেন। যেন সূত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য যাচাই করা যায়। পরবর্তী যুগগুলিতে সনদ সংরক্ষণের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তির প্রসিদ্ধি, সততা, মহত্ব, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি যত বেশিই হউক না কেন, তিনি কার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং তিনি কোন্ সূত্রে হাদীসটি বলেছেন তা উল্লেখ না করলে মুহাদ্দিসগণ কখনোই তার বর্ণিত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেন নি। উপরন্তু তিনি এবং তার সনদে

বর্ণিত প্রত্যেক রাবী পরবর্তী রাবী থেকে হাদীসটি নিজে শুনেছেন কিনা তা যাচাই করেছেন। সনদের গুরুত্ব বুঝাতে অনেক কথা তাঁরা বলেছেন।

প্রথম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

এই জ্ঞান হলো দ্বীন (ধর্ম); কাজেই কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ তা দেখে নেবে।[১০৬]

সুফিয়ান ইবনু উ'আইনাহ (১৯৮ হি) বলেন, একদিন ইবনু শিহাব যুহরী (১২৫ হি) হাদীস বলছিলেন। আমি বললাম: আপনি সনদ ছাড়াই হাদীসটি বলুন। তিনি বলেন: তুমি কি সিঁড়ি ছাড়াই ছাদে আরোহণ করতে চাও?[১০৭]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনু সাঈদ আস-সাওরী (১৬১ হি) বলেন: "সনদ মুমিনের অস্ত্র স্বরূপ।"[১০৮]

উতবাহ ইবনু আবী হাকীম (১৪০ হি) বলেন, একদিন আমি ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ফারওয়া (১৪৪ হি) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ইবনু শিহাব যুহরী (১২৫ হি) উপস্থিত ছিলেন। ইবনু আবী ফারওয়া হাদীস বর্ণনা করে বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ...। তখন ইবনু শিহাব যুহরী তাকে বলেন, হে ইবনু আবী ফারওয়া, আল্লাহ আপনাকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর নামে কথা বলতে আপনার কত বড় দুঃসাহস! আপনি হাদীস বলছেন অথচ হাদীসে সনদ বলছেন না। আপনি আমাদেরকে লাগামহীন হাদীস বলছেন!"[১০৯]

প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন:

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

"সনদ বর্ণনা ও সংরক্ষণ দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা না থাকলে যে যা চাইত তাই বলত।"[১১০]

তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু ইসহাক ইবনু ঈসা (২১৫ হি) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি)-কে বললাম, একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমার সালাতের সাথে পিতামাতার জন্য সালাত আদায় করা এবং তোমার সিয়ামের সাথে পিতামাতার জন্য সিয়াম পালন করা নেককর্মের অন্তর্ভুক্ত।' তিনি বলেন: হাদীসটি আপনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? আমি বললাম: শিহাব ইবনু খিরাশ থেকে। তিনি বলেন: শিহাব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তিনি কার নিকট শুনেছেন? আমি বললাম: তিনি হাজ্জাজ ইবনু দীনার থেকে। তিনি বলেন: হাজ্জাজ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? আমি বললাম: তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বললেন: হে আবু ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনু দীনার ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাঝে বিশাল দূরত্ব রয়েছে, যে দূরত্ব অতিক্রম করতে অনেক বাহনের প্রয়োজন। অর্থাৎ হাজ্জাজ দ্বিতীয় হিজরীর শেষ দিকের একজন তাবে-তাবেয়ী। অন্তত ২/৩ জন ব্যক্তির মাধ্যম ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না। তিনি যেহেতু বাকী সনদ বলেন নি, সেহেতু হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।[১১১]

এভাবে প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সনদ' (ঁহরহঃবৎৎঁঢ়ঃবফ পযধরহ ড়ভ ধঁঃযড়ৎরঃরবং) উল্লেখ অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে দুইটি অংশের সমন্বিত রূপকে বুঝায়। **প্রথম অংশ :** হাদীসের সূত্র বা সনদ ও **দ্বিতীয় অংশ :** হাদীসের মূল বক্তব্য বা 'মতন'।

একটি উদাহরণ দেখুন। ইমাম মালিক (১৭৯ হি) ২য় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক। তিনি তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে বলেন:

مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

"মালিক, আবুয্ যিনাদ (১৩০হি) থেকে, তিনি আ'রাজ (১১৭হি) থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (৫৯হি) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এই দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এই সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।"[১১২]

উপরের হাদীসের প্রথম অংশ "মালিক আবুয্ যিনাদ থেকে.... আবু হুরাইরা থেকে" হাদীসের সনদ বা সূত্র। শেষে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণীটুকু হাদীসের "মতন" বা বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে শুধু শেষের বক্তব্যটুকুই নয়,

বরং সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপকেই হাদীস বলা হয়। একই বক্তব্য দুইটি পৃথক সনদে বর্ণিত হলে তাকে দুইটি হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় শুধু সনদকেই হাদীস বলা হয়।[১১৩]

১. ৪. ৩. সনদ বনাম লিখিত পাণ্ডুলিপি

উপরের হাদীস ও হাদীস -গ্রন্থসমূহে সংকলিত অনুরূপ অগণিত হাদীস থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীগণ সম্ভবত হাদীস লিপিবদ্ধ বা সংকলিত করে রাখতেন না, শুধুমাত্র মুখস্থ ও মৌখিক বর্ণনা করতেন। এজন্য বোধহয় মুহাদ্দিসগণ এভাবে সনদ উল্লেখ করে হাদীস সংকলিত করেছেন। অনেকেই ধারণা করেন যে, হাদীস তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী শতকেই সংকলিত বা লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর পূর্বে তা মৌখিতভাবে প্রচলিত ছিল।

বিষয়টি কখনোই তা নয়। হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞানই এই কঠিন বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। বস্তুত হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সুক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁরা মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনায় ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশের পথ রোধ করেছেন। হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদ বর্ণনায় সর্বদা মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির পাশাপাশি লিখনি ও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হতো। অনুরূপভাবে হাদীস নিরীক্ষা ও জালিয়াতি নির্ধারণেও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হতো।

১. ৪. ৩. ১ হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও সনদ বর্ণনায় পাণ্ডুলিপি

সাহাবীগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন ও কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। সাহাবীগণের হাদীস লিখে রাখার প্রয়োজনও তেমন ছিল না। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস ২০/৩০ টির অধিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে কাটানো দিনগুলির স্মৃতি থেকে ২০/৩০ টি বা ১০০ টি, এমনকি হাজারটি ঘটনা বা কথা বলার জন্য লিখে রাখার প্রয়োজন হতো না। তাছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোনো বড় বিষয় ছিল না। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) স্মৃতি আলোচনা, তাঁর নির্দেশাবলি হুবহু পালন, তাঁর হুবহু অনুকরণ ও তাঁর কথা মানুষদের শোনানোই ছিল তাঁদের জীবনের অন্যতম কাজ। অন্য কোনো জাগতিক ব্যস্ততা তাঁদের মন-মগজকে ব্যস্ত করতে পারত না। আর যে স্মৃতি ও যে কথা সর্বদা মনে জাগরুক এবং কর্মে বিদ্যমান তা তো আর পৃথক কাগজে লিখার দরকার হয় না। তা সত্ত্বেও অনেক সাহাবী তাঁদের মুখস্থ হাদীস লিখে রাখতেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণ করতেন।[১১৪]

সাহাবীগণের ছাত্রগণ বা তাবেয়ীগণের যুগ থেকে হাদীস শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করা। অধিকাংশ তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীস শুনতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে বা পাণ্ডুলিপি থেকে মুখস্থ করে তা তাঁদের ছাত্রদের শোনাতেন। তাঁদের ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা তাদের নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখে নিতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন। তাবেয়ীগণের যুগ, অর্থাৎ প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এভাবে সকল পঠিত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখা হাদীস শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ বিষয়ক অগণিত বিবরণ হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুএকটি উদাহরণ দেখুন।

তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আকীল (১৪০ হি) বলেন:

كُنْتُ أَذْهَبُ أَنَا وَأَبُوْ جَعْفَرٍ اِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَعَنَا أَلْوَاحٌ صِغَارٌ نَكْتُبُ فِيْهَا الْحَدِيْثَ

"আমি এবং আবু জা'ফর মুহাম্মাদ আল-বাকির (১১৪ হি) সাহাবী জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (৭০ হি) এর নিকট গমন করতাম। আমরা সাথে ছোট ছোট বোর্ড বা স্লেট নিয়ে যেতাম যেগুলিতে আমরা হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম।"[১১৫]

তাবিয়ী সাঈদ ইবনু জুবাইর (৯৫ হি) বলেন:

كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا امْتَلأَتِ الصَّحِيْفَةُ أَخَذْتُ نَعْلِيْ فَكَتَبْتُ فِيْهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ

"আমি সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (৬৮ হি) এর নিকট বসে হাদীস লিপিবদ্ধ করতাম। যখন লিখতে লিখতে পৃষ্ঠা ভরে যেত তখন আমি আমার সেণ্ডেল নিয়ে তাতে লিখতাম। লিখতে লিখতে তাও ভরে যেত।"[১১৬]

তাবিয়ী আমির ইবনু শারাহীল শা'বী (১০২ হি) বলেন:

اُكْــتُبُوْا مَا سَــمِعْتُمْ مِنِّــيْ وَلَوْ عَلَى جِدَارٍ

"তোমরা যা কিছু আমার নিকট থেকে শুনবে সব লিপিবদ্ধ করবে। প্রয়োজনে দেওয়ালের গায়ে লিখতে হলেও তা লিখে রাখবে।"[১১৭]

তাবিয়ী আবু কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ (১০৪ হি) বলেন:

اَلْكِــتَابَةُ أَحَبُّ إِلَــيَّ مِنَ النِّسْيَــانِ

"ভুলে যাওয়ার চেয়ে লিখে রাখা আমার কাছে অনেক প্রিয়।"[১১৮]
তাবিয়ী হাসান বসরী (১১০ হি) বলেন:

إِنَّ لَنَا كُـتُـباً نَـتَعَاهَدُهَا

"আমাদের নিকট পাণ্ডুলিপি সমূহ রয়েছে, যেগুলি আমরা নিয়মিত দেখি এবং সংরক্ষণ করি।"[১১৯]
প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন:

لَوْلاَ الْكِـتَابُ لَمَا حَفِظْـنَا

"হাদীস শিক্ষার সময় পাণ্ডুলিপি আকারে লিখে না রাখলে আমরা মুখস্থই করতে পারতাম না।"[১২০]
এ বিষয়ক অগণিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন।[১২১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, তাবেয়ীগণের যুগ থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার সাথে সাথে তা লিখে রাখতেন। হাদীস শিক্ষা দানের সময় তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণ সাধারণত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস পড়ে শেখাতেন। কখনো বা মুখস্থ পড়ে হাদীস শেখাতেন তবে পাণ্ডুলিপি নিজের হেফাজতে রাখতেন যেন প্রয়োজনের সময় তা দেখে নেওয়া যায়।

তাবিয়ীগণের যুগে বা তৎপরবর্তী যুগে কতিপয় মুহাদ্দিস ছিলেন যাঁরা পাণ্ডুলিপি ছাড়াই হাদীস মুখস্থ রাখতেন এবং বর্ণনা করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, এরা পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর না করায় মাঝে মাঝে বর্ণনায় ভুল করতেন। বস্তুত মৌখিক শ্রবণ ও পাণ্ডুলিপির সংরক্ষণের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা করা সম্ভব। এজন্য যে সকল 'রাবী' শুধুমাত্র পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে বা শুধুমাত্র মুখস্থশক্তির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করতেন তাঁদের হাদীস মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের বর্ণনায় ভুল ও বিক্ষিপ্ততা ধরা পড়ে। এই জাতীয় অগণিত বিবরণ আমরা রিজাল ও জারহু ওয়াত তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই। দুইএকটি উদাহরণ দেখুন:

আবু আম্মার ইকরিমাহ ইবনু আম্মার আল-ইজলী (১৬০ হি) দ্বিতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীস মুখস্থকারী (حافظ) হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মুখস্থ হাদীসগুলি লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রাখতেন না, ফলে প্রয়োজনে তা দেখতে পারতেন না। এজন্য তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু ভুল পাওয়া যেত। ইমাম বুখারী (১৫৬ হি) বলেন:

لَمْ يَكُـنْ لَهُ كِـتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيْـثُهُ

"তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল না; এজন্য তাঁর হাদীসে বিক্ষিপ্ততা পাওয়া যায়।"[১২২]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস জারীর ইবনু হাযিম ইবনু যাইদ (১৭০ হি)। তাঁর বিষয়ে ইবনু হাজার বলেন:

ثِقَـةٌ ... وَلَهُ أَوْهَامٌ إِذَا حَـدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ

তিনি নির্ভরযোগ্য।...তবে তিনি যখন পাণ্ডুলিপি না দেখে শুধুমাত্র মুখস্থ স্মৃতির উপর নির্ভর করে হাদীস বলতেন তখন তার ভুল হতো।[১২৩]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান ইবনু আব্দুল আযীয (১৭০হি)। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন এবং সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু আউফের বংশধর ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। আর এই ভুল ভ্রান্তির কারণ হলো পাণ্ডুলিপি ব্যতিরেকে মুখস্থ বর্ণনা করা। তৃতীয় হিজরী শতকের মদীনার মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক উমার ইবনু শাব্বাহ (২৬২ হি) তাঁর 'মদীনার ইতিহাস' গ্রন্থে এই ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন:

كَانَ كَثِيْرَ الْغَلَطِ فِيْ حَدِيْثِهِ لأَنَّهُ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ

"তিনি হাদীস বর্ণনায় অনেক ভুল করতেন; কারণ তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যাওয়ার ফলে তিনি স্মৃতির উপর নির্ভর করে মুখস্থ হাদীস বলতেন।"[১২৪]

ইবনু হাজার আসকালানীর ভাষায়:

مَتْـرُوْكٌ، احْتَـرَقَتْ كُـتُـبُهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ فَاشْتَدَّ غَلَطُهُ

"তিনি একজন পরিত্যক্ত রাবী। তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি পুড়ে যায়। এজন্য তিনি স্মৃতির উপর নির্ভর করে হাদীস বলতেন। এতে তাঁর ভুল হতো খুব বেশি।"[১২৫]

তৃতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাজিব ইবনু সুলাইমান আল-মানবিজী (২৬৫ হি)। তিনি ইমাম নাসাঈর উস্তাদ ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপি না থাকার কারণে তার ভুল হতো। ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি) বলেন:

كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ وَلَمْ يَكُــنْ لَهُ كِــتَابٌ، وَهِمَ فِيْ حَدِيْثِـــهِ

"তিনি হাদীস মুখস্থ বলতেন এবং স্মৃতিশক্তির উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁর কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল না। এজন্য তার হাদীসে ভুল দেখা দেয়।"[১২৬]

তৃতীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম ইবনু মুসলিম, আবু উমাইয়া (২৭৩ হি)। তাঁর সম্পর্কে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি) বলেন:

...وكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ دَخَلَ مِصرْ َ فَحَدَّثَهُمْ مِنْ حِفْظِهِ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ بِأَشْيَاءَ أَخْطَأَ فِيْهَا فَلاَ يُعْجِبُنِيْ الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ إِلاَّ مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ

"... তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি মিশরে আগমন করেন এবং তথায় কোনো পাণ্ডুলিপি ছাড়া মুখস্থ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন; যে সকল হাদীস বর্ণনায় তিনি ভুল করেন। এজন্য তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীস আমি দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। শুধুমাত্র যে হাদীসগুলি তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে বর্ণনা করেছেন সেগুলিই গ্রহণ করা যায়।[১২৭]

ইমাম শাফিয়ী (২০৪ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম আলিম। তিনি লিখেছেন: যে মুহাদ্দিসের ভুল বেশি হয় এবং তার কোনো বিশুদ্ধ লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।[১২৮]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য শিক্ষকের নিকট থেকে মৌখিক শ্রবণ ও লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ উভয়ের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করা হতো। সুপ্রসিদ্ধ 'হাফিয-হাদীসগণ', যাঁরা আজীবন হাদীস শিক্ষা করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্থ রেখেছেন, তাঁরাও পাণ্ডুলিপি না দেখে হাদীস শিক্ষা দিতেন না বা বর্ণনা করতেন না।

৩য় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আলী ইবনুল মাদীনী (২৩৪ হি) বলেন:

لَيْسَ فِيْ أَصْحَابِنَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ عَبْدِاللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِنَّهُ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ مِنْ كِتَابِهِ وَلَنَا فِيْهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের সাথীদের মধ্যে আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) -এর চেয়ে বড় বা বেশি যোগ্য কেউই ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো পাণ্ডুলিপি সামনে না রেখে হাদীস বর্ণনা করতেন না। আর তাঁর মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"[১২৯]

অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) বলেন: "অনেকে আমাদেরকে স্মৃতি থেকে হাদীস শুনিয়েছেন এবং অনেকে আমাদেরকে পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শুনিয়েছেন। যাঁরা পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শুনিয়েছেন তাঁদের বর্ণনা ছিল বেশি নির্ভুল।"[১৩০]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের সমন্বয়কে অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন: প্রথমত হাদীসটি উস্তাদের মুখ থেকে শাব্দিকভাবে শোনা বা তাকে মুখে পড়ে শোনানো ও দ্বিতীয়ত পঠিত হাদীসটি নিজে হাতে লিখে নেওয়া ও তৃতীয়ত উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে সংশোধন করে নেওয়া। কোনো মুহাদ্দিস স্বকর্ণে শ্রবণ ব্যতীত শুধু পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস শেখালে বা পাণ্ডুলিপি ছাড়া শুধু মুখস্থ হাদীস শেখালে তা গ্রহণ করতে তাঁরা আপত্তি করতেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ (২৯০ হি) বলেন,

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّاق: اكْتُبْ عَنِّي وَلَوْ حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ، فَقُلْتُ: لا، وَلا حَرْفًا.

"ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (২৩৩ হি) বলেন: ইমাম আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি) আমাকে বলেন : তুমি আমার নিকট থেকে অন্তত একটি একটি হাদীস লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া গ্রহণ কর। আমি বললাম: কখনোই না, আমি লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রমাণ ছাড়া মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে একটি অক্ষরও গ্রহণ করতে রাজী নই।[১৩১]

আব্দুর রাযযাক সান'আনীর মত সুপ্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসের নিকট থেকেও লিখিত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয় ব্যতিরেকে একটি হাদীস গ্রহণ করতেও রাজী হন নি ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন!

এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতি দেখুন। তৃতীয় শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হাদীস বিচারক ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি) বলেন : যদি কোনো 'রাবী'র হাদীস তিনি সঠিকভাবে মুখস্থ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তার কাছে তার পুরাতন পাণ্ডুলিপি চাইতে হবে। তিনি যদি পুরাতন পাণ্ডুলিপি দেখাতে পারেন তবে তাকে ইচ্ছাকৃত ভুলকারী বলে গণ্য করা যাবে না। আর যদি তিনি বলেন যে, আমার মূল প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার কাছে তার একটি অনুলিপি আছে তাহলে তার কথা গ্রহণ করা যাবে না। অথবা যদি বলেন যে, আমার পাণ্ডুলিপিটি আমি পাচ্ছি না তাহলেও তাঁর কথা গ্রহণ করা যাবে না। বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বুঝতে হবে।[১৩২]

১. ৪. ৩. ২. সনদে শ্রুতি বর্ণনার অর্থ ও প্রেক্ষাপট

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই হাদীস লিখে মুখস্থ করা হতো। মুহাদ্দিসগণ লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন, নিরীক্ষা করতেন, বিশুদ্ধতা যাচাই করতেন এবং প্রত্যেকেই তাঁর শ্রুত হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখিত পুস্তকের রেফারেন্স প্রদান না করে শুধুমাত্র 'মৌখিক বর্ণনা'র উপর কেন নির্ভর করতেন। তাঁরা কেন (حدثنا، أخبرنا), অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন', 'আমাকে সংবাদ দিয়েছেন' ইত্যাদি বলতেন? তাঁরা কেন বললেন না, অমুক পুস্তকের এই কথাটি লিখিত আছে... ইত্যাদি?

প্রকৃত বিষয় হলো, সাহাবীগণের যুগ থেকেই 'পুস্তক'-এর চেয়ে 'ব্যক্তি'র গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-নির্ভরতা ও এতদসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা দূর করার জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনাকারী উস্তাদ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এজন্য হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় (حدثنا، أخبرنا) অর্থাৎ 'আমাকে বলেছেন' কথাটির অর্থ হলো আমি তাঁর পুস্তকটি তাঁর নিজের কাছে বা তাঁর অমুক ছাত্রের কাছে পড়ে স্বকর্ণে শুনে তা থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করছি। কেউ কেউ 'আমি তাঁকে পড়তে শুনেছি', বা 'আমি পড়েছি' এরূপ বললেও, সাধারণত 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' বা 'আমাদেরকে বলেছেন' বলেই তাঁরা এক বাক্যে বিষয়টি উপস্থাপন করতেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, উপরে উল্লিখিত মুয়াত্তা গ্রন্থের সনদটির অর্থ এই নয় যে, মালিক আবুয যিনাদ থেকে শুধুমাত্র মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন এবং তিনি আ'রাজ থেকে মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন এবং তিনি আবূ হুরাইরা থেকে মৌখিক বর্ণনা শুনেছেন। বরং এখানে সনদ বলার উদ্দেশ্য হলো এই সনদের রাবীগণ প্রত্যেকে তাঁর উস্তাদের মুখ থেকে হাদীসটি শুনেছেন, লিখেছেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি মৌখিক বর্ণনার সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন।

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (২৫৬ হি) এই হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা বলেছেন, মালিক থেকে আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: এই দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এই সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।"[১৩৩]

এখানে ইমাম বুখারী মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসটি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এখানে মুয়াত্তা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নি। বরং তিনি ইমাম মালিকের একজন ছাত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যত পাঠকের কাছে মনে হতে পারে যে, ইমাম বুখারী মূলত শ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় কখনোই তা নয়। ইমাম মালিকের নিকট থেকে শতাধিক ছাত্র মুয়াত্তা গ্রন্থটি পূর্ণরূপে শুনে ও লিখে নেন। তাঁদের বর্ণিত লিখিত মুয়াত্তা গ্রন্থ তৎকালীন বাজারে 'ওয়ার্‌রাক' বা 'হস্তলিখিত পুস্তক' ব্যবসাসীদের দোকানে পাওয়া যেত। ইমাম বুখারী যদি এইরূপ কোনো 'পাণ্ডুলিপি' কিনে তার বরাত দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করতেন তবে মুহাদ্দিসগণের বিচারে বুখারীর উদ্ধৃতিটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হতো। কারণ পাণ্ডুলিপি নির্ভরতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি তাঁর মুখ থেকে আগাগোড়া শুনে ও পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করতেন যে সকল মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী সে সকল মুহাদ্দিসের নিকট যেয়ে মুয়াত্তা গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বকর্ণে শুনেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মুয়াত্তা গ্রন্থের হাদীসগুলি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু কখনোই গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেন নি। বরং যাদের কাছে তিনি গ্রন্থটি পড়েছেন তাদের সূত্র প্রদান করেছেন। যেমন এখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামার সূত্র উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর কথার অর্থ হলো

'আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামার' নিকট ইমাম মালিকের গ্রন্থটির মধ্যে এই হাদীসটি আমি স্বকর্ণে পঠিত শুনেছি।

৩য় শতাব্দীর অন্যতম মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিমও (২৬২হি) এই হাদীসটি মুয়াত্তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ...

"আমাদেরকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ বলেন, মালিক থেকে, আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: ..."[১৩৪]

এখানে ইমাম মুসলিমও একইভাবে পুস্তকের উদ্ধৃতি না দিয়ে পুস্তকটির বর্ণনাকারীর উদ্ধৃতি প্রদান করছেন।

৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম বাইহাকী আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি) তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' নামক হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ...

"আমাদেরকে আলী ইবনু আহমদ ইবনু আবদান বলেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনু উবাইদ সাফ্ফার বলেন, আমাদেরকে ইসমাঈল কাযী বলেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা'নাবী বলেন, তিনি মালিক থেকে, তিনি আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন: ...।"[১৩৫]

সনদটি দেখে কেউ ভাবতে পারেন যে, ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে গ্রন্থকার পর্যন্ত মাঝে ৮ জন বর্ণনাকারী! সকলেই শুধু মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির উপর নির্ভর করেছেন! কাজেই ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই বেশি!!

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইমাম বাইহাকীর এই সনদের অর্থ হলো: ইমাম মালিকের লেখা মুয়াত্তা গ্রন্থটি আমি আলি ইবনু আহমদ ইবনু আবদান-এর নিকট পঠিত শুনেছি। তিনি তা আহমদ ইবনু উবাইদ সাফ্ফার-এর নিকট পড়েছেন। তিনি পুস্তকটি ইসমাঈল কাযীর নিকট পাঠ করেছেন। তিনি পুস্তকটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা কা'নাবীর নিকট পাঠ করেছেন। তিনি মালিক থেকে....। এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি মুয়াত্তা গ্রন্থটি বাজার থেকে ক্রয় করে নিজে পাঠ করে তার থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন নি। বরং তিনি মুয়াত্তার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এমন একটি ব্যক্তির নিকট তা পাঠ করে শুনেছেন যিনি নিজে গ্রন্থটি বিশুদ্ধ পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছেন... এভাবে শেষ পর্যন্ত। বাইহাকী এই হাদীসটি আরো অনেকগুলি সনদে উল্লেখ করেছেন। সকল সনদেই তিনি মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মূলত বলেছেন যে, ইমাম মালিকের মুয়াত্তা গ্রন্থটি তিনি বিভিন্ন উস্তাদের নিকট বিভিন্ন সনদে বিশুদ্ধরূপে পড়ে শ্রবণ করেছেন।[১৩৬]

এভাবে আমরা দেখছি যে, লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির সমন্বয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ পাণ্ডুলিপি বা পুস্তকের বরাত প্রদানের পরিবর্তে শ্রবণের বরাত প্রদানের নিয়ম প্রচলন করেন। তাঁদের এই পদ্ধতিটি ছিল অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। বর্তমান যুগে প্রচলিত গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখ করে 'Reference' বা তথ্যসূত্র দেওয়ার চেয়ে এভাবে শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে 'Reference' দেওয়া অনেক নিরাপদ ও যৌক্তিক। তৎকালীন হস্তলিখিত গ্রন্থের যুগে শুধুমাত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থ পাঠে ভুলের সম্ভাবনা, গ্রন্থের মধ্যে অন্যের সংযোজনের সম্ভাবনা ও অনুলিপিকারের ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গ্রন্থকারের মুখ থেকে গ্রন্থটি পঠিতরূপে গ্রহণ করলে এ সকল ভুল বা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না।

ইহূদী-খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থ লিখতেন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে। এতে বাইবেলের বিকৃতি সহজ হয়েছিল। ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ্য বিকৃতি বিদ্যমান, যেগুলিকে তাঁরা (erratum) ভুল এবং (Various readings) বা পাঠের বিভিন্নতা বলে অভিহিত করেন।[১৩৭] মিল প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ ত্রিশহাজার ভুল রয়েছে। আর ক্রিসবাখ প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেলের মধ্যে এইরূপ একলক্ষ পঞ্চাশহাজার ভুল রয়েছে। আর শোলয-এর মতে এইরূপ বিকৃতি বাইবেলের মধ্যে এত বেশি যে তা গণনা করে শেষ করা যায় না।[১৩৮]

এ বিকৃতি ও ভুলের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পেরেছিলেন মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির বিষয়ে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে।

আমরা আরো দেখছি যে, হাদীস তৃতীয় শতাব্দীতে বা পরবর্তী কালে সংকলিত হয়েছে মনে করাও ভুল। মূলত প্রথম শতাব্দী থেকেই হাদীস সংকলন করা হয়েছে। পরবর্তী সংকলকগণ তাঁদের গ্রন্থে পূর্ববর্তী সংকলকদের সংকলিত পুস্তকগুলি সংকলিত করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণ কখনোই হাদীস বর্ণনার তথ্যসূত্র হিসাবে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন নি। বরং পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি মৌখিক বর্ণনা ও

শ্রুতির উপরে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১. ৪. ৪. ব্যক্তিগত সততা যাচাই

বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদীসকে হাদীসের নামে কথিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা থেকে পৃথক করার জন্য মুহাদ্দিসগণের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সনদে উল্লিখিত সকল 'রাবী'-র ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাদের ব্যক্তিগত সততা, সত্যপরায়ণতা ও ধার্মিকতা (عدالة) সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরা 'রাবী'র কর্ম পর্যবেক্ষণ করতেন এবং প্রয়োজনে সমকালীন আলিম, মুহাদ্দিস ও শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করতেন।

সাহাবীগণের সমকালীণ ১ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী আবুল আলীয়া রুফাই' ইবনু মিহরান (৯০ হি) বলেন: কোনো স্থানে কোনো ব্যক্তি হাদীস বলেন বা শিক্ষাদান করেন জানলে আমি হাদীস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তার নিকট গমন করতাম। সেখানে যেয়ে আমি তার সালাত পর্যবেক্ষণ করতাম। যদি দেখতাম, তিনি সুন্দর ও পূর্ণরূপে সালাত প্রতিষ্ঠা করছেন তবে আমি তার নিকট অবস্থান করতাম এবং তার নিকট থেকে হাদীস লিখতাম। আর যদি তার সালাতের বিষয়ে অবহেলা দেখতাম তবে আমি তার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা না করেই ফিরে আসতাম। আমি বলতাম: যে সালাতে অবহেলা করতে পারে সে অন্য বিষয়ে বেশি অবহেলা করবে।[১৩৯]

তাঁরা শুধু হাদীস বর্ণনাকারীর বাহ্যিক কর্মই দেখতেন না, তার আচরণ, আখলাক, সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদিও জানার চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আসিম ইবনু সুলাইমান আল-আহওয়াল (১৪০ হি) বলেন, আমি আবুল আলিয়া (৯০ হি)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা (দ্বিতীয় শতকের তাবিয়ীগণ) তোমাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে সালাত- সিয়াম বেশি পালন কর বটে, কিন্তু মিথ্যা তোমাদের জিহ্বায় প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।[১৪০]

এছাড়া উক্ত রাবীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং তার পাণ্ডুলিপির সাথে মুখের বর্ণনা মিলিয়ে তাঁর সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। নিজেরদের পর্যবেক্ষণের পাশাপশি মূলত সমকালীন আলিমদের মতামতের মাধ্যমে তারা রাবীর সততা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করতেন। ইয়াহইয়া ইবনু মুগীরাহ (২৫৩ হি) বলেন: আমি প্রখ্যাত তাবি-তাবিয়ী জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ (১৮৮ হি)-কে তার ভাই আনাস ইবনু আব্দুল হামীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তার হাদীস লিখবে না; কারণ সে মানুষের সাথে কথাবার্তায় মিথ্যাকথা বলে। সে হিশাম ইবনু উরওয়াহ, উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিখেছে। কিন্তু যেহেতু মানুষের সাথে কথাবার্তায় তার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে সেহেতু তার হাদীস গ্রহণ করবে না।[১৪১]

তবে সর্বাবস্থায় তাঁদের মূল সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতো ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক নিরীক্ষা। এজন্য অগণিত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মুহাদ্দিস কোনো একজন রাবী সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনে প্রবল ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে তার নিকট হাদীস শিখতে গিয়েছেন। কিন্তু যখনই তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা ও ভুল দেখতে পেয়েছেন তখনই সেই ব্যক্তির বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে গিয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহার্‌রির আল-জাযারী ২য় শতকের একজন আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন। খলীফা মনসূরের শাসনামলে (১৩৬-১৫৮ হি) তিনি বিচারকের দায়িত্বও পালন করেন। তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১হি) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহার্‌রিরের নেক আমল, বুজুর্গী ও প্রসিদ্ধির কথা শুনে আমার মনে তার প্রতি এত প্রবল ভক্তি জন্মেছিল যে, আমাকে যদি এখতিয়ার দেওয়া হতো যে, তুমি জান্নাতে যাবে অথবা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুহাররিরের সাথে সাক্ষাত করবে, তাহলে আমি তার সাথে সাক্ষাতের পরে জান্নাতে যেতে চেতাম। কিন্তু যখন আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মিথ্যার ছড়াছড়ি দেখে আমার মনের সব ভক্তি উবে গেল। ছাগলের শুকনো লাদিও আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়।[১৪২]

১. ৪. ৫. সাহাবীগণের সততা

এভাবে প্রত্যেক রাবীর ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বর্ণনার যথার্থতা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে নিরীক্ষা ও যাচাই করেছেন। 'রাবী'র ব্যক্তিগত প্রসিদ্ধি, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি কোনো কিছুই তাঁদেরকে এই যাচাই ও নিরীক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, যাচাই ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে অনেক দেশ বরেণ্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেও তাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন সাহাবীগণ। একমাত্র সাহাবীগণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ ব্যক্তিগত সততা ও বিশ্বস্ততা নিরীক্ষা করেন নি। তাঁরা সকল সাহাবীকে ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও সত্যপরায়ণ বলে মেনে নিয়েছেন।

ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ এবং শিয়াগণ মুহাদ্দিসগণের এই মূলনীতির সমালোচনা করেন। তাঁরা সাহাবীগণের সততায় বিশ্বাস করেন না। বরং তারা সাহাবীগণকেই জালিয়াত বলে অভিযুক্ত করেন।

সাহাবীগণের সততা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁদের সততার বিষয়ে 'হাদীসের' নির্দেশনাও আমি এখানে আলোচনা করব না। আমি এখানে যুক্তি, বিবেক ও কুরআনের আলোকে সাহাবীগণের সততার বিষয়টি

আলোচনা করব।

(১) মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণের বিষয়ে মূলত 'বিশ্বজনীন' মানবীয় মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না কোনো মানুষের বিষয়ে মিথ্যাচার প্রমাণিত হবে, ততক্ষণ তাকে 'সত্যবাদী' বলে গণ্য করতে হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। 'তার সাথে তার ভাইয়ের মামলা বা শত্রুতা আছে' এই অভিযোগে অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বর্ণিত সংবাদ বা তথ্য বাতিল করা যায় না। মুসলিম উম্মাহ এই নীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। সাহাবীগণ পরস্পরে যুদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন বিরোধিতা ও জাগতিক সমস্যায় পড়েছেন, কিন্তু কখনো কোনোভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অবস্থাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন। সাহাবীদের বিরুদ্ধে যারা বিষোদগার করেন, তাঁরা একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, অমুক ঘটনায় অমুক সাহাবী হাদীসের নামে মিথ্যা বলেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ইতিহাসে সাহাবীদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু লিখিত রয়েছে। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেছেন বলে কোনো তথ্য প্রমাণিত হয় নি। কাজেই তাঁদের দেওয়া তথ্য গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কোনো সাধারণ সন্দেহের ভিত্তিতে, হয়ত তিনি মিথ্যা বলেছেন এই ধারণার উপরে কারো সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

(২) আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণ ও বিচারের সময় তা নিরীক্ষা করতেন। অন্যান্য সাহাবীর বর্ণনা তারা অনেক সময় যাচাই করেছেন। একটি ঘটনাতেও কারো ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যা বা জালিয়াতি ধরা পড়ে নি। বরং সাহাবীগণের সত্যবাদিতা, সততা, ও এক্ষেত্রে তাঁদের আপোসহীনতা ইতিহাস-খ্যাত। হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সতর্কতা ছিল অতুলনীয়।

(৩) যে কোনো ধর্ম-প্রচারক বা মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতার মত ও পরিচয় তাঁর সহচরদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। এজন্য সকল ধর্মেই নবী, রাসূল বা ধর্ম-প্রবর্তকের সহচরদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। এদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনোভাবেই নবী বা রাসূলের বাণী, বাক্য ও আদর্শ জানা সম্ভব নয়। সাহাবীগণের প্রতি সন্দেহ বা অনাস্থার অর্থই হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অস্বীকার করা এবং ইসলামকে ব্যবহারিক জীবন থেকে মুছে দেওয়া। কারণ কুরআন, হাদীস বা ইসলাম সবই এ সকল সাহাবীর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি।

(৪) সাহাবীগণের সততায় অবিশ্বাস করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়ত অবিশ্বাস করা। যারা মনে করেন যে, অধিকাংশ সাহাবী স্বার্থপর, অবিশ্বাসী বা ধর্মত্যাগী ছিলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)) একজন ব্যর্থ নবী ছিলেন (নাঊযূ বিল্লাহ!)। লক্ষ মানুষের সমাজে অজ্ঞাত অখ্যাত দুই চার জন্য মুনাফিক থাকা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কিন্তু যারা দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে থেকেছেন এবং সাহাবী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদেরকেও যদি কেউ 'প্রবঞ্চক' বলে দাবি করেন, তবে তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যর্থতার দাবি করছেন।

একজন ধর্ম প্রচারক যদি নিজের সহচরদের হৃদয়গুলিকে ধার্মিক বানাতে না পারেন, তবে তিনি কিভাবে অন্যদেরকে ধার্মিক বানাবেন! তাঁর আদর্শ শুনে, ব্যবহারিকভাবে বাস্তবায়িত দেখে ও তাঁর সাহচর্যে থেকেও যদি মানুষ 'সততা' অর্জন করতে না পারে, তবে শুধু সেই আদর্শ শুনে পরবর্তী মানুষদের 'সততা' অর্জনের কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

আজ যিনি মনে করেন যে, কুরআন পড়ে তিনি সততা শিখেছেন, অথচ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কুরাআন পড়ে, জীবন্ত কুরআনের সাহচর্যে থেকেও আবূ হুরাইরা সততা শিখতে পারেন নি, তিনি মূলত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়তকেই অস্বীকার করেন। মানবীয় দুর্বলতা, ক্রোধ, দলাদলি ইত্যাদি এক বিষয় আর প্রবঞ্চনা বা জালিয়াতি অন্য বিষয়। ধর্মের নামে জালিয়াতি আরো অনেক কঠিন বিষয়। কোনো ধর্ম-প্রবর্তক যদি তাঁর অনুসারীদের এই কঠিনতম পাপের পঙ্কিলতা থেকে বের করতে না পারেন, তবে তাকে কোনোভাবেই সফল বলা যায় না। কোনো স্কুলের সফলতা যেমন ছাত্রদের পাশের হারের উপর নির্ভর করে, তেমনি ধর্মপ্রচারকের সফলতা নির্ভর করে তার সাহচর্য-প্রাপ্তদের ধার্মিকতার উপর।

(৫) সর্বোপরি কুরআনে বিশ্বাসী কোনো মুসলিম কখনোই সাহাবীদের সততায় সন্দেহ করতে পারে না। কুরআনে বারংবার সাহাবীগণের ধার্মিকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। অল্প কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করছি।

মহিমাময় আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[১৪৩]

এখানে সাহাবীগণকে তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে: প্রথমত, প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ, দ্বিতীয়ত, প্রথম অগ্রগামী আনসারগণ এবং তৃতীয়ত তাঁদেরকে যারা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছেন। প্রথম দুই পর্যায়ের সাহাবীগণকে সফলতার মাপকাঠি ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী এই দুই ভাগের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন কারীমে অন্যান্য অনেক স্থানে সকল মুহাজির ও সকল আনসারকে 'প্রকৃত মুমিন' ও জান্নাতী বলে উল্লেখ করা

হয়েছে ।[১৪৪]

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে 'বাইয়াতে রেদওয়ান' সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"মুমিনগণ যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট 'বাইয়াত' গ্রহণ করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন ।"[১৪৫]

হাদীস-বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এই 'বাইয়াতে' অংশগ্রহণ করেছিলেন । একজন মুনাফিকও এতে অংশ নেয় নি ।

তাবূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীর প্রশংসায় বলেন হচ্ছে:

لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সংগে ঈমান এনেছে, তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং তারাই সফলকাম ।"[১৪৬]

হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সকল সাহাবীই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন । একজন মুনাফিকও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল সাহাবীর ঢালাও প্রশংসা করে ও তাঁদের ধার্মিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার 'ঢালাও' ঘোষণা দিয়ে এরশাদ করা হয়েছে:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ

"কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন । তিনি কুফ্‌রী, পাপ ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন । তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী ।"[১৪৭]

অন্যত্র মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে ইসলামগ্রহণকারী উভয় প্রকারের সাহাবীগণকে 'ঢালাওভাবে' কল্যাণ বা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে । তবে আল্লাহ উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।"[১৪৮]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ সকলেই মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সংগ্রাম করেছেন ।

সাহাবীগণের প্রসংসায়, তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ঈমান ও জান্নাতের সাক্ষ্য সম্বলিত আরো অনেক আয়াত কুরআন কারীমে রয়েছে ।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন আবূ হুরাইরা, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আনাস ইবনু মালিক, আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, আবূ সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, আলী ইবনু আবী তালিব, উমার ইবনুল খাত্তাব, উম্মু সালামাহ, আবূ মূসা আশ'আরী, বারা ইবনু আযিব, আবূ যার গিফারী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ উমামা বাহিলী, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, সাহল ইবনু সাদ, উবাদা ইবনুস সামিত, ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন, আবূ দারদা, আবূ কাতাদা, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, উবাই ইবনু কা'ব মু'আয ইবনু জাবাল, উসমান ইবনু আফ্‌ফান প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবী ।

এঁরা সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রসিদ্ধ সহচর, মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণকারী, তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, বাইয়াতে রেদোয়ানে অংশগ্রহণকারী বা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার ।

এখন যদি কেউ বলেন যে, তিনি কুরআন বিশ্বাস করেন, তবে এ সকল সাহাবীর সকলের বা কারো কারো সততায় বা বিশ্বস্ত তায় তিনি বিশ্বাস করেন না, তবে তিনি মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক অথবা জ্ঞানহীন মূর্খ । কুরআন যাকে সৎ, ঈমানদার ও সফলকাম বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং কুরআন যার জন্য 'কল্যাণের' প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে তার সততার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ কুরআনের সাক্ষ্য অস্বীকার করা ।

১. ৪. ৬. তুলনামুলক নিরীক্ষা

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় এবং বিশুদ্ধ হাদীসকে অশুদ্ধ হাদীস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের অন্যতম পদ্ধতি ছিল

সার্বিক নিরীক্ষা (Cross Examine)। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মূলত সাহাবীগণের কর্মধারার অনুসরণ করেছেন।

১. ৪. ৬. ১ তুলনামূলক নিরীক্ষার মূল প্রক্রিয়া

আবু হুরাইরা (রা) একজন সাহাবী। অনেক তাবিয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন এবং কেউ অল্প দিন তাঁর সাথে থেকেছেন। কোনো সাহাবী বা মুহাদ্দিস একেক ছাত্রকে একেকটি হাদীস শিখাতেন না। তাঁরা তাঁদের নিকট সংগৃহীত হাদীসগুলি সকল ছাত্রকেই শিক্ষা দিতেন। ফলে সাধারণভাবে আবূ হুরাইরা (রা) বর্ণিত সকল হাদীসই তাঁর অধিকাংশ ছাত্র শুনেছেন। তাঁরা একই হাদীস আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ আবু হুরাইরার (রা) সকল ছাত্রের বর্ণিত হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করে সেগুলি পরস্পরের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষা করেছেন।

যদি দেখা যায় যে, ৩০ জন তাবেয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিন্তু বাকী ৫/১০ জনের শব্দ অন্য রকম, তবে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবূ হুরাইরা যে শব্দে বলেছেন হুবহু সেই শব্দে মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকী কয়জন হাদীসটি ভালভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন নি। এতে তাদের মুখস্থ ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবূ হুরাইরার (রা) কোনো ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ১০০ টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলি বা অধিকাংশ হাদীস তিনি হুবহু মুখস্থ রেখে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবিয়ী ১০০ টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন ভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য তাবেয়ীর বর্ণনার সাথে মেলে না তাহলে বুঝা যাবে যে তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্থ রাখতে পারতেন না। এই বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি "যয়ীফ" বা দুর্বল রাবী হিসাবে চিহ্নিত হন।

ভুলের পরিমাণ, ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তার বর্ণিত এ সকল উল্টো পাল্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে তিনি ইচ্ছা পূর্বক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক হাদীসের নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে "মিথ্যাবাদী" রাবী বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস শুধুমাত্র এই ধরণের "মিথ্যাবাদী" বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসকে কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। বরং তাকে "মিথ্যা" বা "মাউযূ" হাদীস রূপে চিহ্নিত করা হতো।

অনেক সময় দেখা যায় যে, আবূ হুরাইরার (রা) কোন ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলছেন যা অন্য কোন ছাত্র বলছেন না। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে নিরীক্ষা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবিয়ী ছাত্র আবূ হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বা হাসান (সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য) হাদীস হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

আর যদি উপরোক্ত তুলনামূলক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে অধিকাংশ হাদীস বা অনেক হাদীস গ্রহণযোগ্য রাবীদের বর্ণনার সাথে কমবেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তবে তার বর্ণিত এই অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল বা মিথ্যা হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করা হতো।

সাধারণত একজন তাবিয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক তাবিয়ী চেষ্টা করতেন যথা সম্ভব বেশি সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন সেখানেই গমন করতেন। মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাদের থেকে সকল তাবিয়ীর হাদীস, তাঁদের থেকে বর্ণিত তাবে-তাবেয়ীগণের হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই ধারা অব্যহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে 'রাবী'গণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪৯]

ইমাম তিরমিযী আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবনু ইসা (২৭৫ হি) বলেন, আমাদেরকে আলী ইবনু হুজর বলেছেন, আমাদেরকে হাফস ইবনু সুলাইমান বলেছেন, তিনি কাসীর ইবনু যাযান থেকে, তিনি আসিম ইবনু দামুরাহ থেকে, তিনি আলী ইবনু আবু তালিব থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, মুখস্থ করবে, কুরআনের হালালকে হালাল হিসেবে পালন করবে ও হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের দশ ব্যক্তির বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।"[১৫০]

হাদীসটি এভাবে সংকলিত করার পরে ইমাম তিরমিযী হাদীসটির দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ

এই হাদীসটি “গরীব”। এই একটিমাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি জানা যায় না। এর সনদ সহীহ নয়। হাফস ইবনু সুলাইমান (১৮০ হি) হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিরমিযীর এ মতামত তাঁর ও দীর্ঘ তিন শতকের অগণিত মুহাদ্দিসের নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত। তাঁদের নিরীক্ষার সংক্ষিপ্ত পর্যায়গুলি নিম্নরূপ:

১. তাঁরা হাফস ইবনু সুলাইমান বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করেছেন।
২. হাফস যে সকল শিক্ষকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের অন্যান্য ছাত্র বা হাফসের ‘সহপাঠী’ রাবীদের বর্ণনা সংগ্রহ করে তাঁদের বর্ণনার সাথে তার বর্ণনার তুলনা করেছেন।
৩. এই হাদীসে হাফসের উস্তাদ কাসীর ইবনু যাযানের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করে হাফসের বর্ণনার সাথে তুলনা করেছেন।
৪. কাসীরের উস্তাদ আসিম ইবনু দামুরাহ বর্ণিত সকল হাদীস তার অন্যান্য ছাত্রদের সূত্রে সংগ্রহ করে হাফসের এই বর্ণনার সাথে তুলনা করেছেন।
৫. আলী (রা) এর অন্যান্য ছাত্রদের সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীস সংগ্রহ করে তুলনা করেছেন।
৬. আলী (রা) ছাড়া অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসের সাথে এই বর্ণনার তুলনা করেছেন।

এই নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন:

ক. এই হাদীসটি এই একটিমাত্র সূত্র ছাড়া কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। অন্য কোনো সাহাবী থেকে কেউ বর্ণনা করেন নি। আলীর অন্য কোনো ছাত্র হাদীসটি আলী থেকে বর্ণনা করেন নি। আসিমের অন্য কোনো ছাত্র তা তার থেকে বর্ণনা করেন নি। কাসীরের অন্য কোনো ছাত্র তা বর্ণনা করেন নি। এভাবে তারা দেখেছেন যে, দ্বিতীয় হিজরীর শেষ প্রান্তে এসে হাফস ইবনু সুলাইমান দাবী করছেন যে, এই হাদীসটি তিনি এই সূত্রে শুনেছেন। তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনো ‘সাক্ষী’ পাওয়া গেল না।

খ. এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলো। কারণ সাধারণভাবে এরূপ ঘটে না যে, আলী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আসিম ছাড়া কেউ জানবেন না। আবার আসিম একটি হাদীস শেখাবেন তা একমাত্র যাযান ছাড়া কেউ জানবেন না। আবার যাযান একটি হাদীস শেখাবেন তা হাফস ছাড়া কেউ জানবেন না।

গ. এখন দেখতে হবে যে, হাফস বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের অবস্থা কী? মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, হাফস তার উস্তাদ যাযান এবং অন্যান্য সকল উস্তাদের সূত্রে যত হাদীস বর্ণনা করেছেন প্রায় সবই ভুলে ভরা। এজন্য তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, হাফস যদিও কুরআনের বড় কারী ও আলিম ছিলেন, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় ‘দুর্বল’ ছিলেন। তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না বললেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বা ভুল করতেন খুব বেশি। এজন্য তাঁরা তাকে ‘দুর্বল’ ও ‘পরিত্যক্ত’ বলে গণ্য করেছেন।[১৫১]

হাদীস বর্ণনাকারী বা ‘রাবী’র বর্ণনার যথার্থতা নির্ণয়ের এই সুক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফলে মুহাদ্দিস যখন কোনো ‘রাবী’ বা হাদীসের বিষয়ে বিধান প্রদান করেন তখন তাঁরা অবাক হয়েছেন বা আপত্তি করেছেন। কেউ বলেছেন: এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা বিচারের ধৃষ্ঠতা। কেউ বলেছেন: এ হলো অকারণে, না জেনে বা আন্দাজে নেককার মানুষদের সমালোচনা। বর্তমান যুগেই নয়, ইসলামের প্রথম যুগগুলিতেও অনেক মানুষ এই প্রকারের ধারণা পোষণ করতেন।[১৫২]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ‘রাবী’ ও ‘হাদীসের’ সমালোচনায় হাদীসের ইমামগণের সকল বিধান ও হাদীস বিষয়ক মতামত এই নিরীক্ষার ভিত্তিতে। কোনো মুহাদ্দিস যখন কোনো রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন যে, তিনি (ثقة، ضابط، حافظ، صدوق، لا بأس به، ضعيف، كثير الوهم، منكر الحديث، متروك، كذاب، وضاع): নির্ভরযোগ্য, পরিপূর্ণ মুখস্থকারী, মুখস্থকারী, সত্যপরায়ণ, চলনসই, দুর্বল, অনেক ভুল করেন, আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, হাদীস বানোয়াটকারী ইত্যাদি তখন বুঝতে হবে যে, তার এই ‘সংক্ষিপ্ত মতামতটি’ তার আজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম, হাদীস সংগ্রহ ও তুলনামূলক নিরীক্ষার ফল।

অনুরূপভাবে যখন তিনি কোনো হাদীসের বিষয়ে বলেন:

صحيح، ضعيف، منكر، موضوع، مرسل، الصحيح وقفه...

হাদীসটি সহীহ, যয়ীফ, আপত্তিকর, বানোয়াট, মুরসাল, সহীহ হলো যে হাদীসটি সাহাবীর বাণী... ইত্যাদি তাহলেও আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি তাঁর আজীবনের সাধনার নির্যাস আমাদেরকে দান করলেন।

এভাবে আমরা মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা সম্পর্কে জানতে পারছি। এবার আমরা এই কর্মধারার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করব।

১. ৪. ৬. ২. নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলি

মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে রাবীর ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করতেন। এ বিষয়ক ২/১ টি ঘটনা দেখুন:

১. দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন তাবিয়ী উফাইর ইবনু মা'দান বলেন: "উমর ইবনু মুসা আল-ওয়াজিহী আমাদের নিকট হিমস শহরে করেন আগমন। আমরা হিমসের মসজিদে তার নিকট (হাদীস শিক্ষার্থে) সমবেত হই। তিনি বলতে থাকেন: আপনাদের নেককার শাইখ আমাদেরকে হাদীস বলেছেন। আমরা বললাম: নেককার শাইখ বলতে কাকে বুঝাচ্ছেন? তিনি বলেন: খালিদ ইবনু মাদান। আমি বললাম: আপনি কত সনে তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তিনি বলেন: আমি ১০৮ হিজরীতে তার নিকট হাদীস শিক্ষা করি। আমি বললাম: কোথায় তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাত হয়েছিল? তিনি বলেন: আরমিনিয়ায় যুদ্ধের সময়। আমি বললাম: আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন। খালিদ ইবনু মা'দান ১০৪ হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আপনি তার মৃত্যুর ৪ বছর পরে তার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। অপরদিকে তিনি কখনই আরমিনিয়ায় যুদ্ধে যান নি। তিনি শুধুমাত্র বাইযান্টাইন রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।"[১৫৩]

এভাবে এই রাবীর মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যক্ত ও মিথ্যাবাদী 'রাবী' রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবু হাতেম রাযী বলেন: উমর ইবনু মূসা পরিত্যক্ত, সে মিথ্যা হাদীস তৈরী করত। বুখারী বলেন: তার বর্ণিত হাদীস আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন: লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেন: লোকটি বানোয়াটভাবে হাদীসের সনদ ও মতন তৈরি করত। দারাকুতনী, নাসাঈ প্রমূখ মুহাদ্দিস বলেন: সে পরিত্যক্ত।[১৫৪]

২. আবুল ওয়ালীদ তাইয়ালিসী হিশাম ইবনু আব্দুল মালিক (২২৭ হি) বলেন: "আমি আমির ইবনু আবী আমের আল-খাযযায-এর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম। একদিন হাদীসের সনদে তিনি বললেন: 'আমাদেরকে আতা ইবনু আবী রাবাহ (১১৪ হি) বলেছেন'। আমি প্রশ্ন করলাম: আপনি কত সালে আতা থেকে হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন: ১২৪ হিজরী সালে। আমি বললাম: আতা তো ১১৩/১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন!"

এভাবে তার বর্ণনার মিথ্যা ধরা পড়ে। এই মিথ্যা ইচ্ছাকৃত হতে পারে বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি) বলেন: যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলে থাকেন তাহলে তিনি একজন মিথ্যাবাদী ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। আর যদি তিনি ভুলক্রমে আতা ইবনুস সাইব (১৩৬ হি) নামের অন্য তাবিয়ীকে আতা ইবনু আবী রাবাহ বলে ভুল করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি একজন অত্যন্ত অসতর্ক, জাহিল ও পরিত্যক্ত রাবী।"[১৫৫]

৩. ১ম হিজরী শতকের একজন রাবী সুহাইল ইবনু যাকওয়ান আবু সিনদী ওয়াসিতী। তিনি আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করতেন। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে তার মিথ্যাচার ধরা পড়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, আমাদেরকে আব্বাদ বলেছেন: সুহাইল ইবনু যাকওয়ানকে আমরা বললাম: আপনি কি আয়িশা (রা) কে দেখেছেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ, দেখেছি। আমরা বললাম: বলুনতো তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। তিনি বলেন: তাঁর গায়ের রং কাল ছিল। সুহাইল আরো দাবি করেন যে, তিনি ইবরাহীম নাখয়ীকে দেখেছেন, তাঁর চোখ দুটি ছিল বড় বড়।

সুহাইলের এই বক্তব্য তার মিথ্যা ধরিয়ে দিয়েছে। কারণ আয়েশা (রা) ফর্সা ছিলেন। আর ইবরাহীম নাখয়ীর চোখ নষ্ট ছিল।[১৫৬]

১. ৪. ৬. ৩. শব্দগত ও অর্থগত নিরীক্ষা

হাদীসের সংগ্রহ ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের শব্দ, বাক্য বিন্যাস ও অর্থের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি, বাক্যের ব্যবহার ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষা ও ভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা লক্ষ্য করতেন। বর্ণিত হাদীসটির অর্থ মানবীয় যুক্তি, জ্ঞান, বিবেক বিরোধী কি না, অথবা কুরআন ও হাদীসের সুপরিচিত বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী কি না তা বিবেচনা করতেন। ফলে অনেক সময় বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত সততা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসকে তাঁরা মিথ্যা বা বানোয়াট বলে প্রত্যাখ্যান করতেন। পরবর্তী আলোচনায় পাঠক এ বিষয়ক অনেক উদাহরণ দেখতে পাবেন।

১. ৪. ৬. ৪. 'রাবী'-র উস্তাদকে প্রশ্ন করা

মুহাদ্দিসগণ কোনো রাবীর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের পরে চেষ্টা করতেন তিনি যে উস্তাদের সূত্রে হাদীসটি বলেছেন তাঁর কাছে যেয়ে সরাসরি তাকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে বর্ণনাটি যাচাই করার। এজন্য প্রয়োজনে তাঁরা হাজার মাইল পরিভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করতেন। উক্ত শিক্ষকের মৃত্যুর কারণে তার নিকট প্রশ্ন করা সম্ভব না হলে তাঁরা তার অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনা সংগ্রহ করে তুলনা করতেন। এই জাতীয় একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা কারী 'রাবী' হাসান ইবনু উমারাহ আল-বাজালী (১৫৩ হি) তিনি বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন এবং কিছুদিন বাগদাদের বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন। সমকালীন নাকিদ বা

সমালোচক হাদীসের ইমামগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তার দুর্বলতা প্রমাণিত করেন। এ বিষয়ে দ্বিতীয় হিজরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাকিদ ও ইমাম আল্লামা শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০ হি) বলেনঃ "হাসান ইবনু উমারাহ আমাকে ৭ টি হাদীস বলেন। তিনি বলেন যে, তিনি হাদীসগুলি হাকাম ইবনু উতাইবাহ (১১৩ হি) এর নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার থেকে শুনেছেন। আমি হাকাম ইবনু উতাইবাহ-এর সাথে সাক্ষাত করে সেগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ এগুলি মধ্যে একটি হাদীসও আমি বলি নি।"[১৫৭]

আবু দাউদ তায়ালিসী সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি) বলেনঃ শু'বা আমাকে বলেনঃ আমাকে হাসান ইবনু উমারাহ বলেন, আমাকে হাকাম ইবনু উতাইবাহ বলেছেন, আব্দুর রাহমান ইবনু আবী লাইলা বলেছেন, আলী (রা) বলেছেনঃ "উহুদের শহীদগণকে গোসল দেওয়া হয়, কাফন পরানো হয় এবং জানাযার সালাত আদায় করা হয়।" এরপর আমি হাকামের নিকট গমন করে উহুদের শহীদগণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ তাঁদের গোসল করানো হয় নি এবং কাফন পরানো হয় নি। আমি বললামঃ তাহলে হাসান ইবনু উমারাহ যে আপনার সূত্রে এইসব কথা বর্ণনা করছে? তিনি বলেনঃ আমি কখনোই তাকে এই হাদীস বলি নি।"[১৫৮]

আবু দাউদ তায়ালিসী আরো বলেনঃ আমাকে শু'বা বললেনঃ তুমি জারীর ইবনু হাযিম (১৭০ হি) এর নিকট গমন করে তাকে বলঃ আপনার জন্য হাসান ইবনু উমারাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয নয়; কারণ সে মিথ্যা বলে। তায়ালিসী বলেনঃ আমি প্রশ্ন করলামঃ কিভাবে তা জানলেন? তিনি বলেনঃ তিনি আমাকে হাকাম ইবনু উতাইবাহর সূত্রে অনেক হাদীস শুনিয়েছেন যেগুলির কোনো ভিত্তি আমি পাই নি।

তায়ালিসী বলেনঃ আমি বললামঃ সেগুলি কি? শু'বা বলেনঃ আমি হাকামকে বললামঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি উহদ যুদ্ধের শহীদগণের সালাতুল জানাযা আদায় করেছিলেন? তিনি বলেনঃ না, তিনি তাঁদের সালাতুল জানাযা আদায় করেন নি। আর হাসান ইবনু উমারাহ বলছেন, তাকে হাকাম বলেছেন, তাকে মুকসিম বলেছেন, তাকে ইবনু আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহদের শহীদগণের সালাতুল জানাযা আদায় করেন এবং দাফন করেন। আমি হাকামকে বললামঃ জারজ সন্তানের বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি বলেনঃ তাদের জানাযা পড়া হবে। আমি বললামঃ এই হাদীস কার থেকে বর্ণিত? হাকাম বলেনঃ হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। অথচ হাসান ইবনু উমারাহ বলছেনঃ তাকে হাকাম হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনুল জাযযার থেকে আলীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।"[১৫৯]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শু'বা হাসান ইবনু উমারাহ-এর বর্ণিত হাদীসগুলি তার উস্তাদের নিকট পেশ করে হাসানের বর্ণনার অযথার্থতা ও তার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এইরূপ অগণিত ঘটনা আমরা রিজাল গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই। মূলত মুহাদ্দিসগণের সফরের একটি বড় অংশ ব্যয় করতেন সংকলিত হাদীস সমূহ 'রাবী'র উস্তাদের নিকট পেশ করে সেগুলির যথার্থতা যাচাইয়ের কাজে।

১. ৪. ৬. ৫. বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনার তুলনা

মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষার অন্যতম দিক ছিল রাবীর সতীর্থ বা 'সহপাঠি'-গণের বর্ণনা সংগ্রহ ও তুলনা করে তার যর্থার্থতা নির্ণয় করা। তুলনা ও নিরীক্ষার এই প্রক্রিয়া ছিল তাঁদের সার্বক্ষণিক হাদীস চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাদীস শ্রবণের সংঙ্গে সংঙ্গে তাঁরা সেই হাদীসকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত অন্যদের বর্ণিত হাদীসগুলির সাথে তুলনা করতেন। এরপর প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে অন্যান্য রাবীদেরকে প্রশ্ন করতেন, তাঁদের বর্ণনার সাথে এই বর্ণনার তুলনা করতেন এবং প্রয়োজন মত পাণ্ডুলিপির সাথে মেলাতেন।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু দাউদ তায়ালিসী (২০৪ হি) বলেন, আমরা একদিন আমাদের উস্তাদ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের (১৬০ হি) নিকট বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় সমসাময়িক রাবী হাসান ইবনু দীনার সেখানে আগমন করেন। শু'বা তাকে বলেন, আপনি এখানে বসুন। তিনি বসেন এবং হাদীস বলেনঃ আমাদেরকে হামীদ ইবনু হিলাল বলেছেন, তিনি মুজাহিদ (২১-১০৪ হি) থেকে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (২৩ হি) বলতে শুনেছেন...। হাদীসটি শুনে শু'বা অবাক হয়ে বলেনঃ মুজাহিদ উমার থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন? এ কিভাবে সম্ভব? এসময় হাসান ইবনু দীনার উঠে চলে যান। অন্য একজন রাবী আবুল ফাদল বাহর ইবনু কুনাইয আস-সাক্কা (১৬০ হি) সেখানে আগমন করেন। শু'বা তাকে বলেনঃ আবুল ফাদল, আপনি হামীদ ইবনু হিলাল থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদেরকে হামীদ ইবনু হিলাল বলেছেন, আমাদেরকে বনী আদী গোত্রের আবু মুজাহিদ নামের একজন আলিম বলেছেন, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলতে শুনেছেন...। তখন শু'বা বলেনঃ তাহলে এই হলো আসল বিষয়।[১৬০]

হাসান ইবনু দীনার তার হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন। প্রসিদ্ধ রাবী মুজাহিদের জন্ম উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এর শাহাদতের দুই এক বছর পূর্বে। তিনি উমরের নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেন নি। তিনি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাবীর নামে ভুল করেছেন। বাহর আস-সাক্কা-এর বর্ণনার সাথে তুলনা করে শু'বা বুঝতে পারলেন হাসান ইবনু দীনারের ভুল কোথায়। তিনি হামীদ ইবনু হিলালের উস্তাদের নাম ঠিকমত মনে রাখতে পারেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না বললেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন। তিনি হাদীস নির্ভুলরূপে মুখস্থ রাখতে বা বর্ণনা করতে পারেন না।

তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'নাকিদ' মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) মূসা ইবনু ইসমাঈল (২২৩ হি)-এর

নিকট গমন করে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইবনু দীনারের (১৬৭ হি) বর্ণিত হাদীসগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মূসা বলেন: আপনি এই পাণ্ডুলিপিগুলি আর কারো কাছে শুনেন নি? ইয়াহইয়া বলেন: আমি ইতোপূর্বে হাম্মাদের ১৭ জন ছাত্রের কাছে তাদের নিকট সংকলিত হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসগুলির পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনেছি। আপনি ১৮তম ব্যক্তি যার কাছে আমি হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসগুলি পড়তে চাই। মূসা বলেন: কেন? ইয়াহইয়া বলেন: কারণ হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুই এক স্থানে ভুল করতেন; এজন্য আমি তার ভুল এবং তার ছাত্রদের ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে চাই। যদি দেখি যে, হাম্মাদের সকল ছাত্রই একইভাবে বর্ণনা করছেন তাহলে বুঝতে পারব যে, হাম্মাদ এভাবেই বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ভুল হলে তা হাম্মাদেরই ভুল। আর যদি দেখি যে, ছাত্রদের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবে যে, এক্ষেত্রে ভুল ছাত্রর নিজের। এভাবে আমি হাম্মাদের নিজের ভুল এবং তাঁর ছাত্রদের ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।[১৬১]

মুহাদ্দিসগণের 'তুলনামূলক নিরীক্ষা'-র অগণিত উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ইমাম মুসলিম বিস্তারিতভাবে তার "আত-তাময়ীয' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় একটি উদাহরণ এখানে পেশ করছি। তিনি বলেন:

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হাদীসের সনদে বা মতনে হতে পারে। মতনে ভুলের একটি উদাহরণ। আমাকে হাসান হুলওয়ানী ও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ দারিমী বলেছেন, আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল মাজীদ বলেছেন, আমাদেরকে কাসীর ইবনু যাইদ বলেছেন, আমাকে ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ বলেছেন, কুরাইব ইবনু আবী মুসলিম (৯৮ হি) থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি বলেন: আমি আমার খালা (নবী-পত্নী) মাইমূনার ঘরে রাত্রি যাপন করি। ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাতে দাঁড়ান। তখন আমি তাঁর ডান পার্শে দাঁড়াই। তিনি আমাকে ধরে তাঁর বাম পার্শে দাঁড় করিয়ে দেন।...."

ইমাম মুসলিম বলেন: এই হাদীসটি ভুল। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনায় এর বিপরীত কথা বর্ণনা করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ বামে দাঁড়িয়েছিলেন এরপর তিনি তাঁকে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করিয়ে দেন। ... আমি এখানে কুরাইব ইবনু আবী মুসলিম থেকে তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা এবং এরপর ইবনু আব্বাস থেকে ইবনু আব্বাসের অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা উল্লেখ করব, যারা কুরাইবের সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁরই অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. আমাদেরকে ইবনু আবী উমর বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমর ইবনু দীনার থেকে, কুরাইব থেকে ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি মাইমূনার গৃহে রাত্রি যাপন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে উঠে ওযু করে সালাতে দাঁড়ান। ইবনু আব্বাস বলেন: আমি তখন উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে ওযু করেন সেভাবে ওযু করে তাঁর নিকট আগমন করি এবং তাঁর বামে দাঁড়াই। তিনি তখন আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন।
২. মাখরামাহ ইবনু সুলাইমান কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।
৩. সালামা ইবনু কুহাইল কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে অনুরূপভাবে।
৪. সালিম ইবনু আবীল জা'দ কুরাইব থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে এভাবেই।
৫. হুশাইম আবু বিশর থেকে সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে ইবনু আব্বাস থেকে।
৬. আইউব সাখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, তার পিতা সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।
৭. হাকাম ইবনু উতাইবাহ সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে।
৮. ইবনু জুরাইজ আতা ইবনু আবী রাবাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।
৯. কাইস ইবনু সা'দ আতা ইবনু আবী রাবাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।
১০. আবু নাদরাহ (মুনযির ইবনু মালিক) ইবনু আব্বাস থেকে।
১১. শা'বী ইবনু আব্বাস থেকে।
১২. তাউস ইকরামাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে।

ইমাম মুসলিম বলেন: এভাবে কুরাইব থেকে এবং ইবনু আব্বাসের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে সহীহ বর্ণনায় প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু আব্বাসকে তাঁর বামে দাঁড় করিয়েছিলেন বলে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে ভুল।[১৬২]

পাঠক, এখানে ইমাম মুসলিমের নিরীক্ষার গভীরতা ও প্রামণ্যতা লক্ষ্য করুন। তিনি এই একটি হাদীস ইবনু আব্বাস থেকে ১৩টি সূত্রে সংকলিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক বর্ণনাকে ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা থেকে পৃথক করলেন।

তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ নামক 'রাবী'র সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, কুরাইব তাকে বলেছেন, ইবনু আব্বাস তাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে দাঁড়ান এবং তিনি তাঁকে বামে দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর তিনি ইয়াযিদের উস্তাদ 'কুরাইবের' অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনার সাথে তা মেলালেন। কুরাইবের অন্য তিনজন প্রসিদ্ধ ছাত্র মাখরামাহ, সালামা ও সালিমের বর্ণনা ইয়াযিদের বর্ণনার বিপরীত। তাঁরা তিনজনেই বলছেন যে, কুরাইব বলেছেন, ইবনু আব্বাস বামে দাঁড়িয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ডানে দাঁড় করান। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পারেন নি।

ইমাম মুসলিম এখানেই থামেন নি। তিনি এরপর কুরাইব ছাড়াও ইবনু আব্বাসের অন্য ৫ জন ছাত্র: সাঈদ ইবনু জুবাইর,

আতা ইবনু আবী রাবাহ, আবু নুদরাহ, শা'বী ও ইকরিমাহ থেকে হাদীসটির বিবরণ সংকলিত করে তার সাথে উপরের বর্ণনাটির তুলনা করলেন। এই ৫ জনের বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ ইবনু আবী যিয়াদ হাদীসটির ভুল বর্ণনা দিয়েছেন। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইবনু আব্বাস তাঁর সকল ছাত্রকে বলেছেন যে, তিনি প্রথমে বামে দাঁড়িয়েছিলেন, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডানে দাঁড় করিয়ে দেন। ইবনু আব্বাসের সকল ছাত্রের ন্যায় কুরাইবও তাঁর ছাত্রদেরকে এই কথায় বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ইয়াযিদ তাঁর স্মৃতির দুর্বলতার কারণে হাদীসটি ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন।

এইরূপ ব্যাপক তুলনা ও নিরীক্ষা মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে করতেন। হাদীস ও রাবীর বিধান বর্ণনায় তাঁদের প্রতিটি মতামতই এইরূপ গভীর ও ব্যাপক তুলনা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'য়া ইবনু উক্ববা আল-হাদরামী আল-গাফিকী (১৭৪ হি)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে পেয়েছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলের পরিমাণ খুবই বেশি। নাকিদ মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলি তাঁর নিকট থেকে বা তাঁর ছাত্রদের নিকট থেকে সংকলিত করেছেন। এরপর তিনি যেসকল উস্তাদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের অন্যান্য ছাত্রদের থেকে হাদীসগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। এরপর এ সকল বর্ণনার সনদ ও মতনের তারতম্য দেখতে পেয়ে 'ইবনু লাহীয়াহ'-কে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনু লাহীয়াহ-এর মারাত্মক ভুলের উদাহরণ হিসাবে ইমাম মুসলিম বলেনঃ আমাদেরকে যুহাইর ইবনু হারব বলেছেন, আমাদেরকে ইসহাক ইবনু ঈসা বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীয়াহ বলেছেন, মূসা ইবনু উকবাহ (১৪১ হি) আমার কাছে লিখে পাঠিয়েছেন, আমাকে বুসর ইবনু সাঈদ বলেছেন, যাইদ ইবনু সাবেত (রা) থেকে, তিনি বলেছেনঃ

اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যে হাজামত করেন বা সিংগার মাধ্যমে দেহ থেকে রক্ত বের করেন।" ইবনু লাহীআর ছাত্র ইসহাক ইবনু ঈসা বলেনঃ আমি ইবনু লাহীআহকে বললামঃ তাঁর বাড়ীর মধ্যে কোনো নামাযের স্থানে? তিনি বলেনঃ মসজিদে নববীর মধ্যে।"

ইমাম মুসলিম বলেনঃ হাদীসটির বর্ণনা সকল দিক থেকে বিকৃত। এর সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল হয়েছে। ইবনু লাহীয়াহ এর মতনের শব্দ বিকৃত করেছেন এবং সনদে ভুল করেছেন। এই হাদীসের সহীহ বিবরণ আমি উল্লেখ করছি।

আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম বলেন, আমাদেরকে বাহয ইবনু আসাদ বলেন, আমাদেরকে উহাইব ইবনু খালিদ ইবনু আজলান (১৬৫ হি) বলেন, আমাকে মূসা ইবনু উকবাহ বলেন, আমি আবুন নাদর সালিম ইবনু আবু উমাইয়াহ (১২৯ হি)- কে বলতে শুনেছি, তিনি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত থেকে বলেছেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى ... فِيهَا لَيَالِيَ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের মধ্যে চাটাই দিয়ে একটি ছোট ঘর বানিয়ে তার মধ্যে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন....।"

ইমাম মুসলিম বলেনঃ "আমাকে মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিনদ আল-ফারাযী (১৪৫ হি) বলেছেন, আমাদেরকে আবুন নাদর সালিম বলেছেন, তিনি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত থেকে, তিনি বলেনঃ

احْـــتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُجَـــيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ حَصِـــيـــرٍ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চাটাই দিয়ে মসজিদের মধ্যে একটি ঘর বানিয়ে নেন... ।"

ইমাম মুসলিম বলেনঃ এভাবে আমরা সঠিক বর্ণনা পাচ্ছি উহাইব ইবনু খালিদ (১৬৫ হি) থেকে মূসা ইবনু উকবাহ থেকে, আবুন নাদর থেকে। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিনদ আল-ফারাযী (১৪৫ হি) দ্বিতীয় সূত্রে আবুন নাদর থেকে যে বর্ণনা করেছেন তাও উল্লেখ করলাম। ইবনু লাহিয়া এখানে হাদীসের মতন বর্ণনায় ভুল করেছেন তার কারণ তিনি হাদীসটি মূসার নিকট থেকে স্বকর্ণে শুনেন নি। শুধুমাত্র লিখে পাঠানো পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। (এজন্য তিনি احتجر বা ঘর বানিয়েছেন শব্দটিকে احتجم বা রক্ত বাহির করেছেন বলে পড়েছেন।) যারা মুহাদ্দিসের নিজের মুখ থেকে স্বকর্ণে না শুনে বা মুহাদ্দিসকে নিজে পড়ে না শুনিয়ে শুধুমাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই আমরা এই বিকৃতির ভয় পাই।

আর সনদের ভুল হলো, মূসা ইবনু উকবাহ হাদীসটি আবুন নাদর সালিম-এর নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। আবুন নাদর হাদীসটি বুসর ইবনু সাঈদ থেকে শিখেছেন। কিন্তু ইবনু লাহিয়াহ সনদ বর্ণনায় আবুন নাদর- এর নাম উল্লেখ না করে বলেছেনঃ মূসা হাদীসটি বুসর থেকে শুনেছেন।[১৬৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম মুসলিম দুই পর্যায়ে তুলনা করেছেন। প্রথমত ইবনু লাহীয়াহর উস্তাদ মূসার অন্য ছাত্র উহাইবের

বর্ণনার সাথে ইবনু লাহীয়ার বর্ণনার তুলনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূসার উস্তাদ আবনু নাদরের অন্য ছাত্রের বর্ণনার সাথে মূসার দুই ছাত্রের বর্ণনার তুলনা করেছেন। উভয় বর্ণনা প্রমাণ করেছে যে, ইবনু লাহিয়াহ সনদ বর্ণনায় ও মতন উল্লেখে মারাত্মক ভুল করেছেন।

১. ৪. ৬. ৬. বিভিন্ন সময়ের বর্ণনার মধ্যে তুলনা করা

সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের অন্যতম পদ্ধতি বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে প্রশ্ন করা। এই পদ্ধতি সাহাবীগণ ব্যবহার করতেন হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণও এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। এখানে ২ টি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

১. উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৫ হি) এর সেক্রেটারী আবুয যুআইযাহ বলেন, একদিন মারওয়ান আমাকে বলেন: আবু হুরাইরাহ (রা) কে ডেকে আনাও। আবু হুরাইরা উপস্থিত হলে তিনি আবু হুরাইরাকে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আর আমাকে পর্দার আড়ালে বসে সেগুলি লিখতে নির্দেশ দিলেন। এরপর এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলে মারওয়ান পুনরায় আবু হুরাইরাকে ডেকে পাঠান এবং আমাকে পর্দার আড়ালে আগের বছরে লেখা পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসতে বলেন। তিনি আবু হুরাইরাকে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আবারো প্রশ্ন করেন এবং আবু হুরাইরা গত বছরে বলা হাদীসগুলি পুনরায় বলেন। আমি মিলিয়ে দেখলাম যে, তিনি একটুও কমবেশি করেন নি বা কোনো শব্দ আগে পিছেও করেন নি।[১৬৪]

২.উমারাহ ইবনুল কা'কা বলেন, আমাকে ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি) বলেন: তুমি আমাকে আবু যুর'আ ইবনু আমর ইবনু জারীব থেকে হাদীস বর্ণনা কর। আবু যুর'আর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ হলো, আমি তাকে একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করি। এরপর দুই বৎসর পরে আমি তাকে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। দ্বিতীয়বার তিনি হুবহু প্রথম বারের মতই বর্ণনা করেন, একটি অক্ষরও বেশিকম করেন নি।"[১৬৫]

১. ৪. ৬. ৭. স্মৃতি ও শ্রুতির সাথে পাণ্ডুলিপির তুলনা

আমরা দেখেছি যে, তাবেয়ীগণের যুগ থেকে 'রাবী' ও মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা করা হাদীসগুলি পৃথকভাবে পাণ্ডুলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতেন। তাঁরা পাণ্ডুলিপির সাথে মুখস্থ বর্ণনার তুলনা করে নির্ভুলতা যাচাই করতেন। প্রয়োজনে তাঁরা পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর, কালি ইত্যাদি পরীক্ষা করতেন। এখানে বর্ণিত হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণের কয়েকটি নযির উল্লেখ করছি।

(১) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন মুহাদ্দিস খলীফা ইবনু মূসা বলেন, আমি গালিব ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-জাযারী নামক একজন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা করতে গমন করি। তিনি আমাদেরকে হাদীস লেখাতে শুরু করে তার পাণ্ডুলিপি দেখে বলতে থাকেন: আমাকে মাকহূল (১১৫ হি) বলেছেন..., আমাকে মাকহূল বলেছেন ...., এভাবে তিনি মাকহূলের সূত্রে হাদীস লেখাতে থাকেন। এমন সময় তাঁর পেশাবের বেগ হয় তিনি উঠে যান। তখন আমি তার পাণ্ডুলিপির মধ্যে নযর করে দেখি সেখানে লেখা রয়েছে: আমাকে আবান ইবনু আবী আইয়াশ (১৪০ হি) বলেছেন, আনাস থেকে, আবান বলেছেন, অমুক থেকে...। তখন আমি তাকে পরিত্যাগ করে সেখান থেকে উঠে আসলাম।[১৬৬]

অর্থাৎ, এ রাবী তার হাদীসগুলি আবানের নিকট থেকে শুনেছেন ও লিখেছেন। তবে আবান মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল বলে ও অনির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত। এজন্য তিনি হাদীস পড়ার সময় তার নাম বাদ দিয়ে প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাকহূলের নামে হাদীসগুলি বলছিলেন। খলীফা সুযোগ পেয়ে তার মুখের বর্ণনার সাথে লিখিত পাণ্ডুলিপির তুলনা করে তার জালিয়াতি ধরে ফেলেন।

(২) দ্বিতীয় শতকের নাকিদ ইমাম, আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী (১৯৮ হি) বলেন, একদিন সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি) একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: হাদীসটি আমাকে বলেছেন হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান (১২০ হি), তিনি আমর ইবনু আতিয়্যাহ আত-তাইমী (মৃতু ১০০ হিজরীর কাছাকাছি) নামক তাবিয়ী থেকে তিনি সালমান ফারিসী (৩৪ হি) থেকে।

আব্দুর রাহমান বলেন: আমি বললাম: হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান তো এই হাদীস রিবয়ী ইবনু হিরাশ (১০০ হি) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সালমান ফারিসী থেকে। (অর্থাৎ, আপনার সনদ বর্ণনায় ভুল হয়েছে, হাম্মাদের উস্তাদ আমর ইবনু আতিয়াহ নয়, বরং রিবয়ী ইবনু হিরাশ।) সুফিয়ান সাওরী বলেন: এই সনদ কে বলেছেন? আমি বললাম: আমাকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (১৬৭ হি) বলেছেন, তিনি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান থেকে এই সনদ উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি বললাম: শু'বা ইবনুল হাজ্জাজও (১৬০ হি) আমাকে এই সনদ বলেছেন। তিনি বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি বললাম: হিশাম দাসতুআয়ীও (১৫৪ হি) আমাকে এই সনদ বলেছেন। তিনি বললেন: হিশাম? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন: আমি যা বলছি তাই লিখ। আমি হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: আমি আমর ইবনু আতিয়্যাহ থেকে হাদীসটি শুনেছেন।

আব্দুর রাহমান বলেন: আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেল যে, এখানে সুফিয়ান সাওরী ভুল করলেন। অনেকদিন যাবত আমি এই ধারণায় পোষণ করে থাকলাম যে, এ সনদ বলতে সুফিয়ান সাওরী ভুল করলেন। এরপর একদিন আমি আমার উস্তাদ মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার গুনদার (১৯৩ হি) এর মাধ্যমে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের যে হাদীসগুলি শুনেছিলাম সেগুলির লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে

দেখলাম যে, শু'বা বলেছেন, আমাকে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান বলেছেন, তাকে রিবয়ী ইবনু হিরাশ বলেছেন, সালমান ফারিসী থেকে। শু'বা বলেন: হাম্মাদ একবার বলেন যে, তিনি আমর ইবনু আতিয়্যাহ থেকে হাদীসটি শুনেছেন।

আব্দুর রহমান বলেন: পাণ্ডুলিপি দেখার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, সুফিয়ান সাওরী ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর নিজের মুখস্থের বিষয়ে তাঁর গভীর আস্থা থাকার কারণে অন্যান্যদের বিরোধিতাকে তিনি পাত্তা দেন নি।[১৬৭]

(৩) দ্বিতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) বলেন, যদি মুহাদ্দিসগণ শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬০) থেকে বর্ণিত হাদীসের সঠিক বর্ণনার বিষয়ে মতভেদ করেন তাহলে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার গুনদার (১৯৩ হি) এর পাণ্ডুলিপিই তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা করবে। গুনদার-এর পাণ্ডুলিপির বর্ণনাই সঠিক ও নির্ভুল বলে গৃহীত হবে।[১৬৮]

(৪) তৃতীয় শতকের তিনজন মুহাদ্দিস, মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু উসমান আর-রাযী (২৭০ হি), ফাদল ইবনু আব্বাস ও আবু যুরু'আ রাযী উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল কারীম (২৬৪ হি) একত্রে বসে হাদীস আলোচনা করছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম একটি হাদীস বলেন যাতে ফাদল আপত্তি উঠান। তিনি অন্য একটি বর্ণনা বলেন। দুজনের মধ্যে হাদীসটির বিষয়ে বচসা হয়। তাঁরা তখন আবু যুরআকে সালিস মানেন। আবু যুরআ মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম চাপাচাপি করতে থাকেন। তিনি বলেন: আপনার নীরবতার কোনো অর্থ নেই। আমার ভুল হলে তাও বলেন। আর তাঁর ভুল হলে তাও বলেন। আবু যুর'আ তখন তার পাণ্ডুলিপি আনতে নির্দেশ দেন। তিনি ছাত্র আবুল কাসিমকে বলেন, তুমি গ্রন্থাগারে ঢুকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি বাদ দেবে। এরপরের সারির বই গুণে প্রথম থেকে **১৬** খণ্ড পাণ্ডুলিপি রেখে **১৭** তম খণ্ডটি নিয়ে এস। তিনি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এসে আবু যুরআকে প্রদান করলেন। আবু যুরআ পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকেন এবং একপর্যায়ে হাদীসটি বের করেন। এরপর তিনি পাণ্ডুলিপিটি মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিমের হাতে দেন। মুহাম্মাদ পাণ্ডুলিপিতে সংকলিত হাদীসটি পড়ে বলেন: হ্যাঁ, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। আর ভুল তো হতেই পারে।"[১৬৯]

(৫) তৃতীয় হিজরীর একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান ইবনু উমর আল-ইসপাহানী রুস্তাহ (২৫০ হি)। তিনি একদিন হাদীসের আলোচনাকালে আবু যুরআ রাযী (২৬৪ হি) ও আবু হাতিম রাযী মুহাম্মাদ ইবনু ইদরিস (২৭৭ হি) উভয়ের উপস্থিতিতে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন: আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে তিনি আবু হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যোহরের সালাত ঠাণ্ডা করে আদায় করবে; কারণ উত্তাপের কাঠিন্য জাহান্নামের প্রশ্বাস থেকে।"। একথা শুনেই প্রতিবাদ করেন আবু যুর'আ রাযী। তিনি বলেন: আপনি (তাবিয়ী আবু সালিহ-এর উস্তাদ সাহাবীর নাম আবু হুরাইরা উল্লেখ করে) ভুল বললেন। সকলেই তো হাদীসটি (তাবিয়ী আবু সালিহ-এর মাধ্যমে) সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে বর্ণনা করেন। কথাটি আব্দুর রাহমানের মনে খুবই লাগে। তিনি বাড়ি ফিরে নিজের নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আবু যুরআর কাছে চিঠি লিখে বলেন: "আমি আপনাদের উপস্থিতিতে একটি হাদীস আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণনা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন যে, আমার বর্ণনা ভুল, সবাই হাদীসটি আবু সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেন। কথাটি আমার মনে খুবই আঘাত করেছিল। আমি বিষয়টি ভুলতে পারি নি। আমি বাড়িতে ফিরে আমার নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডলিপি পরীক্ষা করে দেখেছি। সেখানে দেখলাম যে হাদীসটি আবু সাঈদের সূত্রেই বর্ণিত। যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে আবু হাতিম ও অন্য সকল বন্ধুকে জানিয়ে দেবেন যে, আমার ভুল হয়েছিল। আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। ভুল স্বীকার করে লজ্জিত বা অপমানিত হওয়া (ভুল গোপন করে) জাহান্নামের আগুনে পোড়ার চেয়ে উত্তম।"[১৭০]

(৬) তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস সুলাইমান ইবনু হারব (২২৪ হি) বলেন: আমি যখন আমার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ 'নাকিদ' মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনু মা'য়ীন (২৩৩ হি) এর সাথে বিভিন্ন হাদীস আলোচনা করতাম, তখন তিনি মাঝে মাঝে বলতেন: এই হাদীসটি ভুল। আমি বলতাম: এর সঠিক রূপ কি হবে? তিনি বলতেন তা জানি না। তখন আমি আমার পাণ্ডুলিপি দেখতাম। আমি দেখতে পেতাম যে, তাঁর কথাই ঠিক। হাদীসগুলি পাণ্ডুলিপিতে অন্যভাবে লিখা রয়েছে।[১৭১]

(৭) ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি) কে প্রশ্ন করা হয়: আবুল ওয়ালীদ কি পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্য? তিনি বলেন: না। তার পাণ্ডুলিপিগুলিতে নোকতা দেওয়া ছিল না এবং হরকত দেওয়া ছিল না। তবে তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের নিকট থেকে যে হাদীসগুলি শুনেছিলেন ও লিখেছিলেন সেগুলি তিনি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৭২]

(৮) তৃতীয় শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াকূব ইবনু হুমাইদ ইবনু কাসিব (২৪০ হি)। ইমাম আবু দাউদ (২৭৫ হি) বলেন, ইয়াকূব- এর বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে অনেক হাদীস দেখতে পেলাম যেগুলি অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেন না। এজন্য আমরা তাকে তার মূল পাণ্ডুলিপিগুলি দেখাতে অনুরোধ করি। তিনি কিছুদিন যাবত আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেন। এরপর তিনি তার পাণ্ডুলিপি বের করে আমাদেরকে দেখান। আমরা দেখলাম তার পাণ্ডুলিপিতে অনেক হাদীস নতুন তাজা কালি দিয়ে লেখা। পুরাতন লিখা ও নতুন লিখার মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে। আমরা দেখলাম অনেক হাদীসের সনদের মধ্যে রাবীর নাম ছিল না, তিনি সেখানে নতুন করে রাবীর নাম বসিয়েছেন। কোনো কোনো হাদীসের ভাষার মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ বা বাক্য যোগ করেছেন। এজন্য আমরা তার হাদীস গ্রহণ

করা থেকে বিরত থাকি।[১৭৩]

(৯) ৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী (৩৬৫ হি) বলেন: মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আশ নামক এক ব্যক্তি মিশরে বসবাস করতেন এবং হাদীস বর্ণনা করতেন। আমি হাদীস সংগ্রহের সফরকালে মিশরে তার নিকট গমন করি। তিনি আমাদেরকে একটি পাণ্ডুলিপি বের করে দেন। পাণ্ডুলিপিটির কালি তাজা এবং কাগজও নতুন। এতে প্রায় এক হাজার হাদীস ছিল, যেগুলি তিনি হযরত আলীর বংশধর মূসা ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুসা ইবনু জা'ফার সাদিক ইবনু মুহাম্মাদ বাকির ইবনু যাইনুল আবিদীন ইবনু হুসাইন ইবনু আলী থেকে তাঁর পিতা-পিতামহদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন বলে দাবী করেন। এর প্রায় সকল হাদীসই অজ্ঞাত, অন্য কেউ এই সনদে বা অন্য কোনো সনদে তা বর্ণনা করেনি। কিছু হাদীসের শব্দ বা মতন অন্যান্য সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, তবে এই সনদে নয়। তখন আমি সনদে উল্লিখিত মুসা ইবনু ইসমাঈল সম্পর্কে আলী-বংশের সমকালীন অন্যতম নেতা হুসাইন ইবনু আলীকে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন: এই মূসা ৪০ বৎসর যাবত মদীনায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি কখনোই কোনোদিন বলেন নি যে, তিনি তাঁর পিতা-পিতামহদের সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে কোনো হাদীস তিনি শুনেছেন বা বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন: এই পাণ্ডুলিপির হাদীসগুলির কোনো ভিত্তি আমরা খুজে পাইনি। এগুলি তিনি বানিয়েছিলেন বলে বুঝা যায়।[১৭৪]

১. ৪. ৭. নিরীক্ষার ভিত্তিতে হাদীসের প্রকারভেদ

নিরীক্ষার ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে মূলত তিনভাগে ভাগ করেছেন: সহীহ বা বিশুদ্ধ, হাসান বা ভাল অর্থাৎ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ও যয়ীফ বা দুর্বল। যয়ীফ হাদীস দুর্বলতার কারণ ও দুর্বলতার পর্যায়ের ভিত্তিতে বিভিন্নভাগে বিভক্ত।

এখানে সাধারণ পাঠকের অনুধাবনের জন্য এগুলি সহজ ব্যাখ্যার চেষ্টা করব। মনে করুন একজন বিচারক একজন হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষ্য প্রমাণাদি নিরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো সে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এক ব্যক্তিকে খুন করেছে। প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তিনি সাম্ভাব্য ৪ প্রকার রায় প্রদান করতে পারেন: ১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৩. কয়েক বছরের কারাদণ্ড বা ৪. বেকসুর খালাস। মোটামুটিভাবে হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রেও এই পর্যায়গুলি রয়েছে।

১. ৪. ৭. ১. সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীস

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) 'আদালত': হাদীসের সকল রাবী পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) 'যাবত': সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩)'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) 'শুযূয মুক্তি': হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) 'ইল্লাত মুক্তি': হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত।[১৭৫]

প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা বলতে পারি যে, প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ তাকে "সহীহ" বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে গণ্য করেন। নিরীক্ষার মাধ্যমে যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস এই মানের নির্ভুল বা সহীহ বলে গণ্য করা হয় তাদের নির্ভরযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (ثقة، ثبت، حجة): নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

১. ৪. ৭. ২. 'হাসান' অর্থাৎ 'সুন্দর' বা গ্রহণযোগ্য হাদীস

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাসান হাদীসের মধ্যেও উপর্যুক্ত ৫টি শর্তের বিদ্যমানতা অপরিহার্য। তবে দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে যদি সামান্য দুর্বলতা দেখা যায় তবে হাদীসটিকে 'হাসান' বলা হয়। অর্থাৎ হাদীসের সনদের রাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে সৎ, প্রত্যেকে হাদীসটি ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে শুনেছেন বলে প্রমাণিত, হাদীসটির মধ্যে 'শুযূয' ও 'ইল্লাত' নেই। তবে সনদের কোনো রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনা'র ক্ষমতা বা 'যাবত' কিছুটা দুর্বল বলে বুঝা যায়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এইরূপ 'রাবী'র বর্ণিত হাদীস 'হাসান' বলে গণ্য।[১৭৬]

পরিভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে সাধারণ পাঠকের জন্য আমরা বলতে পারি যে, যে পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজন বিচারক খুনের অভিযোগে অভিযুক্তকে দীর্ঘ মেয়াদী শাস্তি দেন, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন শাস্তি প্রদান করেন না, সেই পর্যায়ের প্রমাণাদির ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ একটি হাদীসকে 'হাসান' বলে গণ্য করেন। যে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগণ আরবীতে (صدوق، لا بأس به، شيخ، صالح الحديث) সত্যপরায়ণ, অসুবিধা নেই, চলনসই ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

১. ৪. ৭. ৩. 'যয়ীফ' বা দুর্বল হাদীস

যে 'হাদীসের' মধ্যে হাসান হাদীসের শর্তগুলির কোনো একটি শর্ত অবিদ্যমান দেখা যায়, মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে

'যয়ীফ' হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ রাবীর বিশ্বস্ততার ঘাটতি, তাঁর বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনা বা স্মৃতির ঘাটতি, সনদের মধ্যে কোনো একজন রাবী তাঁর উর্ধ্বতন রাবী থেকে সরাসরি ও স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেননি বলে প্রমাণিত হওয়া বা দৃঢ় সন্দেহ হওয়া, হাদীসটির মধ্যে 'শুযূয' অথবা 'ইল্লাত' বিদ্যমান থাকা... ইত্যাদি যে কোনো একটি বিষয় কোনো হাদীসে মধ্যে থাকলে হাদীসটি যয়ীফ বলে গণ্য।[১৭৭]

শর্ত পাঁচটির ভিত্তিতে 'যয়ীফ' হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন মুহাদ্দিসগণ। সেগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো হাদীসকে 'যয়ীফ' বলে গণ্য করার অর্থ হলো, হাদীসটি 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয় বলেই প্রতীয়মন হয়। বর্ণনাকারীগণের দুর্বলতা বুঝাতে মহাদ্দিসগণ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন (ضعيف، ليس بشيء، لا يعرف، منكر الحديث، متروك، كذاب): দুর্বল, কিছুই নয়, মূল্যহীন, অজ্ঞাত পরিচয়, জঘন্য উলটোপাল্টা হাদীস বর্ণনাকারী, পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী, ইত্যাদি।

"যয়ীফ" বা দুর্বল হাদীসের দুর্বলতার তিনটি পর্যায় রয়েছে:

১. ৪. ৭. ৩. ১. কিছুটা দুর্বল

বর্ণনাকারী ভুল বলেছেন বলেই প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু ভুল রয়েছে। তবে তিনি ইচ্ছা করে ভুল বলতেন না বলেই প্রমাণিত। এইরূপ "যয়ীফ" হাদীস যদি অন্য এক বা একাধিক এই পর্যায়ের "কিছুটা" যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তা "হাসান" বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলে গণ্য হয়।

১. ৪. ৭. ৩. ২. অত্যন্ত দুর্বল (যায়ীফ জিদ্দান, ওয়াহী)

এইরূপ হাদীসের বর্ণনাকারীর সকল হাদীস তুলনামূলক নিরীক্ষা করে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ বা প্রায় সকল হাদীসই অগণিত ভুলে ভরা, যে ধরনের ভুল সাধারণত অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তার চেয়েও মারাত্মক ভুল, তবে তার বর্ণিত হাদীস "পরিত্যক্ত", একেবারে অগ্রহণযোগ্য বা অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করা হবে। এরূপ দুর্বল হাদীস অনুরূপ অন্য দুর্বল সুত্রে বর্ণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

১. ৪. ৭. ৩. ৩. মাউযূ বা বানোয়াট হাদীস

যদি প্রমাণিত হয় যে এরূপ দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে সমাজে প্রচার করতেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসের সূত্র (সনদ) বা মূল বাক্যের মধ্যে কমবেশি করতেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে "মাওযূ" বা বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করা হয়। বানোয়াট হাদীস জঘন্যতম দুর্বল হাদীস।[১৭৮]

১. ৪. ৮. গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

জালিয়াতি ও মিথ্যা থেকে হাদীস হেফাযতের জন্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম কর্ম ছিল গ্রন্থাকারে সনদসহ সকল হাদীস সংকলন করা। আমরা দেখেছি যে, তাবিয়ীগণের যুগ বা প্রথম হিজরী শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিক্ষা, মুখস্থ ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হাদীস লিখে রাখার প্রচলন ছিল। তবে নির্দিষ্ট নিয়মে গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন শুরু হয় দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে। তৃতীয় হিজরী শতকে এই কর্ম পূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী দুই শতাব্দীতেও সনদসহ হাদীস সংকলনের ধারা চালু থাকে এবং কিছু গ্রন্থ সংকলিত হয়। প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের সংকলিত হাদীসগুলি সনদসহ সংকলিত করেন। এছাড়া তাঁরা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সফর ও হাদীস সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত সকল 'হাদীস' সংগ্রহ ও সনদ-সহ সংকলিত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এসকল গ্রন্থ সংকলিত হয়:

১. সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করা।
২. শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলন করা।
৩. বর্ণনাকারীদের বিবরণসহ তাদের বর্ণিত হাদীস সংকলন করা।
৪. শুধুমাত্র অনির্ভরযোগ্য বা বানোয়াট হাদীস সংকলন করা।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ৪ শতাব্দী পর্যন্ত হাদীস সংকলনের যে ধারা চালু থাকে এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে কথিত ও প্রচারিত সকল হাদীস সংকলিত করা। যাতে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষাভিত্তিক বিধানের আলোকে এগুলির মধ্য থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হাদীস বেছে নিতে পারেন। অনেকে বর্ণনাকারী রাবী বা বর্ণনাকারী সাহাবীর নামের ভিত্তিতে হাদীস সংকলন করতেন। কেউ বা বিষয়ভিত্তিক হাদীস সংকলন করতেন। সবারই মূল উদ্দেশ্য ছিল হাদীস নামে প্রচলিত সব কিছু সংকলিত করা।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকারের হাদীস সংকলিত হয়েছে। এখানে অজ্ঞতার কারণে অনেকে ভুল ধারণার কবলে পড়েন। উপরের পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত সাহাবী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের হাদীস বিচার, সনদ যাচাই, নিরীক্ষা ইত্যাদি থেকে অনেকে মনে করেন যে, মুহাদ্দিসদের এসকল বিচার ও নিরীক্ষার মাধ্যমে যাদের ভুল বা মিথ্যা ধরা পড়েছে তাদের হাদীস তো তারা গ্রহণ করেননি এবং সংকলনও করেন নি। কাজেই কোনো হাদীসের গ্রন্থে হাদীস সংকলনের অর্থ হলো এসকল হাদীস নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে বলেই উক্ত মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে তাঁর গ্রন্থে সংকলিত করেছেন।

এ ধারণাটি একেবারেই অজ্ঞতা প্রসূত এবং প্রকৃত অবস্থার একেবারেই বিপরীত। কয়েকজন সংকলক বাদে কোনো সংকলকই শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেন নি। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আলিম ও

ইমাম হাদীস সংকলন করেছেন সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সনদসহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে; যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কথিত বা প্রচারিত সককিছুই সংরক্ষিত হয়। তাঁরা কোনো হাদীসই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা কাজ হিসাবে সরাসরি বর্ণনা করেননি। বরং সনদসহ, কে তাদেরকে হাদীসটি কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মূলত বলেছেন : "অমুক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'এই কথাটি হাদীস', আমি তা সনদসহ সংকলিত করলাম"। হাদীস প্রেমিক পাঠকগণ এবার সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট বেছে নিন। এ সকল সংকলকের কেউ কেউ আবার হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের আলোচনা করেছেন এবং দুর্বলতা বা সবলতা বর্ণনা করেছেন।

অল্প কয়েকজন সংকলক শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি) ও ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (২৬১ হি) অন্যতম। তাঁদের পরে আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনুল জারূদ (৩০৭ হি), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি), আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ, ইবনুশ শারকী (৩২৫ হি), কাসিম ইবনু ইউসূফ আল-বাইয়ানী (৩৪০ হি), সাঈদ ইবনু উসমান, ইবনুস সাকান (৩৫৩ হি), আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতি (৩৫৪ হি), আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), যিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (৬৪৩ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করে 'সহীহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৭৯] কিন্তু পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসদের চুলচেরা নিরীক্ষার মাধ্যমে শুধুমাত্র বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয়ের সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাকী কোনো গ্রন্থেরই সকল হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত হয় নি। বরং কোনো কোনো গ্রন্থে যয়ীফ, বাতিল ও মিথ্যা হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বাদশ হিজরী শতকের অন্যতম আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি/ ১৭৬২খৃ) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এ গ্রন্থগুলির সকল সনদসহ বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সে সকল গ্রন্থ যেগুলির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পর্যায়ে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সব ধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এই পর্যায়ে রয়েছে : মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শারহ মায়ানীল আসার, শারহ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হলো ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যে সকল 'হাদীস' পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যে সকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েযদের ওয়াযে প্রচারিত বিভিন্ন কথা, যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথাবার্তা, (৫). যে সকল 'হাদীস' মূলত সাহাবী বা তাবেয়ীদের কথা, ইহুদিদের গল্প বা পূর্ববর্তী যামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা, যেগুলিকে ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনে হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবনে আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবনে আসাকের, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। খাওয়ারিজমী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদ ইমাম আবু হানীফাও প্রায় এই পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐসকল হাদীস রয়েছে যা ফকীহগণ, সূফীগণ বা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচলিত ও তাঁদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যে সকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা কোনো ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ তৈরি করেছেন যার ত্রুটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সূত্রের (সনদের) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রন্থের উপরেই মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের গ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেযী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলেমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।[১৮০]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় এবং সহীহ হাদীসকে দুর্বল ও মাউযূ হাদীস থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের দৃঢ়তা ছিল আপোষহীন ও অনমনীয়। দুনিয়ার বুকে কোনো যুগে কোনো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা আলিম কখনো বলেননি যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেই হাদীসকে সহীহ বলা যাবে। অমুক আলিম যেহেতু হাদীসটি সংকলন করেছেন, কাজেই হাদীসটি হয়ত সহীহ হবে।

তেমনিভাবে সংকলক যত মর্যাদাসম্পন্নই হোন, তাঁর সংকলিত কোনো হাদীসের মধ্যে দুর্বলতা বা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার সম্ভাবনা থাকলে তা স্পষ্টরূপে বলতে কোনো দ্বিধা তাঁরা কখনোই করেন নি। হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষাকে তাঁরা সকল ব্যক্তিগত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উপরে স্থান দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদীসের নামে সকল মিথ্যা ও ভুল চিহ্নিত করে বিশুদ্ধ হাদীসকে ভুল ও মিথ্যা 'হাদীস' থেকে পৃথক রাখার এই প্রবল দৃঢ়তার কারণেই মুহাদ্দিসগণ কখনোই কারো দাবী বিনা যাচাইয়ে মেনে নেন নি। তাঁরা কখনোই মনে করেন নি যে, অমুক মহান ব্যক্তিত্ব যেহেতু হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন, সেহেতু তাঁর মতামত বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া উচিত।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ উপরের সকল 'সহীহ' হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত প্রতিটি হাদীসের সনদ পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষা পদ্ধতিতে বিচার ও যাচাই করেছেন। এই বিচারের মাধ্যমেই তাঁরা ঘোষণা দিয়েছেন যে, বুখারী ও মুসলিম তাঁদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সংকলিত সকল হাদীস 'সহীহ' বলে মেনে নেওয়ার কারণ এই নয় যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসগুলিকে সহীহ বলেছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদা এখানে একেবারেই মূল্যহীন। প্রকৃত বিষয় হলো, তাঁরা হাদীসগুলিকে সহীহ বলে দাবী করেছেন এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে মুহাদ্দিসগণ তাঁদের সংকলিত হাদীসগুলির সনদ যাচাই করেছেন এবং তাঁদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

অন্য আরো লেখক শুধুমাত্র সহীহ অথবা সহীহ ও হাসান হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কেউ কেউ সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলন করবেন ও জাল বা মাউদূ হাদীস বাদ দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের দাবি কখনোই বিনা যাচাইয়ে মেনে নেন নি। বরং তাঁদের সংকলিত সকল হাদীস যাচাই করে তাদের গ্রন্থাবলির বিষয়ে বিধান প্রদান করেছেন। এ সকল যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ লেখক ও সংকলকই তাঁদের ঘোষণা ও সংকল্প পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারো দাবিই মুহাদ্দিসগণ বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করেন নি।

১. ৪. ৯. গ্রন্থাকারে রাবীগণের বিবরণ সংরক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ সকল হাদীস সংকলন করেন, যেন সনদ পর্যালোচনা করে বিশুদ্ধ হাদীসকে মিথ্যা বা ভুল থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলনের পাশাপাশি রাবীগণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক তথ্যাবলি গ্রন্থাকারে সংকলন করতে থাকেন; যেন এ সকল তথ্যের আলোকে হাদীসগ্রন্থগুলিতে সংকলিত হাদীসগুলির সনদ বিচার করা যায়। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নেও ক্রম বিবর্তন ঘটে।

২য় হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে মুহাদ্দিসগণ প্রথমে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য সকল বর্ণনাকারীর বিবরণ একত্রে সংকলন করতে শুরু করেন। ইমাম লাইস ইবনু সা'দ (১৭৫ হি), আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি থেকে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। এসকল গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য, অনির্ভরযোগ্য, মিথ্যাবাদী সকল রাবীর জীবনী, তাদের বর্ণিত কিছু হাদীস ও তাদের বর্ণিত হাদীসের নিরীক্ষার ভিত্তিতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক বিধান সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী শতকগুলিতে এই প্রকারের গ্রন্থ রচনার ধারা অব্যাহত থাকে। তৃতীয় হিজরী শতকে আহমদ ইবনু হাম্বাল, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ,ও পরবর্তী যুগের অগণিত মুহাদ্দিস এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ শুধুমাত্র অনির্ভরযোগ্য ও মিথ্যাবাদী রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। দ্বিতীয় শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি) সর্বপ্রথম 'আদ-দুআফা' নামে এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী শতকগুলিতে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। এ সকল গ্রন্থে দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবীগণ, তাদের বর্ণিত কিছু হাদীস ও তাদের বিষয়ে ইমামদের মতামত সংকলন করা হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি তৃতীয় হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা শুরু করেন।

বস্তুত, রাবীগণের বিবরণ সংগ্রহ ও সংকলন মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণের একটি অতুলনীয় কর্ম। প্রথম হিজরী শতাব্দী

থেকে পরবর্তী ৬০০ বৎসর যাবত মুহাদ্দিসগণ মুসলিম দেশের প্রতিটি জনপদে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক রাবীর নাম, বংশ, জন্ম, মৃত্যু, শিক্ষা, কর্ম, শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত সকল তথ্য সহ তাঁর বর্ণিত হাদীসের নিরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে তার সম্পর্কে তার সমসাময়িক ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামত ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে সংরক্ষণ করেছেন। হাদীসে রাসূলকে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে সংরক্ষন করার জন্য তাঁরা এভাবে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর কোনো নযির নেই। এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো যুগে যে কোনো গবেষক যে কোনো হাদীসের সনদ বিচার ও নিরীক্ষা করতে সক্ষম হন।

১. ৪. ১০. জাল হাদীস গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ

১. ৪. ১০. ১. মিথ্যাবাদী রাবীদের পরিচয় ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা

হাদীসের নামে মিথ্যা চিহ্নিত করার জন্য অন্যতম পদক্ষেপ ছিল মিথ্যাবাদীদের জালিয়াতি পৃথকভাবে সংকলন করা। এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি ছিল দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীদের বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থগুলি।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলি ছিল ইসলামী জ্ঞান ও বিশেষত হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ। হাজার হাজার শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষা করতেন। শত শত মুহাদ্দিস, ইমাম সমাজে বিদ্যমান। সবাই সনদসহ হাদীস শুনতেন ও শেখাতেন। সনদের মধ্যে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির পরিচয় জানা না থাকলে জেনে নিতেন। সেই যুগে মিথ্যাবাদী রাবীদের নাম ও পরিচয় জানা থাকলেই তাদের মিথ্যা ও জালিয়াতী থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে সংকলিত অনেক হাদীস গ্রন্থই বিষয়ভিত্তিক না সাজিয়ে বর্ণনাকারী রাবী বা সাহাবীর নামের ভিত্তিতে সাজানো হতো। কারণ রাবীর ভিত্তিতেই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা। এছাড়া সবাই সকল হাদীস পড়তেন। শুধুমাত্র নিদিষ্ট বিষয়ের হাদীস পড়ার প্রবণতা তখন ছিল না।

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী থেকে ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত ৪ শতাব্দী যাবৎ হাদীসের নামে প্রচারিত ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম কর্ম ছিল দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবীদের বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করা। এসকল গ্রন্থে এই শ্রেণীর রাবীদের নাম, পরিচয়, তাদের বর্ণিত কিছু ভুল বা মিথ্যা 'হাদীস', তাদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক নিরীক্ষার ফলাফল ও মতামত সংকলিত করা হতো।

১. ৪. ১০. ২. মিথ্যা বা জাল হাদীস সংকলন

৬ষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত এই জাতীয় গ্রন্থগুলিই ছিল হাদীসের নামে মিথ্যাচারী ও তাদের মিথ্যাচার সম্পর্কে জানার প্রধান উৎস। ৬ষ্ঠ শতকের পরেও এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা অব্যাহত থাকে। তবে জাল হাদীস চিহ্নিত করণ প্রক্রিয়ায় নতুন ধারার সৃষ্টি হয়।

কালের আবর্তনে হাদীস চর্চাসহ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। বর্ণনাকারীদের পরিচয় জানার আগ্রহ কমতে থাকে। স্বল্প সময়ে ও স্বল্প কষ্টে যে কোনো বিষয় শিখে নেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। রাবীদের নামের ভিত্তিতে সংকলিত গ্রন্থ থেকে মিথ্যা হাদীস জেনে নেওয়ার সময় ও আগ্রহ হ্রাস পায়। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বিষয়ভিত্তিক জাল ও বানোয়াট হাদীস সংকলন শুরু করেন, যেন পাঠক সহজেই কোনো বিষয়ে কোনো হাদীস জাল কিনা তা জেনে নিতে পারেন। ৫ম হিজরী শতক থেকে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইবনুল জাউযীর কর্মের মাধ্যমে এই ধারা বিশেষভাবে গতিলাভ করে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। প্রথম দিকে মুহাদ্দিসগণ এ সকল মাউদূ হাদীস সনদ সহকারে উল্লেখ করে সনদ আলোচনার মাধ্যমে এগুলির মিথ্যাচার প্রমাণ করতেন। পরবর্তী সময়ে সনদ উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র বানোয়াট হাদীসগুলি একত্রে সংকলন করা হয়।

এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত। কিছু গ্রন্থে হাদীসের প্রথম অক্ষর অনুসারে (Alphabeticlly) সাজানো হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস শুধুমাত্র মাউযূ হাদীস একত্রিত করেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সমাজে প্রচলিত হাদীস সমূহ একত্রিত করে সেগুলির মধ্যে কোনটি সহীহ এবং কোনটি বানোয়াট তা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বানোয়াট হাদীস ছাড়াও দুর্বল হাদীসও সংকলিত করেছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়ে গত ৯ শতাব্দীতে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে এই জাতীয় প্রধান গ্রন্থগুলি ও লেখকদের নাম উল্লেখ করছি।

১. আল-মাউদূআত, আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আন-নাক্কাশ (৪১৪হি)।
২. যাখীরাতুল হুফ্ফায, মুহাম্মাদ ইবনু তাহির ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭হি)।
৩. আল-আবাতীল ওয়াল মানাকীর, হুসাইন ইবনু ইবরাহীম আল-জূযকানী (৫৪৩হি)।
৪. কিতাবুল কুস্সাস্ ওয়াল মুযাক্কিরীন, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী, ইবনুল জাউযী (৫৯৭ হি)।
৫. আল-মাউদূআত, আবুল ফারাজ, ইবনুল জাউযী (৫৯৭ হি)।
৬. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, আবুল ফারাজ ইবনুল জাউযী (৫৯৭ হি)।
৭. আল-আহাদীসুল মাউদূআহ ফীল আহকামিল মাশরূআ, আবু হাফস উমার ইবনু বাদর আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
৮. আল-মুগনী আন হিফযিল কিতাব, উমার আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
৯. আল-উকূফ আলাল মাউকূফ, উমার আল-মাউসিলী (৬২২ হি)।
১০. আল-মাউদূআত, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাগানী (৬৫০ হি)।
১১. আদ-দুররুল মুলতাকিত, আস-সাগানী (৬৫০ হি)।
১২. আহাদীসুল কুস্সাস, আহমাদ ইবনু আব্দুল হালীম, ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি)।
১৩. মুখতাসারুল আবাতীল, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ যাহাবী (৭৪৮হি)।
১৪. তারতীবু মাউদূআতি ইবনিল যাওযী, যাহাবী (৭৪৮ হি)।

১৫. আল-মাউদূআত ফিল মাসাবীহ, উমার ইবনু আলী কাযবীনী (৭৫০হি)।
১৬. আল-মানারুল মুনীফ, ইবনু কাইয়িম আল-জাউযিয়্যাহ (৭৫১ হি)।
১৭. আল-আহাদীস আল্লাতী লা আসলা লাহা ফিল এহইয়া, আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আলী আস-সুবকী (৭৭১ হি)।
১৮. আত-তাযকিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহিরা, মুহাম্মাদ ইবনু বাহাদুর আয-যারকাশী (৭৯৪ হি)
১৯. তাবঈনুল আজাব ফী মা ওরাদা ফী শাহরি রাজাব, ইবনু হাজর আসকালানী আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি)।
২০. আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান সাখাবী (৯০২হি)।
২১. আল-লাআলী আল-মাসনূআহ, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান সুয়ূতী (৯১১হি)।
২২. আত-তাআক্কুবাত আলাল মাউদূআত, সুয়ূতী (৯১১ হি)।
২৩. আদ-দুরারুল মুনতাশিরাহ, সুয়ূতী (৯১১ হি)।
২৪. তাহযীরুল খাওয়াস মিন আহাদীসিল কুস্‌সাস, সুয়ূতী (৯১১ হি)।
২৫. আল-গাম্মায আলাল লাম্মায, আলী ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সামহূদী (৯১১হি)
২৬. তাময়ীযুত তাইয়িবি মিনাল খাবীস, আব্দুর রাহমান আয যাবীদী (৯৪৪হি)।
২৭. আশ-শাযারাহ ফীল আহাদীসিল মুশতাহিরাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী আদ-দিমাশকী (৯৫৩ হি)।
২৮. তানযীহুশ শারীয়াহ, আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইরাক (৯৬৩ হি)।
২৯. তাযকিরাতুল মাউদূআত, মুহাম্মাদ তাহির ফাতানী (৯৮৬ হি)।
৩০. আল-আসরারুল মারফূআহ, মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি)।
৩১. আল-মাসনূ ফী মা'রিফাতিল মাউদূ, মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি)।
৩২. মুখতাসারুল মাকাসিদ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২হি)।
৩৩. আল-জাদ্দুল হিস্‌সীস ফী বায়ানি মা লাইসা বিহাদীস, আহমদ ইবনু আব্দুল কারীম আমিরী (১১৪৩ হি)।
৩৪. কাশফুল খাফা, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আজলূনী (১১৬২ হি)।
৩৫. আল-কাশফুল ইলাহী আন শাদীদিদ দা'ফি ওয়াল মাউদূ ওয়াল ওয়াহী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তারাবলুসী (১১৭৭ হি)
৩৬. আন-নাওয়াফিহুল আতিরাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আস-সান'আনী (১১৮১ হি)
৩৭. আন-নুখবাতুল বাহিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাবনাবী (১২৩২ হি)
৩৮. আল-ফাওয়াইদুল মাজমূআ, মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী (১২৫০হি)।
৩৯. আসনাল মাতালিব, মুহাম্মাদ ইবনু সাইয়িদ দারবীশ (১২৭৬ হি)।
৪০. হুসনুল আসার, মুহাম্মাদ দারবীশ (১২৭৬ হি)।
৪১. আল-আসারুল মারফূআহ, আব্দুল হাই লাখনাবী (১৩০৪ হি)।
৪২. আল-লু'লু আল-মারসূ, মুহাম্মাদ ইবনু খালীল আল-মাশীশী (১৩০৫হি)।
৪৩. তাহযীরুল মুসলিমীন, মুহাম্মাদ ইবনুল বাশীর আল-মাদানী (১৩২৯হি)।

বর্তমান শতকেও এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একই বিষয়ে এত গ্রন্থের প্রয়োজন কি? আসল বিষয় হলো, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে শুরু হওয়ার পরে হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রচেষ্টা কখনো থামে নি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে জালিয়াত ও জালিয়াতির পরিচিতির আলোচনায় আমরা এসকল বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারব। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা যেমন অব্যাহত থেকেছে, তেমনি সে সকল মিথ্যাকে চিহ্নিত করা ও বিশুদ্ধ হাদীস থেকে তা পৃথক করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থেকেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে নতুন নতুন কথা হাদীসের নামে প্রচারিত হয়েছে। তখন সেই দেশের প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ গবেষণার মাধ্যমে সেগুলির সত্যতা ও অসত্যতা নির্ণয় করেছেন। এ সকল কথা কোনো হাদীসের গ্রন্থে সনদসহ বর্ণিত হয়েছে কিনা, সনদের গ্রহণযোগ্যতা কিরূপ, এই অর্থে অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় তাঁরা নির্ণয় করেছেন। এছাড়া পূর্ববর্তী গবেষকদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল থাকলে তা পরবর্তী লেখকগণ আলোচনা করেছেন। এভাবে এ বিষয়ে লেখনি ও গবেষণার ধারা অব্যাহত থেকেছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, গত দেড় হাজার বছরে সকল যুগে ও সকল শতকে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ হাদীসে রাসূলের হেফাযতে জাগ্রত প্রহরায় সদা সতর্ক থেকেছেন। তাঁরা সদা সর্বদা চেষ্টা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের নামে মিথ্যাচারের সকল প্রচেষ্টার চিহ্নিত করে হাদীস নামের মিথ্যা কথার খপ্পর থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করার। মহান আল্লাহ এ সকল মানুষদেরকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

১. ৫. মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকারভেদ

আমরা দেখেছি যে, ইসলামের গোপন শত্রুরা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের নামে মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে ছড়াতে থাকে। ওহীর উপরেই ধর্মের ভিত্তি। ওহীর মাধ্যমে কোনো কথা প্রমাণিত করতে পারলেই তা মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কুরআন অগণিত মানুষের মুখস্থ, কুরআনের নামে সরাসরি মিথ্যা বা বানোয়াট কিছু বলার সুযোগ কখনোই ছিল না। এজন্য হাদীসের নামে মিথ্যা বলার চেষ্টা তারা করেছে।

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক মানুষ বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্যে হাদীসের নামে মিথ্যা বলতে থাকে। এছাড়া অনেক মানুষ অজ্ঞতা, অবহেলা বা অসাবধানতা বশত হাদীসের নামে মিথ্যা বলেন। কারো মুখে কোনো ভাল কথা, কোনো প্রাচীন প্রজ্ঞাময় বাক্য, কোনো সাহাবী

বা তাবিয়ীর কথা শুনে কারো কাছে ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে তা বলার সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন কারণে হাদীসের নামে জালিয়াতি চলতে থাকে।

আমরা দেখেছি যে, মিথ্যা দুই প্রকার: ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ মূলত স্মৃতির বিভ্রাট, হাদীস মুখস্থকরণে অবহেলা বা হাদীস গ্রহণে অসতর্কতা। আর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষতি বা উপকার (!) করা।

আমরা জানি যে, ওহীর সম্পর্ক ধর্মের সাথে। কাজেই ওহীর নামে মিথ্যা বলার সকল উদ্দেশ্যই ধর্ম কেন্দ্রিক। কেউ ধর্মের নামে ধর্মের ক্ষতি করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে কামাই রুজি করার জন্য বা নিজের ফাতওয়া, দল বা বংশকে শক্তিশালী করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। কেউ ধর্মের নামে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাদীস বানিয়েছেন। কেউ নিঃস্বার্থভাবে (!) মানুষদের ভালকাজে উৎসাহ দান ও খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য হাদীস বানিয়েছেন। এ সকল কারণ আমরা তিন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি: ১. ধর্মের ক্ষতি করা, ২. ধর্মের উপকার করা ও ৩. নিজের জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকরণ সম্পর্কে ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুস সালাহ্ আবু আমর উসমান ইবনু আব্দুর রাহমান (৬৪৩হি) বলেন: হাদীস বানোয়াটকারী জালিয়াতগণ বিভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক একদল মানুষ যারা নেককার ও দরবেশ বলে সমাজে পরিচিত। এরা এদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির কারণে সাওয়াবের আশায় বানোয়াট কথা হাদীসের নামে সমাজে প্রচার করতেন। এদের বাহ্যিক পরহেযগারী, নির্লোভ জীবনযাপন ইত্যাদি দেখে মানুষ সরল মনে এদের কথা বিশ্বাস করে এসকল বানোয়াট কথা হাদীস বলে গ্রহণ করতো। এরপর হাদীসের অভিজ্ঞ ইমামগণ সুক্ষ্ম নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি ধরে ফেলেন এবং প্রকাশ করে দেন।... সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নেককাজের ফযীলত ও অন্যায় কাজের শাস্তি বিষয়ক মিথ্যা ও বানোয়াট কথাকে হাদীস নামে প্রচার করাকে এধরনের কেউ কেউ জায়েয মনে করত।[১৮১]

আল্লামা যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হি) বলেন: হাদীস জালকারীগণ তাদের জালিয়াতির উদ্দেশ্য ও কারণের দিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের :

১. অনেক যিনদীক মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাদীস বানিয়েছে। হাম্মাদ ইবনু যাইদ বলেছেন: যিনদীকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে দশ হাজার হাদীস তৈরি করেছে।

২. কিছু মানুষ নিজেদের ধর্মীয় মতামত সমর্থন করার জন্য হাদীস জাল করেছে।

৩. কিছু মানুষ খলীফা ও আমীরদের পছন্দসই বিষয়ে হাদীস জাল করে তাদের প্রিয়ভাজন হতে চেষ্টা করেছে।

৪. কিছু মানুষ ওয়ায ও গল্প বলে অর্থ কামাই করার মানসে হাদীস জাল করেছে।

৫. কিছু মানুষ নিজে ভাল ছিলেন, কিন্তু তাদের পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য তাদের পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। তারা বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

৬. কেউ কেউ নিজেদের ফাতওয়া বা মাসআলার দলীল প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীস বানাতেন।

৭. কেউ কেউ নতুনত্ব ও অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন অপ্রচলিত সনদ ও মতন তৈরি করতেন।

৮. কিছু মানুষ এভাবে মিথ্যা হাদীস তৈরি করাকে দ্বীনদারী বলে মনে করতেন। তারা তাদের বিভ্রান্তির কারণে মনে করতেন যে, মানুষদের ভাল করার জন্য ও ভালর পথে ডাকার জন্য মিথ্যা বলা যায়। এরা নেককার, সংসারত্যাগী বুযুর্গ হিসাবে সমাজে পরিচিত। হাদীস জালিয়াতির ক্ষেত্রে এদের ক্ষতিই সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ তারা এ কঠিন পাপকে নেককর্ম ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন; ফলে কোনোভাবেই তাদেরকে এথেকে বিরত করা যেত না। আর তাদের বাহ্যিক তাকওয়া, নির্লোভ জীবন ও দরবেশী দেখে মানুষেরা প্রভাবিত হতেন এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করতেন। এজন্যই ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান (১৯৮ হি) বলতেন, হাদীসের বিষয়ে নেককার বুযুর্গদের চেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী আমি দেখিনি।[১৮২] তিনি নেককার বুযুর্গ বলতে বুঝাচ্ছেন সেইসব জাহিলকে যারা নিজেদের নেককার মনে করেন এবং বুযুর্গীর পথে চলেন, কিন্তু হালাল হারাম বুঝেন না।[১৮৩]

আমরা এখানে হাদীসের নামে জালিয়াতির প্রধান কারণগুলি ও এতে লিপ্ত মানুষদের বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. ৫. ১. যিনদীক ও ইসলামের গোপন শত্রুগণ

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অর্ধ শতকের মধ্যে ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এসব দেশের অনেক অমুসলিম নাগরিক স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকে তাদের পূর্ব ধর্ম অনুসরণ করতে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ তাদের পূর্বের বিভিন্ন ধর্ম ও মতামতের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেন। তারা সমাজে মুসলিম বলে গণ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলিমগণের বিশ্বাস ও কর্ম নষ্ট করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মানুষদেরকে 'যিনদীক' বলা হতো। এরা তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অগণিত মিথ্যা কথা সমাজে হাদীস হিসাবে প্রচার করতো। আমার দেখেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার নেতৃত্বে এই শ্রেণির মানুষেরাই প্রথম বানোয়াট হাদীস প্রচার শুরু করে।

এসকল ভণ্ড যিনদীক কখনো বা 'আলীর (রা) ভক্ত সেজে তাঁর ও তাঁর বংশের পক্ষে বানোয়াট হাদীস প্রচার করতো। কখনো বা

সূফী-দরবেশ সেজে মানুষদের ধোঁকা দিত এবং পারসিক বা ইহুদী-খৃস্টানদের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-মার্কা দরবেশীর পক্ষে হাদীস বানাতো। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী বিশ্বাস নষ্ট করা ও তাকে হাস্যাস্পদ ও অযৌক্তিক হিসাবে পেশ করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, তারা সনদসহ হাদীস বানাতো। তৎকালীন সময়ে সনদ ছাড়া হাদীস বলার কোনো উপায় ছিল না। তারা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণের নাম জানতো। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের সনদ তাদের মুখস্থ ছিল। এসকল সনদের নামে তারা হাদীস বানাতো।

এগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ ছিল। তবে 'নাকিদ' মুহাদ্দিসদের কাছে এই ধোঁকার কোনো কার্যকরিতা ছিল না। তাঁরা উপরে বর্ণিত নিরীক্ষার মাধ্যমে এদের জালিয়াতি ধরে ফেলতেন। যেমন একজন বলল যে, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, তিনি সুফিয়ান সাওরী থেকে, তিনি ইবনু সিরীন থেকে, তিনি আনাস ইবনু মালিক থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে...। তখন তাঁরা উপরের পদ্ধতিতে সনদে বর্ণিত সকল রাবীর অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণিত হাদীসের সাথে এর তুলনা করতেন। পাশাপাশি এই ব্যক্তির অন্যান্য বর্ণনা ও তার কর্ম বিচার করে অতি সহজেই জালিয়াতি ধরে ফেলতেন।

এদের বানানো একটি হাদীস দেখুন। মুহাম্মাদ ইবনু শুজা' নামক একব্যক্তি বলছে, আমাকে হিব্বান ইবনু হিলাল, তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে, তিনি আবুল মাহযাম থেকে তিনি আবু হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মহান প্রভুর সৃষ্টি কী থেকে? তিনি বলেন: তিনি একটি ঘোড়া সৃষ্টি করেন, এরপর ঘোড়াটিকে দাবড়ান। ঘোড়াটির দেহ থেকে যে ঘাম নির্গত হয় সে ঘাম থেকে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন।[১৮৪]

আমরা স্পষ্টত বুঝতে পারছি যে, মহান আল্লাহ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাসকে হাস্যাস্পদরূপে তুলে ধরা ও মুসলিম বিশ্বাসকে তামাশার বিষয়ে পরিণত করাই এইরূপ জালিয়াতির উদ্দেশ্য।

এসকল জালিয়াত অনেক সময় তাদের জালিয়াতির কথা বলে বড়াই করত। আব্দুল করীম ইবনু আবীল আরজা দ্বিতীয় হিজরী শতকের এইরূপ একজন জালিয়াত। ধর্মদ্রোহিতা, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন তৎকালীন প্রশাসক মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু আলী। শাস্তির পূর্বে সে বলে, আল্লাহর কসম, আমি চার হাজার বানোয়াট হাদীস জালিয়াতি করে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছি।[১৮৫]

তৃতীয় আব্বাসীয় খলীফা মাহদী (শাসনকাল ১৫৮-১৬৯ হি) বলেন, আমার কাছে একজন যিনদীক স্বীকার করেছে যে, সে ৪০০ হাদীস বানোয়াট করেছে, যেগুলি এখন মানুষের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে।[১৮৬]

১. ৫. ২. ধর্মীয় ফিরকা ও দলমতের অনুসারীগণ

সাধারণত মানুষ নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে চায় না। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অগণিত মানুষ নিজের বুদ্ধি, বিবেক, বিচার ও প্রজ্ঞা দিয়ে 'ওহী'-র দুর্বলতা! ও অপূর্ণতা!! দূর!!! করতে চেষ্টা করেছে ও করছে। সকলেরই চিন্তা ওহীর মধ্যে এই কথাটি কেন থাকল না! এই কথাটি না হলে ধর্মের পূর্ণতা আসছে না। ঠিক আছে আমি কথাটি ওহীর নামে বলি। তাহলে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে!!!

এদের মধ্যে অনেকে নিজে কোনো মনগড়া ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করেছে বা অনুসরণ করেছে এবং এই মতের পক্ষে 'ওহী' জালিয়াতি করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলিম সমাজে নও-মুসলিমদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাব, ইসলামের গোপন শত্রুদের অপপ্রচার ও বিভিন্ন সমাজের সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির প্রভাবে নতুন নতুন ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভাবন ঘটে। আলী (রা) ও সকল সাহাবীর বিরুদ্ধে জিহাদ ও মনগড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় খারিজী মতবাদ। আলী (রা) এর ভক্তি ও ভালবাসার ছদ্মাবরণে মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের মতবাদ ছড়ানোর জন্য প্রচারিত হয় শিয়া মতবাদ। মহান আল্লাহর মর্যাদা রক্ষার ভুয়া দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কাদারীয়া' মতবাদ, যাতে তাকদীর বা মানুষের ভাগ্যের বিষয়ে মহান আল্লাহর জ্ঞানকে অস্বীকার করা হতো। মহান আল্লাহর ক্ষমতা প্রমাণের বাড়াবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাবারিয়া' মতবাদ, যাতে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতাকে অস্বীকার করা হতো। মহান আল্লার একত্ব প্রতিষ্ঠার মনগড়া দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাহ্মিয়া', 'মুতাজিলা' ইত্যাদি মতবাদ, যেখানে মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা হতো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা হুবহু আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস ও পালন করেছেন। সাহাবীগণকে ভালবাসতে হবে আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশধরদেরকেও ভালবাসতে হবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, নেই কোনো বাড়াবাড়ির অবকাশ। মানুষের ভাগ্যের বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান ও নির্ধারণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য মানুষের কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি। উভয় বিষয়ের সকল আয়াত ও হাদীস সহজভাবে বিশ্বাস করেছেন তাঁরা। এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য তাঁরা দেখেন নি।

কিন্তু নতুন মতের উদ্ভাবকগণ কুরআন-হাদীসের কিছু নির্দেশনা মানতে যেয়ে বাকীগুলি অস্বীকার বা ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেকে নিজের মতকেই সঠিক বলে মনে করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, তার মতই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পক্ষে এবং এ মতের পক্ষে হাদীস বানানোর অর্থ হলো আল্লাহ ও তার রাসূলের (ﷺ) পক্ষে হাদীস বানানো। কিছু বানোয়াট বা মিথ্যা কথাকে ওহীর নামে বা হাদীসের নামে বলে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (ﷺ) 'সঠিক পছন্দের!! মতকে' শক্তিশালী করা যায় তাহলে অসুবিধা কি?! এ তো ভাল কাজ বলে গণ্য হওয়া উচিত। এজন্য তাদের কেউ কেউ যখন তাদের মতের পক্ষে স্পষ্ট কোনো হাদীস পান নি তখন প্রয়োজনে নিজেদের পক্ষে ও

বিরোধীদের বিপক্ষে হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছেন। ফিকহী ও মাসআলাগত মতভেদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো মিথ্যা হাদীস তৈরী করা হয়েছে।[১৮৭]

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন শিয়াগণ। নবী-বংশের ভক্তির নামে তাঁরা অগণিত বানোয়াট কথা ধর্মবিশ্বাসের অংশ বানিয়েছিলেন। এরপর সেগুলির সমর্থনে অগণিত হাদীস বানিয়ে প্রচার করেছেন। নবীদের পরে সকল মানুষের মধ্যে আলীর শ্রেষ্ঠত্ব, আলীর অগণিত অলৌকিক ক্ষমতা, আলীর পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসা, আলী বংশের মাহাত্ম্য, তাঁকে ও তাঁর বংশধরদেরকে বাদ দিয়ে যারা খলীফা হয়েছেন তাঁদের যুলুম ও শাস্তি, যারা তাঁর বিরোধিতা করেছেন তাঁদের ভয়ঙ্কর পরিণতি ও শাস্তি, যারা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মানেন নি বা অন্যান্য সাহাবীদেরকে ভালবেসেছেন তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে অগণিত বানোয়াট কথাকে তারা হাদীস নামে প্রচার করেছেন।

তাঁদের জালিয়াতি এত ব্যাপক ছিল যে, তাদের আলেমগণও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ৭ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত শীয়া আলিম, আলী (রা)-এর বক্তৃতা সংকলন বলে কথিত ও প্রচারিত 'নাহজুল বালাগাত' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ইবনু আবীল হাদীদ আব্দুল হামীদ ইবনু হিবাতুল্লাহ (৬৫৬ হি) বলেন: "ফযীলত বা মর্যাদা জ্ঞাপক হাদীসের ক্ষেত্রে প্রথম মিথ্যাচারের শুরু হয়েছিল শিয়াদের দ্বারা। তার প্রথমে তাদের নেতার পক্ষে বিভিন্ন হাদীস জালিয়াতি করে প্রচার করেন। বিরোধীদের সাথে প্রচণ্ড শত্রুতা ও হিংসা তাদেরকে এই কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।..."[১৮৮]

১. ৫. ৩. নেককার সংসারত্যাগী সরল বুযুর্গগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলা ও প্রচার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন ও ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ কিছু ধার্মিক মানুষের 'মানুষকে ভাল পথে নেওয়ার আগ্রহ।' কুরআনের ফযীলত, বিভিন্ন সূরার ফযীলত, বিভিন্ন সময়ে বা দিনে বিভিন্ন প্রকারের সালাতের ফযীলত, বিভিন্ন প্রকার যিকিরের ফযীলত ইত্যাদি সর্বপ্রকারের নেক কর্মের ফযীলত, বিভিন্ন পাপ বা অন্যায় কাজের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বানানো হয়েছে এই উদ্দেশ্যে।[১৮৯]

জাল হাদীস তৈরী ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ সকল নেককার মানুষরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিছু নেককার মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন। এরা এদের সরলতার কারণে হাদীস নামে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন এবং বর্ণনা করতেন। অনেক সময় কোনো সুন্দর কথা বা জ্ঞানের বাক্য শুনলে তারা তা অসতর্কভাবে হাদীস বলে বর্ণনা করতেন। আর কিছু নেককার বলে পরিচিত মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন।

১. ৫. ৩. ১. নেককারগণের অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা

সূফী দরবেশ আল্লাহওয়ালা মানুষেরা সরলমনা ভালো মানুষ। সবাইকে সরল মনে বিশ্বাস করা ও দয়া করাই তাঁদের কাজ। আর মুহাদ্দিসের কাজ দারোগার কাজ। দরবেশের শুরু বিশ্বাস দিয়ে আর দারোগার শুরু অবিশ্বাস দিয়ে। কোনো মানুষ যদি তার কোনো বিপদের কথা বলে, বা কোনো অপরাধের জন্য ওজর পেশ করে তখন সাধারণত সরল প্রাণ মানুষেরা তা বিশ্বাস করে ফেলেন। কিন্তু একজন দারগা প্রথমেই অবিশ্বাস দিয়ে শুরু করেন। তিনি তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করেন, সে ধোঁকা দিচ্ছে না সত্য কথা বলছে। এরপর তিনি তা বিশ্বাস করেন।

কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের অগণিত নির্দেশের আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে সাহাবীগণ ও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ ওহী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় সদাজাগ্রত প্রহরী বা দারোগার দায়িত্ব পালন করছেন। সুক্ষ্ম নিরীক্ষা ও যাচাই ছাড়া তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা কোনো কথা সঠিক বলে গ্রহণ করেন নি।

পক্ষান্তরে সরলপ্রাণ 'যাহিদ' সূফী-দরবেশগণ রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কোনো কথা শোনামাত্র আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা কখনো তাঁরা চিন্তা করেননি। তাঁরা যা শুনেছেন সবই ভক্তের হৃদয় দিয়ে শুনেছেন, সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন, আমল করেছেন এবং অন্যকে আমল করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য তাবে-তাবেয়ীদের যুগ থেকেই মুহাদ্দিসগণ এধরনের নেককার দরবেশদের হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইমাম মালিক (১৭৯ হি.) বলতেন: মদীনায় অনেক দরবেশ আছেন, যাদের কাছে আমি লক্ষ টাকা আমানত রাখতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত একটি হাদীসও আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।[১৯০]

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) বলেন : "নেককার বুযুর্গরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের বিষয়ে যত বেশি মিথ্যা বলেন অন্য কোনো বিষয়ে তাঁরা এমন মিথ্যা বলেন না।" ইমাম মুসলিম (২৬১ হি) এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন: এ সকল নেককার মানুষেরা ইচ্ছাকরে মিথ্য বলেন না, কিন্তু বেখেয়ালে তাঁরা মিথ্যাচারে লিপ্ত হন। কারণ তাঁরা হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন না, উল্টে পাল্টে ফেলেন, অধিকাংশ সময় মনের আন্দাজে হাদীস বলেন, ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচারে লিপ্ত হন।"[১৯১]

ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি), নববী (৬৭৬ হি), ইরাকী (৮০৬) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এই অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ্ তাঁর সুনানে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আত-তালহী বলেছেন, আমাদেরকে সাবিত ইবনু মূসা আবু ইয়াযিদ বলেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আ'মাশ

থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

"যার রাতের সালাত অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।"[১৯২]

মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছেন যে, এই কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট কথা। তবে তা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা সে বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন।

ইবনু মাজাহর উস্তাদ ইসমাঈল ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটি আবু ইয়াযিদ সাবিত ইবনু মূসা ইবনু আব্দুর রাহমান (২২৯ হি) থেকে শুনেছেন ও লিখেছেন। একমাত্র তিনিই এই হাদীসটির বর্ণনাকারী। তিনি দাবী করেন যে, শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ (১৭৮ হি) তাকে এই হাদীসটি বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণ শারীকের সকল ছাত্রের হাদীস, শারীকের উস্তাদ সুলাইমান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৭ হি)-এর সকল ছাত্রের হাদীস, আ'মাশের উস্তাদ আবু সুফিয়ান তালহা ইবনু নফি'-এর সকল ছাত্রের হাদীস এবং জাবির (রা)-এর অন্যান্য ছাত্রের হাদীস সংগ্রহ করে তুলনা করেছেন এবং নিশ্চিত হয়েছেন যে এই হাদীসটি একমাত্র সাবিত ছাড়া কেউ বর্ণনা করেন নি। তাঁরা দেখেছেন যে, 'সাবিত' 'শারীক'-এর এমন কোনো ঘনিষ্ট ছাত্র বা দীর্ঘকালীন সহচর ছিলেন না যে, শারীক অন্য কোনো ছাত্রকে না বলে শুধুমাত্র তাঁকেই এই হাদীসটি বলবেন। এছাড়া সাবিত বর্ণিত অন্যান্য হাদীস নিরীক্ষা করে তাঁরা সেগুলির কিছু কিছু হাদীসে মারাত্মক ভুল দেখতে পেয়েছেন। এভাবে সামগ্রিক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সাবিত ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেছেন।

সাবিত ইবনু মূসা তৃতীয় হিজরী শতকের একজন নেককার আবিদ ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর ধার্মিকতার কারণে সাধারণভাবে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। তবে তুলনামূল নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধে বেশ কিছু হাদীস ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত। তিনি যে সকল উস্তাদের সূত্রে হাদীসগুলি বলছেন, সে সকল উস্তাদের দীর্ঘদিনের বিশেষ ছাত্র বা অন্য কোনো ছাত্র সেই হাদীস বলছেন না। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) সাবিত সম্পর্কে বলেন: 'তিনি মিথ্যাবাদী'।[১৯৩]

পক্ষান্তরে আবু হাতিম রাযী (২৭৭ হি), ইবনু আদী (৩৬৫ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস সাবিতের এ মিথ্যাকে 'অনিচ্ছাকৃত' মিথ্যা বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেন যে, সাবিত মূলত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন না। সাধারণ আবিদ ছিলেন। তিনি ৭/৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এগুলির মধ্যে দুটি হাদীস বাদে বাকীগুলি তিনি ঠিকমতই বর্ণনা করেছেন। এতে মনে হয় তাঁর ভুল অনিচ্ছাকৃত। এজন্য তাঁরা তাকে স্পষ্টভাবে 'মিথ্যাবাদী' না বলে 'দুর্বল' বলেছেন।[১৯৪]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস সাবিতের 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা'র কারণ উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইর (২৩৪ হি) বলেন, হাদীসটি বাতিল। সাবিত বুঝতে না পেরে হাদীসটি বলেছেন। শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ হাসি-মশকরা করতে ভালবাসতেন। আর সাবিত ছিলেন নেককার আবিদ মানুষ। সম্ভবত, শারীক যখন হাদীস বলছিলেন তখন সাবিত সেখানে উপস্থিত হন। শারীক বলছিলেন: আমাদেরকে আ'মাশ, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে। এমতাবস্থায় সাবিত সেখানে প্রবেশ করেন। সাবিতকে দেখে শারীক হাদীস বলা বন্ধ করে তার সরলতা মণ্ডিত উজ্জল চেহারা লক্ষ্য করে বলেন: 'যার রাতের সালাত অধিক হয়, দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হয়।' শারীকের এই কথা সাবিত অনবধানতাবশত উপরের সনদে বর্ণিত হাদীস মনে করেন। এভাবে তিনি শারিকের একটি কথাকে ভুলবশত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেন। এ কারণে ইবনু সালাহ, নববী, ইরাকী ও অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে 'অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা'-র উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন।[১৯৫]

১. ৫. ৩. ২. 'নেককার'গণের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা

'নেককার' বলে পরিচিত কিছু মানুষ এর চেয়েও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতেন। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলতেন। হাদীস জালিয়াতির ক্ষেত্রে এরাই ছিলেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক।

তারা যে সকল বিষয়ে হাদীস বানিয়েছেন, তার অনেক বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। কিন্তু এসকল নেককার (!) মানুষ অনুভব করেছেন যে, এ সকল সহীহ হাদীসের ভাষা ও সেগুলিতে বর্ণিত পুরস্কার বা শাস্তিতে মানুষের আবেগ আসে না। তাই তারা আরো জোরালো ভাষায়, বিস্তারিত কথায়, অগণিত পুরস্কার ও কঠিনতম শাস্তির কথা বলে হাদীস বানিয়েছেন, যেন মানুষেরা তা শুনেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। এভাবে তাঁরা 'ওহীর' অপূর্ণতা (!) মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে পূরণ (!) করতে চেয়েছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয় ছিল যে, তাদের 'ধার্মিকতা'র কারণে সমাজের অনেক মানুষই তাদের এসকল জালিয়াতির ক্ষপ্পরে পড়তেন। তাঁরা এগুলিকে হাদীস বলে বিশ্বাস করেছেন। শুধুমাত্র 'নাকিদ' মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের জালিয়াতি ধরেছেন।

শয়তান এদেরকে বুঝিয়েছিল যে, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে নয়, পক্ষেই মিথ্যা বলছি। এ সকল মিথ্যা ছাড়া

মানুষদের হেদায়েত করা সম্ভব নয়। কাজেই ভাল উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা শুধু জায়েযই নয় বরং ভাল কাজ। শয়তান তাদেরকে বুঝতে দেয় নি যে, তাদের সব চিন্তাই ভুল খাতে প্রবাহিত হয়েছে। মিথ্যা ছাড়া মানুষদেরকে ভাল পথে আনা যাবে না একথা ভাবার অর্থ হলো, ওহী মানুষের হেদায়েত করতে সক্ষম নয়। কুরআন কারীম ও বিশুদ্ধ হাদীস তার কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই আজগুবি মিথ্যা দিয়ে মানুষকে হেদায়েত করতে হবে! কি জঘন্য চিন্তা!

তাদের এসব মনগড়া কথা যে, ওহীর পক্ষে বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পক্ষে সে কথা দাবী করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? তারা যে কথাকে ইসলামের পক্ষে বলে বলে মনে করেছে তা সর্বদা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। আজগুবি গল্প, অল্প কাজের অকল্পনীয় সাওয়াব, সামান্য অন্যায়ের বা পাপের ঘোরতর শাস্তি, সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী, কাল্পনিক অলৌকিক কাহিনী, বিভিন্ন বানোয়াট ফযীলতের কাহিনী ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছে। অগণিত কুসংস্কার ছাড়িয়েছে তাদের মধ্যে। নফল 'ইবাদতের' সাওয়াবে বানানো মনগড়া সাওয়াবের কল্প কাহিনী মুসলিম উম্মাহকে ফরয দায়িত্ব ভুলিয়ে দিয়েছে। অগণিত মনগড়া 'আমল' মুসলমানদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কর্ম ও দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বানোয়াট হাদীসগুলি আলোচনার সময় এসবের অনেক উদাহরণ দেখতে পাব।

'ওহীর পক্ষে মিথ্যা বলার' কারণেই যুগে যুগে সকল ধর্ম বিকৃত হয়েছে। ওহীর পক্ষে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খৃস্টধর্মের বিকৃতিকারী পৌল নামধারী শৌল এবং তার অনুসারী খৃস্টানগণ। এরা 'ঈশ্বরের' মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য, 'যীশু'-র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও অধিক সংখ্যক মানুষকে 'সুপথে' আনয়ন করার জন্য ওহীর নামে মিথ্য বলেছে। এরা ভেবেছে যে, আমরা ঈশ্বরের বা যীশুর পক্ষে বলছি, কাজেই এ মিথ্যায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু তারা মূলত শয়তানের খেদমত করেছে। আল্লাহ বলেন:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল হে কেতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না; এবং যে-সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"[১৯৬]

মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এই ধরনের পথভ্রষ্ট খেয়াল-খুশীমত ওহী বানানো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে। তবে সনদ ও সনদ নিরীক্ষা ব্যবস্থার ফলে এদের জালিয়াতি ধরা পড়ে গিয়েছে। এ সকল 'নেককার জালিয়াত' বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাদীস তৈরি করতেন।

ক. কিছু মানুষ কুরআন এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াতের 'অগণিত' কাল্পনিক সাওয়াব বর্ণনা করে হাদীস তৈরি করতেন।

খ. অন্য অনেকে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত বিভিন্ন নেক আমলের সাওয়াব বর্ণনায় হাদীস তৈরি করতেন। যেমন তাসবীহ, যিকির, তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য সহীহ হাদীসে অনেক সাওয়াব বর্ণিত হয়েছে। তারা মনে করতেন যে, এসকল হাদীস মানুষের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে না। এজন্য এ সকল বিষয়ে 'আকর্ষণীয়' হাদীস তৈরি করতেন। অনুরূপভাবে সুন্নাতের পক্ষে ও বিদ'আতের বিপক্ষে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এ সকল জালিয়াত সেগুলিতে খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা সুন্নাতের সাওয়াব, মর্যাদা এবং বিদ'আতের পাপ ও বিদ'আতীদের কঠিন পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির বিষয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছেন।

গ. কেউ কেউ নতুন বিভিন্ন প্রকারের 'নেক আমল' তৈরি করে তার ফযীলতে হাদীস বানাতেন। যেমন বিভিন্ন মাসের জন্য বিশেষ পদ্ধতির সালাত, সপ্তাহের প্রত্যেক দিনের জন্য বিশেষ সালাত, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বপ্নে দেখা, জান্নাতে নিজের স্থান দেখা ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ সালাত। অনুরূপভাবে বিভিন্ন 'দরুদ', 'যিকির', 'দোয়া', 'মুনাজাত' ইত্যাদি বানিয়ে সেগুলির বানোয়াট ফযীলত উল্লেখ করে হাদীস তৈরি করেছেন। এরূপ অগণিত 'ইবাদত' তারা তৈরি করেছেন এবং এগুলির ফযীলতে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের কাহিনী বলেছেন।

ঘ. অনেক মানুষের অন্তর নরম করার জন্য সংসার ত্যাগ, লোভ ত্যাগ, ক্ষুধার ফযীলত, দারিদ্র্যের ফযীলত, বিভিন্ন কাহিনী, শাস্তি, পুরস্কার বা অনুরূপ গল্প কাহিনী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে চালিয়েছেন।

এখানে এই ধরনের দু'এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উল্লেখ করছি। এ সকল মানুষ মুহাদ্দিসগণের নিকট তাদের মিথ্যা সনদগুলি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করত। তবে তাঁদের নিরীক্ষামূলক প্রশ্নের মুখে অনেক সময় স্বীকার করতো যে, তারা হাদীস জালিয়াতি করেছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন প্রখ্যাত আলিম, আবিদ ও ফকীহ আবু ইসমাহ নূহ ইবনু আবু মারিয়াম (১৭৩ হি)। হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তার চৌকস পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে 'আল-জামি' বলা হতো। খলীফা মানসূরের সময়ে (১৩৬-১৫৮ হি) তাকে খোরাসানের মারভ অঞ্চলের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। তাকে সেই এলাকার অন্যতম আলিম বলে গণ্য করা হতো। মু'তাযিলা, জাহমিয়া, আহলুর রাই ফকীহ ও বিদ'আতী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন।

এত কিছু সত্ত্বেও তিনি হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বলতেন। তিনি কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে কিছু হাদীস বর্ণনা করতেন। মুহাদ্দিসগণ তাকে প্রশ্ন করেন: আপনি ইকরিমাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে কুরআনের প্রত্যেক সূরার ফযীলতে যে হাদীস বলেন তা আপনি কোথায় পেলেন? ইকরিমাহ-এর ঘনিষ্ট ছাত্রগণ বা অন্য কোনো ছাত্র এই হাদীস বর্ণনা করেন না, অথচ

আপনি কিভাবে তা পেলেন? তখন তিনি বলেন: আমি দেখলাম, মানুষ কুরআন ছেড়ে দিয়েছে। তারা আবু হানীফার ফিকহ এবং ইবনু ইসহাকের মাগাযী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য আমি তাদেরকে কুরআনের দিকে ফিরিয়ে আনতে এই হাদীস বানিয়েছি।[১৯৭]

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আবিদ, আলিম ও ওয়ায়িয আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু গালিব গুলাম খালীল (২৭৫ হি)। তিনি রাজধানী বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংসারত্যাগী আবিদ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্বদা শাক সব্জি খেতেন, অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ওয়ায করতেন। 'আহলুর রাই' বলে কথিত (হানাফী) ফকীহগণের বিরুদ্ধে, মু'তাযিলা, শিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া ও অন্যান্য বিদআতী মতের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। সাধরণের মধ্যে তার ওয়াজের প্রভাব ছিল অনেক। শ্রোতাদের মন নরম করতে ও তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে তিনি নিত্যনতুন গল্প কাহিনী হাদীসের নামে জালিয়াতি করে বলতেন। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নামে সনদ তৈরি করে তিনি মিথ্যা হাদীসগুলি বলতেন।

আবু জা'ফার ইবনুশ শুআইরী বলেন, একদিন গুলাম খালীল হাদীস বলতে গিয়ে বলেন, আমাকে বাকর ইবনু ঈসা (২০৪ হি) বলেছেন, তিনি আবু উওয়ানা থেকে.... । আমি বললাম, বাকর ইবনু ঈসা তো অনেক পুরাতন মানুষ। ইমাম আহমদ (২৪১ হি) ও তার পর্যায়ের মানুষেরা তার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। আপনি তাকে জীবিত দেখেন নি। একথা বলার পরে তিনি চুপ করে চিন্তা করতে থাকেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলে ফেলেন কিনা। এজন্য আমি বললাম: হতে পারে যে, আপনার উস্তাদ বাকর ইবনু ঈসা অন্য আরেক ব্যক্তি। তিনি চুপ করে থাকলেন। পরদিন তিনি আমাকে বললেন: আমি গতরাতে চিন্তা করে দেখেছি, বসরায় আমি 'বাকর ইবনু ঈসা' নামের ৬০ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস শুনেছি![১৯৮]

মিথ্যার বাহাদুরি দেখুন! হাদীসের 'নকিদ' ইমামদের নিকট এই ধরনের 'ঠান্ডা' মিথ্যার কোনো মূল্য নেই। বসরায় কোন্ যুগে কতজন 'রাবী' ছিলেন নামধামসহ তাদের বর্ণিত হাদীস তারা সংগ্রহ ও সংকলিত করেছেন। এজন্য এরা অনেক সময় এঁদের কাছে জালিয়াতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো।

চতুর্থ শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আদী (৩৬৫ হি) বলেন, হাদীস সংগ্রহের সফরে যখন হার্‌রান শহরে ছিলাম তখন আবু আরূবার মাজলিসে আবু আব্দুল্লাহ নাহাওয়ান্দী বলেন, আমি গুলাম খালীলকে বললাম, শ্রোতাদের হৃদয়-কাড়া যে হাদীসগুলি বলছেন সেগুলি কোথায় পেলেন? তিনি বলেন: মানুষের হৃদয় নরম করার জন্য আমি এগুলি বানিয়েছি।[১৯৯]

এ সকল নেককার মানুষের জালিয়াতির ক্ষতি সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের সকল ইমামই আলোচনা করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে ইবনুস সালাহ, নববী ও ইরাকীর বক্তব্য দেখেছি। এ বিষয়ে আল্লামা সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী হানাফী (৮১৬ হি.) লিখেছেন: "মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসের প্রচলনে সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন দুনিয়াত্যাগী দরবেশগণ, তাঁরা অনেক সময় সাওয়াবের নিয়্যাতেও মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন।"[২০০]

ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) বলেন : "বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সূফী সাওয়াবের বর্ণনায় ও পাপাচারের শাস্তির বর্ণনায় মিথ্যা হাদীস বানানো ও প্রচার করা জায়েয বলে মনে করতেন।"[২০১]

সুয়ূতী (৯১১ হি) বলেন, জালিয়াতির উদ্দেশ্য অনুসারে মিথ্যাবাদী জালিয়াতগণ বিভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর ছিলেন কিছু মানুষ যাদেরকে সংসারত্যাগী নির্লোভ নেককার বলে মনে করা হতো। তাঁরা তাঁদের বিভ্রান্তির কারণে আল্লাহর নিকট সাওয়াব পাওয়ার আশায় মিথ্যা হাদীস বানাতেন। .... (২য় শতকের প্রখ্যাত দরবেশ) আবু দাউদ নাখয়ী সুলাইমান ইবনু আমর রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ে ও দিনের পর দিন নফল সিয়াম পালনে ছিলেন অতুলনীয়। তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে প্রচার করতেন।... আবু বিশর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী খোরাসানের অন্যতম ফকীহ, আবিদ ও সুন্নাতের সৈনিক ছিলেন। সুন্নাতের পক্ষে এবং বিদ'আত ও বিদ'আতপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথাকে হাদীসের নামে প্রচার করতেন। ... ওয়াহ্‌ব ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাফস (২৫০ হি) তার যুগের অন্যতম নেককার আবিদ ও ওয়ায়িয ছিলেন। ২০ বৎসর তিনি কারো সাথে কোনো জাগতিক কথা বলেন নি। তিনিও হাদীসের নামে জঘন্য মিথ্যা কথা বলতেন।[২০২]

আল্লামা আলী কারী (১০১৪ হি.) লিখেছেন: অত্যধিক ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত সংসারত্যগী দরবেশগণ শবে-বরাতের নামায, রজব মাসের নামায ইত্যাদি বিভিন্ন ফযীলতের বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন। তাঁরা মনে করতেন এতে তাঁদের সাওয়াব হবে, দ্বীনের খেদমত হবে। বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন এই সকল মানুষ। তাঁরা এই কাজকে নেককাজ ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন, কাজেই তাঁদেরকে কোনো প্রকারেই বিরত রাখা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাঁদের নেককর্ম, সততা, ইবাদত বন্দেগি ও দরবেশীর কারণে সাধারণ মুসলিম ও আলিমগণ তাঁদের ভালবাসতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন ও বর্ণনা করতেন। অনেক সময় ভালো মুহাদ্দিসও তাঁদের আমল আখলাকে ধোঁকা খেয়ে তাঁদের বানোয়াটি ও মিথ্যা হাদীস অসতর্কভাবে গ্রহণ করে নিতেন।[২০৩]

১. ৫. ৪. আমীরদের মোসাহেবগণ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলি মুলত ধর্মীয়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছাড়াও জাগতিক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনেক মানুষ হাদীস বানিয়েছেন। অর্থ কামাই, সম্মান বা সুনাম অর্জন, রাজা-বাদশাহদের দৃষ্টি আকর্ষণ, দরবারে মর্যাদা লাভ, রাজনৈতিক বা গোষ্ঠিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তারা হাদীস বানিয়েছেন।

শাসক-প্রশাসকদের কাছে যাওয়ার ও তাদের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করে থাকে। দ্বিতীয় হিজরী শতকে কোনো কোনো দুর্বল ঈমান 'আলিম' খলীফা বা আমীরদের মন জয় করার জন্য তাদের পছন্দ মোতাবেক হাদীস বানানোর চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস যুহাইর ইবনু হারব (২৩৪ হি) বলেনঃ তৃতীয় আব্বাসী খলীফা মুহাম্মাদ মাহ্‌দী (রাজত্বকাল ১৫৮-১৬৯ হি) এর দরবারে কয়েকজন মুহাদ্দিস আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গিয়াস ইবনু ইবরাহীম আন-নাখয়ী। খলীফা মাহ্‌দী উন্নত জাতের কবুতর উড়াতে ও কবুতরের প্রতিযোগিতা করাতে ভালবাসতেন। খলীফার পছন্দের দিকে লক্ষ্য করে গিয়াস নামক এই ব্যক্তি তার সনদ উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া ও পাখি ছাড়া আর কিছুতে প্রতিযোগিতা নেই।' একথা শুনে মাহদী খুশী হন এবং উক্ত মুহাদ্দিসকে ১০ হাজার টাকা হাদিয়া প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু যখন গিয়াস দরবার ত্যাগ করছিলেন তখন মাহদী বলেন, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি মিথ্যা বলেছেন। আমি আপনাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করেছি। তিনি কবুতরগুলি জবাই করতে নির্দেশ দেন। তিনি আর কখনো উক্ত মুহাদ্দিসকে তার দরবারে প্রবেশ করতে দেন নি।[২০৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল হাদীসটি সহীহ, যাতে ঘোড়দৌড়, উটদৌড় ও তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।[২০৫] এই ব্যক্তি খলীফার মনোরঞ্জনের জন্য সেখানে 'পাখি' শব্দটি যোগ করেছে।

পঞ্চম আব্বাসী খলীফা হারূন আর-রাশীদ (শাসনকাল ১৯৩-১৭০ হি) রাষ্ট্রীয় সফরে মদীনা আগমন করেন। তিনি মসজিদে নববীর মিম্বারে উঠে বক্তৃতা প্রদানের ইচ্ছা করেন। তাঁর পরনে ছিল কাল শেরোয়ানী। তিনি এই পোশাকে মিম্বারে নববীতে আরোহণ করতে দ্বিধা করছিলেন। মদীনার মশহুর আলিম ও বিচারক ওয়াহ্‌ব ইবনু ওয়াহ্‌ব আবুল বুখতুরী তখন বলেনঃ আমাকে জা'ফর সাদিক বলেছেন, তাঁকে তাঁর পিতা মুহাম্মাদ আল-বাকির বলেছেন, জিবরাঈল (আ) কালো শেরোয়ানী পরিধান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন।[২০৬]

এভাবে তিনি খলীফার মনোরঞ্জনের জন্য একটি মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে চালালেন। আবুল বুখতুরী হাদীস জালিয়াতিতে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

১. ৫. ৫. গল্পকার ওয়ায়েযগণ

ওয়াযের মধ্যে শ্রোতাদের দৃষ্টি-আকর্ষণ, মনোরঞ্জন, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার ও নিজের সুনাম, সুখ্যাতি ও নগদ উপার্জন বৃদ্ধির জন্য অনেক মানুষ ওয়াযের মধ্যে বানোয়াট কথা হাদীস নামে বলেছেন। মিথ্যা ও জাল হাদীসের প্রসারে এসকল ওয়ায়েয ও গল্পকারদের ভূমিকা ছিল খুব বড়। হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে এদের দুঃসাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা ছিল খুবই বেশি। তাদের অনেকেই শ্রোতাদের অবাক করে পকেট খালি করার জন্য শ্রোতাদের চাহিদা মত মিথ্যা বানিয়ে নিতেন দ্রুত। এছাড়া কোনো জালিয়াতের জাল হাদীস বা গল্প কাহিনী আকর্ষণীয় হলে অন্যান্য ওয়ায়িয জালিয়াতরা তা চুরি করত এবং নিজের নামে সনদ বানিয়ে প্রচার করত।[২০৭]

এদের বুদ্ধি ও দুঃসাহসের নমুনা দেখুন। তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি) ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি)। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে বাগদাদে ও পুরো মুসলিম বিশ্বে তাঁদের পরিচিতি। তাঁরা দুজন একদিন বাগদাদের এক মসজিদে সালাত আদায় করেন। সালাতের পরে একজন ওয়ায়িয ওয়ায করতে শুরু করেন। ওয়াযের মধ্যে তিনি বলেনঃ আমাকে আহমদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন দুজনেই বলেছেন, তাঁদেরকে আব্দুর রাযযাক, তাঁকে মা'মার, তাকে কাতাদাহ, তাকে আনাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে তবে এর প্রত্যেক অক্ষর থেকে একটি পাখি তৈরি করা হয়, যার ঠোঁট স্বর্ণের, পালকগুলি মহামূল্য পাথরের .... । এভাবে সে তার আজগুবি গল্প ও অগণিত সাওয়াবের কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করে। ওয়ায শেষে উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই তাকে কিছু কিছু 'হাদিয়া' প্রদান করেন।

ওয়ায চলাকালীন সময়ে আহমদ ও ইয়াহইয়া অবাক হয়ে একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করেন, এ হাদীসকি আপনি ঐ ব্যক্তিকে বলেছেন? উভয়েই বলেন, জীবনে আজই প্রথম এই 'হাদীস'টি শুনছি। ওয়ায শেষে মানুষের ভীড় কমে গেলে ইয়াহইয়া লোকটিকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করেন। লোকটি কিছু হাদীয়া পাবে ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে। ইয়াহইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই হাদীসটি তোমাকে কে বলেছেন? সে বলেঃ ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আহমদ ইবনু হাম্বাল। তিনি বলেনঃ আমি তো ইয়াহইয়া এবং ইনি আহমদ। আমর দুজনের কেউই এই হাদীস জীবনে শুনিনি, কাউকে শেখানো তো দূরের কথা। মিথ্যা যদি বলতেই হয় অন্য কারো নামে বল, আমাদের নামে বলবে না। তখন লোকটি বলে, আমি সবসময় শুনতাম যে, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একজন আহাম্মক। এখন সেই কথার প্রমাণ পেলাম। ইয়াহইয়া বলেন, কিভাবে? সে বলে, আপনারা কি মনে করেন যে, দুনিয়াতে আপনারা

ছাড়া আর কোনো ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আহমদ ইবনু হাম্বাল নেই? আমি আপনার সাথী আহমদ ছাড়া ১৬ জন আহমদ ইবনু হাম্বালের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছি। একথা শুনে আহমদ ইবনু হাম্বাল মুখে কাপড় দিয়ে বলেন, লোকটিকে যেতে দিন। তখন লোকটি দুজনের দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল।[২০৮]

৪র্থ হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান আল-বুসতী (৩৫৪ হি) বলেন: আমি আমার হাদীস সংগ্রহের সফর কালে সিরিয়ার 'তাজরোয়ান' নামক শহরে প্রবেশ করি। শহরের জামে মসজিদে সালাত আদায়ের পরে এক যুবক দাঁড়িয়ে ওয়ায শুরু করে। ওয়াযের মধ্যে সে বলেঃ আমাকে আবু খালীফা বলেছেন, তাঁকে ওয়ালীদ বলেছেন, তাঁকে শু'বা বলেছেন, তাঁকে কাতাদা বলেছেন, তাঁকে আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ কোনো মুসলিমের প্রয়োজন পূরণ করে তাহলে আল্লাহ তাকে এত এত পুরস্কার প্রদান করবেন... এভাবে সে অনেক কথা বলে। তার কথা শেষ হলে আমি তাকে ডেকে বললাম, তোমার বাড়ি কোথায়? সে বলেঃ আমি বারদায়া এলাকার মানুষ। আমি বললাম, তুমি কি কখনো বসরায় গিয়েছ? সে বলল: না। আমি বললাম: তুমি কি আবু খালীফাকে দেখেছ? সে বলল: না। আমি বললাম: তাহলে কিভাবে তুমি আবু খালীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করছ, অথচ তুমি তাকে কোনোদিন দেখনি? যুবকটি বলল: এ বিষয়ে প্রশ্ন করা ভদ্রতা ও আদবের খেলাফ। এই একটি মাত্র সনদই আমার মুখস্থ আছে। আমি যখনই কোনো হাদীস বা কথা কারো মুখে শুনি, আমি তখন সেই কথার আগে এই সনদটি বসিয়ে দিয়ে কথাটি বর্ণনা করি। ইবনু হিব্বান বলেন, তখন আমি যুবকটিকে রেখে চলে আসলাম।[২০৯]

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল ফারাজ ইবনুল জাউযী (৫৯৭ হি) বলেন, আমাদের এলাকায় একজন ওয়ায়িয আছেন। তিনি বাহ্যত পরহেযগার ও আল্লাহভীরু মানুষ। কাজে কর্মে দরবেশী ও তাকওয়া প্রকাশ করেন। তার বিষয়ে আমাকে আমার দুজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আলিম বন্ধু বলেছেন, এক আশুরার দিনে ঐ লোকটি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আশুরার দিনে এই কাজ করবে তার এই পুরস্কার, যে এই কাজ করবে তার এই পুরস্কার... এভাবে অনেক কাজের অনেক প্রকার পুরস্কার বিষয়ক অনেক হাদীস তিনি বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এই হাদীসগুলি আপনি কোথা থেকে মুখস্থ করলেন? তিনি বলেন: আল্লাহর কসম, আমি কখনোই হাদীসগুলি শিখিনি বা মুখস্থ করিনি। এই মুহূর্তেই এগুলি আমার মনে এল এবং আমি বললাম।[২১০]

ইবনুল জাউযী বলেন, আমার সমকালীন একজন ওয়ায়িয এসব মিথ্যা হাদীস দিয়ে একটি বইও লিখেছে। সে বইয়ের একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

একদিন হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) খলীফা উমার (রা) এর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। উমার (রা) ব্যস্ত ছিলেন। হাতের কাজ শেষ করে মাথা উঠিয়ে তিনি তাঁদের দুজনকে দেখতে পান। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে চুমু খান, প্রত্যেককে ১০০০ মুদ্রা প্রদান করেন এবং বলেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাদের আগমন বুঝতে পারিনি। তাঁরা দুজন ফিরে যেয়ে তাঁদের পিতা আলী (রা)-এর নিকট উমারের আদব ও বিনয়ের কথা উল্লেখ করেন। তখন আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনুল খাত্তাব ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। তাঁরা দুজন উমারের কাছে ফিরে যেয়ে তাঁকে এই হাদীস শোনান। তখন তিনি কাগজ ও কালি চেয়ে নিয়ে লিখেন: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা আমাকে বলেছেন, তাঁরা তাঁদের পিতা আলী মুরতাযা থেকে, তাঁদের নানা নবী মুসতাফা (ﷺ) থেকে, তিনি বলেছেন, উমার ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ। উমার ওসীয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে যেন তাঁর কাফনের মধ্যে বুকের উপরে এই কাগজটি রাখা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ওসীয়ত মত কাজ করা হয়। পরদিন সকালে সকলে দেখতে পান যে, কাগজটি কবরের উপরে রয়েছে এবং তাতে লিখা রয়েছেঃ হাসান ও হুসাইন সত্য বলেছেন, তাঁদের পিতা সত্য বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, উমার ইসলামের নূর ও জান্নাতবাসীদের প্রদীপ।

ইবনুল জাউযী বলেন, সবচেয়ে দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো, এই জঘন্য বানোয়াট মিথ্যা ও আজগুবি কথা লিখেই সে সন্তুষ্ট থাকে নি। আমাদের যুগের অনেক আলিমকে তা দেখিয়েছে। হাদীসের সনদ ও বিশুদ্ধতা বিষয়ক জ্ঞানের অভাব আলিমদের মধ্যেও এত প্রকট যে, অনেক আলিম এই জঘন্য মিথ্যাকেও সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।[২১১]

১. ৫. ৬. আঞ্চলিক, পেশাগত বা জাতিগত বৈরিতা

বিভিন্ন বংশ, জাতি, দেশ বা শহরের মানুষেরা নিজেদের প্রাধান্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক সময় জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। আরব জাতি ও আরবী ভাষার পক্ষে, ফার্সী ভাষা ও পারসিক জাতির বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে ফার্সী ভাষার পক্ষে ও আরবী ভাষার বিরুদ্ধে হাদীস জালিয়াতি করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের বা পেশার পক্ষে বা বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে। এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছেঃ 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা হলো ফারসী ভাষা।' 'আল্লাহ যখন ক্রোধান্বিত হন তখন আরবীতে ওহী নাযিল করেন। আর যখন তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তখন ফার্সী ভাষায় ওহী নাযিল করেন।' 'আরশের আশেপাশে যে সকল ফিরিশতা রয়েছেন তারা ফার্সী ভাষায় কথা বলেন।' অনুরূপভাবে তাঁতীদের বিরুদ্ধে, স্বর্ণকারদের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য পেশার বিরুদ্ধে কুৎসা ও নিন্দা মূলক হাদীস তৈরি করা হয়েছে পেশাগত হিংসাহিংসির কারণে।

বিভিন্ন শহর, দেশ বা জনপদের ফযীলতে বা নিন্দায় হাদীস বানানো হয়েছে। বলতে গেলে তৃতীয় হিজরী শতকের পরিচিত প্রায় সকল শহর ও দেশের প্রশংসায় বা নিন্দায় হাদীস বানানো হয়েছে। মক্কা, মদীনা ইত্যাদি যে সকল শহরের ফযীলতে সহীহ

হাদীস রয়েছে সেগুলির জন্যও অনেক ‘চিত্তাকর্ষক’ জাল হাদীস বানানো হয়েছে।[২১২]

১. ৫. ৭. প্রসিদ্ধির আকাঙ্খা

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তৎকালীন যুগে সনদ ও মতন ছিল হাদীসের অবিচ্ছেদ্য দুটি অংশ। সনদ ও মতনের সমন্বিত রূপকেই হাদীস বলা হত। এই সমন্বিতরূপের হাদীস মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। অনেক সময় কোনো মুহাদ্দিস প্রসিদ্ধির বা স্বকীয়তার জন্য এই সমন্বিত রূপের মধ্যে পরিবর্তন করতেন। এক সনদের হাদীস অন্য সনদে বা এক রাবীর হাদীস অন্য রাবীর নামে বর্ণনা করতেন। মিথ্যার প্রকারভেদের মধ্যে আমরা মিথ্যা সনদ বানানোর বিষয়ে দু একটি উদাহরণ উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৬. মিথ্যার প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ‘হাদীসের নামে মিথ্যা’ বলার বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১. ৬. ১. সনদে মিথ্যা

‘সনদ’ ও ‘মতন’ এর সম্মিলিত রূপই হাদীস। হাদীস বানাতে হলে সনদ জালিয়াতি অত্যাবশ্যক। আবার অনেক সময় সনদ জালিয়াতিই ছিল জালিয়াতের মূখ্য উদ্দেশ্য। মিথ্যাবাদীগণ তাদের উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য অনুসারে সনদে জালিয়াতি করত। এদের জালিয়াতি কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ৬. ১. ১. বানোয়াট কথার জন্য বানোয়াট সনদ

সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কাজেই একটি মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে চালাতে হলে তার সাথে একটি সনদ বলতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াতগণ নিজেরা মনগড়াভাবে বিভিন্ন সুপরিচিত আলেমদের নামে একটি সনদ বানিয়ে নিত। অথবা তাদের মুখস্থ কোনো সনদ সকল বানোয়াট হাদীসের আগে জুড়ে দিত। আমরা উপরে আলোচিত বিভিন্ন বানোয়াট হাদীসে এর উদাহরণ দেখতে পেয়েছি। এভাবে অধিকাংশ বানোয়াট হাদীসের সনদও মনগড়া। একটি উদাহরণ দেখুন:

ইমাম ইবনু মাজাহ বলেন আমাকে সাহল ইবনু আবী সাহল ও মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বলেছেন তাদেরকে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ আবুস সালত হারাবী বলেছেন: আমাকে আলী রেযা, তিনি তাঁর পিতা মুসা কাযিম, তিনি তাঁর পিতা জা’ফর সাদিক, তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মাদ বাকির, তিনি তার পিতা আলী যাইনুল আবেদীন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম হুসাইন (রা), তিনি তাঁর পিতা আলী (রা) থেকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَلإِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالأَرْكَانِ

“ঈমান হলো অন্তরের মা’রিফাত বা জ্ঞান, মুখের কথা ও বিধিবিধান অনুসারে কর্ম করা।”[২১৩]

তাহলে অন্তরের জ্ঞান, মুখের স্বীকৃতি ও কর্মের বাস্তবায়নের সামষ্টিক নাম হলো ঈমান বা বিশ্বাস। কথাটি খুবই আকর্ষণীয়। অনেক তাবেয়ী ও পরবর্তী আলিম এভাবে ঈমানের পরিচয় প্রদান করেছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনু হাম্বাল প্রমুখ এই মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা বলেন: ঈমান মূলত মনের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতির নাম। কর্ম ঈমানের অংশ নয়, ঈমানের দাবী ও পরিণতি। ঈমান ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলাম। এই হাদীসটি সহীহ হলে তা ইমাম আবু হানীফার মতের বিভ্রান্তি প্রমাণ করে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় হাদীসটি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পাঠক লক্ষ্য করুন। এ সনদের রাবীগণ রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বংশের অন্যতম বুযুর্গ ও শিয়া মযহাবে ১২ ইমামের ৭ জন ইমাম। এ জন্য সহজেই আমরা সরলপ্রাণ মানুষেরা ধোঁকা খেয়ে যাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের হেফাজতে নিয়োজিত মুহাদ্দিসগণকে এভাবে প্রতারণা করা সম্ভব ছিল না। তাঁরা তাঁদের নিয়মে হাদীসটি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা তাদের নিরীক্ষায় দেখেছেন যে, সনদে উল্লিখিত ৭ প্রসিদ্ধ ইমামের কোনো ছাত্র এই হাদীসটি বর্ননা করেন নি এবং অন্য কোনো সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয় নি।

শুধুমাত্র আব্দুস সালাম আবুস সাল্‌ত দাবী করলেন যে, ইমাম আলী রেযা (২০৩হি:) তাকে এই হাদীসটি বলেছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের ২০০ বৎসর পরে এসে আবুস সাল্‌ত নামের এই ব্যক্তি হাদীসটি প্রচার করছেন। মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, আবূস সাল্‌ত আব্দুস সালাম নামক এই ব্যক্তি অনেক হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অগণিত ভুল। তিনি এমন সব হাদীস বিভিন্ন মুহাদ্দিস ও আলেমের নামে বলেন যা তাদের অন্য কোন ছাত্র বলেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি হাদীস ঠিকমত মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তবে তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা হাদীস বলতেন কিনা তা নিয়ে তাঁরা কিছুটা দ্বিধা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও কতিপয় ইমাম বলেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ভাল ছিলেন বলেই দেখা যায়। শিয়া হলেও বাড়াবাড়ি করতেন না। কিন্তু তিনি অগণিত উল্টোপাল্টা ও ভিত্তিহীন (মুনকার) হাদীস বলেছেন, যা আর কোন বর্ণনাকারী কখনো বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি ইচ্ছা করে মিথ্যা বলতেন না বলে বুঝা যায়। অপরপক্ষে আল-জুযানী, উকাইলী প্রমুখ ইমাম বলেছেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন।[২১৪]

যারা তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুল বলেছেন বলে মনে করেছেন তাঁরা হাদীসটিকে "বাতিল", "ভিত্তিহীন" "খুবই যয়ীফ" ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। আর যারা তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে দেখেছেন, তাঁরা হাদীসটিকে "মাওযূ", বা বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন।[২১৫]

অষ্টম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনুল কাইয়িম মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ও আমলকে ঈমানের অংশ বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে ঈমান হলো অন্তরের জ্ঞান, মুখের স্বীকৃতি ও বিধিবিধান পালন। তিনি এই মতের পক্ষে দীর্ঘ আলোচনার পরে বলেন, তবে এ বিষয়ে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ বর্ণিত যে হাদীসটি ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন, সে হাদীসটি মাউযূ, তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়।"[২১৬]

আমরা দেখছি যে, এ সনদের সকল রাবী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। এ হলো জাল হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াতগণ তাদের জালিয়াতি চালানোর জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে সনদ তৈরী করতো। তাদের এই জালিয়াতি সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিলেও নিরীক্ষক মুহাদ্দিসদের ধোঁকা দিতে পারত না। কারণ সনদে জালিয়াতের নাম থেকে যেত। জালিয়াত যাকে উস্তাদ বলে দাবী করেছে তার নাম থাকত। উস্তাদের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণিত হাদীস এবং এই জালিয়াতের বর্ণিত হাদীসের তুলনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ জালিয়াতি ধরে ফেলতেন।

জালিয়াতির আরেকটি উদাহরণ দেখুন। ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি বলেনঃ আমাকে সাওর ইবনু ইয়াযিদ (১৫৫হিঃ) বলেছেন, তিনি খালিদ ইবনু মা'দান (মৃঃ ১০৩ হিঃ) থেকে, তিনি মু'আয ইবনু জাবাল থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করতে পারব? তিনি বলেনঃ হাঁ, তবে যদি গোসল ফরয থাকে তাহলে কুরআন স্পর্শ করবে না। আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে কুরআনের বাণীঃ (পবিত্রগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করে না)[২১৭] এর অর্থ কি? তিনি বলেনঃ এর অর্থ হলোঃ কুরআনের সাওয়াব মুমিনগণ ছাড়া কেউ পাবে না।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি বানোয়াট। হাদীসের ইমামগণ ইসমাঈল ইবনু যিয়াদ (আবী যিয়াদ) নামক এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে অন্যান্য সকল বর্ণনার সাথে তার তুলনামূলক নিরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন যে, এ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস কোনটিই সঠিক নয়। তিনি একজন ভাল আলেম ছিলেন ও মাওসিল নামক অঞ্চলের কাযী বা বিচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি শু'বা (১৬০হিঃ), ইবনু জুরাইজ (১৫০হিঃ), সাওর (১৫৫হিঃ) প্রমুখ তৎকালীন বিভিন্ন সুপরিচিত মুহাদ্দিসের নামে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা তারা কখনো বলেন নি বা তাদের কোন ছাত্র তাদের থেকে বর্ণনা করেন নি।

যেমন এখানে সাওর-এর নামে তিনি হাদীসটি বলেছেন। সাওর দ্বিতীয় হিজরী শতকের সিরিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তাঁর অগণিত ছাত্র ছিল। অনেকে বছরের পর বছর তাঁর কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। কোনো ছাত্রই তার থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করে নি। অথচ ইসমাঈল তার নামে এই হাদীসটি বললেন। অবস্থা দেখে মনে হয় তিনি ইচ্ছাপূর্বক এভাবে বানোয়াট হাদীস বলতেন। ইমাম দারাকুতনী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য ইমাম এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাকে দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদী বলেছেন। তার বর্ণিত সকল হাদীস, যা শুধুমাত্র তিনিই বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ বর্ণনা করেনি, এরূপ সকল হাদীসকে তাঁরা মাওযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।

এই ইসমাঈল বর্ণিত আরেকটি বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেনঃ আমাকে গালিব আল-কাত্তান, তিনি আবু সাঈদ মাকবুরী থেকে তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

أَبْغَضُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ الْفَارِسِيَّةُ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা হলো ফার্সী ভাষা, আর জান্নাতের অধিবাসীদের ভাষা হলো আরবী ভাষা।"[২১৮]

১. ৬. ১. ২. প্রচলিত হাদীসের জন্য বানোয়াট সনদ

আমরা দেখেছি যে, অনেক সময় জালিয়াতের উদ্দেশ্য হতো নিজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তারা প্রচলিত 'মতন' বা বক্তব্যের জন্য বিশেষ সনদ তৈরি করত। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

ইমাম মালিক ২য় হিজরী শতকের মুহাদ্দিসগণের অন্যতম ইমাম। তিনি তাঁর উস্তাদ নাফি' থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) "মালিক, নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে" অত্যন্ত সহীহ ও অতি প্রসিদ্ধ সনদ। এই সনদে বর্ণিত সকল হাদীসই মুহাদ্দিসগণের নিকট সংরক্ষিত। তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীর বলেন, আমাকে মালিক বলেছেন, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا

হে আল্লাহ, আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালের সময়ে বরকত দান করুন।[২১৯]

৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খালীলী (৪৪৬ হি) বলেনঃ এটি একটি মাউদূ বা বানোয়াট হাদীস। আব্দুল মুনইম নামক এই ব্যক্তি ছিল একজন মিথ্যাবাদী জালিয়াত। ইমাম আহমদের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একদিন আমার পিতাকে বললামঃ আমি আব্দুল মুনইম ইবনু বাশীরকে বাজারে দেখলাম। তিনি বলেনঃ বেটা, সেই মিথ্যাবাদী জালিয়াত এখনো বেঁচে আছে? এই হাদীস এই সনদে একেবারেই ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন। কখনোই কেউ তা মালিক থেকে বা নাফি' থেকে বর্ণনা করেনি। এই হাদীস মূলত সাখর আল-গামিদী নামক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।[২২০]

এখানে আমরা দেখছি যে, আল্লামা খালীলী হাদীটিকে মাউযূ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আবার তিনি নিজেই উল্লেখ করছেন যে, হাদীসটি অন্য সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, এই সনদে এই হাদীসটি মাউদূ। এই সনদ ও মতনের সম্মিলিত রূপটি বানোয়াট। তিনি সংক্ষেপে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষার ফলাফলও বলে দিয়েছেন। ইমাম মালিকের অগণিত ছাত্রের কেউ এই হাদীসটি তাঁর সূত্রে এই সনদে বর্ণনা করেনি। একমাত্র আব্দুল মুনইম দাবী করছে যে, ইমাম মালিক তাকে হাদীসটি বলেছেন। আর আব্দুল মুনইমের বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসগণ তার মিথ্যাচার ধরেছেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

তবে এর অর্থ নয় যে, এই হাদীসের মতনটি মিথ্যা। মতনটি অন্য বিভিন্ন সনদে সাখর আল-গামিদী ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্নিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষায় তা সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।[২২১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, আব্দুল মুনইম একটি প্রচলিত ও সহীহ 'মতন' এর জন্য একটি 'সুপ্রসিদ্ধ সহীহ সনদ' জাল করেছে। আর সেই যুগে প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য এইরূপ বানোয়াট সনদের কি গুরুত্ব ছিল তা আমাদের যুগে অনুধাবন করা অসম্ভব। মুহাদ্দিসগণ সাখার আল-গামিদীর সূত্রে হাদীসটি জানতেন। কিন্তু তাঁরা যখনই শুনেছেন যে, অমুক শহরে এক ব্যক্তি মালিকের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তখন তাঁরা তার কাছে গিয়েছেন, তার হাদীস লিখেছেন ও নিরীক্ষা করেছেন। যখন নিরীক্ষার মাধ্যমে লোকটির জালিয়াতি ধরা পড়েছে তখন তারা তা প্রকাশ করেছেন। আবার অন্যান্য মুহাদ্দিস তার কাছে গিয়েছেন। মোটামুটি লোকটি বেশ মজা অনুভব করেছে যে, কত মানুষ তার কাছে হাদীস শুনতে আসছে! কিভাবে সে সবাইকে বোকা বানাচ্ছে!! কিন্তু তার জালিয়াতি যে ধরা পড়বে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় নি। কোনো জালিয়াতই ধরা পড়ার চিন্তা করে জালিয়াতি করে না।

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু আবান তৃতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি এভাবে হাদীস বর্ণনায় কিছু জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের মত প্রসিদ্ধ ইমামও তার কাছে হাদীস শিখতে গমন করেন। ইমাম আহমদ পরবর্তীকালে বলতেন: "ইবরাহীম ইবনুল হাকামের কাছে হাদীস শিখতে বাগদাদ থেকে ইয়ামানের এডেন পর্যন্ত সফর করলাম। সফরের টাকাগুলি 'ফী সাবিলিল্লাহ' চলে গেল!"[২২২]

১. ৬. ১. ৩. সনদের মধ্যে কমবেশি করা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা যেভাবে শুনতে হবে ঠিক অবিকল সেভাবেই বলতে হবে। সনদের মধ্যে কোনোরূপ কমবেশি করাও তাঁর নামে মিথ্যা বলা। মুহাদ্দিসগণ এজন্য প্রচলিত সনদের মধ্যে কমবেশি করাকে বানোয়াটি ও জালিয়াতি বলে গণ্য করেছেন। মাউকূফ বা মাকতূ' হাদীসকে অর্থাৎ সাহাবীর কথা বা তাবিয়ীর কথাকে মারফূ হাদীস রূপে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ)-এর কথা রূপে বর্ণনা করা, মুরসাল বা মুনকাতি' হাদীসকে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করা, সনদের কোনো একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর পরিবর্তে অন্য একজন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীর নাম ঢুকানো বা যে কোনো প্রকারে হাদীসের সনদের মধ্যে পরিবর্তন করা হাদীসের নামে মিথ্যাচার বলে গণ্য। এধরনের মিথ্যাচার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারী 'মিথ্যাবাদী' ও জালিয়াত বলে গণ্য। অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাচারী অগ্রহণযোগ্য, দুর্বল ও পরিত্যক্ত বলে গণ্য। এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ দেখুন।

আবু সামুরাহ আহমদ ইবনু সালিম ২য়-৩য় হিজরী শতকের একজন 'রাবী'। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে শারীক বলেছেন, আ'মাশ থেকে, তিনি আতিয়্যা থেকে তিনি আবু সাঈদ খুদরী থেকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ (علي خير البرية) "আলী সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

হাদীসের ইমামগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এই আবু সালামাহ আহমাদ ইবনু সালিম অত্যন্ত দুর্বল রাবী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন আলিম ও মুহাদ্দিস থেকে তাদের নামে এমন সব হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। তার একটি মিথ্যা বা ভুল বর্ণনা হলো এই হাদীসটি। এই হাদীসটি শারীক ইবনু আব্দুল্লাহর অন্যান্য ছাত্রও বর্ণনা করেছেন, এছাড়া শারিকের উস্তাদ আ'মাশ থেকে শারীক ছাড়াও অন্য অনেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্ত তারা বলেছেনঃ আ'মাশ থেকে, তিনি আতিয়্যাহ থেকে বলেছেন, হযরত জাবির বলতেনঃ (كنا نعد عليا خيرنا) "আমরা আলীকে আমাদের মধ্যে উত্তম বলে মনে করতাম।"

তাহলে আমরা দেখছি যে, আবু সালামাহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনটি বিষয় পরিবর্তন করেছেন।

প্রথমত, হাদীসটি আতিয়্যাহ জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, অথচ আবু সালামাহ আতিয়্যার উস্তাদের নাম ভুল করে আবু

সাঈদ খুদরী বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে তিনি সনদের মধ্যে সাহাবীর নাম পরিবর্তন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি হাদীসটির শব্দ বা মতনও পরিবর্তন করেছেন।

তৃতীয়ত, তিনি সনদের মধ্যে পরিবর্তন করে জাবিরের কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি মূলত জাবিরের (রা) নিজের কথা, অথচ তিনি একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক পরিবর্তন। কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেন নি তা তার নামে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত বড় অপরাধ। কোন সাহাবী, তাবেয়ী বা বুজুর্গের কথা বা জ্ঞান মূলক প্রবাদকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা হিসাবে উল্লেখ করা মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসের একটি বিশেষ প্রকার।[২২৩] আমরা একটু পরেই বিষয়টি আবারো উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ।

ইবরাহীম ইবনুল হাকাম ইবনু আবান তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী। তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে জালিয়াতি করতেন। তবে সনদের মধ্যে। তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিস আব্বাস ইবনু আব্দুল আযীম বলেন: ইবরাহীম ইবনুল হাকাম তার পিতার সূত্রে তাবিয়ী ইকরিমাহ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু হাদীস শিক্ষা করেন ও লিখে রাখেন। এই হাদীসগুলি তার পাণ্ডুলিপিতে এভাবে মুরসাল রূপেই লিখিত ছিল। কোনো সাহাবীর নাম তাতে ছিল না। পরবর্তী সময়ে তিনি এগুলিতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবীর (রা) নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করতেন। এই সনদগত মিথ্যাচারের ফলে তিনি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন।[২২৪]

১. ৬. ১. ৪. সনদ চুরি বা হাদীস চুরি

হাদীস জালিয়াতির ক্ষেত্রে মিথ্যাচারীদের একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো 'চুরি' (**سرقة**)। 'হাদীস চুরি' অর্থ হলো, কোনো মিথ্যাচারী রাবী অন্য একজন 'রাবী'র কোনো হাদীস শুনে সেই হাদীস উক্ত রাবীর সূত্রে বর্ণনা না করে বানোয়াট সনদে তা বর্ণনা করবে। চুরি কয়েক প্রকারে হতে পারে:

ক. 'চোর' জালিয়াত মূল সনদ ঠিক রাখবে। তবে যার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছে তার নাম না বলে তার উস্তাদের নাম বলবে এবং নিজেই সেই উস্তাদের নিকট থেকে শুনেছে বলে দাবী করবে।

খ. চোর জালিয়াত মুল সনদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করবে। সনদের মধ্যে একজন রাবীর নাম পরিবর্তন করে সে নতুন সনদ বানাবে।

গ. চোর জালিয়াত হাদীসটির মতন-এর জন্য নতুন সনদ বানাবে। একজন দুর্বল বা মিথ্যাচারী রাবীর বর্ণিত কোনো হাদীস তার মুখে বা কোনো স্থানে শুনে তার ভাল লাগে। হাদীসটির 'আকর্ষণীয়তার' কারণে তারও ইচ্ছা হয় হাদীসটি বলার। তবে হাদীসটি মূল জালিয়াতের নামে বললে তার 'সম্মান' কমে যায়। এছাড়া এতে আকর্ষণীয়তা ও নতুনত্ব থাকে না। এজন্য সে এই 'জাল' হাদীসটির জন্য আরেকটি 'জাল' সনদ তৈরি করবে।

জাল হাদীস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে চুরির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দুর্বল বা জাল হাদীস অনেক সময় ১০/১৫ টি সনদে বর্ণিত থাকে। এতগুলি সনদ দেখে অনেক সময় মুহাদ্দিস ধোঁকা খেতে পারেন। তিনি ভাবতে পারেন, হাদীসের সনদগুলি দুর্বল হলেও যেহেতু এতগুলি সনদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেহেতু হয়ত এর কোনো ভিত্তি আছে। এক্ষেত্রে তাকে দুইটি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে। প্রথমত, তাকে দেখতে হবে যে, প্রত্যেক সনদেই মিথ্যাবাদী রাবী আছে কিনা। দ্বিতীয়ত নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে হবে যে, এখানে চুরি আছে কিনা। যদি দেখা যায় যে, হাদীসটি নির্দিষ্ট কোনো যুগে নির্দিষ্ট কোনো রাবীর বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে সেই রাবীর হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। এরপর কোনো কোনো দুর্বল বা জালিয়াত রাবী তা উক্ত রাবীর উস্তাদ থেকে বা অন্য কোনো সনদে বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে বুঝা যাবে যে, পরের রাবীগণ 'চুরি' করেছেন।

এখানে চুরির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আমরা ইতোপূর্বে নেককারদের অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার উদাহরণ হিসাবে তৃতীয় হিজরী শতকের মাশহুর আবিদ সাবিত ইবনু মূসা (২২৯ হি) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছি, যে হাদীসে বলা হয়েছে: 'যার রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' এই হাদীসটি সর্বপ্রথম সাবিতই বলেন। মুহাদ্দিসগণ সাবিতের মুখে হাদীসটি শোনার পরে বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, সাবিত ছাড়া কেউ হাদীসটি ইতোপূর্বে বলেন নি। কিন্তু এই হাদীসটি সাবিতের মাধ্যমে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে কোনো কোনো দুর্বল ও মিথ্যাচারী রাবী এই হাদীসটি সাবিতের উস্তাদ শারীক থেকে বা অন্যান্য সনদে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে চুরি বলে চিহ্নিত করেছেন। এ সকল চোর জালিয়াতের একজন আব্দুল হামীদ ইবনু বাহ্‌র আবুল হাসান আসকারী, তিনি সাবিতের পরের যুগে দাবী করেন যে, তিনিও হাদীসটি শারীক থেকে শুনেছেন। ৪র্থ হিজরীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু আদী বলেন, আমাকে হাসান ইবনু সুফিয়ান বলেন, আমাকে আব্দুল হামীদ ইবনু বাহ্‌র বলেছেন, আমাদেরকে শারীক বলেছেন, আ'মাশ থেকে, আবু সুফিয়ান থেকে জাবির থেকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি রাত্রে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করে তবে দিনে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' ইবনু আদী বলেন, হাদীসটি সাবিত ইবনু মুসা থেকে প্রসিদ্ধ। তার থেকে পরবর্তীতে অনেক দুর্বল রাবী হাদীসটি চুরি করেছে। আব্দুল হামীদ তাদের একজন।[২২৫]

চতুর্থ হিজরী শতকের একজন জালিয়াত রাবী হাসান ইবনু আলী ইবনু সালিহ আল-আদাবী। আল্লামা ইবনু আদী বলেন:

আমি লোকটির নিকট থেকে হাদীস শুনেছি ও লিখেছি। লোকটি হাদীস জাল করত এবং চুরি করত। একজনের হাদীস আরেকজনের নামে বর্ণনা করতো। এমন সব লোকের নাম বলে হাদীস বলতো যাদের কোনো পরিচয় জানা যায় না।

এরপর তিনি এই হাসান ইবনু আলীর হাদীস চুরির অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আদী বলেন: আমাকে হাসান ইবনু আলী আদাবী বলেন, আমাদেরকে হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদ বলেছেন, তিনি শারীক থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যার রাতের সালাত অধিক হবে দিবসে তার চেহারা সৌন্দর্যময় হবে।' ইবনু আদী বলেন: হাদীসটি সাবিত ইবনু মুসার হাদীস। সাবিতের পরে অনেক দুর্বল রাবী হাদীসটি চুরি করে বিভিন্ন রাবীর নাম দিয়ে চালিয়েছে। এই সনদে হাসান ইবনু আলী আল-আদাবী হাদীসটিকে হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদের নামে চালাচ্ছে। অথচ হাসান ইবনু আলী ইবনু রাশিদ প্রসিদ্ধ ও সত্যপরায়ণ রাবী ছিলেন, তিনি কখনোই এই হাদীসটি শারীক থেকে বা অন্য কোনো সনদে বর্ণনা করেন নি। তাঁর পরিচিত কোনো ছাত্র হাদীসটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেন নি।[২২৬]

২য় শতকের একজন দুর্বল রাবী 'হুযাইল ইবনুল হাকাম'। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ (১৫৯ হি) বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَوْتُ الْغَرِيْبِ (مَوْتُ غُرْبَةٍ) شَهَادَةٌ

"প্রবাসের মৃত্যু শাহাদত বলে গণ্য।"[২২৭]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী এই হুযাইল নামক রাবী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত সন্ধান ও নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এই হাদীসটি একমাত্র এই ব্যক্তি ছাড়া কোনো রাবী আব্দুল আযীয থেকে বা অন্য কোনো সূত্রে বর্ণনা করেন নি।

এ যুগের অন্য একজন রাবী ইবরাহীম ইবনু বাকর আল-আ'ওয়ার। তিনি এসে দাবী করলেন যে, তিনি হাদীসটি আব্দুল আযীয থেকে শুনেছেন। তিনিও বললেন: আমাদেরকে আব্দুল আযীয বলেছেন, ইকরিমাহ থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে...। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করলেন যে, ইবরাহীম নামক এই ব্যক্তি হাদীসটি চুরি করেছেন। তাঁরা দেখলেন যে, ইবরাহীম আব্দুল আযীয থেকে হাদীস শুনেন নি। যখন হুযাইল হাদীস বলতেন তখনও তিনি বলেন নি যে, তিনিও হাদীসটি শুনেছেন। হুযাইলের সূত্রে যখন হাদীসটি মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে তখন তিনিও হাদীসটি হুযাইলের সূত্রে জানতে পারেন। এখন হুযাইলের সূত্রে হাদীসটি বললে তার 'মর্যাদা' কমে যাবে। এজন্য তিনি হুযাইলের সনদ চুরি করলেন। হুযাইলের উস্তাদকে নিজের উস্তাদ দাবী করে তিনি হাদীসটি বলতে শুরু করলেন।[২২৮]

১. ৬. ২. মতনে মিথ্যা

জালিয়াতির প্রধান ক্ষেত্র হলো হাদীসের 'মতন' বা মূল বক্তব্য। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত মিথ্যা কথা মূলত দুই প্রকারের হতে পারে: জালিয়াত নিজের মনগড়া কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলবে অথবা কোনো প্রচলিত কোনো কথাকে তাঁর নামে বলবে। উভয় প্রকারের মিথ্যা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে।[২২৯]

১. ৬. ২. ১. নিজের মনগড়া কথা হাদীস নামে চালানো

অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে, মিথ্যাবাদী রাবী নিজের বানানো কথা হাদীস বলে চালাচ্ছে। আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, মাউযূ বা মিথ্যা হাদীসের মধ্যে এই প্রকারের হাদীসের সংখ্যায় বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জালিয়াত প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে একটি বক্তব্য বানিয়ে তা হাদীস নামে চালায়।[২৩০] উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উদাহরণের মধ্যে আমরা এই প্রকারের অনেক 'জাল হাদীস' দেখতে পেয়েছি। কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে বানোনো, বিভিন্ন প্রকারের 'বানোয়াট আমলের' বানোয়াট ফযীলতে বানানো, দেশ, জাতি, দল, মত ইত্যাদির পক্ষে বা বিপক্ষে বানানো জাল হাদীসগুলি সবই এই পর্যায়ের।

১. ৬. ২. ২. প্রচলিত কথা হাদীস নামে চালানো

অনেক সময় দুর্বল রাবী বা মিথ্যাবাদী রাবী ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর কথা, অথবা কোনো প্রবাদ বাক্য, নেককার ব্যক্তির বাণী, পূর্ববর্তী নবীদের নামে প্রচলিত কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো কথা, কোনো প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাণী বা অনুরূপ কোনো প্রচলিত কথাকে 'হাদীসে রাসূল' বলে বর্ণনা করেন। আল্লামা ইরাকী (৮০৬হি) এই জাতীয় মাউদূ হাদীসের দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম উদাহরণ

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

'দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপের মূল।'

আল্লামা ইরাকী বলেন, এই বাক্যটি মূলত কোনো কোনো নেককার আবিদের কথা। ঈসা (আ)-এর কথা হিসাবেও প্রচার করা হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই।

আর দ্বিতীয় উদাহরণ:

اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ.

'পাকস্থলী রোগের বাড়ি আর খাদ্যভ্যাস নিয়ন্ত্রণ সকল ঔষধের মূল ।'
কথাটি চিকিৎসকদের কথা । হাদীস হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই ।[২৩১]

উপরে 'সনদের মধ্যে কমবেশি করা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে আমরা এই জাতীয় কিছু উদাহরণ দেখেছি । এই প্রকারের 'মিথ্যা' বা জালিয়াতির আরো অনেক উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাব । এখানে আমাদের দেশে আলেমগণের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ একটি হাদীসের কথা উল্লেখ করছি ।

আমাদের দেশে 'হাদীস' বলে প্রচলিত একটি কথা:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"মুসলিমগণ যা ভাল মনে করবেন তা আল্লাহর নিকট ভাল ।"

আমাদের দেশে সাধারণভাবে কথাটি হাদীসে নববী বলে প্রচারিত । কথাটি মূলত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা)-এর । একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করলে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে । ইবনু মাসঊদ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন । তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হৃদয়কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন । এজন্য তিনি তাঁকে নিজের জন্য বেঁছে নেন এবং তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন । এরপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়ের পরে অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন । তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়গুলিকে সর্বোত্তম হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন । এজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নবীর সহচর ও পরামর্শদাতা বানিয়ে দেন, তাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেন । অতএব, মুসলমানগণ (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহচর পরামর্শদাতা পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণ) যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহর নিকটেও ভালো । আর তাঁরা যাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর নিকেটেও খারাপ ।"[২৩২]

কোনো কোনো ফকীহ বা আলিম ভুলবশত কথাটি হাদীসে নববী বলে উল্লেখ করেছেন । পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সকল গ্রন্থ তালাশ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি । আল্লামা যাইলায়ী আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), ইবনু হাজার আসকালানী আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা) কথা হিসাবে হাসান সনদে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে কোথাও বর্ণিত হয়নি ।[২৩৩]

১. ৬. ৩. অনুবাদে, ব্যাখ্যায় ও গবেষণায় মিথ্যা

হাদীসের নামে মিথ্যার আরেকটি বড় ক্ষেত্র হলো অনুবাদ ও ব্যাখ্যা । প্রচলিত বই-পুস্তক ও ওয়ায-নসীহত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমরা সাধারণত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ১০০% ঢালাও স্বাধীনতা প্রদান করে থাকি । হাদীসের মূল বক্তব্যকে আমরা আমাদের পছন্দমত কমবেশি করে অনুবাদ করি, অনুবাদের মধ্যে আমাদের অনেক মতামত ও ব্যাখ্যা সংযোগ করি এবং সবকিছুকে 'হাদীস' নামেই চালাই । অথচ সাহাবায়ে কেরাম সামান্য একটি শব্দের হেরফেরের কারণে গলদঘর্ম হয়ে যেতেন!

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদ ইসলামী ফিকহের অন্যতম উৎস । যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু বিধান দেওয়া হয় নি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সেগুলির বিধান নির্ধারণ করতে হয় । যেমন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন । কিন্তু কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি । বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন । অনুরূপভাবে মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কিছু বলা হয় নি । কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলির বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ ।

তবে কিয়াস বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো গাইবী বিষয় জানা যায় না বা ইবাদত বন্দেগি তৈরি করা যায় না । হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না । অনুরূপভাবে মসজিদুল হারামে সালাতের ১ লক্ষগুণ সাওয়াবের উপর কিয়াস করে তথায় যাকাত প্রদানের সাওয়াব ১ লক্ষগুণ বৃদ্ধি হবে বলে বলা যায় না । অথবা আমরা বলতে পারি না যে, রামাদানে যাকাত দিলে ৭০ গুণ সাওয়াব এবং রামাদানে মসজিদে হারামে যাকাত প্রদান করলে ৭০ লক্ষ গুণ সাওয়াব ।

এখানে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি । ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানগ্রন্থে জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে নিম্নের 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য

হাদীসটি সংকলন করেছেন। খুরাইম ইবনু ফাতিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় কোনো ব্যয় করেন তবে তার জন্য সাত শত গুণ সাওয়াব লেখা হয়।"[২৩৪]

ইমাম ইবনু মাজাহ সংকলিত একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

"যদি কেউ নিজে বাড়িতে অবস্থান করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দেয়, তবে সে প্রত্যেক দিরহামের জন্য ৭০০ দিরহাম (সাওয়াব) লাভ করবে। আর যদি সে নিজে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং এই জন্য খরচ করে তবে সে প্রত্যেক দিরহামের জন্য ৭ লক্ষ দিরহাম (সাওয়াব) লাভ করবে। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন: 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।"[২৩৫]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী ইবনু আবী ফুদাইক। তিনি বলেন, 'খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি হাসান বসরীর সূত্রে হাদীসটি বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ নামক এই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা তো দূরের কথা তার কোনো পরিচয়ও জানতে পারেন নি। এজন্য আল্লামা বূসীরী বলেন: "এই সনদটি দূর্বল; কারণ খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ অজ্ঞাত পরিচয়।"[২৩৬]

তাবিয়ী মুজাহিদ বলেন, আবূ হুরাইরা (রা) একবার সীমান্ত প্রহরায় নিয়েজিত ছিলেন। শত্রুর আগমন ঘটেছে মনে করে হটাৎ করে ডাকাডাকি করা হয়। এতে সকলেই ছুটে সমুদ্র উপকূলে চলে যান। তখন বলা হয় যে, কোনো অসুবিধা নেই। এতে সকলেই ফিরে আসলেন। শুধু আবূ হুরাইরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন একব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আবূ হুরাইরা, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

"আল্লাহর রাস্তায় এক মুহূর্ত অবস্থান করা লাইলাতুল কাদ্‌রে হজরে আসওয়াদের নিকট কিয়াম (সালাত আদায়) করার চেয়ে উত্তম।"[২৩৭]

উপরের হাদীসগুলিতে 'আল্লাহর পথে' ব্যয়, অবস্থান ইত্যাদির সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত যে, এখানে 'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধ বা জিহাদ বুঝানো হয়েছে। সকল মুহাদ্দিসই হাদীসগুলিকে 'জিহাদ' বা যুদ্ধের অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। এখানে যদি আমরা অনুবাদে 'আল্লাহর রাস্তায়' বলি, অথবা 'জিহাদ' বলি তবে হাদীসগুলির সঠিক অনুবাদ করা হবে।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে কা'ব ইবনু আজুরা (রা) বলেন, "একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট দিয়ে গমন করে। সাহাবীগণ লোকটি শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা দেখে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই লোকটি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) থাকত! তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"যদি লোকটি তার ছোটছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। যদি সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে। যদি সে নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।"[২৩৮]

এখানে অর্থ উপার্জনের জন্য কর্ম করাকে 'আল্লাহর রাস্তায় থাকা' বা 'আল্লাহর রাস্তায় চলা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে ইলম শিক্ষা, হজ্জ, সৎকাজে আদেশ, ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদে সালাতের অপেক্ষা করা, নিজের নফসকে আল্লাহর পথে রাখার চেষ্টা করা ইত্যাদি কর্মকে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা উপরের হাদীসগুলির সঠিক ও শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করার পরে বলতে পারি যে, বিভিন্ন হাদীসে হালাল উপার্জন, ইলম শিক্ষা, সৎকাজে আদেশ, হজ্জ আদায় ইত্যাদি কর্মকেও 'আল্লাহর রাস্তায় কর্ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করি যে, এইরূপ কর্মে রত মানুষেরাও এসকল হাদীসে উল্লিখিত 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সাওয়াব পেতে পারেন।

কিন্তু আমরা যদি সেরূপ না করে, সরাসরি বলি যে, 'হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হালাল উপার্জনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা হজরে আসওয়াদের নিকট লাইলাতুল কাদ্‌রের সালাত আদায়ের চেয়ে উত্তম', অথবা 'সৎ কাজে আদেশের জন্য র‍্যালি বা মিছিলে

একটি টাকা ব্যয় করলে ৭০ লক্ষ টাকার সাওয়াব পাওয়া যাবে' ... তবে তা মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এভাবে বলেন নি।

অনুরূপভাবে উপরের হাদীসগুলিতে আল্লাহর পথে যুদ্ধে ব্যায় করলে ৭০০ বা ৭ লক্ষ গুণ সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

"সালাত, সিয়াম ও যিক্র (এগুলির সাওয়াব) আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে সাত শত গুণ বর্ধিত হয়।"[২৩৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, এ হাদীসে স্পষ্ট অর্থ হলো, ঘরে বসে সালাত, সিয়াম ও যিক্র পালন করলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয়ের চেয়েও সাত শত গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। কেউ কেউ এখানে কিছু কথা উহ্য রয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসের অর্থ হলো 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায়' সালাত, সিয়াম ও যিকর পালন করলে সেগুলির সাওয়াব আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে খরচ করার চেয়ে সাত শত গুণ বর্ধিত হয়।[২৪০] এখানে আমাদের দায়িত্ব হলো হাদীসটি শাব্দিক অর্থ বলার পরে আমাদের ব্যাখ্যা পৃথকভাবে বলা।

এখানে বিভিন্নভাবে হাদীসের নামে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন কেউ গুণভাগ করে বলতে পারেন যে, 'জিহাদে যেয়ে অর্থ ব্যায় করলে ৭ লক্ষগুণ সাওয়াব। আর ঘরে বসে যিক্র করলে তার ৭ শত গুণ সাওয়াব। এর অর্থ হলো ঘরে বসে যিক্র করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সাওয়াব।' তিনি যদি উপরের হাদীসগুলির সঠিক অনুবাদ করার পরে পৃথকভাবে এই ব্যাখ্যা করেন তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি যদি এই কথাটিকে হাদীসের কথা বলে বুঝান তবে তিনি হাদীসের নামে মিথ্যা বললেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এভাবে বলেন নি। তিনি আল্লাহর পথে খরচের চেয়ে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি বলতে মুল সাওয়াবের চেয়ে ৭০০ গুণ, নাকি ৭০০ গুণের ৭০০ গুণ বুঝাচ্ছেন তাও বলেন নি। কাজেই তিনি যা স্পষ্ট করে বলেন নি, তা তাঁর নামে বলা যায় না। তবে পৃথকভাবে ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলেন যে, 'হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, হালাল উপার্জনের জন্য কর্মরত অবস্থায়, হজ্জের সফরে থাকা অবস্থায়, ইলম শিক্ষারত অবস্থায়, দাওয়াতে রত অবস্থায়, সৎকাজের আদেশের জন্য মিছিলে থাকা অবস্থায় বা নফস'কে শাসন করার অবস্থায় যিক্র করলে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়' তবে তিনিও হাদীসের নামে মিথ্যা বললেন।

হাদীসের নামে মিথ্যা বলার একটি প্রকরণ হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদের সাথে নিজের মনমত কিছু সংযোগ করা বা কিছু বাদ দিয়ে অনুবাদ করা। অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা বলেছেন তার ব্যাখ্যাকে হাদীসের অংশ বানিয়ে দেওয়া। আমাদের সমাজে আমরা প্রায় সকলেই এই অপরাধে লিপ্ত রয়েছি। আত্মশুদ্ধি, পীর-মুরিদী, দাওয়াত-তাবলীগ, রাজনীতিসহ মতভেদীয় বিভিন্ন মাসলা-মাসাইল-এর জন্য আমরা প্রত্যেক দলের ও মতের মানুষ কুরআন ও হাদীস থেকে দলীল প্রদান করি। এরূপ দলীল প্রদান খুবই স্বাভাবিক কর্ম ও ঈমানের দাবি। তবে সাধারণত আমরা আমাদের এই ব্যাখ্যাকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে চালাই।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'দলীয় রাজনীতি' করেন নি, অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পরিবর্তনের মত কিছু করেন নি। বর্তমানে গণতান্ত্রিক 'রাজনীতি' করছেন অনেক আলিম। সৎকাজে আদেশ, অৎসকাজে নিষেধ বা ইকামতে দ্বীনের একটি নতুন মাধ্যম হিসেবে একে গ্রহণ করা হয়। তবে যদি আমরা বলি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাজনীতি করেছেন', তবে শ্রোতা বা পাঠক 'রাজনীতি'র প্রচলিত অর্থ, অর্থাৎ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির কথাই বুঝবেন। আর এই রাজনীতি তিনি করেন নি। ফলে এভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে। এজন্য আমাদের উচিত তিনি কী করেছেন ও বলেছেন এবং আমরা কি ব্যাখ্যা করছি তা পৃথকভাবে বলা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দ্বীন প্রচার করেছেন আজীবন। দ্বীনের জন্য তিনি ও তাঁর অনেক সাহাবী চিরতরে বাড়িঘর ছেড়ে 'হিজরত' করেছেন। কিন্তু তিনি কখনোই দাওয়াতের জন্য সময় নির্ধারণ করে বিভিন্ন এলাকায় সফরে 'বাহির' হন নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেকে হিজরত না করলেও অন্তত কিছুদিনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যেয়ে দাওয়াতের কাজ করছেন। কিন্তু আমরা এ কর্মের জন্য যদি বলি যে, তিনি দাওয়াতের জন্য 'বাহির' হতেন, তবে পাঠক বা শ্রোতা 'নির্ধারিত সময়ের জন্য বাহির হওয়া' বুঝবেন। অথচ তিনি কখনোই এভাবে দাওয়াতের কাজ করেন নি। এতে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে।

যদি আমরা বলি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ মীলাদ মাহফিল করতেন' তবে অনুরূপভাবে তাঁর নামে মিথ্যা বলা হবে। কারণ তাঁরা কখনোই শুধু 'মীলাদ' আলোচনা বা উদযাপনের জন্য কোনো মাহফিল করেন নি। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্ম বিষয়ক দু চারিটি ঘটনা সাহাবীদেরকে বলেছেন। এ সকল হাদীস সাহাবীগণ তাবিয়ীগণকে বলেছেন। এগুলির জন্য তাঁরা কোনো মাহফিল করেন নি বা এগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করেন নি। আজ যদি কোনো মুসলিম 'আনুষঙ্গিক আনুষ্ঠানিকতা' ছাড়া অবিকল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে এ সকল হাদীস বর্ণনা করেন, তবে কেউই বলবেন না যে তিনি মীলাদ মাহফিল করছেন। এতে আমরা বুঝি যে, 'মীলাদ মাহফিল' বলতে যে অর্থ আমরা সকলেই বুঝি সেই কাজটি তিনি করেন নি।

এজন্য আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি করেছেন বা বলেছেন এবং তা থেকে আমরা কি বুঝলাম তা পৃথকভাবে বলা।

আমরা দেখেছি যে, একটি শব্দের হেরফেরের ভয়ে সাহাবীগণ কিভাবে সন্ত্রস্ত হয়েছেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

১. ৭. মিথ্যার পরিচয় ও চিহ্নিত করণ

১. ৭. ১. মিথ্যা চিহ্নিত করণের প্রধান উপায়

১. ৭. ১. ১. জালিয়াতের স্বীকৃতি

মিথ্যা হাদীসের পরিচিতি ও চিহ্নিত-করণের পদ্ধতি উল্লেখ করে আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: "হাদীস মাউদূ বা জাল কিনা তা জানা যায় জালিয়াতের স্বীকৃতির মাধ্যমে অথবা স্বীকৃতির পর্যায়ের কোনো কিছুর মাধ্যমে। মুহাদ্দিসগণ অনেক সময় বর্ণনাকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তার জালিয়াতি ধরতে পারেন। কখনো বা বর্ণিত হাদীসের অবস্থা দেখে জালিয়াতি ধরেন। অনেক বড়বড় হাদীস বানোনো হয়েছে যেগুলির ভাষা ও অর্থের দুর্বলতা সেগুলির জালিয়াতির সাক্ষ্য দেয়।"[২৪১]

আল্লামা নববী, ইরাকী, সাখাবী, সুয়ূতী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও মিথ্যা বা জাল হাদীস চিহ্নিত করার পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করেছেন।[২৪২]

১. ৭. ১. ২. সনদবিহীন বর্ণনা

সাধারণভাবে জালিয়াতের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এজন্য মুহাদ্দিসগণ মুলত এর উপর নির্ভর করেন না। তাঁরা সনদ বিচার বা তুলনামূলক নিরীক্ষা ও নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলির মাধ্যমে 'স্বীকৃতির পর্যায়ের তথ্যাদি' সংগ্রহ করে সেগুলির ভিত্তিতে জালিয়াতি নির্ণয় করেন। এজন্য নিরীক্ষাই হলো জালিয়াতি নির্ণয়ের প্রধান পন্থা। প্রধানত দুইটি কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে বানোয়াট, ভিত্তিহীন, জাল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেন: **প্রথমত,** হাদীসের সনদে মিথ্যাবাদীর অস্তিত্ব ও **দ্বিতীয়ত,** হাদীসের কোনো সনদ না থাকা।

মূলত, প্রথম কারণটিই জালিয়াতি নির্ধারণের মূল উপায়। দ্বিতীয় পর্যায়টি ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরে দেখা যায় নি। হিজরী ৪র্থ/৫ম শতক পর্যন্ত কোনো মানুষই সনদ ছাড়া কোনো হাদীস বলতেন না বা বললে কেউ তাকে কর্ণপাত করতেন না। এজন্য জঘন্য জালিয়াতকেও তার মিথ্যার জন্য একটি সনদ তৈরি করতে হতো। পরবর্তী যুগগুলিতে ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে কিছু কিছু কথা হাদীস নামে প্রচারিত হয় যেগুলি লোকমুখে প্রচারিত হলেও কোনো গ্রন্থে সনদ সহ পাওয়া যায় না। স্বভাবতই মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ একবাক্যে সেগুলিকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জাল বলে গণ্য করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত সকল প্রকারের মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কথাকে প্রতিহত করা এবং তাঁর নামে প্রচলিত কথার উৎস ও সূত্র নির্ণয় করার বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ছিলেন আপোষহীন। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম/৮ম হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত অগণিত জানবাজ মুহাদ্দিস তাঁদের জীবনপাত করেছেন এ সকল প্রচলিত 'কথা'র সূত্র বা উৎস সন্ধান করতে। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় অর্ধ সহস্র বৎসর ধরে লেখা অগণিত হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, জীবনী ইত্যাদি সকল প্রকার পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে তাঁরা এগুলি সন্ধান করেছেন। এই সন্ধানের পরেও যে সকল হাদীস নামে প্রচলিত কথার কোনো 'সনদ' তাঁরা পান নি সেগুলিকে তাঁরা 'ভিত্তিহীন', 'সূত্র বিহীন', বানোয়াট ও মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

১. ৭. ১. ৩. মিথ্যাবাদীর বর্ণনা

জাল বা মিথ্যা হাদীস চেনার অন্যতম উপায় হলো যে, হাদীসটির সনদে এমন একজন রাবী রয়েছেন, যাকে মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং একমাত্র তার মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হয় নি। এজন্য জাল বা মিথ্যা হাদীসের সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসগণ বলেছেন: (ما تفرد بروايته كذاب) "যে হাদীস শুধুমাত্র কোনো মিথ্যাবাদী রাবী বর্ণনা করেছে তা মাউযূ হাদীস।"

এই মিথ্যাবাদী রাবীর উস্তাদ বা পূর্ববর্তী রাবীগণ এবং তার ছাত্র বা পরবর্তী রাবীগণ বিশস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য হলেও কিছু আসে যায় না। মুহাদ্দিসগণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি দেখতে পান যে, এই ব্যক্তি উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেছে তাঁর অন্য কোনো ছাত্রই এই হাদীসটি বর্ণনা করছেন না বা অন্য কোনো সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয় নি, তাহলে তারা নিশ্চিত হন যে, এই মিথ্যাবাদী তার উস্তাদের নামে সনদটি বানিয়ে মিথ্যা হাদীসটি প্রচার করেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মুহাদ্দিস এই মিথ্যাবাদীর নিকট থেকে হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন নিরীক্ষা, পর্যালোচনা বা সংকলনের জন্য।

১. ৭. ১. ৩. ১. মিথ্যাবাদীর পরিচয়

যে সকল রাবী মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেন বলে মুহাদ্দিসগণ বুঝতে পেরেছেন তাদেরকে তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের বিশেষণে আখ্যায়িত করেছেন। কখনো তারা তাদেরকে স্পষ্টত মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কখনো বা তাদেরকে সরাসরি মিথ্যবাদী বা জালিয়াত না বলে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম তিন শতাব্দীর মুহাদ্দিসগণ সাধারণত সহজে কাউকে 'মিথ্যাবাদী' বলতে চাইতেন না। বিশেষত, যে ব্যক্তির বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেছেন বলে ধারণা করেছেন তার বিষয়ে কিছু 'নরম' শব্দ ব্যবহার করতেন। মিথ্যাবাদী রাবীর বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষাকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি:

১. সরাসরি মিথ্যাবাদী বা জালিয়াত বলে উল্লেখ করা

রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝাতে মুহাদ্দিসগন বলে থাকেন:

كاذب، كذاب، يكذب، دجال، وضاع، يضع، أكذب الناس، متهم...

মিথ্যাবাদী, জঘন্য মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বলে, দাজ্জাল, জঘন্য জালিয়াত, জাল করে, অভিযুক্ত, একটি হাদীস জাল করেছে, সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী, মিথ্যার একটি স্তম্ভ, অমুক মুহাদ্দিস তাকে জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন, অমুক তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন.... ইত্যাদি।

২. বাতিল হাদীস বা বালা মুসিবত বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করা

রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অন্যতম:

يحدث بالأباطيل، له أباطيل، له بلايا، مصائب، طامات، من بلاياه، مصائبه، من آفته، آفته فلان، خبيث الحديث، يسرق الحديث...

বাতিল হাদীস বর্ণনা করে, তার কিছু বাতিল হাদীস আছে, তার কিছু বালা-মুসিবত আছে, তার বর্ণিত বালা-মুসিবতের মধ্যে অমুক হাদীসটি,... এই হাদীসের বিপদ অমুক... খবীস হাদীস বর্ণনা করে... হাদীস চুরি করে....

৩. মুনকার (আপত্তিকর) বা মাতরূক (পরিত্যক্ত) বলে উল্লেখ করা

'মুনকার' অর্থ 'অস্বীকারকৃত', 'আপত্তিকৃত', 'অন্যায়', 'গর্হিত' ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অর্থে রাবীকে এবং হাদীসকে 'মুনকার' বলে অভিহিত করেছেন। অনেকে দুর্বল হাদীস বা দুর্বল রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। কেউ কেউ মিথ্যাবাদী রাবীকে 'মুনকার' বলেছেন। বিশেষত, ইমাম বুখারী রাবীগণের ত্রুটি উল্লেখের বিষয়ে অত্যন্ত 'নরম' শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি সরাসরি কাউকে 'মিথ্যাবাদী' বলে উল্লেখ করেন নি। বরং অন্য মুহাদ্দিসগণ যাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, তিনি তাকে 'মুনকার' বলেছেন, অথবা 'মাতরূক' বা 'মাসকূত আনহু', 'মানযূর ফীহ' অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত', 'তাঁর বিষয়ে আপত্তি রয়েছে' বলেছেন।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে প্রচলিত আরেকটি পরিভাষা: "মাতরূক", অর্থাৎ 'পরিত্যক্ত' বা 'পরিত্যাজ্য'। সাধারণত মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল রাবীকে 'পরিত্যক্ত' বলেন। তবে ইমাম বুখারী, নাসাঈ, দারাকুতনী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী রাবীকে 'মাতরূক' বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষত ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ কাউকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলার অর্থই হলো যে, তাঁরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করছেন।

অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসগণ যদি বলেন যে 'অমুকের হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়' তাহলেও তার মিথ্যাচারিতা বুঝা যায়।

৪. তার হাদীস কিছুই নয়, মূল্যহীন... বলে উল্লেখ করা

কেউ কেউ রাবীর মিথ্যাচারিতা বুঝাতে রাবী বা তার বর্ণিত হাদীসকে

ليس بشيء، لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسا....

'মূল্যহীন', 'কিছুই নয়', 'এক পয়সাতেও নেওয়া যায় না' বা অনুরূপ কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ীর কথা প্রনিধান যোগ্য। ইমাম ইসমাঈল ইবনু ইয়াহইয়া মুযানী (২৬৪ হি) বলেন, একদিন একব্যক্তি সম্পর্কে আমি বলি যে, লোকটি মিথ্যাবাদী। ইমাম শাফিয়ী (২০৪ হি) আমাকে বলেন, তুমি তোমরা কথাবার্তা পরিশিলীত কর। তুমি 'মিথ্যবাদী' (كذاب) না বলে বল, (حديثه ليس بشيء) 'তার হাদীস কিছুই নয়'।

৫. পতিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, অত্যন্ত দুর্বল ...ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা

কিছু শব্দ দ্বারা মুহাদ্দিসগণ রাবীর কঠিন দুর্বলতা ব্যক্ত করেছেন। যেমন,

ساقط، واه، واه بمرة، هالك، ذاهب الحديث...

পতিত, অত্যন্ত দুর্বল, একেবারেই বাতিল, ধ্বংসগ্রস্থ, তার হাদীস চলে গেছে, উড়ে গেছে... ইত্যাদি। এ সকল রাবীর হাদীস ইচ্ছাকৃত মিথ্যা না হলেও অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। অনেক মুহাদ্দিস এই পর্যায়ের রাবীর হাদীসকেও জাল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন।

১. ৭. ১. ৩. ২. মিথ্যা হাদীসের বিভিন্ন নাম

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে জাল বা মিথ্যা হাদীসকে 'মাউযূ' (**الموضوع**) বলা হলেও, জাল হাদীস বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণের আরো কিছু প্রচলিত পরিভাষা রয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. বাতিল (باطل)

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা হাদীসকে 'মাউযূ' বা জাল না বলে 'বাতিল' বলেন। বিশেষত, অনেক মুহাদ্দিস রাবীর ইচ্ছাকৃত মিথ্যার বিষয়ে নিশ্চিত না হলে হাদীসকে 'মাউযূ' বলতে চান না। এ ক্ষেত্রে তারা 'বাতিল' শব্দ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল, তবে রাবী ইচ্ছা করে তা জাল করেছে কিনা তা নিশ্চিত নয়।

২. সহীহ নয় (لا يصح)

জাল হাদীস বুঝানোর জন্য মুহাদ্দিসগণের অন্যতম পরিভাষা 'হাদীসটি সহীহ নয়'। এই কথাটি কেউ ভুল বুঝেন। তাঁরা ভাবেন, হাদীসটি সহীহ না হলে হয়ত হাসান বা যয়ীফ হবে। আসলে বিষয়টি তেমন নয়। জাল হাদীস আলোচনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যখন বলেন যে, হাদীসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ নয়, তখন তাঁরা বুঝান যে, হাদীসটি অশুদ্ধ, বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে ফিকহী আলোচনায় কখনো কখনো

তাঁরা 'সহীহ্ নয়' বলতে 'যয়ীফ' বুঝিয়ে থাকেন।

৩. কোনো ভিত্তি নেই, কোনো সূত্র নেই (ليس له أصل، لا أصل له)

মুহাদ্দিসগণ জাল ও মিথ্যা হাদীস বুঝাতে অনেক সময় বলেন, হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই, সূত্র নেই। এদ্বারা তাঁরা সাধারণভাবে বুঝান যে, এই হাদীসটি জনমুখে প্রচলিত একটি সনদ বিহীন বাক্য মাত্র, এর সহীহ্, যয়ীফ বা মাউদূ কোনো প্রকারের কোনো সনদ বা সূত্র নেই এবং কোনো গ্রন্থে তা সনদ সহ পাওয়া যায় না। কখনো কখনো জাল বা বাতিল সনদের হাদীসকেও তাঁরা এভাবে 'এর কোনো ভিত্তি নেই' বলে আখ্যায়িত করেন।

৪. জানি না, কোথাও দেখিনি, পাই নি (لا أعرفه، لم أره، لم أجده)

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীস সংকলিত হয়ে যাওয়ার পরে, কোনো প্রচলিত বাক্য যদি সকল প্রকারের অনুসন্ধানের পরেও কোনো গ্রন্থে সনদ-সহ না পাওয়া যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে, কথাটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের জীবন হাদীস সংগ্রহ, অনুসন্ধান, যাচাই ও নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কেউ যদি বলেন, এই হাদীসটি আমি চিনি না, জানি না, কোথাও দেখি নি, কোথাও পাই নি, পরিচিত নয়..., তবে তাঁর কথাটি প্রমাণ করবে যে, এই হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

৫. গরীব (অপরিচিত), অত্যন্ত গরীব (غريب، غريب جداً)

গরীব অর্থ প্রবাসী, অপরিচিত বা অনাত্মীয়। যে হাদীস কোনো পর্যায়ে শুধু একজন রাবী বর্ণনা করেছেন মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় তাকে 'গরীব' হাদীস বলা হয়। এ পরিভাষা অনুসারে গরীব হাদীস সহীহ্ হতে পারে, যয়ীফও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল হাদীস বুঝাতে এ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। অন্যন্য মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের বিষয়ে বলেছেন 'জানি না, ভিত্তিহীন..., সেগুলির বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, 'গরীব' বা 'গরীবুন জিদ্দান' অর্থাৎ অপরিচিত বা অত্যন্ত অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী, খতীব বাগদাদী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস এভাবে এই পরিভাষাটি কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন। এই পরিভাষাটি বেশি ব্যবহার করেছেন ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফাকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ যাইলায়ী (৭৬২হি)।[২৪৩]

১. ৭. ২. ভাষা, অর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিরীক্ষা

বর্ণনাকারীর বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাইয়ের পাশাপাশি মুহাদ্দিসগণ বর্ণনার অর্থও যাচাই করেছেন। কুরআন কারীম, সুপ্রসিদ্ধ সুন্নাত, বুদ্ধি-বিবেক, ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠিত সত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ কোনো বক্তব্য তাঁরা 'হাদীস' হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

হাদীসের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষাও অভিজ্ঞ নাকিদ মুহাদ্দিসগণকে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা বুঝতে সাহায্য করে। আজীবনের হাদীস চর্চার আলোকে তাঁরা কোনো হাদীসের ভাষা, অর্থ বা বিষয়বস্তু দেখেই অনুভব করতে পারেন যে, হাদীসটি বানোয়াট। বিষয়টি খুব কঠিন নয়। যে কোনো বিষয়ের গবেষক সেই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। একজন নজরুল বিশেষজ্ঞকে পরবর্তী যুগের কোনো কবির কবিতা নিয়ে নজরুলের বলে চালালে তা ধরে ফেলবেন। কবিতার ভাব ও ভাষা দেখে তিনি প্রথমেই বলে উঠবেন, এ তো নজরুলের কবিতা হতে পারে না! কোথায় পেয়েছেন এই কবিতা? কীভাবে??

অনুরূপভাবে যে কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট গবেষক সেই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভুতি লাভ করেন, যা দিয়ে তিনি সে বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারের যোগ্যতা লাভ করেন।

হাদীস শাস্ত্রের প্রাজ্ঞ ইমামগণ, যাঁরা তাঁদের পুরো জীবন হাদীস শিক্ষা, মুখস্থ, তুলনা, নিরীক্ষা ও শিক্ষাদান করে কাটিয়েছেন তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, পুরস্কার বর্ণনা, শাস্তি বর্ণনা, শব্দ চয়ন, বিষয়বস্তু, ভাব, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অনুভুতি লাভ করেন। এর আলোকে তাঁরা তাঁর নামে প্রচারিত কোনো বাক্য বা 'হাদীস' শুনলে সংঙ্গে সংঙ্গে অনুভব করতে পারেন যে, এই বিষয়, এই ভাষা, এই শব্দ বা এই অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হতে পারে অথবা পারে না। এর পাশাপাশি তাঁরা অন্যান্য নিরীক্ষার মাধ্যমে এর জালিয়াতি নিশ্চিত করেন।

মুহাদ্দিসগণের হাদীস সমালোচনা সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারে আমরা অগণিত উদাহরণ দেখতে পাই যে, হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে গণ্য না হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ভাষা, ভাব ও অর্থের কারণে মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে 'পরিত্যক্ত', জাল বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।

মুহাদ্দিসগণের এ বিষয়ক কর্মধারা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এক্ষেত্রে তাঁরা সাহাবীগণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, কোনো হাদীসের বিচারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিবেচ্য হলো, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে প্রমাণিত কিনা তা যাচাই করা। প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করতে হবে, অপ্রমাণিত হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং কোনোরূপ দ্বিধা থাকলে তা অতিরিক্ত নিরীক্ষা করতে হবে। এভাবে ভাষা ও অর্থগত নিরীক্ষায় হাদীসের তিনটি পর্যায় রয়েছে:

১. ৭. ২. ১. মূল নিরীক্ষায় সহীহ বলে প্রমাণিত

যদি বর্ণনাকারীগণের সাক্ষ্য ও সকল প্রাসঙ্গিক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, কথাটি 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী, কর্ম বা অনুমোদন, তবে তা 'ওহীর' নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানেও 'শুযূয' ও 'ইল্লাতের' বিচার করতে হবে, যেখানে ভাষা ও অর্থগত নিরীক্ষার প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত, এই পর্যায়ের প্রমাণিত কোনো হাদীসের মধ্যে ভাষাগত বা অর্থগত দুর্বলতা বা অসংলগ্নতা পাওয়া যায় না। কারণ

শব্দগত বা অর্থগত ভাবে অসংলগ্ন ‘হাদীস’ বর্ণনা করা, অথবা বুদ্ধি, বিবেক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত কোনো ‘হাদীস’ বর্ণনা করাকেই ‘রাবী’র দুর্বলতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অনেক সৎ ও প্রসিদ্ধ রাবী এইরূপ হাদীস বর্ণনা করার ফলে দুর্বল বলে বিবেচিত হয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এজন্য সনদ ও সাধারণ অর্থ নিরীক্ষায় (৫টি শর্ত পূরণকারী) ‘সহীহ’ বলে প্রমানিত কোনো হাদীসের মধ্যে ভাষাগত ও অর্থগত দুর্বলতা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘বিবেক’, ‘বুদ্ধি’ বা ‘আকল’-এর নির্দেশনা আপেক্ষিক। একজন মানুষ যাকে ‘বিবেক বিরোধী’ বলে গণ্য করছেন, অন্যজন তাকে ‘বিবেক’ বা বুদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করতে পারেন। এজন্য মুসলিম উম্মাহর মূলনীতি হলো, কোনো কিছু ‘ওহী’ বলে প্রমাণিত হলে তা মেনে নেওয়া। যেমন কুরআন কারীমে ‘চুরির শাস্তি হিসেবে হস্তকর্তনের’ নির্দেশ রয়েছে। বিষয়টি কারো কাছে ‘বিবেক’ বিরুদ্ধ মনে হতে পারে। কিন্তু মুমিন কখনোই এই যুক্তিতে এই বিধানটি প্রত্যাখ্যান করেন না। বরং বুদ্ধি, বিবেক ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এই বিধানের যৌক্তিকতা বুঝতে চেষ্টা করেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও মুমিনগণ একইরূপ মূলনীতি অনুসরণ করেন।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রেও মুসলিম উম্মাহ একইরূপ মূলনীতি অনুসরণ করেন। স্বভাবতই কুরআন ও হাদীসে বিজ্ঞান বা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় নি। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে এ জাতীয় কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। ‘ওহী’ বলে প্রমাণিত কোনো বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ যদি কোনো ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিপরীত হয়, তবে তাঁরা কখনোই সেই বক্তব্যকে মিথ্যা বা ভুল বলে মনে করেন না। যেমন কুরআন কারীমের কোনো কোনো আয়াতের ব্যাহ্যিক অর্থ দ্বারা মনে হতে পারে যে, পৃথিবী সমতল বা সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত। এক্ষেত্রে মুমিনগণ এ সকল বক্তব্যের সঠিক অর্থ বুঝার চেষ্টা করেন। হাদীসের ক্ষেত্রেও একই নীতি তাঁরা অনুসরণ করেন।

চতুর্থত, নিরীক্ষায় প্রমাণিত কোনো ‘সহীহ হাদীসের’ সাথে অন্য কোনো সহীহ হাদীস বা কুরআনের আয়াতের মূলত কোনো বৈপরীত্য ঘটে না। বাহ্যত কোনো বৈপরীত্য দেখা দিলে মুহাদ্দিসগণ ঐতিহাসিক ও পারিপর্শিক তথ্যাদির ভিত্তিতে ‘ডকুমেন্টারী’ প্রমাণের মাধ্যমে সেই বৈপরীত্য সমাধান করেছেন। কিন্তু কখনোই ঢালাওভাবে শুধু বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে কোনো প্রমাণিত তথ্যকে অগ্রাহ্য করেন নি। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন্ স্থান থেকে হজ্জের ‘তালবিয়া’ পাঠ শুরু করেন সে বিষয়ে একাধিক ‘সহীহ’ বর্ণনা রয়েছে, যেগুলি বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। মুহাদ্দিসগণ এই বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমাধানের জন্য ঐতিহাসিক ও পারিপার্শিক তথ্যাদি বিবেচনা করেছেন, যা আমরা এই পুস্তকের প্রথমে আলোচনা করেছি।

এভাবে কোনো হাদীস ‘ডকুমেন্টারী’ নিরীক্ষায় ‘ওহী’ বলে প্রমাণিত হওয়ার পরেও যদি বাহ্যত অন্য কোনো হাদীস বা আয়াতের সাথে তার বৈপরীত্য দেখা যায়, তবে মুহাদ্দিসগণ সেই বৈপরীত্যের ইতিহাস, কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান করেছেন ও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১. ৭. ২. ২. মূল নিরীক্ষায় ‘মিথ্যা’ বলে প্রমাণিত

যদি কোনো কথা বা বক্তব্যের বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী নয়, বরং বর্ণনাকারী ভুলে বা ইচ্ছায় তাঁর নামে তা বলেছেন, তবে সেক্ষেত্রে সেই বক্তব্যটির ভাষা বা অর্থ বিবেচনা করা হয় না। কোনোরূপ বিবেচনা ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। অধিকাংশ জাল হাদীসই এই পর্যায়ের। জালিয়াতগণ সাধ্যমত সুন্দর অর্থেই হাদীস বানাতে চেষ্টা করেন।

১. ৭. ২. ৩. মূল নিরীক্ষায় দুর্বল বলে পরিলক্ষিত

যদি প্রমাণিত হয় যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও সত্যপরায়ন, তবে তিনি তাঁর বর্ণনায় কিছু ভুল করতেন, তবে সেক্ষেত্রে তার দুর্বলতার মাত্রা অনুসারে বর্ণিত হাদীসটিকে হাসান বা যয়ীফ বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া কোনো বর্ণনাকারীর পরিচয় না জানা না গেলেও হাদীসটি সাধারণভাবে দুর্বল বলে গণ্য করা হয়। সর্বোপরি যদি দেখা যায় যে বর্ণনাকারী সৎ ও সত্যপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ভট অর্থের ‘হাদীস’ বর্ণনা করছেন, যা অন্য কেউ বর্ণনা করছেন না সেক্ষেত্রেও তাঁর বর্ণিত হাদীস দুর্বল বলে গণ্য। এই পর্যায়ের অনেক হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ শব্দ ও অর্থগত নিরীক্ষার মাধ্যমে ‘জাল’ বলে গণ্য করেছেন। জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এরূপ অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলির সনদে কোনো মিথ্যায় অভিযুক্ত না থাকলেও সেগুলিকে জাল বলা হয়েছে। আবার এই জাতীয় কিছু হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। বাহ্যিক সনদের কারণে কেউ কেউ তা দুর্বল বা ‘হাসান’ বললেও, অর্থের কারণে অন্যেরা তা জাল বলে গণ্য করেছেন। এখানে দুইটি উদাহরণ উল্লেখ করছি:

(১) আনাস (রা)-এর সূত্রে ‘আরশ’-এর বর্ণনায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আনাস বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলেন আমি জিবরাঈলকে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি মিকাঈলকে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন আমি ইসরাফীলকে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি রাফী-কে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন আমি লাওহে মাহফূযকে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন, আমি ‘কলম’-কে মহান প্রভুর ‘আরশ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন: আরশের ৩ লক্ষ ৬০ হাজার খুটি আছে..... ইত্যাদি...।

হাদীসটির সনদে ‘মুহাম্মাদ ইবনু নাসর’ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন, যাকে স্পষ্টত ‘মিথ্যাবাদী’ বলা হয় নি। তবে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল। ইবনু হাজার বলেন: “এ হাদীসটির মিথ্যাচার সুস্পষ্ট। হাদীস সাহিত্যে যার কিছুটা দখল আছে তিনি কখনোই এ বিষয়ে দ্বিমত করবেন না।”[২৪৪]

(২) তাবি-তাবিয়ী ফুদাইল ইবনু মারযূক (১৬০হি) বলেছেন, ইবরাহীম ইবনু হাসান থেকে, ফাতিমা বিনতুল হুসাইন ইবনু আলী (১০০ হি) থেকে, আসমা বিনতু উমাইস (রা) থেকে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। এসময়ে তাঁর মস্তক ছিল আলীর (রা) কোলে। এজন্য আলী আসরের সালাত আদায় করতে পারেন নি। এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে যায়। তিনি আলীকে বলেন: তুমি কি সালাত আদায় করেছ? তিনি বলেন না। তখন তিনি বলেন: হে আল্লাহ, আলী যদি আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যে থেকে থাকেন তবে তাঁর জন্য আপনি সূর্য ফিরিয়ে দিন। আসমা বলেন: আমি দেখলাম, সূর্য ডুবে গেল। এরপর ডুবে যাওয়ার পরে আবার তা উদিত হলো।"

এই সনদে আসমা বিনতু উমাইস প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী। ফাতিমা বিনতুল হুসাইন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। ফুদাইল ইবনু মারযূক সত্যপরায়ন রাবী, তবে তিনি ভুল করতেন। ইবরাহীম ইবনু হাসান কিছুটা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে যেহেতু কেউ তাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে স্পষ্টত কিছু বলেন নি, এজন্য ইবনু হিব্বান তাঁকে 'গ্রহণযোগ্য' বলে গণ্য করেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, সনদ বিচারে হাদীসটি 'হাসান' বলে গণ্য হতে পারে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বাহ্যিক সনদের দিকে তাকিয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইবনু তাইমিয়া, ইবনু কাসীর, যাহাবী ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির 'মতন' বা 'মূলবক্তব্য' 'জাল' বলে গণ্য করেছেন।

তাঁদের বিস্তারিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরে আবার উদিত হওয়া একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা। আর মানবীয় প্রকৃতি 'অস্বাভাবিক' ও 'অলৌকিক' ঘটনা বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহ বোধ করে। এজন্য স্বভাবতই আশা করা যায় যে, অন্ত ত বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হবে। কিন্তু একমাত্র আসমা বিনতু উমাইস (রা) ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী থেকে তা বর্ণিত হয় নি। এইরূপ ঘটনা সূর্যগ্রহণের চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়। আমরা দেখি যে, সূর্যগ্রহণের ঘটনা অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, অথচ এই ঘটনাটি এই একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত।

এরপর আসমা (রা)-এর ২০ জনেরও অধিক প্রসিদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন। এইরূপ একটি অত্যাশ্চার্য ঘটনা তাঁর অধিকাংশ ছাত্রই বর্ণনা করবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু বস্তুত তা ঘটে নি। শুধুমাত্র ফাতেমার সনদে তা বর্ণিত হচ্ছে। ফাতেমার ছাত্র বলে উল্লিখিত 'ইবরাহীম ইবনু হাসান' অনেকটা অজ্ঞাত পরিচয়। তিনি ফাতেমার নিকট থেকে আদৌ কিছু শুনেছেন কিনা তা জানা যায় না। অনুরূপ আরেকটি সনদেও ঘটনাটি আসমা বিনতু উমাইস থেকে বর্ণিত। সেই সনদেও দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী ও একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এতবড় একটি ঘটনা এভাবে দুই-একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বলবেন না তা ধারণা করা কষ্টকর।

অন্যদিকে এই ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার সাথে বাহ্যত সাংঘর্ষিক। খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও আলী (রা) সহ অন্যান্য সকল সাহাবী আসরের সালাত আদায় করতে ব্যর্থ হন। সুর্যাস্তের পরে তাঁরা 'কাযা' সালাত আদায় করেন। অন্যদিন ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সহ সাহাবীগণের ফজরের সালাত এভাবে কাযা হয়। এই দুই দিনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আলী (রা)-সহ সাহাবীগণের জন্য সূর্যকে ফেরত আনা বা নেওয়া হলো না, অথচ এই ঘটনায় শুধু আলীর জন্য তা করা হবে কেন? আর ওযরের কারণে সালাতের সময় নষ্ট হলে তো কোনো অসুবিধা হয় না। এছাড়া আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে জামাতে সালাত আদায় করবেন না, আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক/দেড় ঘন্টা যাবত ওহী নাযিল হবে ইত্যাদি বিষয় স্বাভাবিক মনে হয় না।

এই জাতীয় আরো অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে তাঁরা বলেন যে, এই 'মতন'টি ভুল বা বানোয়াট। এ সকল অজ্ঞাত পরিচয় রাবীগণের মধ্যে কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল করেছেন।[২৪৫]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভাষা, অর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি অত্যন্ত যৌক্তিক ও সুক্ষ্ম। যে কোনো বিচারালয়ে বিচারক বুদ্ধিবৃত্তিক ও পরিপার্শ্বিক প্রমাণকে ডকুমেন্টারী প্রমাণের পরে বিবেচনা করেন। কোনো অভিযুক্তের বিষয়ে অপরাধের মোটিভ ও যৌক্তিকতা স্পষ্টভাবে দেখতে পারলেও পাশাপাশি প্রমাণাদি না থাকলে তিনি শুধুমাত্র মোটিভ বিচার করে শাস্তি দেন না। অনুরূপভাবে কোনো অভিযুক্তের বিষয়ে যদি তিনি অনুভব করেন যে, তার জন্য অপরাধ করার কোনো যৌক্তিক বা বিবেক সংগত কারণ নেই, কিন্তু সকল ডকুমেন্ট ও সাক্ষ্য সুস্পষ্টরূপে তাকে অপরাধী বলে নির্দেশ করছে, তখন তিনি তাকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। মুহাদ্দিসগণও এভাবে সর্বপ্রথম 'ডকুমেন্টারী' প্রমাণগুলির নিরীক্ষা করেছেন এবং তারপর ভাষা, অর্থ, ও তথ্য বিবেচনা করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে শব্দ ও অর্থগত নিরীক্ষার কিছু মূলনীতি আমরা দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ।

১. ৭. ৩. মিথ্যা-হাদীস চিহ্নিতকরণে মতভেদ

জাল হাদীস চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই মতভেদ সীমিত এবং খুবই স্বাভাবিক। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হাদীসের নির্ভুলতা যাচাই করা অবিকল বিচারালয়ে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণের নির্ভুলতা প্রমাণ করার মতই একটি কর্ম। বিভিন্ন 'কেসে' আমরা বিচারকগণের মতভেদ দেখতে পাই। এর অর্থ এই নয় যে, বিচার কার্য একটি অনিয়ন্ত্রিত কর্ম এবং বিচারকগণ ইচ্ছা মাফিক মানুষদের ফাঁসি দেন বা একজনের সম্পত্তি অন্যকে প্রদান করেন। প্রকৃত বিষয় হলো, সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিচারকগণ মতভেদ করতে পারেন। হাদীসের নির্ভুলতা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা

দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিছু সংখ্যক হাদীসের বিষয়ে তাঁদের মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: ১. পরিভাষাগত মতভেদ ও ২. প্রকৃত মতভেদ।

১. ৭. ৩. ১. মতভেদ কিন্তু মতভেদ নয়

অনেক সময় মুহাদ্দিসগণের মতভেদ একান্তই পরিভাষাগত। উপরে আমরা দেখেছি যে, মিথ্যাবাদী বা জালিয়াত রাবীর পরিচয় জ্ঞাপনে এবং জাল হাদীস চিহ্নিতকরণে মুহাদ্দিসগণ একাধিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে কখনো কখনো দেখা যায় যে, একটি হাদীসকে একজন মুহাদ্দিস 'মুনকার' বা 'বাতিল' বলছেন এবং অন্যজন তাকে 'মাউযূ' (মাউদূ) বা জাল বলছেন।

এইরূপ একটি পরিভাষাগত বিষয় 'যয়ীফ' শব্দের ব্যবহার। ইলমু হাদীসের পরিভাষায় সকল প্রকার অগ্রহণযোগ্য হাদীসকেই 'যয়ীফ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। যয়ীফ হাদীসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হলো মাউযূ বা জাল হাদীস। কোনো হাদীসকে যয়ীফ বলে আখ্যায়িত করার অর্থ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তা জাল হতে পারে নাও হতে পারে।

আমরা দেখতে পাই যে, অনেক মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত বৃহদাকার গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে অনেক হাদীস 'দুর্বল' বা 'যয়ীফ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ সকল দুর্বল হাদীসের কোনো হাদীসকে অন্যান্য মুহাদ্দিস 'মাউযূ' বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি বাহ্যত মতভেদ বলে মনে হলেও তা প্রকৃত মতভেদ নয়। কোনো মুহাদ্দিস যদি বলেন যে, হাদীসটি যয়ীফ, তবে মাউযূ নয়, এবং অন্য মুহাদ্দিস বলেন যে, হাদীসটি মাউযূ, তবে তা মতভেদ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে সকল মুহাদ্দিস সাধারণত 'মাউযূ' পরিভাষা ব্যবহার করেন নি, বরং সকল 'অনির্ভরযোগ্য' হাদীসকে সংক্ষেপে 'দুর্বল' বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি মতভেদ বলে গণ্য নয়।

১. ৭. ৩. ২. প্রকৃত মতভেদ

কিছু হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের প্রকৃত মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ 'যয়ীফ বনাম মাউযূ'। কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, হাদীসটি মাউযূ নয় বরং যয়ীফ, পক্ষান্তরে কেউ তাকে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন। অল্প কিছু হাদীসের বিষয়ে 'সহীহ বনাম মাউযূ' মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোনো মুহাদ্দিস একটি হাদীসকে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু অন্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সকল মতভেদের ক্ষেত্রে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো একজনের মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। বিষয়টি অনেকটা বিচারের রায়ের ক্ষেত্রে মতভেদ ও আপীলের মত।

১. ৭. ৩. ৩. মতভেদের কারণ

কয়েকটি কারণে এই জাতীয় মতভেদ ঘটে থাকে:

১. ৭. ৩. ৩. ১. সনদের বিভিন্নতা

অনেক সময় একজন মুহাদ্দিস এক বা একাধিক সনদের ভিত্তিতে একটি হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেন। তিনি জানতে পারেন নি যে, হাদীসটি অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য একজন মুহাদ্দিস অন্য এক বা একাধিক সনদের কারণে হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন।

১. ৭. ৩. ৩. ২. রাবীর মান নির্ধারণে মতভেদ

'রাবী'-র বর্ণিত হাদীসগুলির তুলনামূলক নিরীক্ষা হাদীসের বিশুদ্ধতা বিচারের মূল মাপকাঠি। আর এ কারণেই রাবীর বর্ণনা বিচারে কিছু মতভেদ হয়। এদিক থেকে আমরা রাবীগণকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি। (১) পূর্ণ গ্রহণযোগ্য রাবীগণ, যাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সকল নিরীক্ষক মুহাদ্দিস একমত, (২) পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য রাবীগণ, যাদের দুর্বলতা বা জালিয়াতির বিষয়ে নিরীক্ষক মুহাদ্দিসগণ একমত এবং (৩) মতভেদীয় রাবীগণ, যাদের গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ধারণে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন।

যে সকল রাবী কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, তাঁদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশকিছু উল্টাপাল্টা ও ভুল বর্ণনা রয়েছে আবার কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনাও রয়েছে এদের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো মতভেদ করেছেন। তাদের বর্ণিত হাদীসের মধ্যে শুদ্ধ ও ভুল বর্ণনার হার, কারণ ও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ মাঝে মাঝে মতভেদ করেছেন।

কখনোবা কোনো মুহাদ্দিস আংশিক তথ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিয়েছেন, যা অন্য মুহাদ্দিস সামগ্রিক তথ্যের উপর নির্ভর করে বাতিল করেছেন। যেমন একজন রাবীর কিছু হাদীস বিশুদ্ধ বা ভুল দেখে একজন মুহাদ্দিস তাকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন। অন্য মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত সকল হাদীস নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্য বিধান প্রদান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ সকল মতভেদের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ পর্যালোচনা করেছেন এবং মতামত প্রদানকারীগণের বিভিন্ন মতামতের ভারসাম্য, বিচক্ষণতা, গভীরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মতবিরোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালা নির্ণয় করেছেন।[২৪৬]

১. ৭. ৩. ৩. ৩. মুহাদ্দিসের নীতিগত বা পদ্ধতিগত মতভেদ

কখনো কখনো রাবী এবং হাদীসের বিধান প্রদানে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য দেখা যায়। কেউ একটু বেশি ঢিলেমি ও কেউ বেশি কড়াকড়ি করেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এ সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে তাদের মতভেদ নিরসন করেছেন। যেমন,

চতুর্থ শতকের মুহাদ্দিস ইবনু হিব্বান আবু হাতিম মুহাম্মাদ আল-বুসতী (৩৫৪ হি), ৬ষ্ঠ শতকের মুহাদ্দিস ইবনুল জাওযী আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি) ভিত্তিহীন কঠোরতার জন্য অভিযুক্ত। পক্ষান্তরে তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ ইব্নু ঈসা (২৭৯ হি), ৪র্থ-৫ম শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), ১০ম শতকের মুহাদ্দিস জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি) প্রমুখ ঢিলেমির জন্য পরিচিতি লাভ করেছেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

(১) ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযীর কড়াকড়ি-জাত ভুলের উদাহরণ। দ্বিতীয় হিজরী শতকের রাবী আফলাহ ইবনু সাঈদ আনসারী (১৫৬ হি) বলেন, আমাদেরকে উম্মু সালামার গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনু রাফি বলেছেন, আমি আবূ হুরাইরাকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ

"তোমার জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে খুব সম্ভব তুমি এমন কিছু মানুষ দেখতে পাবে যাদের হাতে গরুর লেজের মত (বেত বা ছড়ি) থাকবে। (নিরীহ মানুষদের সন্ত্রস্ত করবে বা আঘাত করবে।) তারা সকালেও আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকবে এবং বিকালেও আল্লাহর ক্রোধের মধ্যেই থাকবে।"

এ হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযী বানোয়াট ও জাল বলে গণ্য করেছেন। তাদের দাবি, এই হাদীসের বর্ণনাকারী আফলাহ ইবনু সাঈদ হাদীস উল্টোপাল্টা বলতেন, জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামতের আলোকে দেখেছেন যে, ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযীর এ মত সম্পূর্ণ ভুল। কোনো মুহাদ্দিসই কখনো বলেন নি যে, আফলাহ জাল হাদীস বর্ণনা করেন। এমনকি কেউ বলেন নি যে, আফলাহ দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য। মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ (২৩০ হি), ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩ হি), আবূ হাতিম রাযী (২৭৭ হি), নাসাঈ (৩০৪ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে তাকে নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনু হিব্বান বা ইবনুল জাওযী কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি যে, আফলাহ অন্য রাবীদের বিপরীত উল্টোপাল্টা কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন। সর্বোপরি এই হাদীসটি আফলাহ ছাড়াও অন্য নির্ভরযোগ্য রাবী আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ এবং ইবনু হিব্বান ও ইবনুল জাওযীর সিদ্ধান্ত ভুল বলে প্রমাণিত।[২৪৭]

(২) ইমাম তিরমিযীর ঢিলেমি-জাত ভুলের উদাহরণ। তিনি বলেন: "আমাদেরকে মুসলিম ইবনু আমর আবু আমর আল-হাযযা মাদানী বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু নাফি' আস-সাইগ বলেন, তিনি কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে তার পিতা থেকে তার দাদা (আমর ইবনু আউফ) থেকে বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

"নবী আকরাম ﷺ দুই ঈদে প্রথম রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৭ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কুরআন পাঠের পূর্বে ৫ তাকবীর বলেছেন।"[২৪৮]

হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন :

حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

"কাসীরের দাদার হাদীসটি হাসান (গ্রহণযোগ্য)। এই বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে এই হাদীসটি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য।[২৪৯]

এভাবে তিনি এ হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয়, তার মতে এ বিষয়ে এইটিই হলো সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হাদীস।

মুহাদ্দিসগণ ইমাম তিরমিযীর এই মতের প্রবল বিরোধিতা করেছেন। কারণ, মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের বর্ণনাকারী কাসীর ইবনু আব্দুল্লাহকে অত্যন্ত দুর্বল "রাবী" বলে গণ্য করেছেন। উপরন্তু অনেকেই তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন: সে অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন: সে দুর্বল। ইমাম আবু দাউদ বলেন: লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম শাফিয়ী বলেন: সে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদীদের একজন। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন: সে পরিত্যক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন: সে তার পিতা থেকে দাদা থেকে একটি মিথ্যা হাদীসের পুস্তিকা বর্ণনা করেছে। শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজন ছাড়া কোনো গ্রন্থে সে সকল হাদীস উল্লেখ করাও জায়েয নয়। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন: এই ব্যক্তি যে দুর্বল সে বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য হয়েছে।[২৫০] এজন্য আবুল খাত্তাব উমর ইবনু হাসান ইবনু দাহিয়া (৬৩৩ হি) বলেন:

"وَكَمْ حَسَّنَ التِّرْمَذِيُّ فِيْ كِتَابِهِ مِنْ أَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَأَسَانِيْدَ وَاهِيَةٍ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيْثُ"

"ইমাম তিরমিযী তার গ্রন্থে কত যে মাউযূ বা বানোয়াট ও অত্যন্ত দুর্বল সনদকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ হাদীসটিও সেগুলির একটি।"[২৫১]

(৩) ইমাম হাকিম-এর মুসতাদরাক থেকে উদাহরণ। হাদীসকে সহীহ বলার ক্ষেত্রে হাকিমের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। তিনি তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে অনেক জাল হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। একটি উদাহরণ দেখুন:

হাকিম বলেন, আমাদেরকে আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উকবা শাইবানী কুফায় অবস্থানকালে বলেছেন, আমাদেরকে কাযী ইবরাহীম ইবনু আবিল আনবাস বলেছেন, আমাদেরকে সাঈদ ইবনু উসমান আল-খার্রায বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহমান ইবনু সাঈদ আল-মুয়ায্যিন বলেছেন, আমাদেরকে কাতার ইবনু খালীফাহ বলেছেন, আবুত তুফাইল থেকে, তিনি আলী ও আম্মার (রা) থেকে: তাঁরা উভয়ে বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ فِيْ الْمَكْتُوْبَاتِ بِـــ(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) وَكَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

"নবী (ﷺ) ফরয সালাতসমূহে জোরে জোরে (সশব্দে) 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন এবং তিনি সালাতুল ফজরে কুনুত পাঠ করতেন...।"

ইমাম হাকিম হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন:

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلاَ أَعْلَمُ فِيْ رُوَاتِهِ مَنْسُوْباً إِلَى الْجَرْحِ

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। এর রাবীদের মধ্যে কেউ দুর্বল বলে গণ্য হয়েছেন বলে জানি না।"[২৫২]

ইমাম যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস হাকিমের এই সিদ্ধান্ত ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বরং মাউযূ বা জাল বলেই প্রতীয়মান হয়। সনদের দুইজন রাবী অত্যন্ত দুর্বল: (১) সাঈদ ইবনু উসমান আল-খার্রায এবং (২) তার উস্তাদ আব্দুর রাহমান ইবনু সাঈদ আল-মুয়ায্যিন।[২৫৩]

আরো অনেক নমুনা আমরা দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ।

(৪) ১০ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধতম মুহাদ্দিস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী। ইলম হাদীসের বিভিন্ন ময়দানে তাঁর খেদমত রয়েছে। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করেন। তিনি তাঁর প্রণীত ও সংকলিত 'আল-জামি' আস-সগীর', 'আল-জামি' আল-কাবীর' 'আল-খাসাইসুল কুবরা' বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ সকল গ্রন্থে সহীহ ও যয়ীফ হাদীস সংকলন করবেন, তবে কোনো জাল হাদীস তিনি এ সকল গ্রন্থে উল্লেখ করবেন না। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর এ সকল গ্রন্থের মধ্যে কিছু জাল হাদীসও দেখতে পেয়েছেন। বিশেষত, ইমাম সুয়ূতী নিজেই জাল হাদীসের বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখেছেন। বেশ কিছু হাদীস ইমাম সুয়ূতী 'জাল' বলে চিহ্নিত করে 'জাল হাদীস' বিষয়ক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। আবার তিনি নিজেই সেগুলিকে 'আল-জামি' আস-সাগীর', আল-জামি' আল-কাবীর' বা 'আল-খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থাদিতে সংকলন করেছেন।

একটি উদাহরণ দেখুন। পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী (৪২৭ হি) ও আহমদ ইবনু আলী খাতীব বাগদাদী (৪৬৩ হি) একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে তৃতীয় হিজরী শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনুস সাল্ত থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন। এই ইসহাক ইবনুস সালত বলেন, আমাদেরকে ইমাম মালিক ইবনু আনাস বলেছেন, আমাদেরকে আবুয যুবাইর মাক্কী বলেছেন, আমাদেরকে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন,

رَأَيْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِالْقُرْآنِ لآمَنْتُ بِهِ، أَصْحَرْنَا فِيْ بَرِيَّةٍ تَنْقَطِعُ الطُّرُقُ دُوْنَهَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَضُوْءَ وَرَأَى نَخْلَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا جَابِرُ اذْهَبْ إِلَيْهِمَا فَقُلْ لَهُمَا: اجْتَمِعَا. فَاجْتَمَعَتَا حَتَّى كَأَنَّهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبَادَرْتُهُ بِالْمَاءِ وَقُلْتُ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يُطْلِعَنِيْ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ فَأَكُلَهُ فَرَأَيْتُ الأَرْضَ بَيْضَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا مَعْشَرَ النَّبِيِّيْنَ أُمِرَتِ الأَرْضُ أَنْ تُوَارِيَ مَا يَخْرُجُ مِنَّا مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এমন তিনটি (অলৌকিক) বিষয় দেখেছি যে, তিনি কুরআন আনয়ন না করলেও আমি তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করতাম। (একবার) আমরা এক দূরবর্তী মরুভূমিতে গমন করি। তখন নবী (ﷺ) ইসতিনজার পানি হাতে নিলেন। তিনি দুইটি পৃথক খেজুরগাছ দেখে আমাকে বললেন, হে জাবির, তুমি গাছদুইটির নিকট যেয়ে তাদেরকে বল: তোমরা একত্রিত হও। এতে গাছ দুইটি এমনভাবে একত্রিত হয়ে গেল যেন তার একই মূল থেকে উৎপন্ন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইসতিনজা সম্পন্ন করেন। আমি তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে তাকে দিলাম। আর আমি বললাম, তাঁর পেট থেকে যা বের হয়েছে তা হয়ত আল্লাহ আমাকে দেখাবেন এবং

আমি তা ভক্ষণ করব। কিন্তু আমি দেখলাম যে, মাটি পরিস্কার সাদা। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইসতিনজা করেন নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে আমাদের নবীগণের বিষয়ে যমীনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের থেকে মল-মূত্র যা নির্গত হবে তা আবৃত করে ফেলতে।......"

ইমাম মালিক ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। অগণিত মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। মূলত, সেই সময়ের সকল মুহাদ্দিসই তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিখেছেন। অনেকেই বছরের পর বছর তাঁর সান্যিধ্যে থেকে হাদীস শিখেছেন। এ সকল অগণিত ছাত্রের কেউই এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। অনুরূপভাবে তাবিয়ী আবুয যুবাইর বা সাহাবী জাবির (রা) থেকেও অন্য কোনো সূত্রে তা বর্ণিত হয় নি। একমাত্র ইসহাক ইবনুস সাল্ত নামক এই ব্যক্তি দাবি করেছেন যে, ইমাম মালিক তাকে হাদীসটি বলেছেন। এই ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল ও বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। আরো লক্ষণীয় হলো, এই ইসহাকের বর্ণনাও তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে কোনোরূপ প্রসিদ্ধি বা পরিচিতি লাভ করেনি। ৫ম শতকে কেউ কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জুরজানী ও খতীব থেকে ইসহাক পর্যন্ত সনদও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্য খতীব বাগদাদী, হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী, যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিসের মতামতের আলোকে ইমাম সুয়ূতী নিজেই হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন এবং জাল হাদীস বিষয়ক 'যাইলুল লাআলী' নামক গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখ করেছেন।

আবার তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মুজিযা, অলৌকিকত্ব ও বৈশিষ্ট্যাবলি বিষয়ক 'আল-খাসাইসুল কুবরা' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি দাবি করেছেন যে, এই গ্রন্থে তিনি কোনো মাউযূ বা জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাঁর এই স্ববিরোধিতা ও হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে তাঁর ঢিলেমির কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫৪]

১. ৮. মিথ্যা হাদীস বিষয়ক কিছু বিভ্রান্তি

১. ৮. ১. হাদীস গ্রন্থ বনাম জাল হাদীস

অজ্ঞতা বশত অনেকে মনে করেন যে, কোনো হাদীস কোনো হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত থাকার অর্থ হলো হাদীসটি সহীহ, অথবা অন্তত উক্ত গ্রন্থের সংকলকের মতে হাদীসটি সহীহ। যেমন কোনো হাদীস যদি সুনানু ইবনি মাজাহ বা মুসান্নাফু আব্দুর রায্যাক গ্রন্থে সংকলিত থাকে তার অর্থ হলো হাদীসটি নিশ্চয় সহীহ, নইলে ইবনু মাজাহ বা আব্দুর রায্যাকের মত অতবড় মুহাদ্দিস তা গ্রহণ করলেন কেন? অন্তত, ইবনু মাজাহ বা আব্দুর রায্যাকের মতে হাদীসটি সহীহ, নইলে তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীসটির স্থান দিতেন না।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এই ধারণাটির উভয় দিকই ভিত্তিহীন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাঁদের গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ সকল প্রকার হাদীসই সংকলন করেছেন। তাঁরা কখনোই দাবি করেন নি বা পরিকল্পনাও করেন নি যে, তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন। কাজেই কোনো হাদীস সুনানে ইবনু মাজাহ বা মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-এ সংকলিত থাকাতে কখনোই বুঝা যায় না যে হাদীসটি সহীহ বা ইবনু মাজাহ বা আব্দুর রায্যাকের মতে সহীহ।

ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা, ইবনুস সাকান, হাকিম ও অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের গ্রন্থে কোনো হাদীস সংকলিত হলে আমরা মনে করব যে, হাদীসটি উক্ত মুহাদ্দিসের মতে সহীহ। তবে এতে প্রমাণিত হয় না যে, হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে সহীহ। আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, কোনো মুহাদ্দিসের দাবিই উম্মাহর অন্যান্য মুহাদ্দিস নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করেন নি। এ জন্য আমরা অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিরীক্ষার আলোকে হাদীসটির বিধান নির্ধারণ করব।

আমাদের সমাজে 'সিহাহ সিত্তাহ'[২৫৫] নামে প্রসিদ্ধ ৬ টি গ্রন্থের মধ্যে ২টি সহীহ গ্রন্থ: "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলকও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসও সংকলন করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছেন, সাথে সাথে তাঁরা এসকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান প্রদান করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন : "এই চার গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং এসকল গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে।"[২৫৬]

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর বিবরণ দেখেছি। তিনি সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী: এ তিনটি গ্রন্থকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত করেছেন, যে সকল গ্রন্থের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। কিন্তু তিনি 'সুনান ইবনি মাজাহ'-কে এই পর্যায়ে উল্লেখ করেন নি। এর কারণ হলো, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (২৭৫ হি) সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থটিকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলির অন্তর্ভুক্ত করেন নি। হিজরী ৭ম শতক পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অতিরিক্ত এ তিনটি সুনানগ্রন্থকেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং হাদীস শিক্ষা ও শিক্ষাদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। ৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু তাহির মাকদিসী, আবুল ফাদল ইবনুল কাইসুরানী (৫০৭ হি) এগুলির সাথে সুনান ইবন মাজাহ যোগ করেন।

তাঁর এ মত পরবর্তী ২ শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেন নি। ৭ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনুস সালাহ আবু

আমর উসমান ইবনু আব্দুর রাহমান (৬৪৩ হি), আল্লামা আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসের মূল উৎস হিসাবে উপরের ৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সুনানে ইবনি মাজাহ-কে তাঁরা এগুলির মধ্যে গণ্য করেন নি। পরবর্তী যুগের অনেক মুহাক্কিক আলিম এদের অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস ৬ষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে ইমাম মালিকের মুআত্তাকে গণ্য করেছেন।

সুনান ইবন মাজাহকে উপরের ৩টি সুনানের পর্যায়ভুক্ত করতে আপত্তির কারণ হলো ইমাম ইবনু মাজাহর সংকলন পদ্ধতি এ তিন গ্রন্থের মত নয়। উপরের তিন গ্রন্থের সংকলক মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিষয়বস্তের প্রয়োজনে কিছু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু মাজাহ তৎকালীন সাধারণ সংকলন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আমরা দেখেছি যে, এসকল যুগের অধিকাংশ সংকলক সনদসহ প্রচলিত সকল হাদীস সংকলন করতেন। এতে সহীহ, যয়ীফ, মাউদূ সব প্রকারের হাদীসই তাঁদের গ্রন্থে স্থান পেত। সনদ বিচার ছাড়া হাদীসের নির্ভরতা যাচাই করা সম্ভব হতো না। ইবনু মাজাহও এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তিনি সহীহ বা হাসান হাদীস সংকলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তিনি সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও কিছু মাউযূ হাদীসও সংকলন করেছেন। তিনি এসকল যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মন্তব্য করেন নি।

৮ম হিজরী শতক থেকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সুনান ইবনি মাজাহকে ৪র্থ সুনানগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করতে থাকেন। মুআত্তা ও সুনান ইবনি মাজাহর মধ্যে পার্থক্য হলো, মুআত্তা গ্রন্থের হাদীস সংখ্য কম এবং এ গন্থের সকল সহীহ হাদীস উপরের ৫ গ্রন্থের মধ্যে সংকলিত। ফলে এ গ্রন্থটিকে পৃথকভাবে অধ্যয়ন করলে অতিরিক্ত হাদীস জানা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে সুনান ইবন মাজাহর মধ্যে উপরের ৫ টি গ্রন্থের অতিরিক্ত সহস্রাধিক হাদীস রয়েছে। এজন্য পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এই গ্রন্থটিকে ৪র্থ সুনান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম ইবনু মাজাহ-এর সুনান গ্রন্থে মোট ৪৩৪১ টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার হাদীস উপরের পাঁচটি গ্রন্থে সংকলিত। বাকী প্রায় দেড় হাজার হাদীস অতিরিক্ত। ৯ম হিজরী শতকের মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ ইবনু আবী বাকর আল-বূসীরী (৮৪০ হি) ইবনু মাজাহর এসকল অতিরিক্ত হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন। আল্লামা বূসীরী ১৪৭৬টি হাদীসের সনদ আলোচনা করেছেন, যেগুলি উপরের ৫টি গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, শুধুমাত্র ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সহীহ বা হাসান হাদীস এবং প্রায় একতৃতীয়াংশ হাদীস যয়ীফ। এগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধশত হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন মুহাদ্দিসগণ।[২৫৭]

১. ৮. ২. আলিমগণের গ্রন্থ বনাম জাল হাদীস

হাদীসের গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করা হয়। তাফসীর, ফিকহ, ওয়ায, আখলাক, ফযীলত, তাসাউফ, দর্শন, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদিতে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়। সাধারণত এ সকল গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদীস উল্লেখ করা হয়। অনেকেই অজ্ঞতা বশত ধারণা করেন যে, এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ নিশ্চয় যাচাই বাছাই করে হাদীসগুলি লিখেছেন। সহীহ না হলে কি আর তিনি হাদীসটি লিখতেন?

এ ধারণাটিও ভিত্তিহীন, ভুল এবং উপরের ধারণাটির চেয়েও বেশি বিভ্রান্তিকর। সাধারণত প্রত্যেক ইল্‌মের জন্য পৃথক ক্ষেত্র রয়েছে। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক বিষয়ের আলিম অন্য বিষয়ে অত বেশি সময় দিতে পারেন না। মুফাস্‌সির, ফকীহ, ঐতিহাসিক, সূফী, ওয়ায়িয ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত আলিম ও বুযুর্গ স্বভাবতই হাদীসের নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার গভীরতায় যেতে পারেন না। সাধারণভাবে তাঁরা হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচলিত গ্রন্থ, জনশ্রুতি ও প্রচলনের উপরে নির্ভর করেন। এজন্য তাঁদের গ্রন্থে অনেক ভিত্তিহীন, সনদহীন ও জাল কথা পাওয়া যায়।

আল্লামা নাবাবী তাঁর "তাকরীব" গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ূতী তাঁর "তাদরীবুর রাবী" গন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে অনেক মিথ্যা কথাকে কিছু বুযুর্গ দরবেশ হাদীস বলে সমাজে চালিয়েছেন। কোনো কোনো মুফাসসির, যেমন – আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আস সা'লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি.) তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে, তাঁর ছাত্র আল্লামা আলী ইবনে আহমাদ আল-ওয়াহিদী নিশাপূরী (৪৬৮ হি.) তাঁর "বাসীত", "ওয়াসিত", "ওয়াজীয" ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে, আল্লামা আবুল কাসেম মাহমূদ ইবনে উমর আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি.) তাঁর "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে, আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বাইযাবী (৬৮৫ হি.) তাঁর "আনওয়ারুত তানযীল" বা "তাফসীরে বাইযাবী" গ্রন্থে এসকল বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এই কাজটি করে ভুল করেছেন। সুয়ূতী বলেন : "ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেছেন যে, প্রথম দুইজন – সা'লাবী ও ওয়াহিদী সনদ উল্লেখপূর্বক এসকল বানোয়াট বা জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের ওজর কিছুটা গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁরা সনদ বলে দিয়ে পাঠককে সনদ বিচারের দিকে ধাবিত করেছেন, যদিও মাওযূ বা মিথ্যা হাদীস সনদসহ উল্লেখ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'মাওযূ' না বলে চুপ করে যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু পরবর্তী দুই জন – যামাখশারী ও বাইযাবী-এর ভুল খুবই মারাত্মক। কারণ, তাঁরা সনদ উল্লেখ করেননি, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে এ সকল বানোয়াট কথা উল্লেখ করেছেন।[২৫৮]

মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.) কোনো কোনো বানোয়াট হাদীস উল্লেখ পূর্বক লিখেছেন : "কুতুল কুলুব", "এহ্ইয়াউ উলূমুদ্দীন", "তাফসীরে সা'লাবী" ইত্যাদি গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে দেখে ধোঁকা খাবেন না।[২৫৯]

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী হানাফী ফিক্‌হের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম ও পর্যায় বিন্যাস উল্লেখ করে বলেন: "আমরা

ফিকহী গ্রন্থাবলির নির্ভরযোগ্যতার যে পর্যায় উল্লেখ করলাম তা সবই ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে। এ সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির বিশুদ্ধতা বা নির্ভরযোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে এই বিন্যাস মোটেও প্রযোজ্য নয়। এরূপ অনেক নির্ভরযোগ্য ফিকহী গ্রন্থ রয়েছে যেগুলির উপর মহান ফকীহগণ নির্ভর করেছেন, কিন্তু সেগুলি জাল ও মিথ্যা হাদীসে ভরপুর। বিশেষত 'ফাতওয়া' বিষয়ক পুস্তকাদি। বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পুস্তকের লেখকগণ যদিও 'কামিল' ছিলেন, তবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তার অসতর্ক ছিলেন।"[২৬০]

এজন্য মুহাদ্দিসগণ ফিক্‌হ, তাফসীর, তাসাউফ, আখলাক ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসগুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষা করে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী (৫৯৩ হি.) তাঁর লেখা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ "হেদায়া"-য় অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি ফকীহ হিসাবে ফিকহী মাসায়েল নির্ধারণ ও বর্ণনার প্রতিই তাঁর মনোযোগ ও সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি যা শুনেছেন বা পড়েছেন তা বাছবিচার না করেই লিখেছেন। তিনি কোনো হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করতে যাননি। পরবর্তী যুগে আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসূফ যাইলায়ী হানাফী (৭৬২ হি.), আল্লামা আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এসকল হাদীস নিয়ে সনদভিত্তিক গবেষণা করে এর মধ্যথেকে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস নির্ধারণ করেছেন।

অনুরূপভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ "এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন" গ্রন্থে ফিক্‌হ ও তাসাউফ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি দার্শনিক ও ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য হাদীসের সনদের বাছবিচার না করেই যা শুনেছেন বা পড়েছেন সবই উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে আল্লামা যাইনুদ্দীন আবুল ফাদ্‌ল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি.) ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর উল্লিখিত হাদীসসমূহের সনদ-ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসগুলি নির্ধারণ করেছেন । এছাড়া ৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ইবনু আলী আস-সুবকী (৭৭১ হি) 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েক শত জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস একটি পৃথক পুস্তকে সংকলিত করেছেন। পুস্তকটির নাম 'আল-আহাদীস আল্লাতী লা আস্‌লা লাহা ফী কিতাবিল এহইয়া', অর্থাৎ 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লিখিত ভিত্তিহীন হাদীসসমূহ'।

১. ৮. ৩. কাশফ-ইলহাম বনাম জাল হাদীস

সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও আল্লাহর প্রিয় ওলী-রূপে প্রসিদ্ধ আলিমগণের বিষয়ে। যেহেতু তাঁরা 'সাহেবে কাশফ' বা কাশ্‌ফ সম্পন্ন ওলী ছিলেন, সেহেতু আমরা ধারণা করি যে, কাশফের মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে তো আর তাঁরা লিখেন নি। কাজেই তাঁরা যা লিখেছেন বা বলেছেন সবই বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি.), আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) প্রমুখ আলিম এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা ইমাম গাযালীর "এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন" ও অন্যান্য গ্রন্থে, হযরত আব্দুল কাদির জীলানী লিখিত কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক মাউযূ বা বানোয়াট হাদীসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন : এতবড় আলেম ও এতবড় সাহেবে কাশফ ওলী, তিনি কী বুঝতে পারলেন না যে, এই হাদীসটি বানোয়াট? তাঁর মত একজন ওলী কী-ভাবে নিজ গ্রন্থে মাউযূ হাদীস উল্লেখ করলেন? তাঁর উল্লেখের দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহ? এই সন্দেহের জবাবে তাঁরা যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

১. ৮. ৩. ১. বুযুর্গগণ যা শুনেন তা-ই লিখেন

বস্তুত সরলপ্রাণ বুযুর্গগণ যা শুনেন তাই লিখেন। এজন্য কোনো বুযুর্গের গ্রন্থে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য ছাড়া কোনো হাদীস উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলে নিশ্চিত হয়েছেন। মূলত তাঁরা যা পড়েছেন বা শুনেছেন তা উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাঁরা আশা করেছেন হয়ত এর কোনো সনদ থাকবে, হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ তা খুঁজে দেবেন।

১. ৮. ৩. ২. হাদীস বিচারে কাশফের কোনো ভূমিকা নেই

হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনোই অবদান নেই। কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নেয়ামত মাত্র, আনন্দ ও শুকরিয়ার উৎস। ইচ্ছামতো প্রয়োগের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত উমারকে (রা) কাশফের মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত সারিয়ার সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখিয়েছিলেন, অথচ সেই উমারকে (রা) হত্যা করতে তাঁরই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আবু লু'লুর কথা তিনি টের পেলেন না।

এছাড়া কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি দ্বারা কখনোই হক বাতিলের বা ঠিক বেঠিকের ফয়সালা হয় না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ ও সমস্যা ঘটেছে, কখনোই একটি ঘটনাতেও তাঁরা কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে হক বা বাতিল জানার চেষ্টা করেননি। খুলাফায়ে রাশেদীন – আবু বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর দরবারে অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর ভুলভ্রান্তির সন্দেহ হলে তাঁরা সাক্ষী চেয়েছেন অথবা বর্ণনাকারীকে কসম করিয়েছেন। কখনো কখনো তাঁরা বর্ণনাকারীর ভুলের বিষয়ে বেশি সন্দিহান হলে তার বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফে মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য বিচার করেননি। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, শুনেছেন ও হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের জন্য সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্ণনাকারীর অবস্থা অনুসারে হাদীস গ্রহণ করেছেন বা যয়ীফ হিসেবে বর্জন করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফে উপর নির্ভর করেননি।

হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য সনদের উপর নির্ভর করা সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতে সাহাবা। আর এ বিষয়ে কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা খেলাফে-সুন্নাত, বিদ'আত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।

১. ৮. ৩. ৩. কাশ্‌ফ- ইলহাম সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়

ইসলামী আকীদার গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, কাশফ বা ইলহাম কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার মাপকাঠি নয়। ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম হানাফী আলিম উমার ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও ৮ম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী আলিম সা'দ উদ্দীন মাসঊদ ইবনু উমার আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি.) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" –তে লিখেছেন :

اَلإِلْهَامُ الْمُفَسَّرُ بِإِلْقَاءِ مَعْنًى فِيْ الْقَلْبِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِصِحَّةِ الشَّيْءِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ

"হক্কপন্থীগণের নিকট 'ইলহাম' যা 'ফয়েযরূপে প্রদত্ত ইলকা' নামে পরিচিত তা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[২৬১]

কোনো কোনো অনভিজ্ঞ বুযুর্গ স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির ভিত্তিতে 'হাদীসের' বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের দাবি করলেও অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ বুযুর্গগণ এর কঠিন বিরোধিতা করেছেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ও সংস্কারক মুজাদ্দিদ-ই আলফ-ই সানী (রাহ) হক্ক-বাতিল বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা জানার ক্ষেত্রে কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করার কঠিন আপত্তি ও প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বারংবার উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন-হাদীসই কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মানদণ্ড। কাশফ কখনোই হাদীস বা বা কোনো মতামাতের সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়।[২৬২]

১. ৮. ৩. ৪. সাহেবে কাশ্‌ফ ওলীগণের ভুলত্রুটি

বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক প্রখ্যাত সাধক, যাঁদেরকে আমরা সাহেবে কাশফ বলে জানি, তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক কথা লিখেছেন যা নিঃসন্দেহে ভুল ও অন্যায়। হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.) লিখেছেন যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ফেরকায়ে নাজীয়ার আলামত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের হ্রস-বৃদ্ধি না মানাকে বাতিলদের আলামত বলে গণ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে সে বলবে : 'আমি নিশ্চয় মুমিন', বরং তাকে বলতে হবে যে, 'ইন্‌শা আল্লাহ আমি মুমিন'। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেন না, আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না এবং 'ইনশা আল্লাহ আমি মুমিন' বলাকে আপত্তিকর বলে মনে করেন, সে জন্য তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীগণকে বাতিল ও জাহান্নামী ফিরকা বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬৩]

ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার পথে সহায়ক ও বিদ'আতে হাসানা। তিনি গান-বাজনার পক্ষে অনেক দুর্বল ও জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।[২৬৪]

এরূপ অগণিত উদাহরণ তাঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। কাজেই, তাঁরা যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেও ঘোষণা দেন তারপরও তার সনদ বিচার ব্যতিরেকে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, সকল বানোয়াট কথাকে চিহ্নিত করা দ্বীনের অন্যতম ফরয। কেউ সন্দেহযুক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বর্ণনা করলেও তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কাজেই, এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতার অবকাশ নেই।[২৬৫]

১. ৮. ৪. বুযুর্গগণের নামে জালিয়াতি

এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার। তা হলো, হাদীসের নামে জালিয়াতির ন্যায় নেককার বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহগণের নামে জালিয়াতি হয়েছে প্রচুর। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

(১) জালিয়াতগণ 'ধর্মের' ক্ষতি করার জন্য অথবা ধর্মের 'উপকার' করার জন্য 'জালিয়াতি' করত। বিশেষ করে যারা ধর্মের অপূর্ণতা দূর করে ধর্মকে আরো বেশি 'জননন্দিত' ও 'আকর্ষণীয়' করতে ইচ্ছুক ছিলেন তাদের জালিয়াতিই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। আর উভয় দলের জন্য এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় দলের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতি করার চেয়ে ওলী-আল্লাহগণের নামে জালিয়াতি করা অধিক সহজ ও অধিক সুবিধাজনক ছিল।

(২) বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি অধিকতর সুবিধাজনক এজন্য যে, সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাঁদের নামের প্রভাব 'হাদীসের' চেয়েও বেশি। অনেক সাধারণ মুসলমানকে 'হাদীস' বলে বুঝানো কষ্টকর। তাকে যদি বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অমুক কাজ করেছেন, করতে বলেছেন ... তবে তিনি তা গ্রহণ করতেও পারেন আবার নাও পারেন। কিন্তু যদি তাকে বলা যায় যে, আব্দুল কাদির জীলানী বা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী বা ... অমুক ওলী এই কাজটি করেছেন বা করতে বলেছেন তবে অনেক বেশি সহজে তাকে 'প্রত্যায়িত'

(convinced) করা যাবে এবং তিনি খুব তাড়াতাড়ি তা মেনে নেবেন। ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর সোনালী দিনগুলির পরে যুগে যুগে সাধারণ মুসলিমদের এ অবস্থা। কাজেই বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি বেশি কার্যকর ছিল।

(৩) ওলী-আল্লাহদের নামে জালিয়াতি সহজতর ছিল এজন্য যে, হাদীসের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর নিবেদিত প্রাণ মুহাদ্দিসগণ যেভাবে সর্তক প্রহরা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা রেখেছিলেন, এক্ষেত্রে তা কিছুই ছিল না বা নেই। কোনো নিরীক্ষা নেই, পরীক্ষা নেই, সনদ নেই, মতন নেই, ঐতিহাসিক বা অর্থগত নিরীক্ষা নেই... যে যা ইচ্ছা বলছেন। কাজেই অতি সহজে জালিয়াতগণ নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারতেন।

(৪) হাদীস জালিয়াতির জন্যও এ সকল বুযুর্গের নাম ব্যবহার ছিল খুবই কার্যকর। এ সকল বুযুর্গের নামে বানোয়াট কথার মধ্যে অগণিত জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা। এ সকল বুযুর্গের প্রতি 'ভক্তির প্রাবল্য'-র কারণে অতি সহজেই ভক্তিভরে এ সকল বিষ 'গলাধঃকরণ' করেছেন মুসলমানরা। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পেরেছে জালিয়াতগণ।

১. ৮. ৪. ১. কাদেরীয়া তরীকা

আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের (দ্বাদশ খৃস্টীয় শতকের) প্রসিদ্ধতম ব্যক্তিত্ব। একদিকে তিনি হাম্বালী মাযহাবের বড় ফকীহ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি প্রসিদ্ধ সাধক ও সূফী ছিলেন। তাঁর নামে অনেক তরীকা, কথা ও পুস্তক মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত। এ সকল তরীকা, কথা ও পুস্তক অধিকাংশ বানোয়াট। কিছু কিছু পুস্তক তাঁর নিজের রচিত হলেও পরবর্তীকালে এগুলির মধ্যে অনেক বানোয়াট কথা ঢুকানো হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর নামে প্রচলিত কাদিরিয়া তরীকা ও 'সির্‌রুল আসরার' পুস্তকটির পর্যালোচনা করব।

প্রচলিত কাদিরিয়া তরীকার আমল, ওযীফা, মুরাকাবা ইত্যাদি পদ্ধতির বিবরণ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)-এর পুস্তকে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ)-এর ওফাতের প্রায় দুইশত বৎসর পরে তাঁর এক বংশধর 'গাওস জীলানী' ৮৮৭ হিজরী সালে (১৪৮২ খৃস্টাব্দে) 'কাদেরীয়া তরীকা'-র প্রচলন করেন। বিভিন্ন দেশে 'কাদেরীয়া তরীকার' নামে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত। হযরত আব্দুল কাদির জীলানীর নিজের লেখা প্রচলিত বইগুলিতে যে সকল আমল, ওযীফা ইত্যাদি লিখিত আছে প্রচলিত 'কাদেরীয়া তরীকার' মধ্যে সেগুলি নেই।

আমাদের দেশে প্রচলিত 'কাদেরীয়া তরীকা'র সূত্র বা 'শাজারা' থেকে আমরা দেখি যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৭৬ হি/১৭৬২খৃ) থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর 'আল-কাওলুল জামীল' গ্রন্থে কাদেরীয়া তরীকার যে বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সাথে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর (১২৪৬ হি/১৮৩১খৃ) 'সিরাতে মুস্তাকীমের' বিবরণের পার্থক্য দেখা যায়। আবার তাঁদের দুইজনের শেখানো পদ্ধতির সাথে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত কাদেরীয়া তরীকার ওযীফা ও আশগালের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এগুলির কোন্‌টি তাঁর নিজের প্রবর্তিত ও কোন্‌টি তাঁর নামে পরবর্তীকালে প্রবর্তিত তা জানার কোনো উপায় নেই।

১. ৮. ৪. ২. সির্‌রুল আসরার

হযরত আব্দুল কাদির জীলানীর নামে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ একটি পুস্তক 'সির্‌রুল আসরার'। পুস্তকটিতে কুরআন-হাদীসের আলোকে অনেক ভাল কথা রয়েছে। পাশাপাশি অনেক জাল হাদীস ও বানোয়াট কথা পুস্তকটিতে বিদ্যমান। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, পরবর্তী যুগের কেউ এ বইটি লিখে তাঁর নামে চালিয়েছে। কয়েকটি বিষয় এই জালিয়াতি প্রমাণ করে:

১. এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে লেখক 'ফরীদ উদ্দীন আত্তার-এর বিভিন্ন বাণী ও কবিতার উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যেমন এক স্থানে বলেছেন: "হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (রহঃ) বলেন..."[২৬৬]। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফরীদ উদ্দীন আত্তার ৫১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৬ হিজরীতে (১২২৯ খৃ) ইন্তেকাল করেন। আর আব্দুল কাদের জীলানী ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৬ খৃ) ইন্তেকাল করেন। ফরীদ উদ্দীন আত্তার বয়সে তাঁর চেয়ে ৪০ বৎসরের ছোট এবং তাঁর ইন্তে কালের সময় ফরীদ উদ্দীন আত্তারের কোনো প্রসিদ্ধি ছিল না। কাজেই 'হযরত শাইখ ...' ইত্যাদি বলে তিনি আত্তারের উদ্ধৃতি প্রদান করবেন একথা কল্পনা করা যায় না।

২. এই পুস্তকে শামস তাবরীয-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখক বলেন: "হযরত শামস তাবরীয (রঃ) বলেছেন..."[২৬৭]। উল্লেখ্য যে, শামস তাবরীয ৬৪৪ হিজরীতে (১২৪৭ খৃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে ৫৬০ হিজরীর পরে তাঁর জন্ম বলে মনে হয়। অর্থাৎ আব্দুল কাদের জীলানীর ইন্তেকালের সময় শামস তাবরীযের জন্মই হয় নি! অথচ তিনি তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছেন!

৩. এই পুস্তকে বারংবার জালাল উদ্দীন রুমীর উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। যেমন লেখক বলছেন: "আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী তাঁর অমর কাব্য মসনবীতে বলেছেন...।"[২৬৮] লক্ষ্যণীয় যে, জালাল উদ্দীন রুমী (৬০৪- ৬৭৬ হি) আব্দুল কাদের জীলানীর (রাহ) ইন্তেকালের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেন! রুমীর জন্মের অর্ধ শত বৎসর আগে তাঁর মসনবীর উদ্ধৃতি প্রদান করা হচ্ছে!!

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, এই পুস্তকটি পুরোটিই জাল, অথবা এর মধ্যে অনেক জাল কথা পরবর্তীকালে ঢুকানো হয়েছে। এই পুস্তকটির মধ্যে অগণিত জাল হাদীস ও জঘন্য মিথ্য কথা লিখিত রয়েছে। আর আব্দুল কাদের জীলানীর (রাহ) নামে

এগুলি অতি সহজেই বাজার পেয়েছে।

১. ৮. ৪. ৩. চিশতীয়া তরীকা

আমাদের দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী (৬৩৩ হি), কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কী (৬৫৩ হি), ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ গঞ্জে শক্কর (৬৬৩ হি) ও নিযাম উদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি), রাহিমাহুমুল্লাহ। এদের নামেই চিশতিয়া তরীকা প্রচলিত। এছাড়া এদের নামে অনেক কথা, কর্ম ও বই-পুস্তকও প্রচলিত। এগুলির মধ্যে এমন অনেক কথা রয়েছে যা স্পষ্টতই মিথ্যা ও বানোয়াট। এখানে চিশতীয়া তরীকা ও এঁদের নামে প্রচলিত দুএকটি বইয়ের বিষয়ে আলোচনা করব।

ভারতের বিভিন্ন দরবারের চিশতীয় তরীকার আমল, ওযীফা ইত্যাদির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। উপর্যুক্ত বুযুর্গগণের নামে প্রচলিত পুস্তকাদিতে এ সকল 'তরীকা' বা পদ্ধতির কিছুই দেখা যায় না। আবার এ সকল পুস্তকে যে সকল যিকর-ওযীফার বিবরণ রয়েছে সেগুলিও প্রচলিত চিশতীয়া তরীকার মধ্যে নেই। চিশতীয়া তরীকার ক্ষেত্রেও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর বিবরণের সাথে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর বিবরণের পার্থক্য দেখা যায়। আবার তাঁদের দুইজনের শেখানো পদ্ধতির সাথে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত চিশতীয়া তরীকার ওযীফা ও আশগালের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এগুলির কোন্‌টি 'অরিজিনাল' ও কোনটি 'বানোয়াট' তা জানার কোনো উপায় নেই।

১. ৮. ৪. ৪. আনিসুল আরওয়াহ, রাহাতিল কুলুব... ইত্যাদি

এ সকল মহান মাশাইখ রচিত বলে কিছু পুস্তক প্রচলিত। এগুলি 'উস্তাদ বা পীরের সাহচর্যের স্মৃতি ও আলোচনা হিসেবে রচিত।' খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী তাঁর উস্তাদ উসমান হারুনীর সাথে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের বিবরণ লিখেছেন 'আনিসুল আরওয়াহ' নামক পুস্তকে। খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী তাঁর উস্তাদ মুঈন উদ্দীন চিশতীর সাথে তার সাহচর্যের স্মৃতিগুলি লিখেছেন 'দলিলুল আরেফীন' পুস্তকে। খাজা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শক্কর তাঁর উস্তাদ কুতুব উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতিগুলি লিখেছেন 'ফাওয়ায়েদুস সালেকীন' পুস্তকে। খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া তাঁর উস্তাদ ফরীদ উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতিগুলি লিখেছেন 'রাহাতিল কুলুব' পুস্তকে। প্রসিদ্ধ গায়ক আমীর খসরু তাঁর উস্তাদ নিজাম উদ্দীনের সাহচর্যের স্মৃতি ও নির্দেশাবলি লিখেছেন 'রাহাতুল মুহিব্বীন' পুস্তকে।

এ সকল পুস্তক পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে এগুলি পরবর্তী যুগের মানুষদের রচিত জাল পুস্তক। অথবা তাঁরা কিছু লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগের জালিয়াতগণ ইচ্ছামত অনেক কিছু ঢুকিয়েছে। এই পুস্তকগুলিতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক অনেক ভাল কথা আছে। পাশাপাশি অগণিত জাল হাদীস ও মিথ্যা কথায় সেগুলি ভরা। এ ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্যাবলি উল্টোপাল্টা লেখা হয়েছে। এমন সব ভুল রয়েছে যা প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে।

প্রত্যেক বুযুর্গ তার মাজালিসগুলির তারিখ লিখেছেন। সন তারিখগুলি উল্টোপাল্টা লেখা। যাতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, পরবর্তীকালে এঁদের নামে এগুলি জালিয়াতি করা হয়েছে। শাওয়াল মাসের ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার ও ৭ তারিখ রবিবার লেখা হয়েছে। অর্থাৎ শাওয়ালের শুরু সোমবারে। কিন্তু ১৫ই জিলক্বদ সোমবার লেখা হয়েছে। অর্থাৎ যিলকাদের শুরুও সোমবারে! শাওয়াল মাস ২৮ দিনে হলেই শুধু তা সম্ভব![২৬৯] আবার পরের মাজলিস হয়েছে ৫ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার। জিলকাদের শুরু সোম, মঙ্গল বা বুধবার যেদিনই হোক, কোনোভাবেই ৫ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার হয় না! আবার পরের মাজলিস ২০শে জিলহজ্ব শনিবার! ৫ তারিখ বৃহস্পতিবার হলে ২০ তারিখ শনিবার হয় কিভাবে? [২৭০] ২০ শে রজব সোমবার এবং ২৭শে রজব রবিবার লেখা হয়েছে। ৫ই শাওয়াল শনিবার অথচ ২০ শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার[২৭১]. ... এইরূপ অগণিত অসঙ্গতি যা প্রথম নজরেই ধরা পড়ে।

কাকী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, ৬১৩ হিজরীতে তিনি বাগদাদে মুঈন উদ্দীনের চিশতির নিকট মুরীদ হন। এরপর কয়েক মাজলিস তিনি বাগদাদেই থাকেন। এরপর তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে আজমীরে আগমন করেন। এভাবে আমরা নিশ্চিত জানতে পারছি যে, ৬১৩ হি (১২১৬ খৃ)-এর পরে মুঈন উদ্দীন চিশতী ভারতে আগমন করেন। বখতিয়ার কাকী আরো উল্লেখ করেছেন যে, আজমীরে অবস্থান কালে আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। একপর্যায়ে তিনি বলেন, আমি পৃথ্বীরাজকে মুসলমানদের হাতে জীবিত বন্দী অবস্থায় অর্পন করলাম। এর কয়েক দিন পরেই সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর সৈন্যগণ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও বন্দী করে।[২৭২]

অথচ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করছেন যে, ৬১৩ হিজরীর প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে ৫৮৮ হিজরীতে (১১৯২ খৃস্টাব্দে) তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথীরাজকে পরাজিত করে আজমীর দখল করেন। আর ৬১৩ হিজরীতে খাজা মুঈন উদ্দীনের আজমীর আগমনের ১০ বৎসর পূবে ৬০৩ হিজরীতে (১২০৬ খৃস্টাব্দে) শিহাবুদ্দীন ঘোরী মৃত্যুবরণ করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এ সকল কাহিনী সবই বানোয়াট। অথবা মুঈন উদ্দীন (রাহ) অনেক আগে ভারতে আসেন। এক্ষেত্রে আনিসুল আরওয়াহ, দলিলুল আরেফীন, ফাওয়ায়েদুস সালেকীন ইত্যাদি পুস্তকে লেখা সন-তারিখ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বানোয়াট।

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসের নামে জালিয়াতির ন্যায় বুযুর্গদের নামেও জালিয়াতি হয়েছে ব্যাপকভাবে। হাদীসের ক্ষেত্রে যেমন সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে, বুযুর্গদের ক্ষেত্রে তা না থাকাতে এদের নামে জালিয়াতি ধরার কোনো পথ নেই। জালিয়াতগণ বুযুর্গদের নামে 'জাল পুস্তক' লিখে সেগুলির মধ্যে জাল হাদীস উল্লেখ করেছে, এবং তাঁদের লেখা বইয়ের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন এ সকল জাল হাদীসের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সাধারণ মুসলিম বলবেন, অমুক বুযুর্গের পুস্তকে এই হাদীস রয়েছে, তা জাল হয় কিভাবে?! এভাবে জালিয়াতগণ এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে!

১. ৮. ৫. জাল হাদীস বনাম যয়ীফ হাদীস

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, জাল হাদীস দুর্বল হাদীসের একটি প্রকার। জাল হাদীসের বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন, 'যয়ীফ' হাদীসের বিষয়ে অনেক মুহাদ্দিস তদ্রূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন নি। দুইটি ক্ষেত্রে তাঁরা 'যয়ীফ' হাদীসের ব্যবহার বা উল্লেখ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন: (১) 'আকীদা' বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং (২) শরীয়তের আহকাম বা বিধানাবলির ক্ষেত্রে। প্রথম ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। শুধু তাই নয়, 'আকীদা' বা বিশ্বাস প্রমাণের ক্ষেত্রে মূলত 'মুতাওয়াতির' বা বহু সাহাবী ও তাবিয়ী বর্ণিত হাদীস, যা সাহাবীগণের মধ্যেই বহুল প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত এইরূপ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। কারণ শুধু কুরআন কারীম ও এইরূপ 'মুতাওয়াতির হাদীস' দ্বারাই 'একীন' বা 'দৃঢ় বিশ্বাস' প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'সহীহ' ও 'হাসান' হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে।[২৭৩]

১. ৮. ৫. ১. যয়ীফ হাদীসের ক্ষেত্র ও শর্ত

পক্ষান্তরে তিনটি বিষয়ে 'অল্প যয়ীফ' হাদীস বলা অনেকে অনুমোদন করেছেন: (১) কুরআনের 'তাফসীর' বা শাব্দিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, (২) ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং (৩) বিভিন্ন নেক আমলের 'ফযীলত' বর্ণনার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নরূপ শর্তগুলি উল্লেখ করেছেন:

(১) যয়ীফ হাদীসটি "অল্প দুর্বল' হবে, বেশি দুর্বল হবে না।

(২) যয়ীফ হাদীসটি এমন একটি কর্মের ফযীলত বর্ণনা করবে যা মূলত সহীহ্ হাদীসের আলোকে জায়েয ও ভালো।

(৩) যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একথা মনে করা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই একথা বলেছেন। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে যদি সত্য হয় তাহলে এই সাওয়াবটা পাওয়া যাবে, কাজেই আমল করে রাখি। আর সত্য না হলেও মূল কাজটি যেহেতু সহীহ হাদীসের আলোকে মুস্তাহাব সেহেতু কিছু সাওয়াব তো পাওয়া যাবে।[২৭৪]

'যয়ীফ' হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মুহাদ্দিসের এই মতটি ভুল বুঝে অনেক সময় এর মাধ্যমে সমাজে 'জাল' হাদীসের প্রচলন ঘটেছে। বস্তুত, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ জাল ও ভিত্তিহীন 'হাদীস' এই 'পথ' দিয়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। সমাজে অগণিত জাল হাদীসের প্রচলনের পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে: (১) অযোগ্য ও ইলমহীন মানুষদের ওয়ায, নসীহত ও বিভিন্ন দ্বীনী দায়িত্ব পালন, (২) সাধারণ আলিমদের অবহেলা বা অলসতা, (৩) প্রসিদ্ধ ও যোগ্য আলিমদের ঢিলেমী, (৪) হেদায়েতের আগ্রহ এবং (৫) ইতিহাস, সীরাত ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুজিযা বর্ণনার আগ্রহ।

১. ৮. ৫. ২. হেদায়াত ও ফযীলতে যয়ীফের নামে জাল হাদীস

জাল হাদীসের প্রচলনের ক্ষেত্রে শেষের কারণদ্বয় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। হেদায়াতের আগ্রহে অনেক যোগ্য আলেম ওয়ায, ফাযায়েল, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক 'যয়ীফ' হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ সকল 'যয়ীফ' হাদীসের মধ্যে অনেক জাল হাদীস তাঁদের পুস্তকে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা এগুলির জালিয়াতি বা দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন নি। ফলে সাধারণ পাঠক এগুলিকে 'সহীহ' হাদীস বলেই গণ্য করেছেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কুরআনের এত আয়াত, এত সহীহ হাদীস সব কিছু উল্লেখ করার পরেও বোধ হয় মানুষের মনে 'হেদায়াতের' কথাটি ঢুকানো গেল না। কিছু যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য কথা না বললে বোধহয় মানুষের মনে 'আসর' করা যাবে না। কুরআনে ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত শাস্তির কথা এবং কুরআনে ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত পুরস্কার, সাওয়াব ও ফযীলতের কথা বোধ হয় মানুষের মনে সত্যিকার আখেরাতমুখিতা, আল্লাহ ভীতি ও আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। এজন্যই বোধহয় তাঁরা আয়াতে কুরআনী ও সহীহ হাদীসের পরে এ সকল যয়ীফ বা ভিত্তিহীন কথাগুলি উল্লেখ করেন।

১. ৮. ৫. ৩. ইতিহাস ও সীরাতে যয়ীফের নামে জাল হাদীস

ইতিহাস, সীরাত ও মুজিযা বর্ণনার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। সকল বিষয়ের লেখকই সে বিষয়ে সর্বাধিক তথ্য সংগ্রহ করতে চান। তথ্য সংগ্রহের এ আগ্রহের ফলে প্রথম যুগ থেকেই অনেক আলিম এ সকল ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে এ আগ্রহের ফলে সীরাতুন্নবী গ্রন্থগুলির মধ্যে অগণিত ভিত্তিহীন জাল হাদীস অনুপ্রবেশ করেছে।

ইতোপূর্বে শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর আলোচনা থেকে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচলিত সকল হাদীসই ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়ে গিয়েছিল। এর পরবর্তী যুগে অতিরিক্ত যা কিছু সংকলিত হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগে বানানো জাল ও ভিত্তিহীন কথা। এই প্রকারের গ্রন্থগুলিকে তিনি ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাস, সীরাত ও মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থগুলির অবস্থাও আমরা এথেকে বুঝতে পারব। প্রথম ছয় শত বৎসরে সংকলিত এই জাতীয় গ্রন্থগুলির অন্যতম হলো: ইবনু ইসহাকের (১৫০হি) 'সীরাহ', ওয়াকেদীর (২০৭ হি) মাগাযী, ইবনু হিশামের (২১৮ হি) সীরাহ, ইবনু সা'দ (২৩০হি)-এর 'তাবাকাত', খালীফা ইবনু খাইয়াতের (২৪০ হি) তারিখ, বালাযুরির (২৭৯ হি) ফুতুহুল বুলদান, ফিরইয়াবীর (৩০১ হি) দালাইলুন নুবওয়াত, তাবারীর (৩১০ হি) তারীখ, মাসউদীর (৩৪৫ হি) তারীখ, বাইহাকীর (৪৫৮ হি) দালাইলুন নুবওয়াত ইত্যাদি। এ সকল পুস্তকে প্রচুর 'অত্যন্ত যয়ীফ' হাদীস এবং কিছু জাল হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও আমরা দেখতে পাই যে, পরবর্তী যুগের লেখকগণ আরো অনেক কথা সংগ্রহ করছেন যা এ সকল গ্রন্থে মোটেও পাওয়া যাচ্ছে

না।

পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অন্যতম হলো সুয়ূতীর (৯১১ হি) আল-খাসাইসুল কুবরা, কাসতালানীর (৯২৩ হি) আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামীর (৯৪২ হি) সুবুলুল হুদা বা সীরাহ শামিয়াহ। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ দাবি করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করবেন, কিন্তু জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা এমন অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলিকে তাঁরা নিজেরাই অন্যত্র জাল ও মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থগুলির অন্যতম হলো আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন হালাবীর (১০৪৪ হি) সীরাহ হালাবিয়াহ, যারকানীর (১১২২ হি) শারহুল মাওয়াহিব ইত্যাদি গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ কোনো বাছ বিচারই রাখেন নি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল যত বেশি পারা যায় তথ্যাদি সংকলন ও বিন্যাস করা। এজন্য কোনোরূপ বিচার ও যাচাই ছাড়াই সকল প্রকার সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ ও সনদবিহীন বিবরণ একত্রিত সংমিশ্রিত করে বিন্যাস করেছেন। ফলে অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা এগুলিতে স্থান পেয়েছে। আর জাল হাদীসের মধ্যে নতুনত্ব ও আজগুবিত্ব বেশি। এজন্য এ সকল পুস্তকে সহীহ হাদীসের পরিবর্তে জাল হাদীসের উপরেই বেশি নির্ভর করা হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, কুরআন কারীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীস দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত, মুজিযা ও মর্যাদা প্রমাণ করা বোধহয় সম্ভব হচ্ছে না, অথবা এ সকল মিথ্যা ও জাল বর্ণনাগুলি ছাড়া বোধহয় তাঁর মর্যাদার বর্ণনা পূর্ণতা পাচ্ছে না!!

এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলির লেখকগণ অধিকাংশ বর্ণনারই সূত্র উল্লেখ করেন নি। যেখনে সূত্র উল্লেখ করেছেন সেখানেও তাদের অবহেলা অকল্পনীয়। একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। সীরাহ হালাবিয়ার লেখক বলেন:

وَرَأَيْتُ فِيْ كِتَابِ التَّشْرِيْفَاتِ فِيْ الْخَصَائِصِ وَالْمُعْجِزَاتِ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مُؤَلِّفِهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيْلَ، فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ، كَمْ عُمِّرْتَ مِنَ السِّنِيْنَ ... رواه البخاري

"আমি 'তাশরীফাত ফিল খাসাইস ওয়াল মুজিযাত' নামক একটি বই পড়েছি। এ বইটির লেখকের নাম আমি জানতে পারি নি। এ বইয়ে দেখেছি, আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাঈল, আপনার বয়স কত? ... হাদীসটি বুখারী সংকলন করেছেন।"[২৭৫]

এই হাদীসটি বুখারী তো দূরের কথা কোনো হাদীস গ্রন্থেই নেই। এই অজ্ঞাত নামা লেখকের বর্ণনার উপর নির্ভর করে গ্রন্থকার হাদীসটি উদ্ধৃত করলেন। একটু কষ্ট করে সহীহ বুখারী বা ইমাম বুখারীর লেখা অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখলেন না। এভাবে তিনি পরবর্তী যুগের মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে একটি জঘন্য মিথ্যা কথা প্রচলনের স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমাদের দেশের আলিমগণ "সীরাহ হালাবীয়া' জাতীয় পুস্তকের উপরেই নির্ভর করেন, ফলে অগণিত জাল কথা তাদের লিখনি বা বক্তব্যে স্থান পায়। প্রসিদ্ধ আলিম ও বুযুর্গ আব্দুল খালেক (রাহ.) তাঁর **'সাইয়েদুল মুরসালীন'** গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূলত এই 'সীরাহ হালাবিয়া' (সীরাত-ই হালাবী) গ্রন্থটির উপরেই নির্ভর করেছেন। স্বভাবতই তিনি গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো তথ্যই যাচাই করেন নি। ফলে এই মূল্যবান গ্রন্থটির মধ্যে আমরা অগণিত জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস দেখতে পাই।

আমরা দেখেছি যে, যয়ীফ হাদীসের উপর আমল জায়েয হওয়ার শর্ত হলো, বিষয়টি বিশ্বাস করা যাবে না, শুধু কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, বিশ্বাস ও কর্ম বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। কারণ যয়ীফ হাদীসের উপর যিনি আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এই আমলের জন্য এই ধরনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। বিশেষত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনী ও মুজিযা বিষয়ক বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন মুমিন কিছু শুনলে তা বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, এ সকল 'যয়ীফ' বা 'জাল' কথাগুলি তাঁর 'ঈমানের' অংশে পরিণত হয়। এভাবে তাঁর 'বিশ্বাসের' ভিত্তি হয় যয়ীফ বা জাল হাদীসের উপর।

১. ৮. ৬. নিরীক্ষা বনাম ঢালাও ও আন্দাযী কথা

জাল হাদীসের ক্ষেত্রে জঘন্যতম ও সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি হলো, নিরীক্ষা ব্যতিরেকে ঢালাও মন্তব্য। আমরা ইতোপূর্বে বারংবার উল্লেখ করেছি এবং পূর্বের সকল আলোচনা থেকে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছি যে, ওহী বা ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সূত্র সংরক্ষণ মুসলিম উম্মাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম-প্রচারক বা প্রবর্তকের শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর বিশুদ্ধতা রক্ষায় এইরূপ সচেষ্ট হয় নি।

সাহাবীগণের যুগ থেকে সকল যুগের মুসলিম আলিম ও মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচারিত প্রতিটি কথা চুলচেরা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেক 'প্রাচ্যবিদ', তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত অনেক মুসলিম ও অনেক অনভিজ্ঞ বা অজ্ঞ মুসলিম 'চিন্তাবিদ' বা 'গবেষক' হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করেন। হাদীস যেহেতু জাল হয়েছে, কাজেই কোনো হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়, অথবা অমুক হাদীসের অর্থ সঠিক নয় কাজেই তা জাল বলে গণ্য হবে .... ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন, মুহাদ্দিসগণ সম্ভবত শুধু সনদই বিচার করেছেন, অর্থ, শব্দ, বাক্য, ভাব ইত্যাদি বিচার ও নিরীক্ষা করেন নি। এগুলি সবই ভিত্তিহীন ধারণা ও উর্বর মস্তিকের বর্বর কল্পনা মাত্র। মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচয়হীনতা এর মূল কারণ। এর চেয়েও বড় কারণ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ইসলাম থেকে মানুষদেরকে বিচ্যুত করার উদগ্র বাসনা।

ইহূদী-খৃস্টান প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ, কাদিয়ানী, বাহাঈ ইত্যাদি অমুসলিম সম্প্রদায় ও শিয়া সম্প্রদায় ছাড়াও কিছু 'জ্ঞানপাপী'

পণ্ডিত হাদীসের বিরুদ্ধে এরূপ ঢালাও মন্তব্য করেন অথবা মর্জিমাফিক অর্থ বিচার করে হাদীস 'জাল' বলে ঘোষণা করেন। তারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করতে চান, কিন্তু ইসলাম পালন করতে চান না। এরা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ, হালাল ভক্ষণ, পবিত্রতা অর্জন, ইত্যাদি কোনো 'কর্ম'ই করতে রাজি নন। কুরআনে উল্লিখিত এ সকল বিষয়কে 'ইচ্ছামত' ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দিতে চান। কিন্তু ভয় হলো, হাদীস নিয়ে। হাদীস থাকলে তো ইচ্ছামত ব্যাখ্যা অচল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এজন্য তারা নির্বিচারে হাদীসকে জাল বলে বাতিল করতে চান।

আশা করি, এই গ্রন্থের আলোচনা থেকে পাঠক এ সকল মানুষের মতামতের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা ও বিচার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক। তাঁরা সনদ, শ্রুতি, পাণ্ডুলিপি, ভাষা, অর্থ, ও প্রাসঙ্গিক সকল প্রমাণের আলোকে যে সকল হাদীসকে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলির বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণবিহীন ঢালাও সন্দেহ একমাত্র জ্ঞানহীন মুর্খ বা বিদ্বেষী জ্ঞানপাপী ছাড়া কেউই করতে পারে না। আর এই নিরীক্ষার ভিত্তিতে যে সকল হাদীসকে তাঁরা জাল ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে গায়ের জোরে হাদীস বলে দাবি করাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার ভয়ঙ্কর দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত।

১. ৮. ৭. জাল হাদীস বিষয়ক কিছু প্রশ্ন

আমরা প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করেছি। দ্বিতীয় পর্বে আমরা আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করব। এ সকল জাল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা পাঠের সময় পাঠকের মনে বারংবার কয়েকটি প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তবুও এখানে প্রশ্নগুলি আলোচনা করতে চাই।

আমরা দেখতে পাব যে, মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীসের মধ্যে অনেক কথা আছে যা অত্যন্ত সুন্দর, অর্থবহ, মূল্যবান ও হৃদয়স্পর্শী। তখন আমাদের কাছে মনে হবে যে, কথাটি তো খুব সুন্দর, একে বানোয়াট বলার দরকার কি? অথবা এত সুন্দর ও মর্মস্পর্শী কথা হাদীস না হয়ে পারে না। অথবা এই কথার মধ্যে তো কোন দোষ নেই, এর বিরুদ্ধে লাগার প্রয়োজন কি? ইত্যাদি।

এর উত্তরে আমাদের বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষা ও বাণীকে অবিকল নির্ভেজালভাবে হেফাযত করা উম্মতের প্রথম দায়িত্ব। তিনি বলেন নি, এমন কোন কথা তাঁর নামে বলাই জাহান্নামের নিশ্চিত পথ বলে তিনি বারবার বলেছেন। কাজেই কোন বাণীর ভাব ও মর্ম কখনোই আমাদের কাছে প্রথমে বিবেচ্য নয়। প্রথম বিবেচ্য হলো, তিনি এই বাক্যটি বলেছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। কোন কথার অর্থ যত সন্দর ও হৃদয়স্পর্শী হোক সে কথাটিকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা হাদীস বলতে পারি না, যতক্ষণ না বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কথা বলেছেন বলে আমরা নিশ্চিতরূপে জানি না সে কথা তাঁর নামে বলার মত কঠিনতম অপরাধ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমরা প্রায়ই দেখব যে, আমরা যে সকল হাদীসকে বানোয়াট বলে উল্লেখ করছি, এ সকল হাদীসকে অনেক বুযুর্গ তার কথায় বা গ্রন্থে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ হয়ত বলতে পারেন: অমুক আলেম বা বুযুর্গ এই হাদীস বলেছেন, তিনি কি তাহলে জাহান্নামী?

আমরা দেখেছি যে, বুযুর্গদের নামে জালিয়াতি হয়েছে অনেক। এ সকল জাল হাদীস বুযুর্গগণ সত্যই বলেছেন না, জালিয়াতরা তাঁদের নামে চালিয়েছে তা আমরা জানি না। যদি তাঁরা বলেও থাকেন, তবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, একজন বুযুর্গের অসংখ্য কর্মের মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে। তাঁদের অসংখ্য ভাল কাজের মধ্যে এ সকল ভুলভ্রান্তি কিছুই নয়। মূলত: তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন। মুজতাহিদ তাঁর সঠিক কর্মের জন্য আল্লাহর কাছে দ্বিগুণ পুরস্কার পান। আর তিনি তার ভুলের জন্য একটি পুরস্কার পান। (সহীহ বুখারী) এছাড়া আল্লাহ বলেছেন: "পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপকে দূর করে দেয়।" (সূরা হূদ: ১১৪ আয়াত)। তাই যিনি অনেক পুণ্য করেছেন তাঁর সামান্য ভুল পুণ্যের কারণে দূরীভূত হয়ে যাবে।

কোনো বুযুর্গ বা সত্যিকারের আল্লাহ-ওয়ালা মানুষ কখনোই জেনেশুনে কোনো জাল বা মিথ্যা কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বলতে পারেন না। না-জেনে হয়ত কেউ বলে ফেলেছেন। কিন্তু তাই বলে আমরা জেনে শুনে কোনো জাল হাদীস বলতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব হলো, কোনো হাদীসের বিষয়ে যদি আমরা শুনি বা জানি যে, হাদীসটি 'জাল' তবে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বলা ও পালন করা বর্জন করব। যদি এ বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ হয় তবে আমরা মুহাদ্দিসগণের তথ্যাদি আলোকে 'তাহকীক' বা গবেষণা করে প্রকৃত বিষয় জানতে চেষ্টা করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, অন্য কারো কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। কাজেই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথা বা সন্দেহজনক কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন যা আমাদের মনে আসবে তা হলো, এতসব বুযুর্গ কিছু বুঝলেন না, এখন আমরা কি তাঁদের চেয়েও বেশী বুঝলাম? এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, এই গ্রন্থে আলোচিত জাল হাদীসগুলিকে জাল বলার ক্ষেত্রে আমার মত অধমের কোন ভূমিকা নেই। এখানে আমি মূলত পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতামত বর্ণনা করছি। পাঠক তা বিস্তারিত দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয় পর্ব:
প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা

২. ১. অশুদ্ধ হাদীসের বিষয়ভিত্তিক মূলনীতি

জাল ও অনির্ভরযেগ্য হাদীস সংকলনের একটি বিশেষ পদ্ধতি হল, যে সকল বিষয়ে সকল হাদীস বা অধিকাংশ হাদীস বানোয়াট বা অনির্ভরযোগ্য সে সকল বিষয়কে একত্রিত করে সংকলিত করা। বানোয়াট হাদীস চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আগ্রহী মুসলিম বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা ছাড়াই অতি সহজে বুঝতে পারেন যে, এই হাদীসটি বানোয়াট; কারণ হাদীসটি যে বিষয়ে বর্ণিত সেই বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এই পদ্ধতিতে রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ ৭ম হিজরী শতকের অন্যতম মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ উমার ইবনু বাদর আল-মাউসিলী (৫৫৭-৬২২ হি) রচিত 'আল-মুগনী' গ্রন্থ। এছাড়া হিজরী একাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ শাফিয়ী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সূফী সাধক মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়েদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসও এ বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন।

২. ১. ১. উমার ইবনু বাদর মাউসিলী হানাফী

যিয়াউদ্দীন আবু হাফস উমার ইবনু বাদর ইবনু সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাউসিলী হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম "আল-মুগনী আনিল হিফযি ওয়াল কিতাব বি-কাউলিহিম লাম ইয়াসিহ্ শাইউন ফী হাযাল বাব" নামক গ্রন্থটি। এই দীর্ঘ নামের প্রতিপাদ্য হলো: 'মুহাদ্দিসগণ সে সকল বিষয়ে বলেছেন যে, এই বিষয়ে কোনো হাদীসই সহীহ নয় সেই বিষয়গুলির বিবরণ। এগুলির জন্য অন্য কোনো গ্রন্থ পাঠ ও মুখস্থ করার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।' এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি ১০১ টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যে সকল বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই অশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। কোনো বিষয়ে কিছু হাদীস বিশুদ্ধ হলে তা উল্লেখ করে বাকি সকল হাদীস অশুদ্ধ বলে জানিয়েছেন।

২. ১. ২. যে সকল বিষয়ে সকল হাদীস অশুদ্ধ

আল্লামা মাউসিলী পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা ও বিস্তারিত গবেষণার আলোকে উল্লেখ করেছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে বর্ণিত সকল হাদীসই অশুদ্ধ। এগুলি হয় বানোয়াট অথবা অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য।

১. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

ঈমান বাড়ে কমে, অথবা বাড়ে না ও কমে না এবং কথা ও কর্মও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত অথবা অন্তর্ভুক্ত নয়, এই অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। এবিষয়ে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সরাসরি কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

২. মুরজিয়া, জাহমিয়্যা, কাদারিয়্যাহ ও আশ'আরিয়্যাহ সম্প্রদায়

এ সকল সম্প্রদায় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী মূলক কোনো সহীহ হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়নি। এদের বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলি বানোয়াট অথবা অত্যন্ত দুর্বল। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশনার আলোকে এ সকল সম্প্রদায়ের বিষয়ে কথা বলেছেন।

৩. আল্লাহর বাণী সৃষ্ট নয়

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট।

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে তাবিয়ীগণ, তাবি-তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী ইমামগণ একমত যে, কুরআন আল্লাহর বাণী, তা তাঁর মহান গুণাবলির অংশ এবং সৃষ্ট নয়। বিভ্রান্ত মু'তাযিলা সম্প্রদায় কুরআনকে সৃষ্টবস্তু বলে বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকে এই বিষয়টি মুসলিম সমাজের অন্যতম বিতর্ক-বিষয় ছিল। এজন্য অনেক জালিয়াত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে হাদীস বানিয়ে প্রসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কুরআন সৃষ্ট নয়। তবে এই অর্থে হাদীস জালিয়াতির সকল প্রচেষ্টা তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৪. নূরের সমূদ্রে ফিরিশতাগণের সৃষ্টি

জিবরাঈল (আ) প্রতিদিন সকালে নূরের সমূদ্রে ডুব দিয়ে উঠে শরীর ঝাড়া দেন এবং প্রতি ফোটা নূর থেকে ৭০ হাজার ফিরিশতা সৃষ্টি করা হয়। এই অর্থে ও এই জাতীয় সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৫. মুহাম্মাদ বা আহমদ নাম রাখার ফযীলত

মুহাম্মাদ বা আহমাদ নাম রাখার ফযীলতে প্রচারিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট হাদীস প্রচারিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ও আহমদ নামধারীদের আল্লাহ শাস্তি দিবেন না, যাদের পরিবারে কয়েক ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ হবে তাদের ক্ষমা করা হবে, বা বরকত দেওয়া হবে ইত্যাদি বিভিন্ন কথা বানিয়ে হাদীসের নামে চালানো হয়েছে। এই নাম দুটি নিঃসন্দেহে উত্তম নাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মহব্বতে সন্তানদের এই নাম রাখা ভাল। তবে এ বিষয়ের বিশেষ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীগুলি বানোয়াট।

৬. আকল অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়

বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশংসা বা ফযীলতে বর্ণিত সকল হাদীস ভিত্তিহীন। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জ্ঞানীগণের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে ইন্দ্রিয়ের প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস সহীহরূপে বর্ণিত হয় নি। জালিয়াতগণ বুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশংসায় অনেক হাদীস বানিয়েছে। যেগুলিতে বুদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে, মানুষ কর্ম নয় বরং বুদ্ধি অনুসারে পুরস্কার লাভ করবে; বুদ্ধিহীন বা নির্বোধের সালাতের চেয়ে বুদ্ধিমানের সালাতের সাওয়াব বেশি.... ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। এগুলি সবই বানোয়াট। কোনো জন্মগত বা বংশগত বিষয়ই আখিরাতের মুক্তি বা মর্যাদার বিষয় নয়। মানুষের ইচ্ছাকৃত কর্মই মূলত তার মুক্তির মাধ্যম। যার বুদ্ধি বেশি ও বুদ্ধি সৎকর্মে ব্যবহার করেন তিনি তার কর্মের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবেন। কিন্তু জন্মগত বা প্রকৃতিগত বুদ্ধি কোনো মুক্তি বা সাওয়াবের বিষয় নয়।

৭. খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘ জীবন

সূরা কাহাফের মধ্যে আল্লাহ মূসার (আ) সাথে আল্লাহর একজন বান্দার কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে এই বান্দার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই বান্দার নাম 'খাযির' (প্রচলিত বাংলায়: খিযির)। এই একটিমাত্র ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনায় খিযির (আ)-এর বিষয়ে কোনো সহীহ বর্ণনা জানা যায় না। তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, কর্ম, নবুয়ত, কর্মক্ষেত্র, এই ঘটনার পরবর্তী কালে তার জীবন ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোনো প্রকারের কোনো বর্ণনা কোনো সহীহ হাদীসে জানতে পারা যায় না। তিনি আবে হায়াতের পানি পান করেছিলেন ইত্যাদি কথা সবই ইহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত কথা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

আল্লামা মাউসিলী বলেন, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন বা কথা বলেছেন, তাঁর পরে বেঁচে আছেন, ইত্যাদি অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বালকে খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘ জীবন ও জীবিত থাকার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন... শয়তানই এই বিষয়টি মানুষদের মধ্যে প্রচারিত করেছে।

ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করা হয়, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) কি এখনো জীবিত আছেন? ইমাম বুখারী বলেন, তা অসম্ভব; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আজকের দুনিয়ায় যারা জীবিত আছেন তাদের সকলেই ১০০ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করবেন।

ইবনুল জাউযী খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) এর দীর্ঘজীবনের বিষয়ে বলেন, এই কথাটি কুরআনের আয়াতের পরিপন্থী। আল্লাহ কুরআন কারীমে এরশাদ করেছেন[২৭৬]: 'আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে?'।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো আলিম খিযিরের জীবিত থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বুযুর্গের কথার উপর নির্ভর করেছেন। তবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

৮. কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত

আল্লামা মাউসিলী বলেন, কুরআনের ফযীলতের বিষয়ে কিছু হাদীস সহীহ, তবে এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট হাদীস সমাজে প্রচার করা হয়েছে। নিম্নলিখিত সূরা বা আয়াতের বিষয়ে বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলত জ্ঞাপক সহীহ বা হাসান হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারাহ, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-ইমরান, সূরা কাহাফ, সূরা কাহাফের প্রথম বা শেষ দশ আয়াত, সূরা মুলক, সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। এছাড়া অন্যান্য সূরার ফযীলতে বর্ণিত হাদীসগুলি বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়া উপরের সূরাগুলির ফযীলতেও অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করা হয়েছে।

৯. আবু হানীফা (রাহ) ও শাফিয়ীর (রাহ) প্রশংসা বা নিন্দা

এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

১০. রোদে গরম করা পানি

রোদে গরম করা পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বা অমঙ্গল হতে পারে অর্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

১১. ওযুর পরে রুমাল ব্যবহার

ওযুর পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আর্দ্র অঙ্গগুলি মুছতেন বা মুছার জন্য রুমাল ব্যবহার করতেন বলে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

১২. সালাতের মধ্যে সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ

আল্লামা মাউসিলী বলেন, ইমাম দারাকুতনী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে সশব্দে 'বিসমিল্লাহ...' পাঠ করেছেন অর্থে বর্ণিত কোনো হাদীসই সহীহ নয়।

১৩. যার দায়িত্বে সালাত (কাযা) রয়েছে তার সালাত হবে না

ইমাম মাউসিলী বলেন, এই অর্থে বর্ণিত হাদীস ভিত্তিহীন।

১৪. মসজিদের মধ্যে জানাযার সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞা

আল্লামা মাউসিলী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

১৫. জানাযার তাকবীরগুলিতে হাত উঠানো

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযার প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোনো তাকবীরের সময় হাত উঠিয়েছেন বলে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

১৮. সালাতুর রাগাইব

সালাতুর রাগাইব বা রজব মাসের প্রথম জুম'আর দিনে বিশেষ নফল সালাতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

১৯. সালাতু লাইলাতিল মি'রাজ

মি'রাজের রাত্রিতে বিশেষ নফল সালাত আদায়ের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২০. সালাতু লাইলাতিন নিসফি মিন শা'বান

শবে বারাতের রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ কিছু রাক'আত নফল সালাতের বিশেষ ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২১. সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাত্রের জন্য বিশেষ নফল সালাত

আল্লামা মাউসিলী বলেন, এ বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তিনি আরো বলেন: নফল সালাতের বিষয়ে শুধুমাত্র নিম্নের সালাতগুলির বিষয়ে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে: ফরয সালাতের আগে পরে সুন্নাত সালাত, তারাবীহ, দোহা বা চাশত, রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু, ইসতিখারার সালাত, কুসূফের (চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের) সালাত, ইসতিসকার সালাত।[২৭৭]

২২. ঈদের তাকবীরের সংখ্যা

আল্লামা মাউসিলী বলেন, ইমাম আহমদ বলেছেন, ঈদের তাকবীরের সংখ্যার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত সকল হাদীসই যয়ীফ।[২৭৮]

২৩. সুন্দর চেহারার অধিকারীদের প্রশংসা

এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট।

২৪. আশুরার ফযীলত

আশুরার দিনে সিয়াম পালনের ফযীলত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। এছাড়া এই দিনে দান করা, খেযাব মাখা, তেল ব্যাবহার, সুরমা মাখা, বিশেষ পানাহার ইত্যাদি বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২৫. রজব মাসে সিয়ামের ফযীলত

রজব মাসে বা এই মাসের কোনো তারিখে নফল সিয়াম পালনের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২৬. ঋণ থেকে উপকার নেওয়াই সুদ

আল্লামা মাউসিলী বলেন, একটি কথা প্রচলিত আছে:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِباً

"যে কোনো কর্জ বা ঋণ থেকে উপকার নেওয়াই সুদ।" এ অর্থে বর্ণিত হাদীসের সনদ সহীহ নয়। সূদের জন্য হাদীসে সুনির্ধারিত সংজ্ঞা ও পরিচিতি রয়েছে।

২৭. অবিবাহিতদের প্রশংসায় কথিত সকল কথা ভিত্তিহীন।

২৮. ছুরি দিয়ে মাংস কেটে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খাওয়ার সময় ছুরি ব্যবহার বা ছুরি দিয়ে মাংস কেটে খাওয়া আ'জামীদের আচরণ, মুসলমানদের তা পরিহার করতে হবে। এই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুরি দিয়ে ছাগলের গোশত কেটে খেয়েছেন।

২৯. আখরোট, বেগুন, বেদানা, কিশমিশ, মাংস, তরমুয, গোলাপ, ইত্যাদির উপকার বা ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৩০. মোরগ বা সাদা মোরগের প্রশংসা বিষয়ক সকল কথা বানোয়াট।

৩১. আকীক পাথর ব্যবহার, বা অন্য কোনো পাথরের গুণাগুণ বিষয়ক সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৩২. স্বপ্নের কথা মহিলাদেরকে বলা যাবে না অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৩৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফার্সী ভাষায় কথা বলেছেন, বা ফার্সী ভাষার নিন্দা করেছেন এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট বা ভিত্তিহীন।

৩৪. জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৩৫. ফাসেক ব্যক্তির গীবত করার বৈধতা

প্রচলিত বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: "ফাসিকের গীবত নেই" অর্থাৎ ফাসিক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান

সত্য ও বাস্তব দোষের কথা উল্লেখ করলে তাতে গীবত হবে না বা গোনাহ হবে না। এই অর্থে বর্ণিত সকল কথা বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও বাতিল। এই প্রকার বানোয়াট কথা অগণিত মুমিনকে 'গীবতের' মত ভয়ঙ্কর পাপের মধ্যে নিপতিত করে।

৩৬. অমুক মাসে, অমুক সালে অমুক কিছু ঘটবে এইরূপ সন, তারিখ ও স্থানভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বানোয়াট।

৩৭. দাবা খেলার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক

হাদীস শরীফে শরীরচর্চা মূলক খেলাধুলার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ভাগ্যনির্ভর খেলাধুলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুদ্ধি নির্ভর কিন্তু শরীরচর্চা বিহীন দাবা খেলার বৈধতার বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকেই আলিমগণ মতভেদ করেছেন। অনেক সাহাবী এই খেলা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তবে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কিছু বর্ণিত হয় নি। আল্লামা মাউসিলী বলেন, এই অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ক হাদীসগুলি দুর্বল বা বানোয়াট পর্যায়ের।

২. ১. ৩. মোল্লা আলী কারী ও দরবেশ হূত

১০ম-১১শ হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ও হানাফী ফকীহ মোল্লা আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন হারাবী কারী (১০১৪ হি) রচিত বিভিন্ন মূল্যবান পুস্তকের মধ্যে দুইটি পুস্তক জাল হাদীস বিষয়ক। একটির নাম: 'আল-আসরারুল মারফুয়া' বা 'আল-মাউদূ'আাত আল-কুবরা' ও অন্যটির নাম 'আল-মাসনূ ফিল হাদীসিল মাউদূ' বা 'আল-মাউদূ'আত আস-সুগরা'। উভয় গ্রন্থের শেষে জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ সিরীয় আলিম ও সূফী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়েদ দরবেশ হূত (১২০৯-১২৭৬ হি) । তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলির একটি 'আসনাল মাতালিব'। এই গ্রন্থে তিনি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সহীহ, যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসের আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি জাল হাদীস বিষয়ক কিছু মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। এই দুই আলিমের উল্লিখিত মূলনীতিগুলির আলোকে আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি[২৭৯]:

২. ১. ৪. জাল হাদীস বিষয়ক কতিপয় মূলনীতি

১. ভবিষ্যতের যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক বর্ণনাসমূহ প্রায় সবই অনির্ভরযোগ্য ও গল্পকারদের বিবরণ।

ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির বিষয়ে অতি অল্প সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত ও প্রচলিত অধিকাংশ হাদীসই অনির্ভরযোগ্য বা ভিত্তিহীন।

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুদ্ধবিগ্রহের বা জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস বা মাগাযী বিষয়ক অধিকাংশ হাদীসের কোনো সনদ বা গ্রহণযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ে অল্প কিছু সহীহ হাদীস রয়েছে। বাকি সবই গল্পকারদের বৃদ্ধি। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনিও ইহূদী-খৃস্টানদের থেকে তথ্য গ্রহণ করতেন।

৩. তাফসীরের ক্ষেত্রে সহীহ সনদের তাফসীর ও শানে নুযূল খুবই কম। এ বিষয়ক অধিকাংশ 'হাদীস'-ই নির্ভরযোগ্য সনদ বা সূত্র বিহীন। বিশেষত, মুহাম্মাদ ইবনু সাইব 'আল-কালবী' (১৪৬হি) বর্ণিত সকল তাফসীরই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এছাড়া মুকাতিল ইবনু সুলাইমান (১৫০হি)-এর বর্ণিত তাফসীরও অনুরূপ। এরা জনশ্রুতি, ইহূদী-খৃস্টানদের ইসরাঈলীয় বর্ণনা ইত্যাদির সাথে অগণিত মিথ্যা মিশ্রিত করেছেন।

৪. নবীগণের কবর সম্পর্কে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাড়া অন্য কোনো নবীর কবর সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৫. মক্কা শরীফে অনেক সাহাবীর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কবরের স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 'মু'য়াল্লা' গোরস্থানে খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর 'কবর' বলে পরিচিত স্থানটিও কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে বলেন যে, এই স্থানটি খাদীজা (রা)-এর কবর। পরে ক্রমান্বয়ে তা মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

৬. মক্কায় ঠিক কোন্ স্থানটিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

৭. কুদায়ীর 'আশ-শিহাব' গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীসসমূহ

৪র্থ হিজরী শতকের পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীস সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসকল হাদীস গ্রন্থের মধ্যে কিছু গ্রন্থে সংকলিত প্রায় সকল হাদীসই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলির অন্যতম হলো ৫ম হিজরী শতকের মিশরীয় আলিম কাযি আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ আল-কুদায়ী (৪৫৪ হি) প্রণীত 'আশ-শিহাব' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিতে তিনি প্রায় ১৫০০ হাদীস সংকলন করেছেন। এর মধ্যে কিছু হাদীস পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে সংকলিত 'সিহাহ সিত্তা' বা অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংকলিত। অবশিষ্ট হাদীসগুলি তিনি নিজের সনদে সংকলন করেছেন। এই ধরনের হাদীসগুলি প্রায় সবই বানোয়াট, ভিত্তিহীন বা অত্যন্ত দুর্বল সনদে সংকলিত।

৮. ইবনু ওয়াদ'আনের 'চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থের সকল হাদীস

৫ম হিজরী শতকের অন্য একজন আলিম ছিলেন ইরাকের মাওসিলের কাযি আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াদ'আন (৪৯৪ হি)। তিনি 'আল-আরবাঈন' বা 'চল্লিশ হাদীস' নামে হাদীসের একটি সংকলন রচনা করেন। এই সংকলনের সকল হাদীসই জাল বা বানোয়াট কথা। ইমাম সুয়ূতী বলেন, এই 'চল্লিশ হাদীস' নামক গ্রন্থের হাদীস নামক জাল কথাগুলির বক্তব্য খুবই সুন্দর।

এগুলির মধ্যে হৃদয় গলানো ওয়ায রয়েছে। কিন্তু কথা সুন্দর হলেই তো তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কথা বলে গণ্য হবে না। বিশুদ্ধ সনদে তাঁর থেকে বর্ণিত হতে হবে। এই গ্রন্থের সকল হাদীসই জাল। তবে জালিয়াতগণ কোনো কোনো জাল হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের কিছু বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছে।

৯. শারাফ বালখী রচিত 'ফাযলুল উলামা' নামক বইয়ের সকল হাদীস।

১০. 'কিতাবুল আরূস' নামক একটি প্রচলিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে নব দম্পতি ও বিবাহিতদের বিষয়ে অনেক জাল কথা সংকলন করা হয়েছে। জালিয়াত বইটি ইমাম জাফর সাদিকের নামে প্রচার করেছে।

১১. তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আালিম 'হাকিম তিরমিযী' মুহাম্মাদ ইবনু আলী (মৃত্যু আনু. ৩২০ হি)। তিনি 'নাওয়াদিরুল উসূল' ও অন্যান্য আরো অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থগুলিতে অনেক জাল হাদীস রয়েছে। এমনকি মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, তিনি তাঁর গ্রন্থগুলিকে জাল হাদীস দিয়ে ভরে ফেলেছেন। ফলে তাঁর গ্রন্থের কোনো হাদীস নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না।

১২. ইমাম গাযালী (৫০৫হি) রচিত 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো হাদীস নিরীক্ষা ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম গাযালীর মহান মর্যাদা অনস্বীকার্য। তবে তিনি হাদীস উল্লেখের ব্যাপারে কোনো যাচাই বাছাই করেন নি। প্রচলিত কিছু গ্রন্থ ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে অনেক জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩. আল্লামা ইমাম আবুল লাইস সামারকানদী নাস্‌র ইবনু মুহাম্মাদ (৩৭৩ হি) রচিত 'তানবীহুল গাফিলীন' গ্রন্থের অবস্থাও অনুরূপ। এই গ্রন্থে অনেক মাউযূ বা জাল ও বানোয়াট হাদীস রয়েছে।

১৪. ৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ আলিম শু'আইব ইবনু আব্দুল আযীয খুরাইফীশ (৫৯৭ হি)। তিনি ওয়ায উপদেশ ও ফযীলত বিষয়ে 'আর-রাওদুল ফাইক' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গ্রন্থটিতেও অনেক জাল হাদীস স্থান পেয়েছে।

১৫. তাসাউফের গ্রন্থগুলিতে সূফী বুযুর্গগণের সরলতার কারণে অনেক জাল হাদীস স্থান পেয়েছে।

১৬. ইমাম হাকিম (৪০৫হি) তাঁর 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে অনেক যয়ীফ, মাউযূ ও বাতিল হাদীসকে 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে তিনি খুবই দুর্বলতা দেখিয়েছেন। এজন্য তাঁর মতামতের উপর নির্ভর করা যায় না।

১৭. কুদা'য়ীর 'আস-শিহাব' গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেন ৬ষ্ঠ শতকের একজন মুহাদ্দিস 'মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাবীব আল-আমিরী (৫৩০ হি)। তিনিও হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের বিষয়ে বিশেষ দুর্বলতা ও ঢিলেমি প্রদর্শন করেছেন। এই গ্রন্থের অনেক দুর্বল, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুর রাউফ মুনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর এ সকল ভুল উল্লেখ করেছেন। এজন্য নিরীক্ষা ছাড়া তাঁর মতামত অগ্রহণযোগ্য।

১৮. 'আলীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর ওসীয়ত' নামে প্রচলিত ওসীয়ত

আলী (রা) এর নামে একাধিক জাল ওসীয়ত প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ জাল ওসীয়ত-এর শুরুতে একটি বাক্য সহীহ হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। পরের সকল বাক্য জাল ও মিথ্যা। এই ওসীয়তের শুরুতে বলা হয়েছে: হে আলী মূসা (আ)-এর কাছে হারূন (আ)-এর মর্যাদা যেরূপ, আমার কাছেও তোমার মর্যাদা সেরূপ। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই।' জালিয়াত এই বাক্যটি সহীহ হাদীস থেকে নিয়েছে। এরপর বিভিন্ন ভিত্তিহীন কথা উল্লেখ করেছে। যেমন, হে আলী, মুমিনের আলামত তিনটি... মুনাফিকের আলামত... হিংসুকের আলামত.... পুরো ওসীয়তটিই বাতিল, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথায় ভরা। মাঝে মধ্যে দুই একটি সহীহ হাদীসের বাক্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২৮০]

এ ছাড়াও আলী (রা) এর নামে আরো একাধিক ওসীয়ত জালিয়াতগণ তৈরি করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 'আলীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত' নামে প্রচলিত সবই জাল। তবে এগুলির মধ্যে জালিয়াতগণ দুই একটি সহীহ হাদীসের বাক্য ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেগুলি অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে।

১৯. আবূ হুরাইরার প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত

আবূ হুরাইরার (রা) উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত নামে আরেকটি জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এই ওসীয়তটিও আগাগোড়া জাল ও মিথ্যা। তবে জালিয়াতগণ তাদের অভ্যাসমত এর মধ্যে অন্য সনদে বর্ণিত দুই চারটি সহীহ হাদীসের বাক্য জোড়াতালি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে।[২৮১]

২০. বিলালের মদীনা পরিত্যাগ ও স্বপ্ন দেখে মদীনায় আগমনের কাহিনী

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে বিলাল (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ছেড়ে সিরিয়া এলাকায় গমন করেন এবং সিরিয়াতেই বসবাস করতেন। কথিত আছে যে, একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে যিয়ারতের উৎসাহ দিচ্ছেন। তখন তিনি মদীনায় আগমন করেন.... ইত্যাদি। আল্লামা কারী বলেন, সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন যে, এই কাহিনীটি বানোয়াট। সম্ভবত, ইবনু হাজার মাক্কী ইমাম সুয়ূতীর এই আলোচনা দেখতে পান নি; এজন্য তিনি এই জাল কাহিনীটিকে তার যিয়ারত বিষয়ক পুস্ত কটিতে উল্লেখ করেছেন।

২১. সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের বা রাতের জন্য বিশেষ নামাযের বিষয়ে বর্ণিত সব কিছু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে আশুরার দিনের বা রাতের নামায, রজব মাসের প্রথম রাতের নামায, রজব মাসের অন্যান্য দিন বা রাতের নামায, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের নামায ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

আল্লামা আলী কারী বলেন, কূতুল কুলূব, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, তাফসীরে সা'আলিবী ইত্যাদি গ্রন্থে এ সকল হাদীস রয়েছে দেখে পাঠক ধোঁকা খাবেন না। এগুলি সবই বানোয়াট।

২২. হাসান বসরী হযরত আলী (রা) থেকে খিরকা বা সূফী তরীকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলে যা কিছু প্রচলিত আছে সবই ভিত্তিহীন বাতিল কথা।

২৩. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমার (রা) ও আলী (রা)-কে তার জামা বা খিরকা দিয়েছিলেন উয়াইস কারণীকে পৌঁছে দেবার জন্য এবং তাঁরা তাঁকে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন মর্মে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন।

২৪. কুতুব -আকতাব, গওস, নকীব-নুকাবা, নাজীব-নুজাবা, আওতাদ ইত্যাদি বিষয়ক সকল হাদীস বাতিল ও ভিত্তিহীন।

২৫. মেহেদি বা মেন্দির বিশেষ ফযীলত বা প্রশংসায় বর্ণিত সকল হাদীস ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। শুধুমাত্র মেহেদি দিয়ে খেযাব দেওয়ার উৎসাহ জ্ঞাপক হাদীসগুলি নির্ভরযোগ্য।

২৬. আজগুবি সাওয়াব বা শাস্তি

মুহাদ্দিসগণ সনদ বিচার ছাড়াও যে সমস্ত আনুষঙ্গিক অর্থ ও তথ্যগত বিষয়কে জাল হাদীসের চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো অস্বাভাবিক সাওয়াব বা শাস্তির বিবরণ।

বিভিন্ন প্রকারের সামান্য নফল ইবাদত বা অত্যন্ত সাধারণ ইবাদত, যিকির, দোয়া, কথা, কর্ম বা চিন্তার জন্য অগণিত আজগুবি সাওয়াবের বর্ণনা। এক্ষেত্রে জালিয়াতগণ কখনো সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যিকির, সালাত, দোয়া বা ইবাদতের এইরূপ আজগুবি সাওয়াব বলেছে। কখনো বা বানোয়াট যিকির, সালাত, সিয়াম ইবাদত তৈরি করে তার বানোয়াট আজগুবি সাওয়াব বর্ণনা করেছে। এসকল জাল হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি একবার অমুক যিকির বলবে, অমুক বা অমুক কাজটি করবে তার জন্য এক লক্ষ নেকী, একলক্ষ পাপ মোচন...। অথবা তার জন্য জান্নাতে একলক্ষ বৃক্ষ রোপন, প্রত্যেক গাছের... গোড়া স্বর্ণের... ডালপালা... পাতা... ইত্যাদি কাল্পনিক বর্ণনা...। অথবা তার জন্য একলক্ষ শহীদের সাওয়াব, সিদ্দীকের সাওয়াব...। অথবা তার জন্য একটি ফিরিশতা/পাখি বানানো হবে, তার এত হাজার বা এত লক্ষ মুখ থাকবে... ইত্যাদি। অথবা অমুক দোয়া পাঠ করলে লোহা গলে যাবে, প্রবাহিত পানি থেমে যাবে.. প্রত্যেক অক্ষরের জন্য এত লক্ষ ফিরিশতা.... ইত্যাদি।

২৭. স্বাভাবিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিপরীত কথা

এই জাতীয় বানোয়াট কথাগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ' বা 'বেগুন যে নিয়্যাতে খাওয়া হবে সেই নিয়্যাত পূরণ হবে'।

২. 'যদি কেউ কোনো কথা বলে এবং সে সময়ে কেউ হাঁচি দেয় তাহলে তা সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।'

৩. তোমরা ডাল খাবে; কারণ ডাল বরকতময়। ডাল কলব নরম করে এবং চোখের পানি বাড়ায়। ৭০ জন নবী ডালের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

৫. স্বর্ণকার, কর্মকার ও তাঁতীগণ সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদী।

২৮. অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর বা ফালতু বিষয়ের আলোচনা

যে সকল কথা সাধারণ জ্ঞানী মানুষেরা আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়, সকল জ্ঞানীর সরদার সাইয়িদুল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে বিষয়ে কথা বলতে পারেন না। এই জাতীয় কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. চাউল যদি মানুষ হতো তাহলে ধৈর্যশীল হতো, কোনো ক্ষুধার্ত তা খেলেই পেট ভরে যেত।
২. আখরোট ঔষধ ও পনির রোগ। দুইটি একত্রে পেটে গেলে রোগমুক্তি।
৩. তোমরা লবণ খাবে। লবণ ৭০ প্রকার রোগের ঔষধ।
৪. তারকাপুঞ্জ আরশের নিচে একটি সাপের ঘাম...।
৫. আল্লাহ ক্রোধান্বিত হলে ফার্সী ভাষায় ওহী নাযিল করেন।
৬. সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুন্দর চেহারাকে আল্লাহ জাহান্নামে শাস্তি দিবেন না।
৭. চোখের নীল রং শুভ।
৮. আল্লাহ মাথার টাকের মাধ্যমে কিছু মানুষকে পবিত্র করেছেন, যাদের মধ্যে প্রথম আলী (রা)।
৯. নাকের মধ্যে পশম গজানো কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপত্তা দেয়।
১০. কান ঝিঁঝিঁ করা বা কান ডাকা বিষয়ক হাদীসগুলি বানোয়াট।

এ প্রকারের বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গাছ, শবজি, ঔষধি ইত্যাদির উপকার বর্ণনায় প্রচারিত হাদীস। অনুরূপভাবে মোরগ, সাদা মোরগ ইত্যাদির ফযীলতে বানোয়াট হাদীসও এই পর্যায়ভুক্ত।

২৯. চিকিৎসা, টোটকা বা খাদ্য বিষয়ক অধিকাংশ কথাই বানোয়াট।

এই জাতীয় ফালতু কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. অমুক অমুক কাজে স্মৃতিশক্তি কমে বা লোপ পায়। অমুক কাজে অমুক রোগ হয়। অমুক কাজ করলে অমুক রোগ দূর হয়... ইত্যাদি।

২. অমুক খাদ্যে কোমর মজবুত হয়। অমুক খাদ্যে সন্তান বেশি হয়। মুমিন মিষ্ট এবং সে মিষ্টি পছন্দ করে। ঝুটা মুখে খেজুর খেলে ক্রিমি মরে।

৩০. উজ পালোয়ান, কোহে কাফ ইত্যাদি বাস্তবতা বিবর্জিত কথাবার্তা

এই জাতীয় ভিত্তিহীন বাতিল কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে:

১. উজ ইবনু উনুক বা ওজ পালোয়ানের কাল্পনিক দৈর্ঘ...'উজ পালোয়ান' বিষয়ক সকল কথাই মিথ্যা ও বানোয়াট।
২. কোহে কাফ বা কাফ পাহাড়ের বর্ণনায় প্রচারিত ও বর্ণিত হাদীস সমূহ। এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন, জাল ও মিথ্যা।
৩. পৃথিবী পাথরের উপর পাথর একটি ষাঁড়ের শিঙ-এর উপর। ..../ একটি মাছের উপরে .../ ষাঁড়টি নড়লে শিং নড়ে আর ভুমিকম্প হয়...। এ জাতীয় সকল কথাই মিথ্যা ও বানোয়াট, যা অসৎসাহসী ও নির্লজ্জ জালিয়াতগণ হাদীসের নামে প্রচার করেছে।

৩১. বিশুদ্ধ হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী কথাবার্তা

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা হলো, আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে কর্মের উপর, নাম বা বংশের উপর নয়। অনুরূপভাবে কর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হলো ফরয, যা করা অত্যাবশক ও হারাম যা বর্জন করা অত্যাবশক। এরপর ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব ইত্যাদি কর্ম রয়েছে। সমাজে অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে যা এ ইসলামী শিক্ষার স্পষ্ট বিরোধী। সনদ বিচারে সেগুলি দুর্বল বা জাল বলে প্রমাণিত। তবে সনদ বিচার ছাড়া শুধ অর্থ বিচার করলেও এর জালিয়াতি ধরা পড়ে।

যেমন, অনেক হাদীসে সামান্য মুস্তাহাব কর্মের পুরস্কার বা সাওয়াব হিসাবে বলা হয়েছে, এই কর্ম করলে তাকে জাহান্নমের আগুন স্পর্শ করবে না বা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে... ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ বা আহমাদ নাম হওয়ার কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। এই প্রকারের সকল হাদীস বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২. ২. মহান স্রষ্টা কেন্দ্রিক জাল হাদীস

১. আল্লাহকে কোনো আকৃতিতে দেখা

চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না বলে কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে:

لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত।"[২৮২]

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া তার সাথে কথা বলবেন।"[২৮৩]

অন্যত্র এরশাদ করা হয়েছে: "মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বলেন: তুমি কখনই আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চুর্ণ-বিচুর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল...।[২৮৪]

কুরআন কারীমের এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, পৃথিবীতে কেউ আল্লাহকে দেখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একটি সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয় নি, যাতে তিনি বলেছেন যে, "আমি জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে বা মি'রাজে চর্ম চক্ষে বা অন্তরের চক্ষে আল্লাহকে দেখেছি।" স্বপ্নের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগ্রত অবস্থায় অন্তরের দৃষ্টিতে আল্লাহকে দেখেছেন কিনা সে বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন: "যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যা কথা বলে।"[২৮৫] ইবনু মাসঊদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবীও এই মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন। আল্লাহ যেমন মূসাকে (আ) 'কথা বলার' মুজিযা প্রদান করেছিলেন, তেমনি তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অন্তরের দৃষ্টিতে দর্শনের মুজিযা দান করেছিলেন।[২৮৬]

যারা 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দর্শন দাবি করেছেন, তাঁরা একমত যে, এই দর্শন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য একটি বিশেষ মুজিযা, যা আর কারো জন্য নয় এবং এই দর্শন হৃদয়ের অনুভব, যেখানে কোনো আকৃতির উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহকে কোনো 'আকৃতি'তে দেখেছেন, অথবা তিনি ছাড়া কোনো সাহাবী আল্লাহকে দেখেছেন বলে যা কিছু বর্ণিত সবই জাল ও মিথ্য।

মি'রাজের রত্রিতে বা আরাফার দিনে, বা মিনার দিনে বা অন্য কোনো সময়ে বা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মহান প্রভু মহিমাময় আল্লাহকে বিশেষ কোনো আকৃতিতে দেখেছেন অর্থে সকল হাদীস বানোয়াট। যেমন, তাকে যুবক অবস্থায় দেখেছেন, তাজ

পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন, উটের পিঠে বা খচ্চরের পিঠে দেখেছেন বা অনুরূপ সকল কথা বানোয়াট ও মিথ্যা।[২৮৭]

এজাতীয় ভিত্তিহীন একটি বাক্য হলো:

رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ صُوْرَةِ شَابٍ أَمْرَدَ

"আমি আমার প্রভুকে একজন দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি এমন যুবক রূপে দেখেছি।" মুহাদ্দিসগণ বাক্যটিকে জাল বলে ঘোষণা করেছেন।[২৮৮]

অনুরূপভাবে উমরের (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "আমার প্রভুর নূর দ্বারা আমার অন্তর আমার প্রভুকে দেখেছে।" আলীর (রা) নামে জালিয়াতগণ বানিয়েছে: "যে প্রভুকে আমি দেখিনা সে প্রভুর ইবাদত করি না।"[২৮৯]

২. ৭, ৭০ বা ৭০ হাজার পর্দা

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নূরের পর্দা রয়েছে।[২৯০] তবে পর্দার সংখ্যা, প্রকৃতি ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। কিছু হাদীসে আল্লাহর পর্দার সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ওয়াযে "৭০ হাজার নূরের পর্দা" "৭০ টি পর্দা", "৭টি পর্দা" ইত্যাদির কথা বলা হয়। মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে, এ অর্থের হাদীসগুলি কিছু সন্দেহাতীতভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা আর কিছু যয়ীফ, দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য কথা।[২৯১]

৩. আরশের নিচের বিশাল মোরগ বিষয়ে

আমাদের সমাজে ওয়াযে আলোচনায় অনেক সময় আরশের নিচের বিশাল মোরগ, এর আকৃতি, এর ডাক ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়। এ সংক্রান্ত হাদীসগুলি ভিত্তিহীন বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল।[২৯২]

৪. যে নিজেকে চিনল সে আল্লাহকে চিনল

আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মাঝে অতি প্রচলিত একটি বাক্য:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে নিজেকে জানল সে তার প্রভুকে (আল্লাহকে) জানল।" অথবা "যে নিজেকে চিনল সে তার প্রভুকে চিনল"। অনেক আলেম তাদের বইয়ে এই বাক্যটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বা হাদীস বলে সনদবিহীন ভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একবাক্যে বলছেন যে, এই বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়, কোনো সনদেই তাঁর থেকে বর্ণিত হয়নি। কোনো কোনো মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, বাক্যটি ৩য় হিজরী শতকের একজন সূফী ওয়ায়েয ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায আল-রাযী (২৫৮ হি:)-র নিজের বাক্য। তিনি ওয়াজ নসিহতের সময় কথাটি বলতেন, তার নিজের কথা হিসাবে, হাদীস হিসাবে নয়। পরবর্তীতে অসতর্কতা বশত কোনো কোনো আলিম বাক্যটিকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯৩]

৫. মুমিনের কালব আল্লাহর আরশ

আমদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মাঝে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য: "মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।" এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্য প্রচলিত, যেমন:

الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ : হৃদয় প্রভুর বাড়ি।

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ : মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

مَا وَسِعَنِيْ أَرْضِيْ وَلاَ سَمَائِيْ وَلَكِنْ وَسِعَنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ

আমার যমিন এবং আমার আসমান আমাকে ধারণ করতে পারেনি, কিন্তু আমার মুমিন বান্দার কলব বা হৃদয় আমাকে ধারণ করেছে।

এগুলো সবই বানোয়াট বা জাল হাদীস। কোনো কোনো লেখক এই ধরণের বাক্যগুলিকে তাঁদের গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের হাফেয যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ অনেক গবেষণা করেও এগুলোর কোন সনদ পান নি, বা কোন হাদীসের গ্রন্থে এগুলোর উল্লেখ পান নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সনদেই এ সকল কথা বর্ণিত হয়নি। এ জন্য তাঁরা এগুলোকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২৯৪]

৬. আমি গুপ্তভাণ্ডার ছিলাম

প্রচলিত একটি বানোয়াট কথা যা হাদীস নামে পরিচিত:

كُنْتُ كَنْزًا لاَ يُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لأُعْرَفَ

"আমি অজ্ঞাত গুপ্তভাণ্ডার ছিলাম। আমি পরিচিত হতে পছন্দ করলাম। তখন আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম; যেন আমি পরিচিত হই।"

ইতোপূর্বে বলেছি যে, প্রচলিত জাল হাদীসগুলি দু প্রকারের। এক প্রকারের জাল হাদীসের সনদ আছে এবং কোনো গ্রন্থে সনদসহ তা সংকলিত। সনদ নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসিগণ সেগুলির জালিয়াতি ধরতে পেরেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জাল হাদীস যেগুলি কোনো গ্রন্থেই সনদসহ সংকলিত হয় নি। অথচ লোকমুখে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং লোকমুখের প্রচলনের ভিত্তিতে কোনো কোনো আলিম তার গ্রন্থে সনদ ছাড়া তা উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারের সম্পূর্ণ অস্তিত্ববিহীন ও সনদবিহীন বানোয়াট একটি কথা এ বাক্যটি।[২৯৫]

৭. কিয়ামতে আল্লাহ মানুষদেরকে মায়ের নামে ডাকবেন

আরেকটি বানোয়াট ও মিথ্যা কথা হলো: কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষদেরকে মায়ের নামে ডাকবেন। এই বাক্যটি একদিকে বানোয়াট বাতিল কথা, অপরদিকে সহীহ হাদীসের বিপরীত। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষদের পরিচয় পিতার নামের সাথে প্রদান করা হবে। বলা হবে, অমুক, পিতা অমুক বা অমুক ব্যক্তির পুত্র অমুক।[২৯৬]

৮. জান্নাতের অধিবাসীদের দাড়ি থাকবে না

জান্নাতের অধিবাসীগণের কোন দাড়ি থাকবে না। সবাই দাড়িহীন যুবক হবেন। শুধুমাত্র আদমের (আ) দাড়ি থাকবে। কেউ বলেছে: শুধুমাত্র মূসার (আ), বা হারুনের (আ) দাড়ি থাকবে বা ইবরাহীম (আ) ও আবু বাকরের (রা) দাড়ি থাকবে। এ গুলি সবই বানোয়াট ও বাতিল কথা।[২৯৭]

৯. আল্লাহ ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা

প্রচলিত একটি মিথ্যা হাদীস:

اَلتَّفَكُّرُ فِيْ عَظَمَةِ اللهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ

মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে এক মুহুর্ত চিন্তা বা ফিকির করা সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে উত্তম।[২৯৮]

২. ৩. পূর্ববর্তী সৃষ্টি ও নবীগণ ও তাফসীর বিষয়ক

পূর্ববর্তী সৃষ্টি, পূর্ববর্তী নবীগণ ও ঘটনা কাহিনীর বিষয়ে কুরআন কারীম সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। শুধুমাত্র যে বিষয়গুলিতে মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক শিক্ষা রয়েছে সেগুলিই আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল সৃষ্টি ও নবীগণের ঘটনা ইহূদীদের মধ্যে অনেক বিস্তারিতভাবে প্রচলিত।

কুরআন কারীমে যেহেতু এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা নেই, সে জন্য সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই অনেক মুফাস্সির এ সকল বিষয়ে ইহূদীদের বর্ণনা কৌতুহলের সাথে শুনতেন। পাশাপাশি তাবিয়ী পর্যায়ে অনেক ইহূদী আলিম ইসলাম গ্রহণ করার পরে এ সকল বিষয়ে তাদের সমাজে প্রচলিত অনেক গল্প কাহিনী মুসলিমদের মধ্যে বলেছেন।

এ সকল গল্প-কাহিনী গল্প হিসেবে শুনতে বা বলতে মূলত ইসলামে নিষেধ করা হয় নি। তবে এগুলিকে সত্য মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সির ও ঐতিহাসিক পূর্ববর্তী নবীগণ বিষয়ক বিভিন্ন আয়াতের তাফসীরে ও তাদের জীবন কেন্দ্রিক ইতিহাস বর্ণনায় ইহূদী-খৃস্টানগণের বিকৃত বাইবেল ও অন্যান্য সত্য-মিথ্যা গল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। প্রথম যুগগুলিতে মুসলিমগণ গল্প হিসেবেই এগুলি শুনতেন। তবে পরবর্তী যুগে এ সকল কাহিনীকে মানুষেরা সত্য মনে করেছেন। কেউ কেউ এগুলিকে হাদীস বলে প্রচার করেছেন।

কুরআনে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, ইহূদী ও খৃস্টানগণ তাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলকে বিকৃত করেছে। অনেক কথা তারা নিজেরা রচনা করে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়েছে। এজন্য হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কথা বর্ণনা করা যাবে, তবে শর্ত হলো, কুরআনের সত্যায়ন ছাড়া কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। সাহাবীগণ ইহূদী-খৃস্টানদের তথ্যের উপর নির্ভর করার নিন্দা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْدَثُ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا أَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟

"কিভাবে তোমরা ইহূদী খৃস্টানদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর? "অথচ তোমাদের পুস্তক (অর্থাৎ কুরআন) যা রাসূলুল্লাহ

(ﷺ)-এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তা নবীনতর, তোমরা তা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাঠ করছ, যার মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি প্রবেশ করতে পারেনি। এই কুরআন তোমাদেরকে বলে দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অনুসারীগণ (ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য জাতি) আল্লাহর পুস্তককে (তাওরাত-ইঞ্জিল ইত্যাদি) পরিবর্তন করেছে এবং বিকৃত করেছে। তারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে বলেছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। পার্থিব সামান্য স্বার্থ লাভের জন্য তারা এরূপ করেছে। তোমাদের নিকট যে জ্ঞান আগমন করেছে (কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান) তা কি তোমাদেরকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করা থেকে নিবৃত করতে পারে না?"[২৯৯]

এতকিছু সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে মুসলিম সমাজে অগণিত 'ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত' প্রবেশ করতে থাকে। পরবর্তী যুগে মুসলিমগণ এগুলিকে কুরআনের বা হাদীসের কথা বলেই বিশ্বাস করতে থাকেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের পরিসরে সম্ভব নয়। এজন্য সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি। আল্লাহর দয়া ও তাওফীক হলে এই বইয়ের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব।

১. বিশ্ব সৃষ্টির তারিখ বা বিশ্বের বয়স বিষয়ক

বিশ্ব সৃষ্টির তারিখ, সময়, বিশ্বের বয়স, আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত বা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত সময়ের হিসাব, আর কতদিন বিশ্ব থাকবে তার হিসাব ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক কথা বানিয়েছে।

ইহূদী ও খৃস্টানগণের 'বাইবেলে' বিশ্বের বয়স প্রদান করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সময় বলা হয়েছে। বাইবেলের হিসাব অনুসারে বর্তমানে বিশ্বের বয়স ৭০০০ (সাত হাজার) বৎসর মাত্র। এ সকল কথা ঐতিহাসিভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত। এ সকল মিথ্যা ও ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে মুসলিম ঐতিহাসিকগণও অনেক কথা লিখেছেন। আর জালিয়াতগণ এই মর্মে অনেক জাল হাদীসও বানিয়েছে।

২. মানুষের পূর্বে অন্যান্য সৃষ্টির বিবরণ

মানব জাতির পূর্বে অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এই বিশ্বে ছিল কিনা সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। তবে মানুষের পূর্বে মহান আল্লাহ জিন জাতিকে মানুষের মতই বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি ও ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। জিন জাতির সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ কুরআন কারীমে নেই। কোনো সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ক কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

জিন জাতির সৃষ্টি রহস্য, জিন জাতির আদি পিতা, জিন জাতির কর্মকাণ্ড, জিন জাতির নবী-পয়গম্বর, তাদের আযাব-গযব, তাদের বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, নবী-রাসূলের নাম ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই ইহূদী খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার, লোককথা ও অনির্ভরযোগ্য গল্প-কাহিনী।

কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবলিস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আদমকে সাজদা করার নির্দেশ অমান্য করে সে অভিশপ্ত হয়। এই ঘটনার পূর্বে তার জীবনের কোনো ইতিহাস সম্পর্কে কোনো সহীহ বর্ণনা নেই। ইবলিসের জন্ম-বৃত্তান্ত, বংশ ও কর্ম তালিকা, জ্ঞান-গরিমা, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বিভিন্ন মানুষরে কথা, ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াত বা অনির্ভরযোগ্য বিবরণ। 'কাসাসুল আম্বিয়া' জাতীয় পুস্তকগুলি এ সকল মিথ্যা কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

৩. সৃষ্টির সংখ্যা: ১৮ হাজার মাখলুখাত

একটি বহুল প্রচলিত কথা হলো: "আঠারো হাজর মাখলুকাত", অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে সৃষ্ট প্রাণীর জাতি-প্রজাতির সংখ্যা হলো ১৮ হাজার। এই কথাটি একান্তই লোকশ্রুতি ও কোনো কোনো আলিমের মতামত। আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির সংখ্যা কত লক্ষ বা কত কোটি সে বিষয়ে কোনো তথ্য কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

৪. নবী-রাসূলগণের সংখ্যা: ১ বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর

কুরআন কারীম থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল জাতি ও সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এরশাদ করা হয়েছে:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ

"প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়েছে।"[৩০০]

এ সকল নবী-রাসূলের মোট সংখ্যা কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। বরং কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে যে, এই নবী-রাসূলগণের কারো কথা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ﷺ) জানিয়েছেন এবং কারো কথা তিনি তাঁকে জানান নি। এরশাদ করা হয়েছে:

وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আপনাকে বলিনি।"[৩০১]

আমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কথা যে নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার বা ২ লক্ষ ২৪ হাজার। এখানে লক্ষণীয়

যে, নবী-রাসূলগণের সংখ্যার বিষয়ে কোনো একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। একাধিক যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসে এ বিষয়ে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। ২ লক্ষ ২৪ হাজারের স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোনো সনদ-সহ হাদীস আমি কোথাও দেখতে পাই নি। তবে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ও অন্য কিছু সংখ্যা এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপঃ

ক. ১ লক্ষ ২৪ হাজার

একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কিন্তু সবগুলি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই অর্থের হাদীসকে জাল বলে গণ্য করেছেন।

ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস তাদের সনদে ইবরাহীম ইবনু হিশাম ইবনু ইয়াহইয়া আল-গাস্‌সানী (২৩৮ হি) নামক তৃতীয় হিজরী শতকের একজন রাবীর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই ইবরাহীম বলেন, আমাকে আমার পিতা, আমার দাদা থেকে, তিনি আবূ ইদরীস খাওলানী থেকে, তিনি আবূ যার গিফারী থেকে বলেছেনঃ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمِ الأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفاً قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْهُمْ قَالَ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جَمٌّ غَفِيْرٌ

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এদের মধ্যে রাসূল কত জন? তিনি বলেন, তিন শত তের জন, অনেক বড় সংখ্যা।"[৩০২]

হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু হিশামের বিষয়ে মুহাদ্দিসদের কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তাবারানী ও ইবনু হিব্বান তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী রাবী বলে চিহ্নিত করেছেন। আবূ যুরআ বলেনঃ লোকটি কায্যাব বা মহা-মিথ্যাবাদী। আবূ হাতিম রাযী তার নিকট হাদীস গ্রহণ করতে গমন করেন। তিনি তার নিকট থেকে তার পাণ্ডুলিপি নিয়ে তার মৌখিক বর্ণনার সাথে মিলিয়ে অগণিত বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্য দেখতে পান। ফলে তিনি বলেনঃ বুঝা যাচ্ছে যে, লোকটি কখনো হাদীস শিক্ষার পিছনে সময় ব্যয় করেনি। লোকটি মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়। যাহাবী তাকে মাতরূক বা পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৩]

যেহেতু হাদীসটি একমাত্র ইবরাহীম ইবনু হিশাম ছাড়া আর কেউ বর্ননা করেন নি, সেহেতু ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।[৩০৪]

ইমাম আহমদ এ অর্থে অন্য একটি হাদীস সংকলন করেছেন। এ হাদীসে মু'আন ইবনু রিফা'আহ নামক একজন রাবী বলেন, আমাকে আলী ইবনু ইয়াযিদ বলেছেন, কাসিম আবূ আব্দুর রাহমান থেকে, তিনি আবূ উমামা (রা) থেকে... নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলেন ১ লক্ষ ২৪ হাজার... ।"[৩০৫]

এই হাদীসের রাবী মু'আন ইবনু রিফা'আহ আস-সুলামী কিছুটা দুর্বল রাবী ছিলেন।[৩০৬] তার উস্তাদ আলী ইবনু ইয়াযিদ আরো বেশি দুর্বল ছিলেন। ইমাম বুখারী তাকে 'মুনকার' বা 'আপত্তিকর' বলেছেন। ইমাম নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে 'পরিত্যক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০৭] তার উস্তাদ কাসিম আবূ আব্দুর রাহমানও (১১২ হি) দুর্বল ছিলেন। এমনকি ইমাম আহমদ, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, কাসিম সাহাবীগণের নামে এমন অনেক কথা বর্ণনা করেন যে,মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ভুলগুলি বলছেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি ৪০ জন বদরী সাহাবীকে দেখেছেন, অথচ তাঁর জন্মই হয়েছে প্রথম শতকের মাঝামাঝি।[৩০৮]

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এই হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল। আরো দু একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে এ সংখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে এ সংখ্যাটি 'মাউযূ' না হলেও দুর্বল বলে গণ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।[৩০৯]

খ. ৮ হাজার পয়গম্বর

আবূ ইয়ালা মাউসিলী মূসা ইবনু আবীদাহ আর-রাবাযী থেকে, তিনি ইয়াযিদ ইবনু আবান আর-রাকাশী থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

بَعَثَ اللهُ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ نَبِيٍّ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَأَرْبَعَةَ آلاَفٍ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ

মহান আল্লাহ ৮ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। ৪ হাজার নবী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এবং বাকী চার হাজার অবশিষ্ট মানব জাতির মধ্যে।"[৩১০]

এই হাদীসটিও দুর্বল। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, এই সনদটিও দুর্বল। আর-রাবাযী দুর্বল। তার উস্তাদ রাকাশী তার চেয়েও

দুর্বল।" ইবনু কাসীর আলোচনা করেছেন যে, আরো একটি সনদে এই সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। সনদটি বাহ্যত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৩১১]

গ. এক হাজার বা তারও বেশি পয়গম্বর

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

إِنِّيْ خَاتِمُ أَلْفِ نَبِيٍّ أَوْ أَكْثَرَ

"আমি এক হাজার বা তারো বেশি নবীর শেষ নবী।"[৩১২]

ইবনু কাসীর, হাইসামী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, সংখ্যার বর্ণনায় অন্যান্য হাদীসের চেয়ে এই হাদীসটি কিছুটা গ্রহণযোগ্য, যদিও এর সনদেও দুর্বলতা রয়েছে।[৩১৩]

৫. নবী-রাসূলগণের নাম

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছেঃ আদম[৩১৪], ইদরিস[৩১৫], নূহ[৩১৬], হুদ[৩১৭], সালিহ[৩১৮], ইবরাহীম[৩১৯], লূত[৩২০], ইসমাঈল[৩২১], ইসহাক[৩২২], ইয়াকূব[৩২৩], ইউসূফ[৩২৪], আইয়ূব[৩২৫], শুয়াইব[৩২৬], মূসা[৩২৭], হারূন[৩২৮], ইউনূস[৩২৯], দাউদ[৩৩০], সুলাইমান[৩৩১], ইল্ইয়াস[৩৩২], ইল্ইয়াসা'[৩৩৩], যুলকিফল[৩৩৪], যাকারিয়া[৩৩৫], ইয়াহইয়া[৩৩৬], ঈসা[৩৩৭], মুহাম্মাদ[৩৩৮] (صلى الله عليهم وسلم)।[৩৩৯]

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহূদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।[৩৪০] কিন্তু তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

مَا أَدْرِيْ أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ

"আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না।"[৩৪১]

মূসার খাদেম হিসাবে ইউশা ইবনু নূন-এর নাম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত কোনো সহীহ হাদীসে অন্য কোনো নবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। কোনো কোনো অত্যন্ত যয়ীফ বা জাল হাদীসে আদম (আ) এর পুত্র "শীস"-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কালুত, হাযকীল, হাযালা, শামূয়েল, জারজীস, শামঊন, ইরমিয়, দানিয়েল প্রমুখ নবীগণের নাম, জীবণবৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরাঈলীয় বর্ণনা ও সেগুলির ভিত্তিতে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মতামত।

৬. আসমানী সহীফার সংখ্যা

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, তিনি নবী ও রাসূলগণকে গ্রন্থাদি প্রদান করেছেন। কিন্তু এ সকল

কিতাব ও সহীফার কোনো সংখ্যা কুরআন কারীমের বা কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। '১০৪' কিতাব ও সহীফার কথাটি আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীসে কথাটি পাওয়া যায় না। উপরে ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর' বিষয়ক যে হাদীসটি আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সে হাদীসের মধ্যে এই ১০৪ সহীফা ও কিতাবের কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসটি জাল অথবা অত্যন্ত দুর্বল।

৭. নবী-রাসূলগণের বয়স বিষয়ক বর্ণনা

কুরআন কারীমে নূহ (আ)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো নবীর আয়ুষ্কাল কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয় নি। আদম (আ) এর আয়ুষ্কাল ১ হাজার বৎসর বলে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ক আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নবীগণের আয়ুষ্কাল বিষয়ক যা কিছু আমাদের দেশে প্রচলিত বই পুস্তকে লিখিত রয়েছে সবই ইহূদী খৃস্টানগণের বিকৃত গ্রন্থাবলি থেকে গৃহীত তথ্য।

৮. নবী-রাসূলগণের জীবন-বৃত্তান্ত

উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের (আ) জীবনবৃত্তান্ত কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। ইলইয়াস, ইলইয়াসা' ও যুলকিফল (আ) সম্পর্কে শুধুমাত্র নাম উল্লেখ ছাড়া কিছুই বলা হয় নি। ইদরিস (আ)-এর বিষয়টিও প্রায় অনুরূপ। অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনের শিক্ষণীয় কিছু দিক শুধু আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা অধিকাংশই ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াত ও জনশ্রুতি। আমাদের দেশের প্রচলিত 'কাসাসুল আম্বিয়া' ও বিভিন্ন নবীর জীবনী বিষয়ক পুস্তকাদিতে যা কিছু লিখা হয়েছে তার অধিকাংশই এ সকল জাল, ভিত্তিহীন ও ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াতের সমষ্টি। এই গ্রন্থের সীমিত পরিসরে এ সকল দিক বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এছাড়া সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনার যোগ্যতাও আমার নেই। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছি।

৯. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)

৯. ১. গন্দম ফল

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত কথা যে, আদম (আ) গন্দম গাছের ফল খেয়েছিলেন। কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং কুরআন বা হাদীসে কোথাও তা নেই। আদম ও হাওয়া (আ)-কে আল্লাহ একটি বিশেষ বৃক্ষের নিকট গমন করতে নিষেধ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা শয়তানের প্ররোচনায় এই বৃক্ষ থেকে ভক্ষণ করেন। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন স্থানে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই এই বৃক্ষ বা ফলের নাম কোথাও বলা হয় নি। পরবর্তী যুগে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন গাছের নাম বলেছেন। ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, আদম (আ) গন্দম, অর্থাৎ গম গাছের ফল ভক্ষণ করেন! কেউ বলেছেন আঙুর, কেউ বলেছেন খেজুর... ইত্যাদি। এগুলি সবই আন্দায কথা। হাদীসে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নি। মুমিনের দায়িত্ব হলো, এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, গাছের বা ফলের নাম জানা নয়। সর্বাবস্থায় এ সকল মানবীয় মতামতকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথা বলে মনে করা যাবে না।[৩৪২]

এ গন্দম ফল নিয়ে আরো অনেক বানোয়াট কথা আমাদের দেশের প্রচলিত কাসাসুল আম্বিয়া ও এই জাতীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। আদমের মনে কূটতর্ক জন্মে, জিবরাঈল তা বের করে পুতে রাখেন, সেখান থেকে গন্দম গাছ হয় .... ইত্যাদি...। সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

৯. ২. আদম ও হাওয়ার (আ) বিবাহ ও মোহরানা

কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আদম (আ)-এর জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয় এবং উভয়কে একত্রে জান্নাতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, আদম জান্নাতে অবস্থানের কিছুদিন পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম থেকে হওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন বা হাদীসে দেওয়া হয় নি। মুফাসসিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। প্রচলিত আছে যে, আদম ও হাওয়ার মধ্যে বিবাহের মোহরান ছিল দরুদ শরীফ পাঠ... ইত্যাদি। এ সকল কথার কোনো ভিত্তি বা সনদ আছে বলে জানা যায় না।

৯. ৩. ইবলিস কর্তৃক ময়ূর ও সাপের সাহায্য গ্রহণ

ইবলিস সাপ ও ময়ূরের সাহায্যে আদম ও হাওয়া (আ)-কে প্ররোচনা প্রদানের চেষ্টা করে বলে অনেক কথা প্রচলিত রয়েছে। এগুলি ইহূদী-খৃস্টানদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন।[৩৪৩]

৯. ৪. পৃথিবীতে অবতরণের পরে

পৃথিবীতে অবতরণের পরে আদম ও হাওয়া (আ) সম্পর্কে কুরআনে কোনো কিছু বলা হয় নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ক বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাঁরা কোথায় অবতরণ করেছিলেন, কোথায় বসবাস করেছিলেন, কি কর্ম করতেন, কোন্ ভাষায় কথা বলতেন, কিভাবে ইবাদত বন্দেগি করতেন, সংসার ও সমাজ জীবন কিভাবে যাপন করতেন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ সকল বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত প্রায় সবই মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের মতামত বা বিভিন্ন গল্পকারদের গল্প। দুই একটি দুর্বল সনদের হাদীসও এ সকল বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৯. ৫. আদম কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ

আদম (আ) পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রচলিত আছে। মূলত বিভিন্ন ঐতিহাসিক, মুফাস্সির বা আলিমের কথা এগুলি। এ বিষয়ক হাদীসগুলি দুর্বল সনদে বর্ণিত। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ বিষয়ক সকল বর্ণনাই অত্যন্ত যয়ীফ ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর বাইতুল্লাহ বিষয়ক আয়াতগুলি উল্লেখ করে বলেন, এ সকল আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম বরকতময় ঘর 'বাইতুল্লাহ'কে ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। এই স্থানটি সৃষ্টির শুরু থেকেই মহা সম্মানিত ছিল। আল্লাহ সেই স্থান ওহীর মাধ্যমে তাঁর খলীলকে দেখিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন:

لَمْ يَجِئْ فِيْ خَبَرٍ صَحِيْحٍ عَنِ الْمَعْصُوْمِ أَنَّ الْبَيْتَ كَانَ مَبْنِيًّا قَبْلَ الْخَلِيْلِ... كُلُّ هَذِهِ الأَخْبَارُ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَقَدْ قَرَّرْنَا أَنَّهَا لاَ تُصَدَّقُ وَلاَ تُكَذَّبُ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে একটিও সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি যে, ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে কাবা ঘর নির্মিত হয়েছিল... এ বিষয়ক সকল বর্ণনা ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এগুলিকে সত্যও মনে করা যাবে না, মিথ্যাও বলা যাবে না।"[৩৪৪]

১০. নূহ (আ) এর নৌকায় মলত্যাগ করা ও পরিষ্কার করা

এ বিষয়ে অনেক মুখরোচক গল্প প্রচলিত রয়েছে। এগুলির কোনো ভিত্তি কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে আছে বলে জানতে পারিনি। বাহ্যত এগুলি বানোয়াট গল্প যা গল্পকাররা বানিয়েছে।

নূহ (আ) এর নৌকার বিবরণ, কোন্ কাঠে তৈরি, তাতে কোন্ প্রাণী কোথায় ছিল, শয়তান কিভাবে প্রবেশ করল ইত্যাদি বিষয়েও অগণিত বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচলিত। এ সকল বিষয়ে সহীহ হাদীসে কোনো তথ্য দেওয়া হয় নি।[৩৪৫]

১১. ইদরীস (আ)-এর সশরীরের আসমানে গমন

কুরআন কারীমে দু স্থানে 'ইদরীস' (আ)-এর উল্লেখ রয়েছে। একস্থানে এরশাদ করা হয়েছে: "এবং ইসমাঈল, এবং ইদরীস এবং যুল কিফ্ল সকলেই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।"[৩৪৬] অন্যত্র বলা হয়েছে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

"এবং স্মরণ কর এ কিতাবের মধ্যে ইদরিসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ স্থানে (মর্যাদায়)।"[৩৪৭]

হাদীস শরীফেও ইদরীস (আ) সম্পর্কে তেমন কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাঁর জন্ম, বংশ, পরিচয়, কর্মস্থল, ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই ইসরায়েলীয় বর্ণনা বা গল্পকারদের বানোয়াট কাহিনী। বিশেষ করে আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, চার জন নবী চিরজীবী: খিযির ও ইলিয়াস (আ) পৃথিবীতে এবং ইদরীস ও ঈসা (আ) আসমানে। প্রচলিত আছে যে, ইদরীস (আ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরের ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানে জীবিত আছেন। অথবা সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় এবং এরপর আবার জীবিত হন....।

এ সকল কথা সবই ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াত। ঈসা (আ) ছাড়া অন্য কোনো নবীর জীবিত থাকা, জীবিত অবস্থায় আসমানে গমন ইত্যাদি কোনো কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

আল্লাহ তাঁকে উচ্চ স্থানে উন্নীত করেছেন অর্থ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। যে মর্যাদার একটি বিশেষ দিক হলো আল্লাহ ইন্তেকালের পরে তাঁকে অন্য কয়েকজন মহান নবী-রাসূলের সাথে রূহানীভাবে আসমানে স্থান দান করেছেন। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসমানে ৮ জন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন। ১ম আসমানে আদম, ২য় আসমানে ইয়াহইয়া ও ঈসা, ৩য় আসমানে ইউসূফ, ৪র্থ আসমানে ইদরীস, পঞ্চম আসমানে হারূন, ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা ও ৭ম আসমানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়।[৩৪৮] শুধু ঈসা (আ) ব্যতীত অন্য সকল নবীকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে।[৩৪৯]

১২. হুদ (আ) ও শাদ্দাদের বেহেশত

শাদ্দাদের জন্ম কাহিনী, শাদ্দাদ ও শাদীদের জীবন কাহিনী, শাদ্দাদের বেহেশতের লাগামহীন বিবরণ, বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে তার মৃত্যু ইত্যাদি যা কিছু কাহিনী বলা হয় সবই বানোয়াট, ভিত্তিহীন কথা। কিছু ইহূদীদের বর্ণনা ও কিছু জালিয়াগণের কাল্পনিক গল্প কাহিনী। এ বিষয়ক কোনো কিছুই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

অনেকে আবার এই মিথ্যাকে আল্লাহর নামেও চালিয়েছেন। এক লেখক লিখেছেন: "সে বেহেশতের কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও কোরআন পাকে উল্লেখ করেছেন যে, হে মুহাম্মাদ!, শাদ্দাদ পৃথিবীতে এমন বেহেশত নির্মাণ করেছিল, দুনিয়ার কোনো মানুষ কোনোদিনই

ঐরূপ প্রাসাদ বানাতে পারে নাই... ।"[৩৫০]

আল্লাহর কালামের কি জঘন্য বিকৃতি!! এখানে কুরআনের সূরা ফাজ্‌র-এর ৬-৭ আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মূলত অনেক মুফাস্‌সির এ আয়াতের তাফসীরে সনদ বিহীনভাবে এ সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। আবার 'কাসাসুল আম্বিয়া' জাতীয় গ্রন্থে সনদ বিহীনভাবে এগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। সবই মিথ্যা কথা।

এ বিষয়ে ইবনু কাসীর বলেন: "অনেক মুফাস্‌সির এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইরাম শহর সম্পর্কে এ সকল কথা বলেছেন। এদের কথায় পাঠক ধোঁকাগ্রস্থ হবেন না। ... এ সকল কথা সবই ইসরায়েলীয়দের কুসংস্কার ও তাদের কোনো কোনো যিনদীকের বানোয়াট কল্প কাহিনী। এগুলি দিয়ে তারা মুর্খ সাধারণ জনগণের বুদ্ধি যাচাই করে, যারা যা শোনে তাই বিশ্বাস করে।..."[৩৫১]

১৩. ইবরাহীম (আ)

১৩. ১. ইব্রাহীম (আ)-এর পিতা

আল্লাহ কুরআনকে তাওরাত, যাবূর ও ইনজীলের বিশুদ্ধতা বিচারের মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারক বা আলিম বাইবেলের বর্ণনাকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করে তার ভিত্তিতে কুরআনের বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করেন। এর একটি উদাহরণ হলো ইবরাহীম (আ) এর পিতার নাম। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ

"এবং যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা আযরকে বললেন"[৩৫২]

এখানে সুস্পষ্টভাবে ইবরাহীমের পিতার নাম 'আযর' বলা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে বলা হয়েছে যে ইবরাহীমের পিতার নাম ছিল 'তেরহ'[৩৫৩]। কুরআন কারীমে সাধারণত নবুয়ত, দাওয়াত ও মু'জিযা বিষয়ক তথ্য ছাড়া নবীগণের পিতা, মাতা, জন্মস্থান, জীবনকাল ইত্যাদি বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য আলোচনা করা হয় না। কখনো কখনো ইহূদীদের মিথ্যাচারের প্রতিবাদের জন্য কিছু তথ্য প্রদান করা হয়। যেমন ইহূদীরা তাদের বাইবেল বিকৃত করে লিখেছে যে, আল্লাহ ৬ দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং ৭ম দিনে বিশ্রাম করেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে আল্লাহর কোনো শ্রম হয়নি বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়নি।

এখানে ইবরাহীমের পিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত ইব্রাহীমের পিতার নামের ক্ষেত্রে ইহূদীদের ভুলটি তুলে ধরা। সর্বাবস্থায় মুমিনের জন্য কুরআন-হাদীসের বর্ণনার পরে আর কোনো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এ জন্য অধিকাংশ প্রাজ্ঞ মুফাস্‌সির বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) -এর পিতার নাম 'আযর' ছিল। কুরআনের এ তথ্যই চূড়ান্ত। ইহূদী-খৃস্টানদের তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন মুসলিম উম্মাহর নেই। বাইবেলের বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে কোনো কোনো মুফাস্‌সির সমন্বয় করতে চেয়েছেন। কেউ বলেছেন বলেছেন যে, আযর ও তেরহ দুইটিই ইব্রাহীম (আ) -এর পিতার নাম ছিল। যেমন ইয়াকূব (আ)-এর আরেকটি নাম ইস্রাঈল। কেউ বলেছেন একটি ছিল তার উপাধি ও একটি ছিল তার নাম। অনুরূপ আরো কিছু মতামত আছে। এ সকল ব্যাখ্যায় কুরআনের বর্ণনাকে বিকৃত করা হয় নি। সকলেই একমত যে, এখানে 'তাহার পিতা' বলতে ইব্রাহীমের জন্মদাতা পিতাকে বুঝানো হয়েছে এবং 'আযর' তারই নাম অথবা উপাধি...।[৩৫৪]

তবে সবচেয়ে জঘন্য ও মিথ্যা একটি মত প্রচলিত আছে যে, বাইবেলের বর্ণনাই ঠিক, ইবরাহীমের পিতার নাম ছিল তেরহ। তার নাম কখনোই আযর ছিল না। তারা কুরআনের বর্ণনাকে সরাসরি মিথ্যা না বলে এর একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ইবরাহীমের এক চাচার নাম ছিল আযর। কুরআনে চাচাকেই 'পিতা' বলা হয়েছে। এভাবে তারা বাইবেলের বর্ণনাকে বিশুদ্ধতার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করেছেন।

'পিতা' অর্থ 'চাচা' বলা মূলত কুরআনের অর্থের বিকৃতি করা এবং কোনো প্রকারের প্রয়োজন ছাড়া স্পষ্ট অর্থকে অস্বীকার করা। কোনো কোনো ব্যতিক্রম স্থানে চাচাকে পিতা বলার দূরবর্তী সম্ভাবনা থাকলেও আমাদেরকে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে: প্রথমত, নিজের জন্মদাতা পিতা ছাড়া কাউকে নিজের পিতা বলা বা নিজেকে তার সন্তান বলে দাবি করা হাদীস শরীফে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কুরআনের স্পষ্ট অর্থ অন্যান্য আয়াত বা হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া রূপক বা ঘোরালো ভাবে ব্যাখ্যা করা বিকৃতির নামান্তর। সহীহ বুখারীতে সংকলিত হাদীস থেকেও আমরা জানতে পারি যে, আযরই ইবরাহীমের জন্মদাতা পিতা এবং এই আযরকেই ইবরাহীম কিয়ামতের দিন ভর্ৎসনা করবেন এবং একটি জন্তুর আকৃতিতে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।[৩৫৫]

এ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা সমর্থন করার জন্য কেউ কেউ দাবি করেন যে, ইবরাহীমের জন্মদাতা পিতা কাফির ছিলেন না; কারণ আদম (আ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কাফির-মুশরিক ছিলেন না। এই কথাটি ভিত্তিহীন এবং কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির সুস্পষ্ট বিপরীত। কুরআন কারীমে এবং অনেক সহীহ হাদীসে বারংবার ইবরাহীমের পিতাকে কাফির বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কুফরী ধর্মের উপর ছিলেন বলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে মৃত্যুর সময়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে তিনি

ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করে বলেন আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরেই থাকব।[৩৫৬] স্বভাবতই আমর ইবনু লুহাই-এর যুগ থেকে আব্দুল মুত্তালিবের যুগ পর্যন্ত পূর্বপুরুষগণও শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিলেন, যদিও তাঁরা সততা, নৈতিকতা, জনসেবা ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩৫৭] রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই অনৈতিকতা, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা মুক্ত ছিলেন।[৩৫৮]

১৩. ২. ইবরাহীম (আ) এর তাওয়াক্কুল

ইবরাহীম (আ.)-এর নামে বানোয়াট একটি গল্প আমাদের মধ্যে প্রচলিত। এ ঘটনায় বলা হয়েছে, তাঁকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিবরাঈল (আ.) এসে তাঁকে বলেন: আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বলেন: আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ.) বলেন: তাহলে আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলেন:

حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ

"তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।"

এ কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী, সনদহীনভাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। মুহাদ্দিসগণ একে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআন কারীমে ইবরাহীম (আ)-এর অনেক দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দোয়া করেননি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।[৩৫৯]

'তাওয়াক্কুলের' নামে দোয়া পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য পাঠককে **'রাহে বেলায়াত'** বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

১৩. ৩. পুত্রের গলায় ছুরি চালানো

কুরআন কারীমে সূরা 'সাফ্ফাত'-এ মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ) কর্তৃক পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন: "(ইবরাহীম বলল) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্ম-পরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করে থাকি।"[৩৬০]

এখানে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মিথ্যা ও কুরআন-হাদীসের বর্ণনার বিপরীত কথা আমাদের সমাজে হাদীস ও তাফসীর হিসাবে প্রচলিত। কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমত, কুরআন কারীমে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম তার পুত্রকে জবাই করতে স্বপ্নে দেখেছিলেন। আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম স্বপ্নে দেখেন যে, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী কর।' এ কথাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে এ প্রকারের কোনো বিবরণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম তাঁর পুত্রকে জানান যে, তিনি তাকে জবাই করার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম তাঁর স্ত্রীকে ও পুত্রকে দাওয়াত খাওয়া... ইত্যাদি মিথ্যা কথা বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যান। ... সর্বশেষ তিনি পুত্রকে সত্য কথাটি জানান। এ সকল কথা কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয় নি। এ ছাড়া এই কথাগুলি নবীগণের মর্যাদার খেলাফ। আল্লাহর খলীল তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে কেন মিথ্যা কথা বলবেন?

তৃতীয়ত, প্রচলিত আছে যে, ইবরাহীম পুত্র ইসমাঈলকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধেন। এরপর শুইয়ে তাঁর গলায় বারংবার ছুরি চালান....। এগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা। কুরআনে তো স্পষ্টই বলা হচ্ছে যে, জবাই করার প্রস্তুতি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান এসে যায়। কোনো ছুরি চালানোর ঘটনা ঘটেনি। হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, জবাইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিকল্প জানোয়ার প্রদান করা হয়।[৩৬১]

এ বিষয়ে ত্রয়োদশ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সিরিয় মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিষয়ে যে গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি তাঁর পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন, কিন্তু কাটে নি... এই গল্পটি জাল, মিথ্যা এবং যিন্দীকদের বানানো...।[৩৬২]

১৪. আইউব (আ)-এর বালা-মুসিবৎ

কুরআনে বলা হয়েছে যে, আইউব (আ) বিপদগ্রস্থ হয়ে সবর করেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল

করেন এবং তাকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন। তাঁকে তাঁর সম্পদ ও সন্তান ফিরিয়ে দেন।[৩৬৩]

আইউব (আ)-এর বালা-মুসিবত বা বিপদাপদের প্রকৃতি, ধরন, বিবরণ, সময়কাল, তাঁর স্ত্রীর নাম, আত্মীয় স্বজনের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো বর্ণনা কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে নেই। এ বিষয়ক যা কিছু বলা হয় সবই মূলত ইসরায়েলীয় রেওয়ায়াত। অধিকাংশ বিবরণের মধ্যে লাগামহীন কাল্পনিক বর্ণনা রয়েছে। বিভিন্ন মুফাস্সির এ বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলেছেন। বিশেষত, ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ, কা'ব আল-আহবার প্রমুখ তাবিয়ী আলিম, যারা ইহূদী ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ ও তাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁরাই এ সকল গল্প 'গল্প' হিসেবে বলেছেন।[৩৬৪]

এগুলিকে গল্প হিসাবে বলা যেতে পারে, কিন্তু কখনোই সত্য মনে করা যাবে না। বিশেষত এ সকল গল্পে আইয়ূব (আ)-এর রোগব্যধির এমন কাল্পনিক বিবরণ রয়েছে যা একজন নবীর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হলে আমরা তা গ্রহণ করতাম ও ব্যাখ্যা করতাম। কিন্তু যেহেতু কোনো সহীহ হাদীসে এ বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয় নি এবং এগুলি ইসরায়েলীয় বর্ণনা ও গল্পকারদের গল্প, সেহেতু এগুলি পরিত্যাজ্য। এ বিষয়ে দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) বলেন, "আইয়ূব (আ)-এর গল্পে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর উপরে ইবলিসকে ক্ষমতাবান করে দেন। তখন ইবলিস তাঁর দেহের মধ্যে ফুঁক দেয়। এতে তাঁর দেহ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। এমনকি তার শরীরের মাংস পচে যায় ও পোকা পড়তে থাকে ... ইত্যাদি। এগুলি গল্পকাররা বলেন এবং কোনো কোনো মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন। ... এ সকল কথা সবই নির্ভেজাল জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। যেই একথা বলুন বা উদ্ধৃত করুন না কেন, তাঁর মর্যাদা যত বেশিই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। এ সকল কথা আল্লাহর কিতাবে বলা হয় নি এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) কোনো হাদীসেও তা বর্ণিত হয় নি। এমনকি কোনো যয়ীফ বা বাতিল সনদের হাদীসেও তা বর্ণিত হয় নি। এ সবই সনদ বিহীন বর্ননা.. ।"[৩৬৫]

১৫. দায়ূদ (আ) এর প্রেম

নবী দায়ূদ (আ) এর সম্পর্কে একটি অত্যন্ত নোংরা গল্প বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও পরবর্তী যুগের দুই একটি হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। গল্পটি মূলত ইহূদীদের বাইবেল থেকে ও তাবিয়ীগণের যুগে বিদ্যমান ইহূদী আলিমদের মুখ থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কোনো কোনো গ্রন্থে এ ঘটনাটিকে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামেও প্রচার করা হয়েছে।

ইহূদীদের নোংরামির একটি অন্যতম দিক হলো তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও যাবূরের মধ্যে তাদেরই নবী-রাসূলগণের নামে ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য অশ্লীল গল্প-কাহিনী লিখে রেখেছে। এ সকল গল্প রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবীদের পাপাচারের কাহিনীকেও হার মানায়। সেগুলির মধ্যে একটি হলো দায়ূদ (আ)-এর নামে প্রেম, ব্যভিচার ও হত্যার কাহিনী। এ গল্পটিই মুসলিম সমাজে কিছুটা সংশোধিতরূপে প্রচারিত। গল্পটির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ: একদিন দায়ূদ (আ) হঠাৎ করে একজন গোসলরত মহিলাকে এক নজর দেখে ফেলেন। এতে তিনি মহিলাটির উপর অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। মহিলাটির স্বামীর নাম ছিল উরিয়া। তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন। দায়ূদ প্রধান সেনাপতির সাথে ষড়যন্ত্র করেন উরিয়াকে যুদ্ধের মাঠে হত্যা করার জন্য। এক পর্যায়ে উরিয়া যুদ্ধে নিহত হলে দায়ূদ ঐ মহিলাকে বিবাহ করেন।[৩৬৬] বাইবেলে এই ঘটনাটি আরো অনেক নোংরাভাবে লেখা হয়েছে।[৩৬৭]

এই ঘটনাটি শুধু মিথ্যা এবং নবীদের প্রকৃতির বিরোধীই নয়; উপরন্তু তা মানবীয় বুদ্ধিরও বিপরীত। একজন বিবেকবান বয়স্ক মানুষ, যার অগণিত স্ত্রী রয়েছে এবং যিনি একজন জনপ্রিয় শাসক তিনি একটিবার মাত্র দৃষ্টি পড়ার ফলে এমন ভাবে প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়বেন এবং এইরূপ হত্যা ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেবেন তা কল্পনা করা যায় না।[৩৬৮]

১৬. হারুত মারুত

ইহূদীগণের মধ্যে যাদুর প্রচলন ছিল। তারা আরো দাবি করত যে, সুলাইমান (আ) যাদু ব্যবহার করেই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা আরো দাবি করত যে, স্বয়ং সুলাইমান (আ) এবং হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশতা তাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। এদের এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে কুরআন কারীমে সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ

"এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা (ইহূদীরা) তা অনুসরণ করত। সুলামইমান কুফুরী করেন নি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা বাবিলে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাারা কাউকে শিক্ষা দিতেন না, এই কথা না বলা পর্যন্ত যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফুরী করিও না।..."

এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্য কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, হারূত ও মারূতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরবী (ما) অর্থ (না)। অর্থাৎ হারূত মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয় নি। সুলাইমানের (আ) সম্পর্কে ইহূদীদের দাবি যেমন মিথ্যা, হারূত ও

মারূত সম্পর্কেও তাদের দাবি মিথ্যা।

তবে অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, ইহূদীগণ যখন কারামত-মুজিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য না করে সবকিছুকেই যাদু বলে দাবি করতে থাকে তখন আল্লাহ দুইজন ফিরিশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেন যাদুর প্রকৃতি এবং যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দানের জন্য। তারা মানুষদেরকে এই পার্থক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তোমরা এই জ্ঞানকে যাদুর জন্য ব্যবহার করে কুফুরী করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকই যাদু ব্যবহারের কুফুরীতে নিমগ্ন হতো। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, তাঁরা দুইজন মানুষ ছিলেন; বিশেষ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বা সৎকর্মশীলতার কারণে তাদেরকে মানুষ ফিরিশতা বলে অভিহিত করতো। তাঁরা এভাবে মানুষদেরকে যাদুর অপকারিতা শিক্ষা দিতেন।

হারূত ও মারূত সম্পর্কে কুরআনে আর কোনো কিছুই বলা হয় নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ক অনেক গল্প-কাহিনী হাদীস নামে বা তাফসীর নামে তাফসীরের গ্রন্থগুলিতে বা সমাজে প্রচলিত। কাহিনীটির সার-সংক্ষেপ হলো, মানব জাতির পাপের কারণে ফিরিশতাগণ আল্লাহকে বলেন, মানুষের এত অপরাধ আপনি ক্ষমা করেন কেন বা শাস্তি প্রদান করেন না কেন? আল্লাহ তাদেরকে বলেন, তোমরাও মানুষের মত প্রকৃতি পেলে এইরূপ পাপ করতে। তারা বলেন, কক্ষনো না। তখন তারা পরীক্ষার জন্য হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফিরিশতাকে নির্বাচন করেন। তাদেরকে মানবীয় প্রকৃতি প্রদান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তারা যোহরা নামক এক পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে মদপান, ব্যভিচার ও নরহত্যার পাপে জড়িত হন। পক্ষান্তরে যোহরা তাদের নিকট থেকে মন্ত্র শিখে আকাশে উড়ে যায়। তখন তাকে একটি তারকায় রূপান্তরিত করা হয়। ...

এ গল্পগুলি মূলত ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী। তবে কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে এগুলি হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ক সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদের কারণে কয়েকটি বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অনেক মুহাদ্দিস সবগুলিই জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল গল্প ফিরিশতাগণ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। ইহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য অনেক ধর্মে ফিরিশতাগণকে মানবীয় প্রকৃতির বলে কল্পনা করা হয়। তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত শক্তি আছে বলেও বিশ্বাস করা হয়। ইসলামী বিশ্বাসে ফিরিশতাগণ মানবীয় প্রবৃত্তি, নিজস্ব চিন্তা বা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র। তাঁরা মহান আল্লাহকে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহর কোনো কর্ম বা কথাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এরূপ কোনো প্রকারের প্রকৃতি তাদের মধ্যে নেই। কাজেই এ সকল কাহিনী ইসলামী আকীদার বিরোধী।

এ বিষয়ে আল্লামা ইবনু কাসীর ও অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস সকল বর্ণনা একত্রিত করে তুলনামূলক নিরীক্ষার ভিত্তিতে বলেছেন যে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো প্রকার হাদীস সহীহ বা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। তাঁর নামে বর্ণিত এই বিষয়ক হাদীসগুলি জাল। তবে সাহাবীগণ থেকে তাঁদের নিজস্ব কথা হিসাবে এ বিষয়ে কিছু কিছু বর্ণনার সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। একথা খুবই প্রসিদ্ধ যে এ সকল বিষয়ে কোনো কোনো সাহাবী (রা) ইহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী শুনতেন ও বলতেন। সম্ভবত এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতেই তারা এগুলি বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।[৩৬৯]

পূববর্তী নবী-রাসূলগণের বিষয়ে আরো অনেক অনেক বানোয়াট গল্প এবং ইসরাঈলীয় বর্ণনা আমাদের সমাজে প্রচলিত। 'কাসাসুল আম্বিয়া' জাতীয় বই-পুস্তক এ সকল মিথ্যা কাহিনীতে ভরপুর। সেগুলির বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনেক বৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন। আপাতত এখানেই এই বিষয়ক আলোচনা শেষ করছি।

২. ৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সীমাহীন ও অতুলনীয় মর্যাদা, ফযীলত, মহত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে কুরআন কারীমের অগণিত আয়াতে এবং অগণিত সহীহ হাদীসে। এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভাব- গম্ভীর ভাষা, বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন ও আত্মিক অনুপ্রেরণা অনেক মুমিনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এজন্য অধিকাংশ সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আয়াত ও সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে সাধারণত একেবারে ভিত্তিহীন বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলি আমরা সর্বদা আলোচনা করি, লিখি ও ওয়ায নসীহতে উল্লেখ করি।

আমরা দেখেছি যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত জাল হাদীসের অন্যতম তিনটি ক্ষেত্র: (১) ফাযায়েল বা বিভিন্ন নেক আমলের সাওয়াব বিষয়ক গ্রন্থাদি, (২) পূববর্তী নবীগণ বা কাসাসুল আম্বিয়া জাতীয় গ্রন্থাদি এবং (৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা বা সীরাতুন্নবী বিষয়ক গ্রন্থাদি। যুগের আবর্তনে ক্রমান্বয়ে এ সকল বিষয়ে জাল ও ভিত্তিহীন কথার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ হিজরী শতকে সংকলিত সীরাত, দালাইল বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে অগণিত ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যেগুলি পূর্ববর্তী কোনো হাদীসের গ্রন্থ তো দূরের কথা, কোনো সীরাত বা মুজিযা বিষয়ক গ্রন্থেও পাওয়া যায় না।

আল্লামা আবুল কালাম আযাদ তার 'রাসূলে রহমত' গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনা ও নিরীক্ষা করে এ জাতীয় কিছু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন গল্পের উল্লেখ করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের পূর্বে আসিয়া (আ) ও মরিয়ম (আ)-এর শুভাগমন, মাতা আমিনাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গর্ভধারণের শুরু থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়ে হযরত আমিনার কোনোরূপ কষ্টক্লেশ না হওয়া... ইত্যাদি।[৩৭০]

কেউ কেউ মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা দ্বারা আমরা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করছি। কত জঘন্য চিন্তা! মনে হয় তাঁর

সত্য মর্যাদায় ঘাটতি পড়েছে যে, মিথ্যা দিয়ে তা বাড়াতে হবে!! নাঊযু বিল্লাহ! মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হন মিথ্যায় এবং সবচেয়ে জঘন্য মিথ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা।

লক্ষণীয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন পূর্ববর্তী নবীগণকে (আ) মূর্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক মুজিযা বা অলৌকিক বিষয় প্রদান করেছিলেন। শেষ নবী ও বিশ্বনবীকেও তিনি অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিযা দিয়েছেন। তবে তাঁর মৌলিক ও অধিকাংশ মুজিযা বিমূর্ত বা বুদ্ধি ও জ্ঞানবৃত্তিক। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মানুষকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুজিযা অনুধাবনে সক্ষম করে। অনেক সময় সাধারণ মুর্খ মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ, আনন্দ দান, উত্তেজিত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গল্পকার, ওয়ায়িয বা জালিয়াতগণ অনেক মিথ্য গল্প কাহিনী বানিয়ে হাদীস নামে চালিয়েছে।

অনেক সময় এ বিষয়ক মিথ্যা হাদীসগুলি চিহ্নিত করাকে অনেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও শানের সাথে বেয়াদবী বলে ভাবতে পারেন। বস্তুত তাঁর নামে মিথ্যা বলাই তাঁর সাথে সবচেয়ে বেশি বেয়াদবী ও দুশমনী। যে মিথ্যাকে শয়তানের প্ররোচনায় মিথ্যাবাদী তাঁর মর্যাদার পক্ষে ভাবছে সেই মিথ্য মূলত তাঁর মর্যাদা-হানিকর। মিথ্যার প্রতিরোধ করা, মিথ্যা নির্ণয় করা এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ। এই নির্দেশ পালনই তাঁর আনুগত্য, অনুসরণ, ভক্তি ও ভালবাসা।

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন্দ্রিক কিছু বানোয়াট কথা উল্লেখ করছি।

১. আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে...

জালিয়াতদের তৈরী একটি জঘন্য মিথ্যা কথা:

أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ...

"আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।"

কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম সহ সকল হাদীস-গ্রন্থে বিশুদ্ধতম সনদে সংকলিত অসংখ্য সাহাবী থেকে বর্ণিত অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তাঁর পরে কোনো নবী হবে না। তিনিই নবীদের অট্টালিকার সর্বশেষ ইট। তিনিই নবীদের সর্বশেষ। তাঁর মাধ্যমে নবুওতের পরিসমাপ্তি।

কিন্তু এত কিছুর পরেও পথভ্রষ্টদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ নামক দ্বিতীয় হিজরী শতকের এক যিনদীক বলে, তাকে হুমাইদ বলেছেন, তাকে আনাস ইবনু মালিক বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান।"[৩৭১]

এ যিনদীক ছাড়া কেউই এ অতিরিক্ত বাক্যটি "তবে আল্লাহ যদি চান" বলেন নি। কোনো হাদীসের গ্রন্থেও এই বাক্যটি পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র এই যিনদীকের জীবনীতে ও মিথ্যা হাদীসের গ্রন্থে মিথ্যাচারের উদাহরণ হিসাবে এই মিথ্যা কথাটি উল্লেখ করা হয়। তা সত্ত্বেও কাদীয়ানী বা অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এই মিথ্যা কথাটি তাদের বিভ্রান্তির প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চায়।

সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের চিহ্ন হলো তাঁর আত্মা, ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও অভিরুচি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশনার নিকট সমর্পিত। এরই নাম ইসলাম। মুসলিম যখন হাদীসের কথা শুনেন তখন তাঁর একটি মাত্র বিবেচ্য: হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে কিনা। হাদীসের অর্থ তাঁর মতের বিপরীত বা পক্ষে তা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন না। বরং নিজের মতকে হাদীসের অনুগত করে নেন।

বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টদের পরিচয়ের মূলনীতি হলো, তারা নিজেদের অভিরুচি ও পছন্দ অনুসারে কোনো কথাকে গ্রহণ করে। এর বিপরীতে সকল কথা ব্যাখ্যা ও বিকৃত করে। এরা কোনো কথা শুনলে তার অর্থ নিজের পক্ষে কিনা তা দেখে। এরপর বিভিন্ন বাতুল যুক্তিতর্ক দিয়ে তা সমর্থন করে। কোনো কথা তার মতের বিপক্ষে হলে তা যত সহীহ বা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশই হোক তারা তা বিভিন্ন ব্যাখ্য করে বিকৃত ও পরিত্যাগ করে।

২. আপনি না হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না

এ ধরণের বানোয়াট কথগুলির একটি হলো:

لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ

"আপনি না হলে আমি আসমান যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।"

আল্লামা সাগানী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে কথাটিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এই শব্দে এই বাক্য কোনো হাদীসের গ্রন্থে কোনো প্রকার সনদে বর্ণিত হয় নি।[৩৭২]

এখানে উল্লেখ্য যে, এ শব্দে নয়, তবে এ অর্থে দুর্বল বা মাওযূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

৩. আরশের গায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নাম

একটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيْ. فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ

مُحَمَّداً وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوباً لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ. فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ، إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ادْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

"আদম (আ:) যখন (নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে) ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন: হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে (ﷺ) চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেন, হে প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটি সমূহের উপর লিখা রয়েছে: (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)। এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তাঁর হক্ক (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"[৩৭৩]

ইমাম হাকিম নাইসাপূরী হাদীসটি সংকলিত করে একে সহীহ বলেছেন। কিন্তু সকল মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ। তবে মাউযূ কিনা তাতে তারা মতভেদ করেছেন। ইমাম হাকিম নিজেই অন্যত্র এ হাদীসের বর্ণনাকারীকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাকিম অনেক যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং ইবনুল জাওযী অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে মাউযূ বলেছেন। এজন্য তাদের একক মতামত মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাঁদের মতামত তাঁরা পুনর্বিচার ও নিরীক্ষা করেছেন।

এই হাদীসটির সনদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সনদটি খুবই দুর্বল, যেকারণে অনেক মুহাদ্দিস একে মাউযূ হাদীস বলে গণ্য করেছেন। হাদীসটির একটিই সনদ: আবুল হারিস আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী নামক এক ব্যক্তি দাবী করেন, ইসমাঈল ইবনু মাসলামা নামক একব্যক্তি তাকে বলেছেন, আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতা, তার দাদা থেকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী আবুল হারিস একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী। এছাড়া আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ হি) খুবই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেন নি। কারণ তিনি কোনো হাদীস ঠিকমত বলতে পারতেন না, সব উল্টোপাল্টা বর্ণনা করতেন। ইমাম হাকিম নিজেই তার 'মাদখাল ইলাস সহীহ' গ্রন্থে বলেছেন:

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه

"আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম তার পিতার সূত্রে কিছু মাউযূ বা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে, এ সকল হাদীসের জালিয়াতির অভিযোগ আব্দুর রাহমানের উপরেই বর্তায়।"[৩৭৪]

এ হাদীসটি উমার (রা) থেকে অন্য কোন তাবেয়ী বলেন নি, আসলাম থেকেও তাঁর কোন ছাত্র তা বর্ণনা করেন নি। যাইদ ইবনু আসলাম প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। তাঁর কোন ছাত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। শুধুমাত্র আব্দুর রহমান দাবী করেছেন যে তিনি এ হাদীসটি তাঁর পিতার নিকট শুনেছেন। তার বর্ণিত সকল হাদীসের তুলনামূলক নিরীক্ষা করে ইমামগণ দেখেছেন তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীসই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা পর্যায়ের। এজন্য ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মাউযূ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই কথাটি মূলত ইহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত শেষ নবী বিষয়ক কথা; যা কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন। অন্য একটি দুর্বল সনদে এই কথাটি উমার (রা) এর নিজের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুর রহমান অন্যান্য অনেক হাদীসের মত এই হাদীসেও সাহাবীর কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৭৫]

এ মর্মে আরেকটি যয়ীফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের কথা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিও হাকিম সংকলন করেছেন। তিনি জানদাল ইবনু ওয়ালিক এর সূত্রে বলেন, তাকে আমর ইবনু আউস আল-আনসারী নামক দ্বিতীয় শতকের এক ব্যক্তি বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবে তাবেয়ী সাঈদ ইবনু আবূ আরূবাহ (১৫৭ হি) বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবিয়ী কাতাদা ইবনু দিআমাহ আস-সাদূসী (১১৫ হি) বলেছেন, তাকে প্রখ্যাত তাবিয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (৯১হি) বলেছেন, তাকে ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন:

أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيْسَى يَا عِيْسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ أَنْ يُؤْمِنُوْا بِهِ فَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ

أَدَمَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَسَكَنَ.

"মহান আল্লাহ ঈসা (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন, তুমি মুহাম্মাদের উপরে ঈমান আনয়ন কর এবং তোমার উম্মাতের যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ প্রদান কর। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না। মুহাম্মাদ (ﷺ) না হলে জান্নাত ও জাহান্নামও সৃষ্টি করতাম না। আমি পানির উপরে আরশ সৃষ্টি করেছিলাম। তখন আরশ কাঁপতে শুরু করে। তখন আমি তার উপরে লিখলাম: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'; ফলে তা শান্ত হয়ে যায়।"[৩৭৬]

ইমাম হাকিম হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেন, "বরং হাদীসটি মাউযূ বলেই প্রতীয়মান হয়।" কারণ এই হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী এই 'আমর ইবনু আউস আল-আনসারী' নামক ব্যক্তি। সে প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নামে হাদীসটি বর্ণনা করেছে। অথচ এদের অন্য কোনো ছাত্র এই হাদীসটি তাদের থেকে বর্ণনা করেনি। এই লোকটি মূলত একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জানদাল ইবনু ওয়ালিক ছাড়া অন্য কোনো রাবী তার নাম বলেন নি বা তার কোনো পরিচয়ও জানা যায় না। এজন্য ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেন যে, এই হাদীসটি ইবনু আব্বাসের নামে বানানো জাল বা মিথ্যা হাদীস।[৩৭৭]

এই অর্থে আরো জাল হাদীস মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন।[৩৭৮]

নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ক হাদীস সমূহ

প্রথমত, আল-কুরআন ও নূরে মুহাম্মাদী

আরবী ভাষায় 'নূর' (**نور**) শব্দের অর্থ আলো, আলোকচ্ছটা, উজ্বলতা (light, ray of light, brightness) ইত্যাদি। আরবী, বাংলা ও সকল ভাষাতেই নূর, আলো বা লাইট যেমন জড় 'আলো' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি আত্মিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক আলো বা পথ প্রদর্শকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী বলেন, "আরবী ভাষায় নূর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃষ্টিগ্রাহ্য আলো বা জ্যোতিকে বলা হয়। অনুরূপভাবে রূপকার্থে সকল সঠিক ও আলোকজ্জ্বল অর্থকে 'নূর' বলা হয়। বলা হয়, অমূকের কথার মধ্যে নূর রয়েছে। অমুক ব্যক্তি দেশের নূর, যুগের সূর্য বা যুগের চাঁদ...।"[৩৭৯]

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে নিজেকে 'নূর' বলেছেন:

اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (জ্যোতি)। তাঁর নূরের উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ...।"[৩৮০]

ইমাম তাবারী বলেন: 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' একথা বলতে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যকার সকলের হাদী বা পথ প্রদর্শক। তাঁরই নূরেই তাঁরা সত্যের দিকে সুপথপ্রাপ্ত হয়।... ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর' অর্থ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসীদের হাদী বা পথ-প্রদর্শক।... আনাস থেকে বর্ণিত, আল্লাহ বলছেন, আমার হেদোয়াতই আমার নূর...।"[৩৮১]

আল্লাহ কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে 'কুরআন'- কে 'আলো' বা নূর বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ... فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক এই উম্মী নবীর ... যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তাঁর সাথে যে নূর অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"[৩৮২]

এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ 'আল-কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে। অন্যত্র কুরআনকে 'রূহ' বা 'আত্মা' ও নূর বলা হয়েছে:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا

نَــهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِــبَادِنَا

"এইভাবে আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ (আত্মা), আমার নির্দেশ থেকে, আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি! কিন্তু আমি একে (এই রূহ বা আল-কুরআনকে) নূর বানিয়ে দিয়েছি, যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি... ।"[৩৮৩]

অন্যত্র মূসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ তাওরাতকেও নূর বলা হয়েছে:

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

"বলুন, তবে কে নাযিল করেছিল মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূর (আলো) ও হেদায়াত (পথ-প্রদর্শন) ছিল ।"[৩৮৪]

অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে নূর ছিল:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ...وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

"নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি তাওরাত, যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও নূর ... এবং আমি তাকে (ঈসাকে) প্রদান করেছি ইনজীল যার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত ও নূর... ।[৩৮৫]

অন্য অনেক স্থানে মহান আল্লাহ সাধারণভাবে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' বলেছেন । এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগ থেকে মুফাস্সিরগণ মতভেদ করেছেন । যেমন এক স্থানে বলেছেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"তারা 'আল্লাহর নূর' ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ 'তাঁর নূর' পূর্ণ করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে ।"[৩৮৬]

এখানে 'আল্লাহর নূর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত রয়েছে । আল্লামা কুরতুবী বলেন:

এখানে 'আল্লাহর নূরের' ব্যাখ্যায় ৫টি মত রয়েছে: (১) আল্লাহর নূর অর্থ আল-কুরআন, কাফিররা কথার দ্বারা তা বাতিল করতে ও মিথ্যা প্রমাণ করতে চায় । ইবনু আব্বাস ও ইবনু যাইদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । (২) আল্লাহর নূর অর্থ ইসলাম, কাফিররা কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায় । সুদ্দী এ কথা বলেছেন । (৩) আল্লাহর নূর অর্থ মুহাম্মাদ (ﷺ), কাফিররা অপপ্রচার ও নিন্দাচারের মাধ্যমে তার ধ্বংস চায় । দাহ্হাক এ কথা বলেছেন । (৪) আল্লাহর নূর অর্থ আল্লাহর দলীল-প্রমাণাদি, কাফিররা সেগুলি অস্বীকার করে মিটিয়ে দিতে চায় । ইবনু বাহর এ কথা বলেছেন । (৫) আল্লাহর নূর অর্থ সূর্য । অর্থাৎ ফুৎকারে সূর্যকে নেভানোর চেষ্টা করার মত বাতুল ও অসম্ভব কাজে তারা লিপ্ত । ইবনু ঈসা এ কথা বলেছেন ।[৩৮৭]

كِــتَابٌ أَنْــزَلْــنَاهُ إِلَيْكَ لِــتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"এই কিতাব । আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন... ।"[৩৮৮]

এখানে স্বভাবতই অন্ধকার ও আলো বলতে 'জড়' কিছু বুঝানো হয় নি । এখানে অন্ধকার বলতে অবিশ্বাসের অন্ধকার এবং আলো বলতে আল-কুরআন অথবা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে ।

অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভিন্ন আয়াতে 'নূর' বা 'আল্লাহর নূর' বলা হয়েছে এবং সেখানে নূর অর্থ 'কুরআন', 'ইসলাম' 'মুহাম্মাদ (ﷺ)' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করেছেন মুফাস্সিরগণ[৩৮৯] । এই ধরনের একটি আয়াত:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"হে কিতাবীগণ, আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি তার অনেক তোমাদের

নিকট প্রকাশ করেন এবং অনেক উপেক্ষা করে থাকেন। তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহর নিকট হতে এক নূর ও স্পষ্ট কিতাব। হেদায়ত করেন আল্লাহ তদ্বারা যে তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে তাকে শান্তির পথে এবং বের করেন তাদেরকে অন্ধকার থেকে নূরে দিকে তাঁরই অনুমতিতে, এবং হেদায়াত করেন তাদেরকে সঠিক পথের দিকে।"[৩৯০]

এ আয়াতে 'নূর' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, নূর অর্থ কুরআন, কেউ বলেছেন, ইসলাম, কেউ বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)। এ তিন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবাই সঠিক পথের আলোক বর্তিকা বা হেদায়াতের নূর বুঝিয়েছেন।[৩৯১]

যারা এখানে নূর অর্থ কুরআন বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এই আয়াতের প্রথমে যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেহেতু শেষে 'নূর' ও 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে 'কুরআন কারীমকে' বুঝানো হয়েছে। আর কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এভাবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে এবং 'স্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে। এখানে একইবস্তুর দুটি বিশেষণ পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন: "আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান প্রদান করি"[৩৯২]। তাঁরা বলেন, পরের আয়াতে এ দুটি বিষয়ের জন্য এক বচনের সর্বনাম ব্যবহার করে আল্লাহ বলেছেন: "হেদায়ত করেন আল্লাহ যাহা দ্বারা"। এ থেকে বুঝা যায় যে, এখানে নূর ও স্পষ্ট কিতাব বলতে একই জিনিস বুঝানো হয়েছে যদ্বারা আল্লাহ যাকে চান অন্ধকার থেকে নূরের প্রতি হেদায়াত করেন। তারা বলেন, এখানে নূর ও স্পষ্ট কিতাব উভয়কে বুঝাতে "একবচনের" সর্বনাম ব্যবহার নিশ্চিত প্রমাণ যে, এখানে উভয় বিশেষণ দ্বারা একটি বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে।[৩৯৩]

যারা 'নূর' অর্থ ইসলাম বা ইসলামী শরীয়ত বলেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, এ আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কথা বলা হয়েছে এবং শেষে কিতাব বা কুরআনের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাঝে নূর বলতে ইসলামকে বুঝানো স্বাভাবিক। এ ছাড়া কুরআনে অনেক স্থানে 'নূর' বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। এরা বলেন যে, আরবীতে 'আলো' বুঝাতে দুইটি শব্দ রয়েছে: 'দিয়া (ضياء) ও নূর (نور)। প্রথম আলোর মধ্যে উত্তাপ রয়েছে, আর দ্বিতীয় আলো হলো স্নিগ্ধতাপূর্ণ আনন্দময় আলো। পূর্ববর্তী শরীয়তগুলির বিধিবিধানের মধ্যে কাঠিন্য ছিল। পক্ষান্তরে ইসলামী শরীয়তের সকল বিধিবিধান সহজ, সুন্দর ও জীবনমুখী। এজন্য ইসলামী শরীয়তকে নূর বলা হয়েছে।[৩৯৪]

যারা এখানে 'নূর' অর্থ 'মুহাম্মাদ (ﷺ) বুঝিয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন যে, 'স্পষ্ট কিতাব' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'নূর' বলতে মুহাম্মাদ (ﷺ)- কে বুঝানো সম্ভব। এ বিষয়ে ইমাম তাবারী বলেন,

يَعْنِيْ بِالنُّوْرِ مُحَمَّداً ﷺ الَّذِيْ أَنَارَ اللهُ بِهِ الْحَقَّ وَأَظْهَرَ بِهِ الإِسْلاَمَ وَمَحَقَ بِهِ الشِّرْكَ فَهُوَ نُوْرٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنُ الْحَقَّ وَمِنْ إِنَارَتِهِ الْحَقَّ تَبْيِيْنُهُ لِلْيَهُوْدِ كَثِيْراً مِمَّا كَانُوا يُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ.

"নূর (আলো) বলতে এখানে 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, যাঁর দ্বারা আল্লাহ হক্ক বা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং শির্ককে মিটিয়ে দিয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আলোকিত হতে চায় তার জন্য তিনি আলো। তিনি হক্ক বা সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর হক্ককে আলোকিত করার একটি দিক হলো যে, ইহূদীরা আল্লাহর কিতাবের যে সকল বিষয় গোপন করত তার অনেক কিছু তিনি প্রকাশ করেছেন।"[৩৯৫]

সর্বোপরি, কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'আলোকজ্জ্বল প্রদীপ' বা 'নূর-প্রদানকারী প্রদীপ' বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলোকোজ্জ্বল (নূর-প্রদানকারী) প্রদীপরূপে।"[৩৯৬]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে, কুরআন কারীমে সত্যের দিশারী, হেদায়াতের আলো ও সঠিক পথের নির্দেশক হিসেবে কুরআন কারীমকে 'নূর' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো কোনো আয়াতে 'নূর' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কুরআন কারীমের এ সকল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), কুরআন বা ইসলাম নূরের তৈরী বা নূর থেকে সৃষ্ট। আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো সৃষ্ট, জড় বা মূর্ত নূর বা আলো বুঝানো হয় নি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, ইসলাম ও কুরআন কোনো জাগতিক, 'জড়', ইন্দ্রিয়গাহ্য বা মূর্ত 'আলো' নয়। এ হলো বিমূর্ত, আত্মিক, আদর্শিক ও সত্যের আলোকবর্তিকা, যা মানুষের হৃদয়কে বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বিশ্বাস, সত্য ও সুপথের আলোয় জ্যোতির্ময় করে।

দ্বিতীয়ত, হাদীস শরীফে নূর মুহাম্মাদী

কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির উপাদান বলতে মূলত প্রথম সৃষ্টিকেই বুঝানো হয়। এরপর তার বংশধররেরা বংশ-পরম্পরায় সেই উপাদান ধারণ করে। কুরআন কারীমে আদম (আ)-কে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ জাগতিক প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। কাউকেই নতুন করে 'মাটি' দিয়ে তৈরি করা হয় না। তবে সকল মানুষকেই মাটির মানুষ বা মাটির তৈরি বলা হয়।

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে অনেক স্থানে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে (বাশার) বা মানুষ, মানুষ ভিন্ন কিছুই নন, তোমাদের মতই মানুষ ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৃষ্টির উপাদানে কোনো বিশেষত্ব কি নেই?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে কিছু হাদীস প্রচলিত রয়েছে। এগুলির অর্থ আমাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং এগুলি মুমিনের কাছে ভাল লাগে। একথা ঠিক যে, সৃষ্টির মর্যাদা তার কর্মের মধ্যে নিহিত, তার সৃষ্টির উপাদান, বংশ ইত্যাদিতে নয়। এজন্য আগুণের তৈরী জিন ও নূরের তৈরী ফিরিশতার চেয়ে মাটির তৈরী মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বেশি মর্যাদাবান। এরপরও যখন আমরা জানতে পারি যে, সৃষ্টির উপাদানেও আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন আমাদের তা ভাল লাগে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, যে কোনো কথা তা যতই ভাল লাগুক, তা গ্রহণের আগে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা। কোনো কথাকে তার অর্থের ভিত্তিতে নয়, বরং সাক্ষ্য প্রমাণের বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে প্রথমে বিচার করা হয়। এরপর তার অর্থ বিচার করা হয়। এখানে এই অর্থের কয়েকটি জাল হাদীস উল্লেখ করছি।

৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আলী (রা) নূর থেকে সৃষ্ট

خُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُوْرٍ، وَكُنَّا عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ آدمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، ثُمَّ خَلَقَ اللهُ آدَمَ فَانْقَلَبْنَا فِيْ أَصْلاَبِ الرِّجَالِ.

"আমাকে ও আলীকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়। আদমের সৃষ্টির ২ হাজার বৎসর পূর্বে আমরা আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন আমরা মানুষদের ঔরসে ঘুরতে লাগলাম।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি একটি মিথ্যা ও জাল হাদীস। জা'ফর ইবনু আহমদ ইবনু আলী আল-গাফিকী নামক একজন মিথ্যাবাদী জালিয়াত এই হাদীসটি বানিয়েছে এবং এর জন্য একটি সনদও সে বানিয়েছে।[৩৯৭]

৫. রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) আল্লাহর নূর, আবূ বকরকে তাঁর নূর... থেকে সৃষ্টি

خَلَقَنِي اللهُ مِنْ نُــوْرِهِ، وخَلَقَ أَبا بَكْرٍ مِنْ نُوري، وخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نور أبي بكر، وخَلَقَ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ...

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাক্‌রকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবূ বাকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার উম্মাতকে উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন... ।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আহমদ ইবনু ইউসূফ আল-মানবিযী নামক এক ব্যক্তি এই মিথ্যা কথাটির প্রচারক। সে এই কথাটির একটি সুন্দর সনদও বানিয়েছে।[৩৯৮]

এ অর্থে আরেকটি বানোয়াট কথা:

إِنَّ اللهَ خَلَقَنِيْ مِنْ نُورِه وخَلَقَ أبا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ وَخَلَقَ عُمَرَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِيْن كُلَّهُمْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ غَيْرَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাক্‌রকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমারকে আবূ বাকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নবী-রাসূল ব্যতীত মুমিনগণের সকলকেই উমারের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩৯৯]

এ অর্থে আরেকটি ভিত্তিহীন কথা:

إِنَّ اللهَ خَلَقَنِيْ مِنْ نُوْرٍ وَخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ نُوْرِيْ وَخَلَقَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مِنْ نُوْرِ أَبِيْ بَكْرٍ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عُمَرَ وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أُمَّتِيْ مِنْ نُوْرِ عَائِشَةَ

"আল্লাহ আমাকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, আবূ বাক্‌রকে আমার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, উমার ও আয়েশাকে আবূ বাকরের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আমার উম্মাতের মুমিন পুরুষগণকে উমারের নূর থেকে এবং মুমিন নারীগণকে আয়েশার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[৪০০]

৬. আল্লাহর মুখমণ্ডলের নূরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৃষ্টি

আব্দুল কাদের জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত 'সির্‌রুল আসরার' নামক জাল পুস্তকটির মধ্যে জালিয়াতগণ অনেক জঘন্য কথা হাদীস নামে ঢুকিয়েছে। এ সকল জাল কথার একটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন:

خَلَقْتُ مُحَمَّداً مِنْ نُوْرِ وَجْهِيْ

"আমি মুহাম্মাদকে আমার মুখমণ্ডলের নূর থেকে সৃষ্টি করেছি।"

এ কথাটি কোনো জাল সনদেও কোথাও বর্ণিত হয় নি।[৪০১]

৭. রাসূলুল্লাহর নূরে ধান-চাউল সৃষ্টি!

জালিয়াতদের বানানো আরেকটি মিথ্যা কথা:

الأَرُزُّ مِنِّي وأنا مِنَ الأَرُزِّ خُلِقَتِ الأَرُزُّ مِنْ بَقِيَّةِ نُوْرِيْ

"চাউল আমা হতে এবং আমি চাউল থেকে। আমার অবশিষ্ট নূর থেকে চাউলকে সৃষ্টি করা হয়।"[৪০২]

৮. ঈমানদার মুসলমান আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্ট

দায়লামী (৫০৯) তার 'আল-ফিরদাউস' নামক পুস্তকে ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন:

اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ الَّذِيْ خُلِقَ مِنْه

"মুমিন আল্লাহর নূরের দ্বারা দৃষ্টিপাত করেন, যে নূর থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৪০৩]

এ হাদীসটিও জাল। এর একমাত্র বর্ণনাকারী মাইসারাহ ইবনু আব্দু রাব্বিহ দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ জালিয়াত ও মিথ্যাবাদী। ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ হাতিম, ইবনু হিব্বান-সহ সকল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত। তাঁরা তার 'রচিত' অনেক জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৪০৪]

৯. নূরে মুহাম্মাদীই (ﷺ) প্রথম সৃষ্টি

উপরের হাদীগুলি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত নয়, যদিও হাদীসগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সনদসহ বা সনদ বিহীনভাবে সংকলিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ এগুলির সনদ আলোচনা করে জাল ও মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত, 'মুমিন আল্লাহর নূরে সৃষ্টি' এই হাদীসটি দাইলামীর গ্রন্থে রয়েছে। এ গ্রন্থের অনেক জাল হাদীসই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, কিন্তু এ হাদীসটি আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে একটি 'হাদীস' যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয় নি, কোথাও কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, সে কথাটি আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। শুধু প্রচলিতই নয়, এ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সনদহীন কথাটি সর্ববাদীসম্মত মহাসত্যের রূপ গ্রহণ করেছে এবং তা ইসলামী বিশ্বাসের অংশ হিসাবে স্বীকৃত। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃত 'আকীদা ও ফিকহ' গ্রন্থেও যা 'হাদীস' হিসাবে উল্লিখিত। হাদীসটি নিম্নরূপ:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ

"আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন"।

একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ হিসাবে হাদীসটি প্রচলিত। হাদীসটির সার সংক্ষেপ হলো, জাবির (রা) রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন? উত্তরে তিনি বলেন:

أوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّك مِنْ نُوْرِهِ....

"সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তার নূর থেকে সৃষ্টি করেন।"

এরপর এ লম্বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নূরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তা থেকে আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, ফিরিশতা, জিন, ইনসান এবং সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়।....

কথাগুলি ভাল। যদি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা কথা বলার বা যা শুনব তাই বলার অনুমতি থাকতো তাহলে আমরা তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতাম ও বলতাম। কিন্তু যেহেতু তা নিষিদ্ধ তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, বা তাঁর নূর থেকে বিশ্ব বা অন্যান্য সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা।

কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, হাদীসটি বাইহাকী বা আব্দুর রায্যাক সান'আনী সংকলন করেছেন। এ দাবিটি ভিত্তিহীন। আব্দুর রায্যাক সান'আনীর কোনো গ্রন্থে বা বাইহাকীর কোনো গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এই কথাটির অস্তিত্ব নেই। সহীহ, যয়ীফ এমনকি মাউযূ বা মিথ্যা সনদেও এই হাদীসটি কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শত শত হাদীসের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছে, যে সকল গ্রন্থে সনদসহ হাদীস সংকলিত হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত যে কোনো হাদীস এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। যে কোনো হাদীস আপনি খুঁজে দেখুন, অন্তত

১০/১৫ টি গ্রন্থে তা পাবেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বা প্রসিদ্ধ হাদীস আপনি প্রায় সকল গ্রন্থে দেখতে পাবেন। অর্থাৎ, এ ধরনের যে কোনো একটি হাদীস আপনি ৩০/৩৫ টি হাদীসের গ্রন্থে এক বা একাধিক সনদে সংকলিত দেখতে পাবেন। কিন্তু হাদীস নামের أول ما خلق الله نوري এই বাক্যটি খুঁজে দেখুন, একটি হাদীস গ্রন্থেও পাবেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগ থেকে পরবর্তী শত শত বৎসর পর্যন্ত কেউ এ হাদীস জানতেন না। কোনো গ্রন্থেও লিখেননি। এমনকি সনদবিহীন সিরাতুন্নাবী, ইতিহাস, ওয়ায বা অন্য কোনো গ্রন্থেও তা পাওয়া যায় না।

যতটুকু জানা যায়, ৭ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আলী তাঈ হাতিমী (৫৬০-৬৩৮হি/১১৬৫-১২৪০খৃ) সর্বপ্রথম এই কথাগুলিকে 'হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনু আরাবী তাঁর পুস্তকাদিতে অগণিত জাল হাদীস ও বাহ্যত ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগে বুযুর্গগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বশত এ সকল কথার বিভিন্ন ওযর ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আবার অনেকে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন। বিশেষত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শাইখ আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৩৪ হি) ইবনু আরাবীর এ সকল জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার প্রতিবাদ করেছেন বারংবার। কখনো কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়।[৪০৫] এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "আমাদের নস্‌স বা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার, ইবনে আরাবীর কাশফ ভিত্তিক ফস্‌স বা ফুসূসুল হিকামের সহিত নহে। ফুতূহাতে মাদানীয়া বা মাদানী নবী ﷺ -এর হাদীস আমাদেরকে ইবনে আরাবীর ফতূহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন।"[৪০৬] অন্যত্র প্রকৃত সূফীদের প্রশংসা করে লিখেছেন : "তাহারা নসস, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী,পরিত্যাগ করত শেখ মহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর ফসস বা ফুসূসুল হিকাম পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং ফুতূহাতে মাদানীয়া, অর্থাৎ হাদীস শরীফ বর্জন করত ইবনে আরাবীর ফুতূহাতে মাক্কীয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না।"[৪০৭] "... নস্‌স বা আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ করত ফসস বা মহিউদ্দীন আরবীর পুস্তক আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ফতূহাতে মাদানীয়া বা পবিত্র হাদীস বর্জন করত ফুতূহাতে মাক্কিয়া পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না।"[৪০৮]

সর্বাবস্থায়, ইবনু আরাবী এ বাক্যটির কোনো সূত্র উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তিনি এর উপরে তাঁর প্রসিদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের লোগোস তত্ত্বের (Theory of Logos) আদলে তিনি 'নূরে মুহাম্মাদী তত্ত্ব' প্রচার করেন। খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈশ্বর সর্বপ্রথম তার নিজের 'জাত' বা সত্ত্বা থেকে 'কালেমা' বা পুত্রকে সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে তিনি সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। ইবনু আরাবী বলেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন।

ক্রমান্বয়ে কথাটি ছড়াতে থাকে। বিশেষত ৯/১০ম হিজরী শতক থেকে লেখকগণের মধ্যে যাচাই ছাড়াই অন্যের কথার উদ্ধৃতির প্রবণতা বাড়তে থাকে। শ্রদ্ধাবশত বা ব্যস্ততা হেতু অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নির্বিচারে একজন লেখক আরেকজন লেখকের নিকট থেকে গ্রহণ করতে থাকেন। যে যা শুনেন বা পড়েন তাই লিখতে থাকেন, বিচার করার প্রবণতা কমতে থাকে।

দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩ হি) তার রচিত প্রসিদ্ধ সীরাত-গ্রন্থ 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে এ হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে' সংকলিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। আগেই বলেছি, হাদীসটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক বা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে বা কোথাও সনদ-সহ সংকলিত হয় নি। আল্লামা কাসতালানী যে কোনো কারণে ভুলটি করেছেন। কিন্তু এ ভুলটি পরবর্তীকালে সাধারণভুলে পরিণত হয়। সকলেই লিখছেন যে, হাদীসটি 'মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে' সংকলিত। কেউই একটু কষ্ট করে গ্রন্থটি খুঁজে দেখতে চাচ্ছেন না। সারা বিশ্বে 'মুসান্নাফ', 'দালাইলুন নুবুওয়াহ' ও অন্যান্য গ্রন্থের অগণিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এছাড়া গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়েছে। যে কেউ একটু কষ্ট করে খুঁজে দেখলেই নিশ্চিত হতে পারেন। কিন্তু কেউই কষ্ট করতে রাজি নয়। ইমাম সুয়ূতী ও অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস এই কষ্টটুকু করেছেন তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও অস্তিত্বহীন কথা।[৪০৯]

গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ এই ভিত্তিহীন কথাটি ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। সকল সীরাত লেখক, ওয়ায়েয, আলেম এই বাক্যকে এবং এ সকল কথাকে হাদীসরূপে উল্লেখ করে চলেছেন।

এই ভিত্তিহীন 'হাদীস'টি, ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরে যার কোনোরূপ অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তা বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজে ঈমানের অংশে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ থেকে অত্যন্ত কঠিন একটি বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে। উপরে আমরা দেখেছি যে, এ ভিত্তিহীন জাল 'হাদীস'টিতে বলা হয়েছে: 'আল্লাহ তাঁর নূর থেকে নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।" এ থেকে কেউ কেউ বুঝেছেন যে, তাহলে আল্লাহর সত্তা বা 'যাত' একটি নূর বা নূরানী বস্তু। এবং আল্লাহ স্বয়ং নিজের সেই যাতের বা সত্ত্বার বা সিফাত বা গুণের অংশ থেকে তার নবীকে তৈরি করেছেন। কী জঘন্য শিরক! এভাবেই খৃস্টানগণ বিভ্রান্ত হয়ে শিরকে লিপ্ত হয়।

প্রচলিত বাইবেলেও যীশুখৃস্ট বারংবার বলছেন যে, আমি মানুষ, আমাকে ভাল বলবে না, আমি গাইব জানি না, ঈশ্বরই ভাল, তিনিই সব জানেন, একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর...। তবে যীশু ঈশ্বরকে পিতা ডেকেছেন। হিব্রু ভাষায় সকল নেককার মানুষকেই ঈশ্বরের পুত্র বলা হয় এবং ঈশ্বরকে পিতা ডাকা হয়। তিনি বলেছেন: 'যে আমাকে দেখল সে ঈশ্বরকে দেখল'। এইরূপ কথা সকল নবীই বলেন। কিন্তু ভণ্ড পৌল থেকে শুরু করে অতিভক্তির ধারা শক্তিশালী হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে খৃস্টানগণ দাবি করতে থাকেন যীশু ঈশ্বরের 'যাতের

অংশ' এবং তাঁর "বাক্য" বিশেষণের প্রকাশ। ঈশ্বর তার যাতের অংশ (same substance) দিয়ে পুত্রকে সৃষ্টি করেন...। ৪র্থ-৫ম শতাব্দী পর্যন্ত আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়াস (Arius) ও তার অনুসারীরা যীশুকে ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ নয়, বরং সৃষ্ট বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু অতিভক্তির প্লাবনে তাওহীদ হেরে যায় ও শিরক বিজয়ী হয়।

এ মুশরিক অতিভক্তগণও সমস্যায় পড়ে গেল। বাইবেলেরই অগণিত আয়াতে যীশু স্পষ্ট বলছেন যে, আমি মানুষ। তিনি মানুষ হিসেবে তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করছেন। এখন সমাধান কী? তাঁরা 'দুই প্রকৃতি তত্ত্বে'-র আবিষ্কার করলেন। তারা বললেন, খৃস্টের মধ্যে দুটি সত্তা বিদ্যমান ছিল। মানবীয় সত্তা অনুসারে তিনি এ কথা বলেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি ঈশ্বর ছিলেন...।[৪১০]

অনেকে মুসলিমও এভাবে শিরকের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন। আল্লাহ আদমের মধ্যে 'তাঁর রূহ' দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহর রূহ' বলা হয়েছে। এতে কখনোই তাঁর নিজের রূহের অংশ বুঝানো হয় নি। বরং তাঁর সৃষ্ট রূহ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে এ হাদীসটি সহীহ বলে প্রমাণিত হলে "তাঁর নূর" বলতে তাঁর সৃষ্ট নূর বুঝা যেত। উপরন্তু এ হাদীসটি সহীহ হলে প্রমাণিত হতো যে সকল মুসলিম, এমনকি কাফিরগণ ও শয়তান-সহ সকল সৃষ্টিই আল্লাহর নূর থেকে তৈরি! কিন্তু কে শোনে কার কথা!

আমাদের উচিত কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা এবং ভিত্তিহীন কথাগুলি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে না বলা।

১০. নূরে মুহাম্মাদীর ময়ূর রূপে থাকা

এ বিষয়ক প্রচলিত অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে রয়েছে নূরে মুহাম্মাদীকে ময়ূর আকৃতিতে রাখা। এ বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসের গ্রন্থে এর কোনো প্রকার সনদ, ভিত্তি বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে গল্পগুলি লেখা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা শাজারাতুল ইয়াকীন নামক একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর মোবরককে একটি ময়ূর আকৃতি দান করত স্বচ্ছ ও শুভ্র মতির পর্দার ভিতরে রেখে তাকে সেই বৃক্ষে স্থাপন করলেন... ক্রমান্বয়ে সেই নূর থেকে সব কিছু সৃষ্টি করলেন... রূহগণকে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে নির্দেশ দিলেন.... ইত্যাদি ইত্যাদি...। এ সকল কথার কোনো সনদ কোথাও পাওয়া যায় না।

১১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তারকা-রূপে ছিলেন

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদম সৃষ্টির পূর্বে তারকারূপে বিদ্যমান ছিলেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন ভাষ্য প্রচলিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাতেমাকে (রা) বলেন, জিবরাঈল তোমার ছোট চাচা ...। এ বিষয়ে প্রচলিত সকল কথাই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি ইসলামী কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত একটি খুতবার বইয়ে লেখা হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَأَلَ جِبْرَائِيْلَ فَقَالَ: يَا جِبْرَائِيْلُ، كَمْ عُمِّرْتَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَسْتُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّ فِيْ الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْماً يَطْلُعُ فِيْ كُلِّ سَبْعِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً، رَأَيْتُهُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ أَلْفَ مَرَّةً. فَقَالَ: يَا جِبْرَائِيْلُ، وَعِزَّةِ رَبِّيْ جَلَّ جَلاَلُهُ، أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

উপরের কথাগুলির অনুবাদে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে: "হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলে কারীম (ﷺ) হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে জিব্রাঈল, আপনার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, চতুর্থ পর্দায় (আসমানে) একটি সিতারা আছে যা প্রতি ৭০ হাজার বছর পর সেখানে উদিত হয়। আমি উহা এ যাবত ৭০ হাজার বার[৪১১] উদিত হতে দেখেছি। এতদশ্রবণে হুজুর (ﷺ) বল্লেন, হে জিব্রাঈল, শপথ মহান আল্লাহর ইজ্জতের, আমি সেই সিতারা। (বুখারী শরীফ)।"[৪১২]

এ সকল কথা সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা যা হাদীস নামে প্রচলন করা হয়েছে।[৪১৩] তবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এ ভিত্তিহীন কথাটিকে বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে চালানো হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সীরাহ হালাবিয়া গ্রন্থের লেখক একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের উপর নির্ভর করে এ জাল হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমরা কি একটু যাচাই করব না? এ সকল ইসলামী কেন্দ্রে এমন অনেক আলিম রয়েছেন যারা যুগ যুগ ধরে 'বুখারী' পড়াচ্ছেন। বুখারী শরীফের অনেক কপি সেখানে বিদ্যমান। কিন্তু কেউই একটু কষ্ট করে পুস্তকটি খুলে দেখার চেষ্টা করলেন না। শুধু সহীহ বুখারীই নয়, বুখারীর লেখা বা অন্য কারো লেখা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এই কথাটি সনদ-সহ বর্ণিত হয় নি। অথচ সেই জাল কথাটিকে বুখারীর নামে চালানো হলো।

কেউ কেউ এই ভিত্তিহীন কথাটিকে শুধু বুখারীর নামে চালানোর চেয়ে 'বুখারী ও মুসলিম' উভয়ের নামে চালানোকে উত্তম (!) বলে মনে করেছেন। উক্ত প্রসিদ্ধ দ্বীনী কেন্দ্রের একজন সম্মানিত মুহাদ্দিস, যিনি বহু বৎসর যাবৎ ছাত্রদেরকে 'সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম' পড়িয়েছেন তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন: "মুসলিম শরীফ ও বুখারী শরীফ"[৪১৪]

আমরা মনে করি যে, এ সকল বুযুর্গ ও আলিম জেনেশুনে এরূপ মিথ্যা কথা বলেন নি। তাঁরা অন্য আলিমদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আলিমদের জন্য এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য ওযর নয়। এখন আমরা যতই বলি না কেন, যে এ হাদীসটি বুখারী

শরীফ বা মুসলিম শরীফের কোথাও নেই, আপনারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম খুলে অনুসন্ধান করুন... সাধারণ মুসলমান ও ভক্তগণ সে সকল কথায় কর্ণপাত করবেন না। তাঁরা কোনোরূপ অনুসন্ধান বা প্রমাণ ছাড়াই বলতে থাকবেন, এতবড় আলিম কি আর না জেনে লিখেছেন!!

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূরত্ব বনাম মানবত্ব

নূরে মুহাম্মাদী বিষয়ে আরো অনেক জাল ও সনদবিহীন কথা ইবনু আরাবীর পুস্তকাদি, সীরাহ হালাবিয়া, শারহুল মাওয়াহিব ইত্যাদি পুস্তকে বিদ্যমান। এসকল পুস্তকের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে 'সাইয়েদুল মুরসালীন' ও অন্যান্য সীরাতুন্নবী বিষয়ক পুস্তকে এগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে অর্থে বর্ণিত ও প্রচলিত সকল হাদীসই বানোয়াট। পাঠক একটু খেয়াল করলেই বিষয়টি অনুভব করতে পারবেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে 'সিহাহ সিত্তাহ' সহ অনেক হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে। এ সকল গ্রন্থে অনেক 'অতি সাধারণ' বিষয়েও অনেক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। সহীহ, হাসান ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জাল হাদীসও কোনো কোনো পুস্তকে সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নূর দ্বারা তৈরি' অর্থে একটি হাদীসও কোনো পুস্তকে পাওয়া যায় না।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের গ্রন্থসমূহে কত ছোটখাট বিষয়ে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ লিখেছেন। অথচ 'নূরে মুহাম্মাদী' বিষয়ে কোনো মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদও লিখেন নি। অনেক তাফসীরের গ্রন্থে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা মায়েদার উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো প্রাচীন মুফাস্‌সিরই রাসূলুল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি বিষয়ক কোনো হাদীস উল্লেখ করেন নি।

ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক বইগুলিতে অগণিত যয়ীফ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে অনেক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের প্রথম ৫০০ বৎসরে লেখা কোনো একটি ইতিহাস বা সীরাত গ্রন্থে 'নূরে মুহাম্মাদী' বিষয়টি কোনোভাবে আলোচনা করা হয় নি। আসলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগ থেকে পরবর্তী ৫/৬ শত বৎসর পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর কোনো ব্যক্তি বা দল 'নূরে মুহাম্মাদী' তত্ত্বের কিছুই জানতেন না।

এখন আমাদের সামনে শুধু থাকল সূরা মায়েদার উপর্যুক্ত আয়াতটি, যে আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন যে, এখানে 'নূর' বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। এখানে আমাদের করণীয় কী?

আমাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

(১) কুরআন-হাদীসের নির্দেশনাকে নিজের পছন্দ অপছন্দের ঊর্ধ্বে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। সুপথপ্রাপ্ত মুসলিমের দায়িত্ব হলো, ওহীর মাধ্যমে যা জানা যাবে তা সর্বান্তকরণে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং নিজের পছন্দ ও মতামতকে ওহীর অনুগত করা। পক্ষান্তরে বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো, নিজের পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে ওহীকে গ্রহণ করা বা বাদ দেওয়া।

(২) কুরআন কারীমে বারংবার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'বাশার' বা মানুষ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ করা হয়েছে: 'আপনি বলুন, আমি মানুষ রাসূল ভিন্ন কিছুই নই', 'আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের মতই মানুষ মাত্র।'[৪১৫] অনুরূপভাবে অগণিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারংবার বলেছেন যে, 'আমি মানুষ', 'আমি তোমাদের মতই মানুষ'। এর বিপরীতে কুরআন বা হাদীসে এক স্থানেও বলা হয় নি যে, আপনি বলনু 'আমি নূর'। কোথাও বলা হয় নি যে, 'মুহাম্মাদ নূর'। শুধু কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন যে, তোমাদের কাছে 'নূর' এসেছে বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়, বরং পরবর্তী কোনো কোনো মুফাস্‌সির একথা বলেছেন।

(৩) এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই তবে আমাদের করণীয় কী তা পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারছেন। আমরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবেই গ্রহণ করব। আর মুফাস্‌সিরদের কথাকে তার স্থানেই রাখব।

আমরা বলতে পারি: কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নূর বলতে আমরা 'কুরআন'-কে বুঝাবো। কারণ কুরআনে স্পষ্টত 'কুরআন'কে নূর বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্পষ্টত নূর বলা হয় নি; কাজেই তাঁর বিষয়ে একথা বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

অথবা আমরা বলতে পারি: কুরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষ। তবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মানব জাতির পথ প্রদর্শনের আলোক-বর্তিকা হিসেবে তাঁকে নূর বলা যেতে পারে।

(৪) কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, তিনি 'হাকীকতে' বা প্রকৃত অর্থে নূর ছিলেন, মানুষ ছিলেন না, শুধু মাজাযী বা রূপক অর্থেই তাঁকে মানুষ বলা যেতে পারে, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের মন-মর্জি অনুসারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা বাতিল করে এমন একটি মত গ্রহণ করলেন, যার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের একটিও দ্ব্যর্থহীন বাণী নেই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদার প্রাচীনত্ব বিষয়ক সহীহ হাদীস

উপর্যুক্ত বাতিল ও ভিত্তিহীন কথার পরিবর্তে আমাদের সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করা উচিত। সহীহ হাদীসে ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي: دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ

"যখন আদম তার কাদার মধ্যে লুটিয়ে রয়েছেন (তাঁর দেহ তৈরি করা হয়েছে কিন্তু রূহ প্রদান করা হয় নি) সে অবস্থাতেই আমি আল্লাহর নিকট খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী রূপে লিখিত। আমি তোমাদেরকে এর শুরু সম্পর্কে জানাব। তা হলো আমার পিতা ইবরাহীমের (আ) দোয়া, ঈসার (আ) সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দর্শন। তিনি যখন আমাকে জন্মদান করেন তখন দেখেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি নূর (জ্যোতি) নির্গত হলো যার আলোয় তাঁর জন্য সিরিয়ার প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে গেল।"[৪১৬]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত স্থিরকৃত হয়? তিনি বলেন: যখন আদম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ, গরীব বলেছেন।[৪১৭]

অন্য হাদীসে মাইসারা আল-ফাজর (রা) বলেন,

قُلْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ مَتَى كُنْتَ (كُتِبْتَ/ جُعِلْتَ) نَبِيًّا؟ قَالَ: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, আপনি কখন নবী ছিলেন (অন্য বর্ণনায়: কখন আপনি নবী হিসেবে লিখিত হয়েছিলেন?, অন্য বর্ণনায়: কখন আপনাকে নবী বানানো হয়?) তিনি বলেন, যখন আদম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন।"

হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন ও সহীহ বলেছেন। যাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪১৮]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ

"নবী (ﷺ)-কে বলা হলো, কখন আপনার জন্য নবুয়ত স্থিরকৃত হয়? তিনি বলেন, আদমের সৃষ্টি ও তার মধ্যে রূহ ফুঁক দেওয়ার মাঝে।"[৪১৯]

এ অর্থে একটি যায়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৫ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নু'আইম ইসপাহানী (৪৩০হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন রাবী সাঈদ ইবনু বাশীর (১৬৯হি) থেকে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। এই সাঈদ ইবনু বাশীর বলেন, আমাকে কাতাদা বলেছেন, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِيْ الْخَلْقِ وَآخِرُهم في البَعْثِ

"আমি ছিলাম সৃষ্টিতে নবীগণের প্রথম এবং প্রেরণে নবীগণের শেষ।"[৪২০]

এ সনদে দুটি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, হাসান বসরী মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। তিনি এখানে (**عن**: আন) বা 'থেকে' শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু বাশীর হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে চলনসই হিসাবে গণ্য করেছেন। অনেকে তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির নিরীক্ষা করে এবং সকল মুহাদ্দিসের মতামত পর্যালোচনা করে তাকে 'যয়ীফ' বা দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।[৪২১]

এ হাদীসটিকে কেউ কেউ তাবিয়ী কাতাদার নিজের মতামত ও তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীর এই হাদীসের বিষয়ে বলেন,

"সাঈদ ইবনু বাশীরের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। সাঈদ ইবনু আবূ আরূবাও হাদীসটি কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাতাদার পরে হাসান বসরী ও আবূ হুরাইরার নাম বলেন নি, তিনি কাতাদা থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ হাদীসটিকে কাতাদার নিজের বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।"[৪২২]

এ সর্বশেষ হাদীসটি ছাড়া উপরের ৪টি হাদীসই সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আদম (আ)-এর সৃষ্টি প্রক্রিয়া পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সন্তান, আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব, খালীল ও রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর

নবুয়ত, খতমে নবুয়ত ও মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ভিত্তিহীন, সনদবিহীন কথাগুলিকে আন্দাযে, গায়ের জোরে বা বিভিন্ন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলার প্রবণতা ত্যাগ করে এ সকল সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা আমাদের উচিত।

১২. আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের সহীহ বা হাসান হাদীসগুলির কাছাকাছি শব্দে জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

كُنْتُ نَبِيًّا وآدمُ بَيْنَ الْمَاءِ والطِّيْنِ

"আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম।"

১৩. যখন পানিও নেই মাটিও নেই

কোনো কোনো জালিয়াত এর সাথে একটু বাড়িয়ে বলেছেন:

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدمُ بَيْنَ الْمَاءِ والطِّيْنِ، وكنت نبيا وَلاَ مَاءَ ولاَ طِيْنٌ

"আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম। এবং যখন পানি ছিল না এবং মাটিও ছিল না তখন আমি নবী ছিলাম।"

আল্লামা সাখাবী, সুয়ূতী, ইবনু ইরাক, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন যে এ কথাগুলি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।[৪২৩]

তুরবায়ে মুহাম্মাদী বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৃষ্টির মাটি

১৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বাকর ও উমার (রা) একই মাটির সৃষ্ট

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নূর নিয়ে যেমন অনেক বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা প্রচলিত হয়েছে, তেমনি তাঁর সৃষ্টির মাটি বিষয়েও কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إن اللهَ خَلَقَنِي وخَلَقَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيْهَا نُدْفَنُ

"মহান আল্লাহ আমাকে, আবূ বাকরকে ও উমারকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মাটিতেই আমাদের দাফন হবে।"

হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল। ইবনুল জাওযী একটি সনদকে 'জাল' ও অন্যটিকে 'ওয়াহী' বা অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে সুয়ূতী, ইবনু ইরাক, তাহের ফাতানী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এ দুটি সনদ ছাড়াও 'হাদীসটি' আরো কয়েকটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল সনদে দুর্বল রাবী থাকলেও মিথ্যায় অভিযুক্ত নেই। কাজেই সামগ্রিকভাবে হাদীসটি 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য।[৪২৪]

১৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আলী (রা), হারূন (আ)... একই মাটির সৃষ্ট

৫ম শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আহমদ ইবনু আলী খতীব বাগদাদী তার 'তারীখ বাগদাদ' গ্রন্থে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর সনদে তিনি বলেন.. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনুল হুসাইন ইবনু দাউদ আল-কাত্তান ৩১১ হিজরীতে তার ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইসামঈলকে বলেছেন। আবূ ইসহাক বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমাদেরকে মূসা ইবনু ইবরাহীম আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমাদেরকে ইমাম মূসা কাযিম বলেছেন, তিনি তাঁর পিতা ইমাম জা'ফর সাদিক থেকে, তিনি তাঁর পিতামহদের সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

خُلِقْتُ أَنَا وَهَارُوْنُ بْنُ عِمْرَانَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ مِنْ طِيْنَةٍ وَاحِدَةٍ

"আমি, হারূন ইবনু ইমরান (আ), ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আ) ও আলী ইবনু আবূ তালিব একই কাদা থেকে সৃষ্ট।"[৪২৫]

লক্ষ্য করুন, এই সনদে রাসূল-বংশের বড় বড় ইমামদের নাম রয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল ও মিথ্যা কথা। এই সনদের দুই জন রাবী: মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ও তার উস্তাদ মূসা ইবনু ইবরাহীম উভয়ই মিথ্যাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এই দুই জনের একজন হাদীসটি বানিয়েছে। তবে জালিয়াতির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বেশি ছিল উস্তাদ মূসার।[৪২৬]

১৬. রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রা) একই মাটির সৃষ্ট

পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নুআইম ইসপাহানী তার 'ফাযাইলুস সাহাবাহ' গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাতেমাকে (রা) ও হাসান-হুসাইন (রা) সম্পর্কে বলেছেন:

خُلِقْتُ وَخُلِقْتُمْ مِنْ طِيْنَةٍ وَاحِدَةٍ

"আমি এবং তোমরা একই মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছি।"

সুয়ূতী, ইবনু ইরাক প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলেছেন।[৪২৭]

১৭. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অস্বাভাবিক জন্মগ্রহণ

আমাদের সমাজের কিছু কিছু মানুষের মধ্যে প্রচলিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাতৃগর্ভ থেকে অস্বাভাবিকভাবে বা অলৌকিকভাবে বের হয়ে আসেন। এ সকল কথা সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও রাসূলুলাল্লাহ (ﷺ)-এর নামে আন্দাযে মিথ্যা বলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম বিষয়ে সহীহ হাদীসের সংখ্যা কম। এগুলিতে বা এছাড়াও এ বিষয়ে সনদ-সহ যে সকল যয়ীফ বর্ণনা রয়েছে সেগুলিতে এ সব কথা কিছুই পাওয়া যায় না।

এখানে একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে বা অজ্ঞতাবশত মনে করেন, অলৌকিকত্ব সম্ভবত মর্যাদার মাপকাঠি। যত বেশি অলৌকিকত্ব ততবেশি মর্যাদা। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। এই ভুল ধারণাকে পূঁজি করে খৃস্টান মিশনারীগণ আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে অপপ্রচার চালান। তাদের একটি লিফলেটে বলা হয়েছেঃ কে বেশি বড়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) না ঈসা মসীহ? ঈসা মসীহ বিনা পিতায় জন্মলাভ করেছেন আর হযরত মুহাম্মাদের পিতা ছিল। ঈসা মসীহ মৃতকে জীবিত করতেন কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) করতেন না। ঈসা মসীহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেন নি, বরং সশরীরে আসমানে চলে গিয়েছেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন।...

এভাবে মুসলিম আকীদার কিছু বিষয়কে বিকৃত করে এবং প্রচলিত ভুল ধারণাকে পূঁজি করে তারা মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

অলৌকিকত্ব কখনোই মর্যাদার মাপকাঠি নয়। নবীদেরকে আল্লাহ অলৌকিকত্ব বা মুজিযা প্রদান করেন হেদায়েতের প্রয়োজন অনুসারে, মর্যাদা অনুসারে নয়। মর্যাদার মূল মানদণ্ড হলো আল্লাহর ঘোষণা। এছাড়া দুনিয়ার ফলাফল আমরা পর্যালোচনা করতে পারি। বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র খৃস্টানদের এ বিষয়টিই আমরা আলোচনা করি।

ঈসা (আ)-এর জন্ম অলৌকিক। এছাড়া মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে বা কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা ইত্যাদি অলৌকিক মুজিযা তাকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মর্যাদা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি নয়। কারণ প্রথমত আল্লাহর ঘোষণা। দ্বিতীয়ত জাগতিক ফলাফলও তা প্রমাণ করে। খৃস্টানদের প্রচলিত বাইবেল থেকে বিচার করলে বলতে হবে যে, মানুষকে সুপথে পরিচালিত করা ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে ঈসা (আ) এর দাওয়াতের ফল সবচেয়ে কম। আল্লাহর হুকুমে ঈসা অনেক রুগীকে সুস্থ করেছেন, মৃতকে জীবিত করেছেন, বরং বাইবেল পড়লে মনে হয় জিনভুত ছাড়ানো ছাড়া আর কোনো বিশেষ কাজই তার ছিল না। কিন্তু তিনি অনেক অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করতে পারেন নি। অনেক মৃত হৃদয়কে জীবিত করেতে পারেন নি। আল্লাহর হুকুমে তিনি অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বাসে অন্ধকে চক্ষু দান করতে পারেন নি। মাত্র ১২ জন বিশেষ শিষ্যের বিশ্বাসও এত দুর্বল ছিল যে, তার গ্রেফতারের সময় একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং একজন তাকে অস্বীকার করেন...।[৪২৮]

পক্ষান্তরে মহিমাময় আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে অনেক অলৌকিকত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অলৌকিকত্ব হলো লক্ষাধিক মানুষকে বিভ্রান্তির অন্ধত্ব থেকে বিশ্বাসের আলোক প্রদান করা। লক্ষাধিক মৃত হৃদয়কে জীবন দান করা।

কাজেই অলৌকিকত্ব সম্পর্কে মিথ্যা, দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য কথাবার্তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, সেগুলিকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদার মাপকাঠি বা নবুয়তের প্রমাণ মনে করা ইসলামের মূল চেতনার বিপরীত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা, নবুওত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে আল-কুরআনই যথেষ্ট। এর পাশাপাশি সহীহ হাদীসগুলির উপর আমরা নির্ভর করব। আমাদের মানবীয় বুদ্ধি, আবেগ বা যুক্তি দিয়ে কিছু বাড়ানো বা কমানোর কোনো প্রয়োজন আল্লাহর দ্বীনের নেই।

১৮. হিজরতের সময় সাওর গিরি গুহায় আবূ বাকরকে সাপে কামড়ানো

১৩শ শতকের মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়েদ দরবেশ হূত বলেন,

مَا يُذْكَرُ فِيْ السِّيَرِ مِنْ نَبَاتِ شَجَرَةٍ عِنْدَ فَمِ الْغَارِ وَقْتَ هِجْرَتِهِ ﷺ وَأَنَّهُ فُتِحَ بَابٌ فِيْ ظَهْرِ الْغَارِ وَظَهَرَ عِنْدَهُ نَهْرٌ وَأَنَّ الْحَيَّةَ لَدَغَتْ أَبَا بَكْرٍ فِيْ الْغَارِ- بَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ.

"সীরাতুন্নবী লেখকগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরতের সময়ে গুহার মুখে গাছ জন্মেছিল, গুহার পিছনে দরজা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেখানে একটি নদী দেখা গিয়েছিল, এবং গুহার মধ্যে আবূ বাকরকে (রা) সাপে কামড় দিয়েছিল- এগুলি সবই বাতিল কথা, যার কোনো ভিত্তি নেই।"[৪২৯]

১৯. মিরাজের রাত্রিতে পাদুকা পায়ে আরশে আরোহণ

আমাদের সমাজে অতি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কথা যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা পায়ে আরশে আরোহণ করেছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট একটি কথা।

মি'রাজের ঘটনা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থ সহ সকল হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে

বিভিন্নভাবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তার এ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি ভালভাবে পড়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া মুসনাদ আহমদ সহ প্রচলিত আরো ১৫/১৬টি হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ক হাদীসগুলি পাঠ করার চেষ্টা করেছি। এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনের কথা বারংবার বলা হয়েছে। কুরআন কারীমেও তাঁর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমনের কথা বলা হয়েছে। তিনি সিদরাতুল মুনতাহার ঊর্ধ্বে বা আরশে গমন করেছেন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি।

রাফরাফে চড়া, আরশে গমণ করা ইত্যাদি কোনো কথা সিহাহ সিত্তা, মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কোনো হাদীস-গ্রন্থে সংকলিত কোনো হাদীসে নেই। ৫/৬ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও এ বিয়য়ে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। দশম হিজরী শতাব্দী ও পরবর্তী যুগে সংকলিত সীরাতুন্নবী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে মি'রাজের বিষয়ে রাফরাফ-এ আরোহণ, আরশে গমন ইত্যাদি ঘটনা বলা হয়েছে। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবীর আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, যে সকল হাদীস কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না, বরং ৫ম হিজরী শতকে বা তার পরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বা বিষয়ভিত্তিক লেখক তা সংকলন করেছেন, সেগুলি সাধারণত বাতিল বা অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীস। বিশেষত ১১শ-১২শ শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে সহীহ, যয়ীফ ও মাউযূ সবকিছু একত্রে মিশ্রিত করে সংকলন করা হয়েছে।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী যারকানী (১১২২ হি) 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে আল্লামা রাযী কাযবীনীর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন:

لَمْ يَرِدْ فِيْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ وَلاَ حَسَنٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، بَلْ ذُكِرَ فِيْهَا أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مُسْتَوًى سَمِعَ فِيْهِ صَرِيْفَ الأَقْلاَمِ فَقَطْ. وَمَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَأَنَّى لَهُ بِهِ! وَلَمْ يَرِدْ فِيْ خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلاَ ضَعِيْفٍ أَنَّهُ رَقِيَ الْعَرْشَ. وَافْتِرَاءُ بَعْضِهِمْ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ.

"কোনো একটি সহীহ, হাসান অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন। বরং বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তথায় এমন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন যে, কলমের খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। যিনি দাবি করবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করেছিলেন তাকে তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। আর কিভাবে তিনি তা করবেন! একটি সহীহ অথবা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি আরশে আরোহণ করেছিলেন। কারো কারো মিথ্যাচারের প্রতি দৃকপাত নিস্প্রয়োজন।"[৪৩০]

সর্বাবস্থায় আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَوَصَلَ إِلَى الْعَرْشِ الْمُعَلَّى أَرَادَ خَلْعَ نَعْلَيْهِ أَخْذاً مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لِسَيِّدِنَا مُوْسَى حِيْنَ كَلَّمَهُ: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. فَنُوْدِيَ مِنَ الْعَلِيِّ الأَعْلَى: يَا مُحَمَّدُ! لاَ تَخْلَعْ نَعْلَيْكَ فَإِنَّ الْعَرْشَ يَتَشَرَّفُ بِقُدُوْمِكَ مُتْنَعِلاً وَيَفْتَخِرُ عَلَى غَيْرِهِ مُتَبَرِّكاً، فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْعَرْشِ وَفِيْ قَدَمَيْهِ النَّعْلاَنِ...

"মি'রাজের রাত্রিতে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ঊর্ধ্বকাশে নিয়ে যাওয়া হলো এবং আরশে মু'আল্লায় পৌঁছালেন, তখন তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলার ইচ্ছা করেন। কারণ আল্লাহ তা'লা মূসাকে (আ) বলেছিলেন: "তুমি তোমার পাদুকা খোল; তুমি পবিত্র 'তুয়া' প্রান্তরে রয়েছ।"[৪৩১] তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করে বলা হয়, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার পাদুকাদ্বয় খুলবেন না। কারণ আপনার পাদুকাসহ আগমনে আরশ সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে এবং অন্যদের উপরে বরকতের অহংকার করবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাদুকাদ্বয় পায়ে রেখেই আরশে আরোহণ করেন।"

এ কাহিনীর আগাগোড়া সবটুকুই বানোয়াট। এ কাহিনীর উৎপত্তি ও প্রচারের পরে থেকে মুহাদ্দিসগণ বারংবার বলছেন যে, এ কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমাদের দেশে অনেক প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিসও এ সকল মিথ্যা কথা নির্বিচারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলে থাকেন। এ সকল কথা তাঁরা কোন্ হাদীস গ্রন্থে পেয়েছেন তাও বলেন না, খুঁজেও দেখেন না, আবার যারা খুঁজে দেখে এগুলির জালিয়াতির কথা বলেছেন তাঁদের কথাও পড়েন না বা শুনতে চান না। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।[৪৩২]

আল্লামা রাযিউদ্দীন কাযবীনী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাক্কারী, যারকানী, আব্দুল হাই লাখনবী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস এ কাহিনীর জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী এ প্রসঙ্গে বলেন: "এই ঘটনা যে জালিয়াত বানিয়েছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি। এত হাদীসের একটি হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের সময় পাদুকা পরে ছিলেন। এমনকি একথাও প্রমাণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরশে আরোহণ করেছিলেন।"[৪৩৩]

২০. মিরাজের রাত্রিতে 'আত-তাহিয়্যাতু' লাভ

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাত্রিতে 'আত-তাহিয়্যাতু' লাভ করেন। এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটির সার-সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে যখন সর্বোচ্চ নৈকট্যে পৌছান তখন মহান আল্লাহকে সম্ভাষণ করে বলেন: (আত-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...)। তখন মহান আল্লাহ বলেন, (আস-সালামু আলাইকা...)। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চান যে তার উম্মতের জন্যও সালামের অংশ থাক। এজন্য তিনি বলেন (আস-সালামু আলাইনা ওয়া...)। তখন জিবারাঈল ও সকল আকাশবাসী বলেন: (আশহাদু...)। কোনো কোনো গল্পকার বলেন: (আস-সালামু আলাইনা...) বাক্যটি ফিরিশতাগণ বলেন...।

এই গল্পটির কোনো ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। কোথাও কোনো গ্রন্থে সনদ সহ এই কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। মি'রাজের ঘটনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে ও সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সনদ-সহ বর্ণনায় মি'রাজের ঘটনায় এই কাহিনীটি বলা হয়েছে বলে আমি দেখতে পাই নি। সনদ বিহীনভাবে কেউ কেউ তা উল্লেখ করেছেন।[৪৩৪]

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-সহ অন্য সকল হাদীসের গ্রন্থে 'আত-তাহিয়্যাতু' বা তাশাহ্হুদ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও এ কথা বলা হয় নি যে, তা মি'রাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, সাহাবীগণ সালাতের শেষে বৈঠকে সালাম পাঠ করতেন। আল্লাহকে সালাম, নবীকে সালাম, জিবরাঈলকে সালাম...। তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন, এভাবে না বলে তোমরা 'আত-তাহিয়্যাতু..." বলবে।[৪৩৫]

সকল হাদীসেই এইরূপ বলা হয়েছে। কোথাও দেখতে পাইনি যে, 'আত-তাহিয়্যাতু' মি'রাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. মুহুর্তের মধ্যে মি'রাজের সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়া

প্রচলিত একটি কথা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজের সকল ঘটনা মুহুর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি সকল ঘটনার পর ফিরে এসে দেখেন পানি গড়ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি। এ সকল কথার কোনো ভিত্তি আছে বলে জানতে পারিনি।

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সিহাহ সিত্তা সহ প্রায় ২০ খানা হাদীস গ্রন্থের মি'রাজ বিষয়ক হাদীসগুলি আমি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ হাদীসে মি'রাজে ভ্রমণ, দর্শন ইত্যাদি সবকিছু সমাপ্ত হতে কত সময় লেগেছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাবারানী সংকলিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِيْ قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ فَأَتَانِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِيْ مَكَانِكَ فَلَمْ أَجِدْكَ

"অতঃপর প্রভাতের পূর্বে আমি মক্কায় আমার সাহাবীদের নিকট ফিরে আসলাম। তখন আবূ বাক্‌র আমার নিকট আগমন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি গত রাতে কোথায় ছিলেন? আমি আপনার স্থানে আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু আপনাকে পাই নি।... তখন তিনি মি'রাজের ঘটনা বলেন।"[৪৩৬]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম রাতে মি'রাজে গমন করনে এবং শেষ রাতে ফিরে আসেন। সারা রাত তিনি মক্কায় অনুপস্থিত ছিলেন। এইরূপ আরো দু একটি হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মি'রাজের ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন।[৪৩৭]

মি'রাজের ঘটনায় কত সময় লেগেছিল তা কোনো গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় নয়। এ মহান অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ সময় ছাড়া বা অল্প সময়ে যে কোনো ভাবে তার মহান নবীর জন্য সম্পাদন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, হাদীসে যা বর্ণিত হয়নি তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে না বলা। আমাদের উচিত এ সকল ভিত্তিহীন কথা তাঁর নামে না বলা। তিনি ফিরে এসে দেখেন পানি গড়ছে, শিকল নড়ছে, বিছানা তখনো গরম রয়েছে ইত্যাদি কথা কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে সনদ সহ বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারিনি। মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত (১২৭৬ হি) এ বিষয়ে বলেন:

ذَهَابُهُ وَرُجُوْعُهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ وَلَمْ يَبْرُدْ فِرَاشُهُ، لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিরাজের রাত্রিতে গমন করেন এবং ফিরে আসেন কিন্তু তখনো তার বিছান ঠাণ্ডা হয় নি, এ কথাটি প্রমাণিত নয়।"[৪৩৮]

২২. মি'রাজ অস্বীকার-কারীর মহিলায় রূপান্তরিত হওয়া

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বানোয়াট কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মিরাজের রাত্রিতে মুহূর্তের মধ্যে এত ঘটনা ঘটেছিল বলে মানতে পারেনি এক ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি একটি মাছ ক্রয় করে তার স্ত্রীকে প্রদান করে নদীতে গোসল করতে যায়। পানিতে ডুব

দেওয়ার পরে সে মহিলায় রূপান্তরিত হয়। একজন সওদাগর তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে বিবাহ করেন.... অনেক বছর পরে আবার ঐ মহিলা পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে দেখেন যে, তার স্ত্রী তখন মাছটি কাটছেন... । এগুলি সবই মিথ্যা কাহিনী ।

২৩. হরিণীর কথা বলা বা সালাম দেওয়া

আমাদের দেশের প্রচলিত একটি গল্প যে, একটি হরিণী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাম দেয়, তাঁর সাথে কথা বলে, অথবা শিকারীর নিকট থেকে তার নাম বলে ছুটি নেয় .... ইত্যাদি । এসকল কথার কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তি পাওয়া যায় না ।[৪৩৯]

২৪. হাসান-হুসাইনের ক্ষুধা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রহৃত হওয়া

আমাদের দেশের অতি প্রচলিত ওয়ায ও গল্প, হাসান-হুসাইনের অভুক্ত থেকে ক্রন্দন, বিবি খাদিজা (রা)[৪৪০]!!, ফাতেমা (রা) ও আলীর কষ্ট, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক ইহূদীর বাড়িতে কাজ করা, ইহূদী কতৃক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে আঘাত করা....ইত্যাদি । এ সকল কাহিনী সবই বানোয়াট । এগুলির কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই । মদীনার রাষ্ট্রপতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কারো বাড়িতে শ্রম বিক্রয় করতে গিয়েছেন বলে বর্ণিত হয় নি । এছাড়া হাসান ও হুসাইন (রা) ৩ ও ৪ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন । আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৪ হি. সালে বনূ নযীর ও ৫ হি. সালে বনূ কুরাইযার ইহূদীদেরকে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন । কাজেই ইমামদ্বয়ের কথা বলার বয়স হওয়ার অনেক আগেই মদীনা ইহূদী মুক্ত হয়েছিল ।

২৫. জাবিরের (রা) সন্তানদের জীবিত করা

প্রচলিত একটি গল্পে বলা হয়, হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে দাওয়াত দেন । ইত্যবসরে জাবিরের এক পুত্র আরেক পুত্রকে জবাই করে । এরপর সে ভয়ে পালাতে যেয়ে চুলার মধ্যে পড়ে পুড়ে মারা যায় । জাবির (রা)-এর স্ত্রী এ সকল বিষয় গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর মেহমানদারী করেন । ... এরপর মৃত পুত্রদ্বয়কে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করেন । ... রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দোয়ায় তারা জীবিত হয়ে ওঠে ।...

পুরো কাহিনীটি আগাগোড়াই বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা ।[৪৪১]

২৬. বিলালের জারি

প্রচলিত বেলালের জারির সকল কথাই বানোয়াট ।

২৭. উসমান ও কুলসূমের (রা) দাওয়াত সংক্রান্ত জারি

এ বিষয়ক প্রচলিত জারিতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা ।

২৮. উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণ

একটি অতি পরিচিত গল্প উকাশার প্রতিশোধ নেওয়ার গল্প । মূল মিথ্যা কাহিনীর উপরে আরো শত রঙ চড়িয়ে এ সকল গল্প বলা হয় । মূল বানোয়াট কাহিনী হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকালের পূর্বে সাহাবীগণকে সমবেত করে বলেন, আমি যদি কাউকে কোনো যুলুম করে থাকি তবে আজ সে প্রতিশোধ বা বদলা গ্রহণ করুক । এক পর্যায়ে উকাশা নামক এক বৃদ্ধ উঠে বলেন, এক সফরে আপনার লাঠির খোঁচা আমার কোমরে লাগে । উকাশা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোমরে লাঠির খোঁচা মেরে প্রতিশোধ নিতে চান । হাসান, হুসাইন, আবু বাকর, উমার প্রমুখ সাহাবী (রাদিয়াল্লহু আনহুম) উকাশার সামনে নিজেদের দেহ পেতে দেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি । উকাশার দাবী অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের গায়ের জামা খুলে দেন । উকাশা তাঁর পেটে চুমু দেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দেন ।..... ইত্যাদি ।

পুরো ঘটনাটিই বানোয়াট । তবে সনদ বিহীন বানোয়াট নয়, সনদ-সহ বানোয়াট । পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নু'আইম ইসপাহানী তার 'হিলইয়াতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি সংকলন করেছেন । তিনি বলেন, আমাদেরকে সুলাইমান ইবনু আহমদ বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আল-বারা বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরীস বলেছেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তিনি জাবির ও ইবনু আব্বাস (রা) থেকে .... এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরিস (২২৮হি) তৃতীয় হিজরী শতকে বাগদাদের প্রসিদ্ধ গল্পকার ওয়ায়েয ছিলেন । ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই ব্যক্তি জালিয়াত ছিলেন । তার ওয়াযের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এইরূপ বিভিন্ন গল্প তিনি সনদ-সহ বানিয়ে বলতেন । এই হাদীসটিও তার বানানো একটি হাদীস । মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল, বানোয়াট ও জঘন্য মিথ্যা ।[৪৪২]

২৯. ইন্তেকালের সময় মালাকুল মাওতের আগমন ও কথাবার্তা

প্রসিদ্ধ একটি গল্প হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের সময় মালাকুল মউতের আগমন বিষয়ক । গল্পটির সার-সংক্ষেপ হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকালের দিন মালাকুল মাউত একজন বেদুঈনের বেশে আগমন করেন এবং গৃহের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন । এক পর্যায়ে ফাতেমা (রা) অনুমতি প্রদান করেন । তিনি গৃহে প্রবেশ করে অনেক কথাবার্তা আলাপ আলোচনার পরে তাঁর পবিত্র রূহকে গ্রহণ করেন.... । গল্পটি বানোয়াট । গল্পটি মূলত উপরের জাল হাদীসের অংশ । আরো অনেক গল্পকার এতে অনেক রং চড়িয়েছেন ।[৪৪৩]

৩০. স্বয়ং আল্লাহ তাঁর জানাযার নামায পড়েছেন!

আরেকটি প্রচলিত ওয়ায ও গল্প হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে তাঁর গোসল ও কাফন সম্পন্ন করা হয় এবং তাঁর মুবারাক দেহকে মসজিদে রাখা হয়। প্রথমে স্বয়ং আল্লাহ তার জানাযার সালাত আদায় করেন! গল্পটি বানোয়াট। এই গল্পটিও উপর্যুক্ত আব্দুল মুনয়িম ইবনু ইদরিসের বানানো গল্পের অংশ।[৪৪৪]

৩১. ইন্তেকালের পরে ১০ দিন দেহ মুবারক রেখে দেওয়া!

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলুব' নামক বইয়ের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ বইয়ের ২৪শ মজলিসে শাইখ নিযামউদ্দীন লিখেছেন, ২রা রবিউল আউয়াল ৬৫৬ হিজরীতে (৮/৩/১২৫৮ খৃ) তিনি তার পীর শাইখ ফরীদ উদ্দীনের দরবারে আগমন করলে তিনি বলেন, "আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাও, কেননা আজ হযরত রেসালতে পানাহ (ﷺ)-এর উরস মোবারক। কালকে চলে যেও। এরপর বললেন, ইমাম সাবী (রহ) হতে রাওয়ায়েত আছে যে, হযরত রেছালতে পানাহ ﷺ- এর বেছাল মোবারক রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে। তাঁর দেহ মোবারক মোজেজার জন্য দশ দিন রাখা হয়েছিলো। দুনিয়ার জীবিত কালে তাঁর পছিনা (ঘাম) মোবারকের সুগন্ধ ছিলো সমস্ত উৎকৃষ্ট সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট। সেই একই খুশবু একই ভাবে বেরিয়েছে ঐ দশ দিন, একটুও কমেনি (সুবহানাল্লা)। হুজুর পাক (ﷺ)-এর এ মোজেজা দেখে কয়েক হাজার ইহুদী তখন মোসলমান হয়েছিল। এ দশদিনের প্রতিদিন গরীব-মিসকিনদেরকে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে বিভিন্ন বিবিদের ঘর হতে। ঐ সময় হুজুর (ﷺ)-এর নয়টি হুজরা ছিল এবং নয়দিন তাঁদের সেখান থেকে দান করা হয়েছে। এবং দশম দিন, অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল দান করা হয়েছে হযরত সিদ্দিকে আকবর আবুবকর (রাদি)-এর ঘর হতে। এদিন মদিনার সমস্ত লোককে পেট ভরে পানাহার করানো হয়েছে এবং এ দিনই তাঁর পবিত্র দেহ মোবারক দাফন করা হয়েছে। এ জন্যই মোসলমানগণ ১২ রবিউল আউয়াল উরস করে এবং ১২ রবিউল আউয়াল দিনটিই উরসের দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ।"[৪৪৫]

আমরা জানি না, হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ)-এর গ্রন্থের মধ্যে পরবর্তী কালে কেউ এই কথাগুলি লিখেছে, নাকি কারো মুখ থেকে গল্পটি শুনে হযরত ফরীদ উদ্দীন (রাহ) এ কথাগুলি সরল মনে বিশ্বাস করেছেন এবং বলেছেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ সকল পুস্তকের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের কোনো উপায় নেই। পুরো বইটিও জাল হতে পারে।

সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মোবারক দেহ ১০ দিন দাফন বিহীন রাখা, হাজার হাজার ইহূদীর ইসলাম গ্রহণ, ১০ দিন খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সকল কথাই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তেকালের দিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাঠক সালাত অধ্যায়ে, রবিউল আউয়াল মাসের আমল বিষয়ক আলোচনার মধ্যে জানতে পারবেন, ইনশা আল্লাহ। তবে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার পূর্বাহ্ণে ইন্তেকাল করেন। পরদিন মঙ্গলবার দিবসে তাঁর গোসল ও জানাযার সালাত আদায়ের শেষে দিবাগত সন্ধ্যায় বা রাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্ম থেকেই কুরআন জানতেন

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, প্রচলিত যে সকল মিথ্যা কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে:

كَانَ ﷺ عَالِماً بِالْقُرْآنِ بِتَمَامِهِ وَتَالِيًا لَهُ مِنْ حِيْنِ وَلاَدَتِهِ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মলগ্ন থেকেই পুরো কুরআন জানতেন এবং পাঠ করতেন।"[৪৪৬]

এ কথা শুধু মিথ্যাই নয়, কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন: "আপনি তো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি..."[৪৪৭] অন্যত্র বলেন: "আপনি আশা করেন নি যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। ইহা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।"[৪৪৮]

৩৩. রাসূলুল্লাহ জন্ম থেকেই লেখা পড়া জানতেন!

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: ওয়ায়েযদের মিথ্যাচারের একটি নমুনা:

لَمْ يَكُنْ ﷺ أُمِّيًّا بَلْ كَانَ قَادِراً عَلَى الْكِتَابَةِ وَالتِّلاَوَةِ مِن ابْتِدَاءِ الْفِطْرَةِ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি প্রকৃতিগতভাবে শুরু থেকেই লিখতে ও পড়তে সক্ষম ছিলেন।"

এ কথাটিও ভিত্তিহীন মিথ্যা এবং তা কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ বলেন: "আপনি তো এর পূর্বে কোনো পুস্তক পাঠ করেন নি এবং নিজ হাতে কোনো পুস্তক লিখেন নি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।"[৪৪৯]

৩৪. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র দাঁতের নূর

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: প্রচলিত আরেকটি মিথ্যা কাহিনী নিম্নরূপ:

فِيْ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِيْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِ عَائِشَةَ إِبْرَتُهَا فَفُقِدَتْ فَالْتَمَسَتْهَا وَلَمْ تَجِدْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَخَرَجَتْ لُمْعَةُ أَسْنَانِهِ فَأَضَاءَتِ الْحُجْرَةَ وَرَأَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ الضَّوْءِ إِبْرَتَهَا

"এক রাতে আয়েশা (রা)-এর হাত থেকে তাঁর সূচটি পড়ে যায়। তিনি তা হারিয়ে ফেলেন এবং খোঁজ করেও পান নি। তখন নবীজী (ﷺ) হেসে উঠেন এবং তাঁর দাঁতের আলোকরশ্মি বেরিয়ে পড়ে। এতে ঘর আলোকিত হয়ে যায় এবং সে আলোয় আয়েশা (রা) তাঁর সূচটি দেখতে পান।"[৪৫০]

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, অনেক লেখক ও আলেম তাঁদের গ্রন্থে সহীহ কথার পাশাপাশি অনেক বাতিল কথাও সংকলন করেছেন। এতে অনেক সময় সাধারণ মুসলিম বিভ্রান্ত হন। যেমন দশম হিজরী শতকের একজন আলিম মুল্লা মিসকীন মুহাম্মাদ আল-ফিরাহী (৯৫৪ হি) কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত **'মা'আরিজুন নুবুওয়াত'** নামক সীরাতুন্নবী বিষয়ক একটি গ্রন্থ এক সময় ভারতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এ গ্রন্থে উপরের মিথ্যা হাদীসটি সংকলিত রয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লামা লাখনবী বলেন: "এ কথা ঠিক যে, এ জাল ও মিথ্যা কথাটি 'মা'আরিজুন নুবুওয়াত' গ্রন্থে ও আরো অন্যান্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। এ সকল গ্রন্থের লেখকগণ শুকনো-ভিজে (ভালমন্দ) সবকিছুই জমা করতেন। কাজেই এ সকল বইয়ের সব কথার উপরে শুধুমাত্র ঘুমন্ত বা ক্লান্ত (অজ্ঞ বা অসচেতন) মানুষেরাই নির্ভর করতে পারে। ..."[৪৫১]

৩৫. খলীলুল্লাহ ও হাবীবুল্লাহ

প্রচলিত একটি 'হাদীসে কুদসী'তে আবূ হুরাইরা (রা)-এর সূত্রে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اِتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَمُوْسَى نَجِيًّا وَاتَّخَذَنِيْ حَبِيْباً ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ لأُوْثِرَنَّ حَبِيْبِيْ عَلَى خَلِيْلِيْ وَنَجِيِّيْ

"আল্লাহ ইবরাহীমকে (আ) খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মূসাকে (আ) নাজীই (একান্ত আলাপের বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং আমাকে হাবীব (প্রেমাস্পদ) হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ বলেছেন, আমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ, আমি আমার হাবীবকে আমার খালীল ও নাজীই-এর উপরে অগ্রাধিকার প্রদান করব।"

হাদীসটি ইমাম বাইহাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর সনদে বলেন, দ্বিতীয় হিজরী শতকের রাবী মাসলামা ইবনু আলী আল-খুশানী (১৯০হি) বলেন, আমাকে যাইদ ইবনু ওয়াকি, কাসিম ইবনু মুখাইমিরা থেকে, আবূ হুরাইরা থেকে বলেন... ।" হাদীসটি উদ্ধৃত করে বাইহাকী বলেন, "এই 'মাসলামা ইবনু আলী' মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল।"[৪৫২]

মাসলামা ইবনু আলী নামক এই রাবীকে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যুর'আ, বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে 'মুনকার' ও একেবারেই অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। নাসাঈ, দারাকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে 'মাতরূক' বা পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মিথ্যায় অভিযুক্ত রাবীকেই মাতরূক বলেন। হাকিম তাকে জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৫৩]

এজন্য অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন; কারণ একমাত্র এই পরিত্যক্ত রাবী ছাড়া কেউ এ হাদীসটি বলেন নি। অপরপক্ষে কোনো কোনো মুহাদ্দিস 'মাসলামা'কে অত্যন্ত দুর্বল রাবী হিসেবে গণ্য করে এই হাদীসটিকে 'দুর্বল' বলে গণ্য করেছেন।[৪৫৪]

পক্ষান্তরে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কেও "খালীল" হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالى قَدْ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إبراهيم خليلا

"মহান আল্লাহ আমাকে খালীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেরূপ তিনি ইবরাহীমকে খালীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[৪৫৫]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকাল পরবর্তী জীবন বা হায়াতুন্নবী

কুরআনের অনেক আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শহীদগণ মৃত নন, তারা জীবিত ও রিয্ক প্রাপ্ত হন। নবীগণের বিষয়ে কুরআন কারীমে কিছু না বলা হলেও সহীহ হাদীসে তাঁদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّون

"নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা সালাত আদায় করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪৫৬]

অন্য একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لاَ يُتْرَكُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ بَعْدِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُنْفَخَ فِيْ الصُّوْرِ

"নবীগণকে ৪০ রাতের পরে তাঁদের কবরের মধ্যে রাখা হয় না; কিন্তু তারা মহান আল্লাহর সম্মুখে সালাতে রত থাকেন; শিংগায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত।"

হাদীসটির বর্ণনাকারী আহমদ ইবনু আলী আল-হাসনবী মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে পরিচিত। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস একে মাউযূ বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস এ অর্থের অন্যান্য হাদীসের সমন্বয়ে একে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৫৭]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ)-কে নিজ কবরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং ঈসা (আ)-কেও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। আল্লামা বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ দর্শনকে উপরের হাদীসের সমর্থনকারী বলে গণ্য করেছেন।[৪৫৮]

কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোনো কোনো পূর্ববর্তী নবীকে হজ্জ পালনরত অবস্থায় দেখেছেন। এ সকল হাদীসকেও কোনো কোনো আলিম নবীগণের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ দর্শনের বিষয়ে কাযী ইয়ায বলেন, এ দর্শনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যা হলো, নবীগণ শহীদগণের চেয়েও মর্যাদাবান। কাজেই নবীগণের জন্য ইন্তিকালের পরেও এইরূপ ইবাদতের সুযোগ পাওয়া দূরবর্তী কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা জীবিত অবস্থায় যেভাবে হজ্জ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তার সূরাত দেখানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে তাকে তিনি দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন...।[৪৫৯]

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"যখনই যে কেউ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"[৪৬০]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ بَعِيْدٍ أُعْلِمْتُهُ

"কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করলে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করে তাহলে আমাকে জানান হয়।"[৪৬১]

হাদীসটির একটি সনদ খুবই দুর্বল হলেও অন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সনদের কারণে ইবনু হাজার, সাখাবী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই সনদটিকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৬২]

আউস (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .... فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: "মহান আল্লাহ মাটির জন্য

নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।"[৪৬৩]

আরো অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিন বিশ্বের যেখানে থেকেই দরুদ ও সালাম পাঠ করবেন, ফিরিশতাগণ সেই সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছিয়ে দেবেন।

আম্মর বিন ইয়াসির (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত:

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِيْ مَلَكاً أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلاَئِقِ، فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَبْلَغَنِيْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيْهِ: هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ

"আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে তিনি সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে তখনই ঐ ফিরিশতা সালাত পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত পৌঁছে দিয়ে বলবে : অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত প্রেরণ করেছে।"

হাদীসটি বাযযার, তাবারানী ও আবুশ শাইখ সংকলন করেছেন। হাদীসের সনদে পরস্পর বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে দুইজন রাবী দুর্বল। এজন্য হাদীসটি দুর্বল বা যয়ীফ। তবে এ অর্থে আরো কয়েকটি দুর্বল সনদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির সামগ্রিক বিচারে নাসিরুদ্দীন আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করছেন।[৪৬৪]

উপরের হাদীসগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে ওফাত পরবর্তী জীবন দান করা হয়েছে। এ জীবন বারযাখী বা পারলৌকিক জীবন, যা একটি বিশেষ সম্মান ও গায়েবী জগতের একটি অবস্থা। এ বিষয়ে হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বলতে হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বলব, এ অপার্থিব ও অলৌকিক জীবনে তাঁর সালাত আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কেউ সালাম দিলে আল্লাহ তাঁর রূহ মুবারাককে ফিরিয়ে দেন সালামের জবাব দেওয়ার জন্য। রাওযার পাশে কেউ সালাম দিলে তিনি তা শুনেন, আর দূর থেকে সালাম দিলে তা তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। এর বেশি কিছুই বলা যাবে না। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। বুঝতে হবে যে, উম্মাতের জানার প্রয়োজন নেই বলেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকি বিষয়গুলি বলেন নি।

কিন্তু এ বিষয়ে অনেক মনগড়া কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নামে বলা হয়। এ সকল কথা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলা হয়। মুমিনের উচিত গাইবী বিষয়ে কুরআন-হাদীসের উপর সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করা এবং এর অতিরিক্ত কিছুই না বলা। গায়েবী জগৎ সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র ততটুকু কথা বলব, যতটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বাইরে কিছু বলার অর্থই হলো: **প্রথমত,** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে আন্দাযে মিথ্যা কথা বলা। **দ্বিতীয়ত,** আমরা দাবি করব যে, গায়েবী বিষয়ে আমাদের জানা জরুরি এমন কিছু বিষয় না শিখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, ফলে এখন আমাদের যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে হচ্ছে।

৩৬. তাঁর ইন্তিকাল পরবর্তী জীবন জাগতিক জীবনের মতই

এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে অন্যতম হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও নবীগণের ইন্তিকাল পরবর্তী এই বারযাখী জীবনকে পার্থিব বা জাগতিক জীবনের মতই মনে করা। এই ধারণাটি ভুল এবং তা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের রীতির পরিপন্থী। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও সূফী মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ দরবেশ হূত ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরের ঘটনাগুলি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে পাঠ করলেই আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কখনোই জাগতিক জীবনের অধিকারী বলে মনে করেন নি। খলীফা নির্বাচনের বিষয়, গোসলের বিষয়, দাফনের বিষয়, পরবর্তী সকল ঘটনার মধ্যেই আমরা তা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবদ্দশায় তাঁর পরামর্শ, দোয়া ও অনুমতি ছাড়া তাঁরা কিছুই করতেন না। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পরে কখনো কোনো সাহাবী তাঁর রাওযায় দোয়া, পরামর্শ বা অনুমতি গ্রহণের জন্য আসেন নি। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযা মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া-পরামর্শ চাননি।

আবু বকরের (রা) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শত্রু, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রাওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী (রা)! অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি বা আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য রাওযা শরীফে কোনো অনুষ্ঠান করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে ফাতিমা, আলী ও আব্বাস (রা) খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার চেয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও মনোমালিন্য হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) সাথে আমীরুল মুমিনীন আলীর (রা) কঠিন যুদ্ধ হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। এসকল যুদ্ধে অনেক সাহাবী সহ

অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছেন। কিন্তু এসকল কঠিন সময়ে তাঁদের কেউ কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে পরামর্শ চান নি। তিনি নিজেও কখনো এসকল কঠিন মুহূর্তে তাঁর কন্যা, জামাতা, চাচা, খলীফা কাউকে কোনো পরামর্শ দেন নি। এমনকি কারো কাছে রূহানীভাবেও প্রকাশিত হয়ে কিছু বলেন নি। আরো লক্ষণীয় যে, প্রথম শতাব্দীগুলির জালিয়াতগণ এ সকল মহান সাহাবীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে, কিন্তু কোনো জালিয়াতও প্রচার করে নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তিকালের পরে রাওযা শরীফ থেকে বা সাহাবীগণের মাজলিসে এসে অমুক সাহাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা কর্ম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৬৫]

৩৭. তিনি আমাদের দরুদ-সালাম শুনতে বা দেখতে পান

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন, প্রচলিত যে সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে:

إِنَّهُ ﷺ يَسْمَعُ صَلاَةَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ نَائِياً مِنْ قَبْرِهِ بِلاَ وَاسِطَةٍ

"যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করে, তবে সেই ব্যক্তি যত দূরেই থাক, তিনি কারো মাধ্যম ছাড়াই তা শুনতে পান।"[৪৬৬]

এই কথাটি শুধু সনদবিহীন, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা কথাই নয়; উপরন্তু তা উপরের সহীহ হাদীসগুলির সুস্পষ্ট বিরোধী।

৩৮. তিনি মীলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন

আব্দুল হাই লাখনবী আরো বলেন: প্রচলিত যে সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে:

يَحْضُرُ ﷺ بِنَفْسِهِ فِيْ مَجَالِسِ وَعْظِ مَوْلِدِهِ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الْقِيَامَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْلِدِ تَعْظِيْماً وَإِكْرَاماً

"মাওলিদের ওয়াযের মাজলিসে তাঁর মাওলিদ বা জন্মের কথা উল্লেখের সময় তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হন। এ কথার উপরে তারা তাঁর মাওলিদের বা জন্মের কথার সময় সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানোর প্রচলন করেছে।"[৪৬৭]

এ কথাটিও সনদহীন, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। উপরন্তু এ কথা পূর্বে উল্লিখিত সহীহ হাদীসগুলির সুস্পষ্ট বিরোধী।

৩৯. মীলাদ মাহফিলের ফযীলত

বর্তমান যুগে প্রচলিত 'মীলাদ মাহফিল' সম্পর্কে আলিমগণের মতভেদ সুপরিচিত। আমি **'এহইয়াউস সুনান'** ও **'রাহে বেলায়াত'** পুস্তকদ্বয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাসের আলোকে মীলাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও এ বিষয়ক আলিমগণের মতামত বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৪৬৮] আমরা দেখেছি যে, মীলাদ মাহফিলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মীলাদ, সীরাত, শামাইল, সুন্নাত ইত্যাদি আলোচনা করা, দরুদ-সালাম পাঠ করা ইত্যাদি সবই সুন্নাত সম্মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নাম ও পদ্ধতিগত কারণে বিভিন্ন মতভেদ দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন মত পোষণ করা ও প্রমাণ পেশ করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। কিন্তু জালিয়াতি করার অধিকার কারোই নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ বিষয়েও অনেক জালিয়াতি করা হয়েছে। আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ আলিম এ জাতীয় অনেক জাল ও মিথ্যা কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা) এর বাণী। যথা:

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَماً عَلَى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ رَفِيْقِيْ فِيْ الْجَنَّةِ، الحديث

অনুবাদ: হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মীলাদ পাঠের নিমিত্ত এক দিরহাম (চারআনা) দান করবে ঐ ব্যক্তি আমার সহিত বেহেশ্‌তে সাথী হবে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) এর বাণী। যথা:

مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ أَحْيَا الإِسْلاَمَ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীর তা'যীম ও সম্মান প্রদর্শন করবে সে পকৃতপক্ষে ইসলামকে পুনঃজীবিত করবে।

হযরত ওসমান গনী (রা) এর বাণী। যথা:

مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ أَوْ حُنَيْنٍ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীর জন্য এক দিরহাম দান করলো, সে যেন বদর বা হোনাইনের যুদ্বেধ যোগদান করলো।

হযরত আলী (রা) এর বাণী। যথা:

مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ سَبَباً فِيْ قِرَاءَتِهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بِالإِيْمَانِ

অনুবাদ: যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবীর তা'যীম করবে এবং মীলাদ পাঠের কারণ হবে, সে দুনিয়া হতে ঈমানের সহিত ইন্তেকাল করবে।"[৪৬৯]

এভাবে আরো অন্যান্য তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীর নামে অনেক জাল কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদেও এই কথাগুলি বর্ণিত হয় নি। ইসলামের প্রথম ৬/৭ শত বৎসরের মধ্যে লিখিত কোনো গ্রন্থে সনদ-বিহীনভাবেও এ মিথ্যা কথাগুলি উল্লেখ করা হয় নি। গত কয়েক শতাব্দী যাবত দাজ্জাল জালিয়াতগণ এ সকল কথা বানিয়ে প্রচার করছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের হাদীসের ভাষা, শব্দ ও পরিভাষা সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনিও বুঝতে পারবেন যে, এগুলি সবই জাল কথা। কোনো ইংরেজি ডকুমেন্ট জাল করতে যেয়ে পানি খাওয়ার ইংরেজি (eating water), অথবা আরবী ডকুমেন্ট জাল করতে যেয়ে "নামায পড়া"-র আরবী "قراءة الصلاة" লিখলে যেমন কোনো যাচাই ছাড়াই বুঝা যায় যে, ডকুমেন্টটি জাল এবং জালিয়াত একজন বাঙালী, তেমনি (قراءة المولد/ قراءة الميلاد) শুনলে আরবী ভাষায় পারদর্শী যে কেউ নিশ্চিত বুঝবেন যে, কথাটি কখনোই সাহাবীদের যুগের কারো কথা নয়; বরং সুনিশ্চিত জাল কথা এবং এ জালিয়াত তুর্কী বা তুর্কী যুগের তুর্কী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত মিসরী কোনো জালিয়াত।

???
(জাল বইটির বিষয়ে আলোচনা) ??????????????
??

৪০. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইলমুল গাইবের অধিকারী হওয়া

আব্দুল হাই লাখনবী বলেন: প্রচলিত যে সকল মিথ্যা কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে বলা হয় তার অন্যতম হলো:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُعْطِيَ عِلْمَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ مُفَصَّلاً وَوُهِبَ لَهُ عِلْمُ كُلِّ مَا مَضَى وَمَا يَأْتِيْ كُلِّيًّا وَجُزْئِيًّا وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِهِ وَعِلْمِ رَبِّهِ مِنْ حَيْثُ الإِحَاطَةِ وَالشُّمُوْلِ، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ عِلْمَ اللهِ أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ بِنَفْسِ ذَاتِهِ بِدُوْنِ تَعْلِيْمِ غَيْرِهِ بِخِلاَفِ عِلْمِ الرَّسُوْلِ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِتَعْلِيْمِ رَبِّهِ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের ও সকল কিছুর বিস্তারিত জ্ঞান প্রদত্ত হয়েছিলেন। যা কিছু অতীত হয়েছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছুরই বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি জ্ঞান তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপকতায় ও গভীরতায় রাসূলুল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, আল্লাহর জ্ঞান অনাদি ও স্বয়ংজ্ঞাত, কেউ তাঁকে শেখান নি। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহর জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তাঁর প্রভুর শেখানোর মাধ্যমে।"

আল্লামা লাখনবী বলেন: এগুলি সবই সুন্দর করে সাজানো মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। ইবনু হাজার মাক্কী তার 'আল-মিনাহুল মাক্কিয়াহ' গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রাজ্ঞ আলিম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ কথাগুলি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সামগ্রিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র তিনিই সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বা আলিমুল গাইব। এ জ্ঞান একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব ও তাঁরই গুণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কাউকে এ গুণ প্রদান করা হয় নি। হ্যাঁ, আমাদের নবী (ﷺ)-এর জ্ঞান অন্য সকল নবী-রাসূলের (আ) জ্ঞানের চেয়ে বেশি। গাইবী বা অতিন্দ্রিয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর প্রতিপালক অন্যান্য সবাইকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে অধিকতর ও পূর্ণতর শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে। তিনি জ্ঞান ও কর্মে পূর্ণতম এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকল সৃষ্টির নেতা।[৪৭০]

মোল্লা আলী কারীও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৪৭১]

৪১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাযির-নাযির হওয়া

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'ইলমুল গাইব' ও মীলাদে উপস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি প্রচলিত বানোয়াট কথা যে, তিনি 'হাযির-নাযির'। হাযির-নাযির দুটি আরবী শব্দ। (حاضر) হাযির অর্থ উপস্থিত ও (ناظر) নাযির অর্থ দর্শক, পর্যবেক্ষক বা সংরক্ষক। 'হাযির-নাযির' বলতে বোঝান হয় 'সর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক'। অর্থাৎ তিনি সদা-সর্বদা সবত্র উপস্থিত বা বিরাজমান এবং তিনি সদা সর্বদা সবকিছুর দর্শক। স্বভাবতই যিনি সদাসর্বত্র বিরাজমান ও সবকিছুর দর্শক তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল যুগের সকল স্থানের সকল গাইবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' দাবি করেন, তাঁরা দাবি করেন যে, তিনি শুধু সর্বজ্ঞই নন, উপরন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথমত, এ গুণটি শুধু আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, বান্দা যেখানেই থাক্ তিনি তার সাথে আছেন, তিনি বান্দার নিকটে আছেন... ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্পর্কে কখনোই ঘুনাক্ষরেও কুরআন বা হাদীসে বলা হয় নি যে, তিনি সর্বদা উম্মাতের সাথে আছেন, অথবা সকল মানুষের সাথে আছেন, অথবা কাছে আছেন, অথবা সর্বত্র উপস্থিত আছেন, অথবা সবকিছু দেখছেন। কুরআনের আয়াত তো দূরের কথা একটি যয়ীফ হাদীসও দ্ব্যর্থহীনভাবে এ অর্থে কোথাও বর্ণিত হয় নি।

কাজেই যারা এই কথা বলেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা কথা বলেন। কোনো একটি সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, তিনি বলেছেন 'আমি হাযির-নাযির'। অথচ তাঁর নামে এই মিথ্যা কথাটি বলা হচ্ছে। এমনকি কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা ইমাম কখনোই বলেন নি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাযির-নাযির'।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে বারংবার অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'ইলমুল গাইব' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী নন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করা উক্ত সকল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা।

তৃতীয়ত, আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন হাদীসে তিনি বলেছেন, উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কবরে উপস্থিত করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাযির-নাযির বলে দাবি করার অর্থ হলো, এ সকল হাদীস সবই মিথ্যা। উম্মাতের দরুদ-সালাম তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না, বরং তিনিই উম্মাতের কাছে উপস্থিত হন!! কাজেই যারা এই দাবিটি করছেন, তাঁর শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। উপরন্তু তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন, নাঊযু বিল্লাহ! নাঊযু বিল্লাহ!!

এ সকল মিথ্যার উৎস ও কারণ

এখানে পাঠকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এইরূপ ইলমুল গাইবের অধিকারী, হাযির-নাযির, ইত্যাদি যখন কোনো হাদীসেই বর্ণিত হয়নি এবং কুরআনেও এভাবে বলা হয় নি, তখন কেন অনেক মানুষ এগুলি বলছেন? তাঁরা কি কিছুই বুঝেন না?

এ বইয়ের পরিসরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইলমুল গাইব, হাযির-নাযির ও অন্যান্য বিষয়ে বানোয়াট কথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলার পিছনে দুটি কারণ প্রধান:

প্রথম কারণ: এ বিষয়ক কিছু বানোয়াট কথা বা বিভিন্ন আলিমের কথার উপর নির্ভর করা। পাশাপাশি দ্ব্যর্থবোধক বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে সেগুলিকে নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করা। আর এ সকল দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসের বিশেষ ব্যাখ্যাকে বজায় রাখতে অগণিত আয়াত ও হাদীসের স্পষ্ট অর্থকে বিকৃত করা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করা।

ইসলামের পূর্ববর্তী ধর্মগুলির বিভ্রান্তির যে চিত্র কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে, এই বিষয়টি ছিল বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। আল্লাহ ঈসা (আ)-কে বিনা পিতায় জন্ম দিয়েছেন, তাকে 'আল্লাহর কালিমা' ও 'আল্লাহর রূহ' বলেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁকে 'ঈশ্বর বা ঈশ্বরের সত্ত্বার (যাতের) অংশ বলেন নি। প্রচলিত বাইবেলেও নেই যে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছেন। কিন্তু খৃস্টানগণ দাবি করলেন, যেহেতু 'আল্লাহর কালাম' আল্লাহর গুণ ও তাঁর সত্তার অংশ, সেহেতু যীশু ঈশ্বরের অংশ। আল্লাহর রূহ তাঁরই সত্তা। যেহেতু যীশুকে ঈশ্বরের আত্মা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেহেতু তিনি ঈশ্বরের যাতের অংশ, ঈশ্বরের জাত ও ঈশ্বর... (God Incarnate)। এ অপব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তারা বাইবেলের অগণিত স্পষ্ট বাক্যের অপব্যাখ্যা করে এই আসমানী ধর্মটিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে। এ জন্য আল্লাহ বলেন:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ

"হে কিতাবীগণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল, এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে (আগত) আত্মা (আদেশ)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং বলিও না 'তিন'...।[৪৭২]

এভাবে আল্লাহ তাদেরকে বাড়িয়ে বলতে নিষেধ করলেন। আল্লাহ যতটুকু বলেছেন ততটুকুই বল। তাকে আল্লাহর কালিমা ও আল্লাহর রূহ বল, কিন্তু এ থেকে বাড়িয়ে ও ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে 'ঈশ্বর' বা 'ঈশ্বরের জাত' বলো না এবং ত্রিত্ববাদের শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়ো না।

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যেও একই কারণ বিদ্যমান। খারিজী, শিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলী ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ই কুরআন-সুন্নাহ মানেন। একটি কারণেই তারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। কুরআন ও হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সাহাবীগণ তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন। এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য দেখতেন না এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চেষ্টা করতেন না। কুরআন-হাদীসে যা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা তাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। যেমন, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো হুকম নেই। আবার অন্যত্র বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে হাকিম বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ উভয় বিষয় সমান ভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু খারিজীগণ একটিকে গ্রহণ করেছে এবং অন্য সকল নির্দেশকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বাতিল করেছে।

অনুরূপভাবে কুরআন কারীমে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কথা ও কর্মের কারণে বিপদাপদের কথা বলা হয়েছে। তেমনি সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় তাও বলা হয়েছে। সাহাবীগণ উভয় কথায় সমানভাবে বিশ্বাস করেছেন। এগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য খুঁজেন নি। কিন্তু কাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা বিভিন্ন সম্প্রদায় একটি কথাকে মূল হিসাবে গ্রহণ করে বাকি কথাগুলিকে বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছেন।

কুরআনে পাপীদের অনন্ত জাহান্নাম বাসের কথা বলা হয়েছে। আবার শিরক ছাড়া সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন বলেও বলা হয়েছে। অগণিত সহীহ হাদীসে পাপী মুমিনের শাস্তিভোগের পরে জান্নাতে গমনের কথা বলা হয়েছে। সাহাবীগণ সবগুলিই সমানভাবে মেনেছেন। কিন্তু বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলি একটিকে মানতে অন্যটিকে বাতিল করেছেন।

'ইলমুল গাইব' বা 'হাযির-নাযির' বিষয়টি ইসলামের প্রথম কয়েকশত বৎসর ছিল না। পরবর্তী কালে এর উৎপত্তি। এ বিষয়েও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আসমান-যমীনের মধ্যে কেউ গাইব জানেন না। বিভিন্ন আয়াতে বারংবার বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'গাইব' বা অদৃশ্য বিষয় জানেন না। মক্কী সূরায়, মদনী সূরায়, মদীনায় অবতীর্ণ একেবারে শেষ দিকের সূরায় সকল স্থানেই তা বলা হয়েছে।[৪৭৩] এর বিপরীতে একটি আয়াতেও বলা হয় নি যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলিমুল গাইব'। তিনি 'গাইবের সবকিছু জানেন' এ কথা তো দূরের কথা 'তিনি গাইব জানেন' এই প্রকারের একটি কথাও কোথাও বলা হয় নি। তবে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ বলেছেন, এগুলি গাইবের খবর বা সংবাদ যা আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানালাম... ইত্যাদি।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি 'গাইব' বা অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক নয়, তিনি মনের কথা জানেন না, তিনি গোপন কথা জানেন না এবং তিনি ভবিষ্যত জানেন না।

আয়েশা, উম্মু সালামা, আসমা বিনত আবী বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আনাস ইবনু মালিক, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইবনু সা'দ, আমর ইবনুল আস প্রমুখ প্রায় দশ জন সাহাবী (ﷺ) থেকে অনেকগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবেঃ

إِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ

"আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।"[৪৭৪]

এ সকল অগণিত সহীহ হাদীসের বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি বলেন নি যে, আমি 'আলিমুল গাইব', বা আমি সকল গোপন জ্ঞানের অধিকারী, অথবা আমি তোমাদের সকল কথাবার্তা বা কাজ কর্মের সময় উপস্থিত থাকি, অথবা আমি ঘরে বসেই তোমাদের সকল কাজ কর্ম ও গোপন বিষয় দেখতে পাই ... এইরূপ কোনো কথাই তিনি বলেন নি।

তবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করেছেন, অনেক মানুষের গোপন বিষয় বলে দিয়েছেন, কোনো কোনো হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, স্বপ্নে বা সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম সবকিছু দেখেছেন। তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে পিছনের মুসল্লীদেরকেও দেখতে পান বলে জানিয়েছেন। কিন্তু কখনোই বলেন নি যে, তিনি পর্দার আড়ালে, ঘরের মধ্যে, মনের মধ্যে বা দূরের কোনো কিছু দেখেন। বরং বারংবার এর বিপরীত কথা বলেছেন।

এখন মুমিনের দায়িত্ব হলো এ সব কিছুকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা। কুরআনের বিভিন্ন স্পষ্ট আয়াত ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) 'গাইব' জানতেন না। আবার কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে গাইবের অনেক বিষয় জানিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সকল নবী-রাসূলের জ্ঞানের চেয়ে বেশি ও পূর্ণতর।

একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো ব্যাখ্যায় যেতে নেই। প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করলেও গুরুত্বের কম বেশি হবে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে। স্পষ্ট কথাকে অস্পষ্ট কথার জন্য ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে না। বরং প্রয়োজনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কথার জন্য অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক কথার ব্যাখ্যা করতে হবে। 'খবর ওয়াহিদ' একক হাদীসের জন্য কুরআনের স্পষ্ট বাণী বা মুতাওয়াতির ও মশহূর হাদীস বাতিল করা যাবে না। প্রয়োজনে কুরআন বা প্রসিদ্ধ হাদীসের জন্য একক ও দ্ব্যর্থবোধক হাদীসের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করতে হবে।

কিন্তু যারা ইলমুল গাইবের দাবি করেন তাঁরা এ সকল দ্ব্যর্থবোধক বা ফযীলত বোধক আয়াত ও হাদীসকে মূল ধরে এর ভিত্তিতে অগণিত সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করে দেন। পাঠকের হৃদয়ঙ্গমের জন্য এখানে তাঁদের এইরূপ কয়েকটি 'দলীল' আলোচনা করছি।

(১) কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'শাহিদ' ও 'শাহীদ' (شاهد وشهيد) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭৫] এই শব্দ দুইটির অর্থ 'সাক্ষী', 'প্রমাণ', 'উপস্থিত' (witness, evidence, present) ইত্যাদি। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুফাস্সিরগণ এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (ﷺ) দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে ও সাক্ষীরূপে প্রেরণ করেছেন। যারা তাঁর প্রচারিত দ্বীন গ্রহণ করবেন, তিনি তাঁদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। এছাড়া পূর্ববর্তী নবীগণ যে তাদের দীন প্রচার করেছেন সে বিষয়েও তিনি এবং তাঁর উম্মাত সাক্ষ্য দিবেন। অনেকে বলেছেন, তাঁকে আল্লাহ তাঁর একত্বের বা ওয়াহদানিয়্যতের সাক্ষী ও প্রমাণ-রূপে প্রেরণ করেছেন।[৪৭৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেক স্থানে মুমিনগণকেও মানব জাতির জন্য 'শাহীদ' বলা হয়েছে।[৪৭৭] অনেক স্থানে আল্লাহকে 'শাহীদ' বলা হয়েছে।[৪৭৮]

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী' বা 'হাযির-নাযির' বলে দাবি করেন তাঁরা এই 'দ্ব্যর্থবোধক' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ গ্রহণ করেন। এরপর সেই অর্থের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কুরআনের সকল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বাণী বাতিল করে দেন। তাঁরা বলেন, 'শাহিদ' অর্থ উপস্থিত। কাজেই তিনি সর্বত্র উপস্থিত। অথবা 'শাহিদ' অর্থ যদি সাক্ষী হয় তাহলেও তাঁকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ না দেখে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। আর এভাবে তিনি সদা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাযির-নাযির ও সকল স্থানের সকল গোপন ও গাইবী জ্ঞানের অধিকারী।

তাঁদের এই ব্যাখ্যা ও দাবির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত, তাঁরা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী মুফাসসিরদের মতামত নিজেদের মর্জি মাফিক বাতিল করে দিলেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা একটি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যাকে মূল আকীদা হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা নিজেদের মর্জিমাফিক বাতিল করে দিলেন। তাঁরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করলেন, যে অর্থে একটি দ্ব্যর্থহীন আয়াত বা হাদীসও নেই। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী বা কোনো ইমামও কখনো এ কথা বলেন নি।

তৃতীয়ত, তাঁদের এই ব্যাখ্যা ও দাবি মূলতই বাতিল। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকেই 'সর্বজ্ঞ', 'ইলমে গাইবের অধিকারী' ও হাযির-নাযির বলে দাবি করতে হবে। কারণ মুমিনগণকেও কুরআনে 'শাহীদ' অর্থাৎ 'সাক্ষী' বা 'উপস্থিত' বলা হয়েছে এবং বারংবার বলা হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ববর্তী সকল উম্মাত সহ পুরো মানব জাতির সম্পর্কে কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। আর উপস্থিত না হলে তো সাক্ষ্য দেওয়া যায় না। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা ও দাবি অনুসারে বলতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন সৃষ্টির শুরু থেকে বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এবং সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন। কারণ না দেখে তাঁরা কিভাবে মানবজাতির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন?!

(২) কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

"নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর (closer) এবং তাঁর স্ত্রী তাদের মাতা। এবং আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর।"[৪৭৯]

এখানে 'আউলা' (أولى) শব্দটির মূল হলো 'বেলায়াত' (الولاية), অর্থাৎ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। 'আউলা' অর্থ 'অধিকতর ওলী'। অর্থাৎ অধিক বন্ধু, অধিক নিকটবর্তী, অধিক যোগ্য বা অধিক দায়িত্বশীল (more entitled, more deserving, worthier, closer)।

এখানে স্বভাবতই 'ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর (closer) বলতে ভক্তি, ভালবাসা, দায়িত্ব, সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হচ্ছে। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহকে তাঁদের নিজেদের সত্ত্বার চেয়েও বেশি আপন, বেশি প্রিয় ও আনুগত্য ও অনুসরণের বেশি হক্কদার বলে জানেন। এই 'আপনত্বের' একটি দিক হলো যে, তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরদ ও প্রেম তার আপনজনদের চেয়েও বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথা বলেছেন। হযরত জাবির, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي (فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ) فَأَنَا مَوْلاهُ

"প্রত্যেক মুমিনের জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী। তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহর বাণী পাঠ কর: "নবী মু'মিনগণের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর"। কাজেই যে কোনো মুমিন যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে সম্পদ রেখে যায়, তবে তার উত্তরাধিকারীগণ যারা থাকবে তারা সে সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি সে ঋণ রেখে যায় বা অসহায় সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপরেই থাকবে। কারণ আমিই তার আপনজন।"[৪৮০]

কিন্তু 'হাযির-নাযির'-এর দাবিদারগণ দাবি করেন যে, এখানে দৈহিক নৈকট্য বুঝানো হয়েছে। কাজেই তিনি সকল মুমিনের নিকট হাযির আছেন।

এখানেও আমরা দেখছি যে একটি বানোয়াট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা কুরআন ও হাদীসে অগণিত দ্ব্যর্থহীন নির্দেশকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাঁর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করছেন না। সর্বোপরি তাদের এ ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবেই বাতিল। কারণ এ আয়াতেই বলা হয়েছে যে "আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর"। অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, "আত্মীয়গণ একে অপরের ঘনিষ্ঠতর বা নিকটতর।"[৪৮১] তাহলে এদের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের বলতে হবে যে, সকল মানুষই হাযির নাযির। কারণ

সকল মানুষই কারো না কারো আত্মীয়। কাজেই তার সদাসর্বদা তাদের কাছে উপস্থিত এবং তাদের সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন!

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, নবী (ﷺ) ও মুমিনগণ মানুষদের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে 'নিকটতর' বা ঘনিষ্ঠতর।[৪৮২] এখানে দাবি করতে হবে যে, সকল মুমিন ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত...!

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইহূদীদের আশূরার সিয়াম পালন করতে দেখেন। তিনি তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলে, এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ) ও ইস্রায়েল সন্তানদেরকে ফেরাউনের উপর বিজয় দান করেন। এজন্য মূসা (আ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিন সিয়াম পালন করেন। তখন তিনি বলেন:

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ (مِنْهُمْ) وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ)-এর নিকটতর। একথা বলে তিনি এ দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন।"[৪৮৩]

এখন এ ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের দাবি করতে হবে যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য মূসার কাছে উপস্থিত ও বিরাজমান!!

(৩) আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (رَقِيَ الْمِنْبَرَ) فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ (أَتِمُّوا الصُّفُوفَ) فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (خَلْفَ ظَهْرِي/مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)، فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ (مِنْ أَمَامِيْ)

একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে (অন্য বর্ণনায়: মিম্বরে আরোহণ করে) তিনি বলেন: হে মানুষেরা, আমি তোমাদের ইমাম। কাজেই তোমরা আমার আগে রুকু করবে না, সাজদা করবে না, দাঁড়াবে না এবং সালাত শেষ করবে না। (অন্য বর্ণনায়: কাতারগুলি পূর্ণ করবে।) কারণ আমি তোমাদেরকে দেখতে পাই আমার সামনে এবং আমার পিছনে, যখন তোমরা রুকু কর এবং যখন তোমরা সাজদা কর। (অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে এবং রুকুর মধ্যে আমি আমার পিছন থেকে তোমাদেরকে দেখি যেমন আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে দেখি।)[৪৮৪]

এই হাদীস থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারছি। হাদীসটি পাঠ করলে বা শুনলে যে কেউ অনুভব করবেন যে, বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টি ও দর্শনের বিষয়ে। মানুষ সামনে যেরূপ সামনের দিকে দেখতে পায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে সেভাবেই পিছনে দেখতে পেতেন। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে, এই দর্শন ছিল সালাতের মধ্যে ও রুকু সাজাদরা মধ্যে। অন্য সময়ে তিনি এইরূপ দেখতেন বলে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। ইবনু হাজার আসকালানী বলেন:

ظَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ وَاقِعاً فِيْ جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ

"হাদীসের বাহ্যিক বা স্পষ্ট অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, পিছন থেকে দেখতে পাওয়ার এই অবস্থাটি শুধুমাত্র সালাতের জন্য খাস। অর্থাৎ তিনি শুধু সালাতের মধ্যেই এইরূপ পিছন থেকে দেখতে পেতেন। এমনও হতে পারে যে, সর্বাবস্থাতেই তিনি এইরূপ দেখতে পেতেন।[৪৮৫]

এই দ্বিতীয় সম্ভাবনা হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত। তা সত্ত্বেও যদি তা মেনে নেওয়া হয় এবং মনে করা হয় যে, তিনি সর্বদা এইরূপ সামনে ও পিছনে দেখতে পেতেন, তবুও এ হাদীস দ্বারা কখনোই বুঝা যায় না যে, তিনি দৃষ্টির আড়ালে, ঘরের মধ্যে, পর্দার অন্তরালে, মনের মধ্যে বা অনেক দূরের সবকিছু দেখতে পেতেন। তা সত্ত্বেও যদি কুরআন ও হাদীসের বিপরীত ও বিরোধী না হতো, তবে আমরা এ হাদীস থেকে দাবি করতে পারতাম যে, তিনি এভাবে সর্বদা সর্বস্থানের সর্বকিছু দেখতেন এবং দেখছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন আয়াতে ও অগণিত সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। মূলত মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়মত রাসূল (ﷺ)-কে এইরূপ ঝামেলা ও বিড়ম্বনাময় দায়িত্ব থেকে উর্ধ্বে রেখেছেন।

কিন্তু 'ইলমুল গাইব' বা 'হাযির-নাযির' দাবিদারগণ এখানে 'তোমাদেরকে দেখতে পাই' কথাটির ব্যখ্যায় বলেন যে, তিনি সদা সর্বদা সর্বস্থানে সর্বজনকে দেখতে পান। আমরা দেখছি যে, এ ব্যখ্যাটি শুধু হাদীসটির বিকৃতিই নয়, উপরন্তু অগণিত আয়াত ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী।

সর্বোপরি সামনে ও পিছনে 'দেখা' বা 'গায়েবী দেখা' দ্বারা 'সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিতি' বা সবকিছু দেখা প্রমাণিত হয় না। কুরআনে বলা হয়েছে যে, শয়তান ও তার দল মানুষদেরকে গায়েবীভাবে দেখে:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ

"সে (শয়তান) ও তার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না।"[৪৮৬]

(৪) মহান আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

"তুমি কি দেখনি কেমন করলেন তোমার রব্ব হস্তীবাহিনীর সাথে।"[৪৮৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর "হাযির নাযির" ও "ইলমুল গাইব" প্রমাণ করতে এ আয়াত উল্লেখ করা হয়। তাঁরা বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্মের পূর্বেও আবরাহার হস্তীবাহিনীর বিপর্যয় দেখেছিলেন। এথেকে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্বের ও পরের সকল কিছু দেখেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সদা-সর্বত্র হাযির বা বিরাজমান!!

এদের কেউ হয়ত সত্যিই অজ্ঞ এবং কেউ জ্ঞানপাপী। তা নাহলে আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, আরবীতে "দেখা" বলতে শুধু চক্ষুর দেখা বুঝানো হয় না, জানা বা জ্ঞানলাভও বুঝানো হয়। কুরআনে এরূপ ব্যবহার অগণিত। দুটি নমুনা দেখুন। কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ

"তারা কি দেখে নি আমি ধ্বংস করলাম তাদের পূর্ববর্তী কত জাতি?"[৪৮৮]

তাঁদের যুক্তির ধারায় এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ জাহল-সহ সকল কাফিরই "হাযির-নাযির" বা অতীত-বর্তমান সবকিছুর দর্শক। তারা নূহ (আ) এবং অন্যান্য নবীদের (আ) যুগের কাফিরগণের ধ্বংসলীলার সময় উপস্থিত ছিল ও তা অবলোকন করেছিল!!

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا

"তোমরা কি দেখ নি কিভাবে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ সপ্ত আসমানকে স্তর-বিন্যস্তকরে?"[৪৮৯]

আমরা কি বলব যে, কুরআন পাঠকারী ও শ্রোতা সকলেই সপ্ত আকাশ সৃষ্টির সময় "হাযির" বা উপস্থিত ছিলেন এবং তা অবলোকন করেছিলেন?!

"হাযির-নাযির", "ইলমুল গাইব" ইত্যাদি বিষয়ের সকল "দলীল"-এ এরূপ। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এ সকল বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যারা বলেন, তাঁরা তাঁদের কথাগুলির পক্ষে একটিও দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস পেশ করছেন না। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক বা দ্ব্যর্থবোধক কিছু আয়াত বা হাদীসকে মনগড়াভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এরপর এরূপ ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে তাঁরা অগণিত আয়াত ও সহীহ হাদীস বাতিল করে দেন। যারা এরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের অনেকের নেক নিয়্যাত ও ভক্তি-ভালবাসা হয়ত নির্ভেজাল। তবে তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যে ওহীর নামে মিথ্যা বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এমন কথা বলেছেন যা তিনি কখনোই নিজের বিষয়ে বলেন নি।

দ্বিতীয় কারণ: এ সকল কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা-বৃদ্ধিকর বলে মনে করা এবং এ সকল কথা বললে তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি বা পূর্ণতা পাবে বলে মনে করা।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভক্তি ও ভালবাসা এবং তাঁর প্রশংসা করা ঈমানের মূল ও মুমিনের অন্যতম সম্বল। তবে এ জন্য কুরআনের অগণিত আয়াত ও অগণিত সহীহ হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশের বাইরে আমাদের যয়ীফ, মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলতে হবে, বা যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে কিছু কথা বানাতে হবে এই ধারণাটিই ইসলাম বিরোধী।

এ সকল ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য নাজাতের একমাত্র উপায় হলো, সকল ক্ষেত্রে বিশেষত আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভর করা। আমাদের বুঝতে হবে যে, আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেক মুমিনকেই একইভাবে বিশ্বাস করতে হবে। আমলের ক্ষেত্রে কোনো আমল কারো জন্য জরুরী আর কারো জন্য কম জরুরী বা অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় তা নয়। তা সকলের জন্য সমান। এজন্য আলিমগণ বলেছেন যে, বিশ্বাসের ভিত্তি হবে কুরআন কারীম বা মুতাওয়াতির হাদীসের উপর। অর্থাৎ যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সেই বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সকল সাহাবীকে জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই জানিয়েছেন। আর এইরূপ বিষয় অবশ্যই কুরআনে থাকবে বা ব্যাপক প্রচারতি 'মুতাওয়াতির' হাদীসে থাকবে।

এছাড়া আরো বুঝতে হবে যে, বিশ্বাসের ভিত্তি 'গাইবী' বিষয়ের উপরে। এ সকল বিষয়ে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো ফয়সালা দেওয়া যায় না। কর্ম বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান নেই এরূপ অনেক নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবিত হয়, এজন্য সেক্ষেত্রে কিয়াস ও ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। যেমন মাইক, ধুমপান ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় সেরূপ নয়। এগুলিতে নতুন সংযোজন সম্ভব নয়। এজন্য এ বিষয়ে কিয়াস বা ইজতিহাদ অর্থহীন। আল্লাহর গুণাবলি, নবীগণের সংখ্যা, মর্যাদা,

ফিরিশতাগণের সংখ্যা, সৃষ্টি, কর্ম, দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীসে যেভাবে যতটুকু বলা হয়েছে তাই বিশ্বাস করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা ওহীর কথাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারি, কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারি না।

এজন্য মুমিনের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো, কুরআন কারীমের সকল কথাকে সমানভাবে গ্রহণ করা এবং কোনো কথাকে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কথাকে বাতিল বা ব্যাখ্যা না করা। অনুরূপভাবে সকল সহীহ হাদীসকে সহজভাবে মেনে নেওয়া। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা। যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কিছু নেই এবং সাহাবীগণও কিছু বলেন নি, সে বিষয়ে চিন্তা না করা, কথা না বলা ও বিতর্কে না জড়ানো। মহান আল্লাহ আমাদের নফসগুলিকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগত করে দিন। আমিন।

২. ৫. আহলু বাইত, সাহাবী ও উম্মত সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুমহান মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী যে, তাঁর পরিবার পরিজন এবং সাথী-সহচরগণের মর্যাদা ও সম্মান হবে নবীগণের পরে বিশ্বের সকল যুগের সকল মানুষের ঊর্ধ্বে। কুরআন ও হাদীসে যদি তাঁদের বিষয়ে কোন প্রকার উল্লেখ নাও থাকত, তবুও তাঁদের মহোত্তম মর্যাদার বিষয় যে কোন বিবেকবান ও জ্ঞানী মানুষ খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন।

এই স্বাভাবিক মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এবং তাঁদের মহিমা, মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছে কুরআন কারীমের অনেক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অগণিত বাণী। এ সকল আয়াত ও হাদীসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। এসবের সার কথা হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিজনগণকে এবং সাহাবীগণকে ভালবাসা ও সম্মান করা তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান করার এবং ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কুরআন ও হাদীসের এসকল মহান বাণী, সহজ ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা অনেক মুর্খ ভক্তের হৃদয়কে তৃপ্ত করতে পারেনি। তৃপ্ত করতে পারেনি অতিভক্তির ভণ্ডামীতে লিপ্ত অগণিত মানুষকে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আজগুবি ও অবাস্তব কথা বানিয়েছে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে। এভাবে তারা তাঁর নামে মিথ্যা বলার জঘন্যতম পাপ করার সাথে সাথে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদনকে কলুষিত করেছে। মুমিনের ঈমান ও জ্ঞানীর অনুভবকে অপবিত্র করেছে। নিচে এ জাতীয় বানোয়াট ও অনির্ভযোগ্য কিছু কথা উল্লেখ করছি।

১. পাক পাঞ্জাতন

আহলু বাইতের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে একত্রিত করে পাঁচজনের একত্রিত বিশেষ মর্যাদা জ্ঞাপক অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা "পাকপাঞ্জাতন" নামে প্রচলিত আছে। "পাকপাঞ্জাতন" বিষয়ক সকল কথা বানোয়াট ও জঘন্য মিথ্যা কথা।

হযরত আলী ও ফাতিমা- রদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কেন্দ্র করে মুর্খরা অনেক বানোয়াট, আজগুবি ও মিথ্যা কথা রটনা করেছে। যেমন। হযরত ফাতিমা (রা:) একদিন একটি পাখির গোশত খেতে চান। হযরত আলী (রা:) অনেক চেষ্ট করেও পাখিটি ধরতে পারেন না।.... জঘন্য মিথ্যা কথা।

২. বিষাদ সিন্ধু ও অন্যান্য প্রচলিত পুঁথি ও বই

বিষাদ সিন্ধু বইয়ের ৯৫% কথা মিথ্যা। বিষাদ সিন্ধু উপন্যাস। কোনো ইতিহাস বা ধর্মীয় পুস্তক নয়। উপন্যাস হিসাবে এর মূল্যায়ন হবে। কিন্তু দু:খজনক কথা হলো, সমাজের সাধারণ মানুষেরা এই ধরণের বইয়ের কথাগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। বিশেষত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জড়িয়ে যে সকল মিথ্যা কথা বলা হয়েছে সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। হযরত মু'আবিয়াকে (রা) ভবিষ্যদ্বাণী করা, মুহাম্মদ হানুফার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করা, হযরত হুসাইনের (রা) গলায় বারংবার ছুরির আঘাতে ক্ষত না হওয়া... তাঁর হত্যাকারীর বেহেশতে নেওয়া ইত্যাদি সকল কথা বানোয়াট। মুহাম্মাদ হানুফা (মুহাম্মাদ ইবনু আলী, ইবনুল হানাফিয়্যাহ) বিষয়ক, ইয়াযিদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর পাহাড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকা ইত্যাদি কথা সবই মিথ্যা।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, 'বিষাদ সিন্ধু' জাতীয় পুস্তকাদি, পুঁথি সাহিত্য ও 'খাইরুল হাশর' জাতীয় পুস্তকগুলিই আমাদের সমাজে মিথ্যা ও জাল হাদীস প্রচারের অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি রয়েছে 'বার চাঁদের ফযীলত', 'নেক আমল', মকছুদুল মুমিনীন, নেয়ামুল কোরান, নাফেউল খালায়েক জাতীয় পুস্তক। সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা প্রসারে এ সকল পুঁথি-পুস্তকের অবদান অনস্বীকার্য। এ সকল পুস্তকের সম্মানিত লেখকগণ তাঁদের যুগের ও সময়ের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কল্যাণময় খেদমতের পাশাপাশি জাল হাদীস, ভিত্তিহীন কথাবার্তা, বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার প্রসারেও এগুলি অবদান রেখেছে।

এক সময় বাংলার 'যোগ্য' আলিমগণ বাংলাভাষায় পুস্তকাদি রচনা 'দূষণীয়' বলে গণ্য করতেন। এই ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তিই সমাজে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য আলিমদের রচিত ভুলভ্রান্তিপূর্ণ পুস্তক প্রচলনের সুযোগ করে দেয়।

৩. ফাতিমা (রা)-এর শরীর টেপার জন্য বাঁদী চাওয়া!

এখানে অনুবাদের বিকৃতি ও মিথ্যার একটি নমুনা উল্লেখ করছি। প্রচলিত একটি পুস্তকে লিখিত হয়েছে: "হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ- একদিন বিবি ফাতেমা (রা) হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন হে পিতঃ! আমাকে সমস্ত দিনই আটা পিষায় ও গৃহ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় তাই আমার শরীরটা বেদনা ও দরদযুক্ত হইয়া যায়। অতএব আমাকে একটি বাঁদী ক্রয় করিয়া দিন যাতে সে আমার শরীরটা টিপিয়ে দিতে ও গৃহ কার্যে আমাকে সাহায্য করিতে পারে। তদুত্তরে হুজুর (ﷺ)

বলিলেন, হে মাতঃ! স্ত্রী লোকের পক্ষে আপন স্বামীর ও পরিজন পোষনের জন্য আটা পিষা গৃহ কার্যে আঞ্জাম করার ন্যায় পুণ্য কাজ আর কিছুই নাই। কিন্তু বাদী বা চাকরানীর সাহায্য লইলে ততদূর ছোওয়াবের ভাগী হইতে পারিবে না। অতএব আমার উপদেশ মানিয়া সর্বদা নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিতে থাক, নিশ্চয়ই তোমার শরীরের বেদনা দুর হইয়া যাইবে এবং শরীর সর্বদা সুস্থ ও সবল থাকবে। আর অতিরিক্ত ছওয়াবও পাইবে। তখন হইতে বিবি ফাতেমা তাহাই করিতেন। দোওয়াঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ".[৪৯০]

একটি সহীহ হাদীসের মনগড়া অনুবাদ করে এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে অনেকে মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলা হয়েছে। উপরন্তু ফাতিমা (রা) এর জন্য অবমাননাকর কথাবার্তা বলা হয়েছে। মূল হাদীসটি বুখারী, মুসলিম ও অন্য সকল মুহাদ্দিস কাছাকাছি শব্দে সংকলন করেছেন: হাদীসটি নিম্নরূপ:

আলী (রা) বলেন, যাঁতা চালানোর কারণে তাঁর হাতে কি কষ্ট হয় তা জানাতে ফাতিমা (আ) নবীজী (ﷺ)-এর নিকট গমন করেন। ফাতিমা শুনেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী দাস-দাসী এসেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাড়িতে যেয়ে তাঁকে পান নি। তখন তিনি আয়েশা (রা)-কে বিষয়টি জানান। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে আসেন তখন আয়েশা বিষয়টি তাঁকে জানান। আলী বলেন, আমরা রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ার পরে তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন। তখন আমরা উঠতে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের জায়গাতেই থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মধ্যখানে বসলেন। এমনকি আমি আমার পেটের উপর তাঁর পদযুগলের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমার যা চাচ্ছ তার চেয়েও উত্তম বিষয় কি তোমাদের শিখিয়ে দেব না? তোমরা যখন তোমাদের বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এই আমলটি তোমাদের জন্য দাসীর চেয়েও উত্তম। আলী বলেন, এরপর আমি কখনোই এই আমলটি ত্যাগ করিনি।

এ হলো মূল ঘটনা, যা বুখারী ও মুসলিম সহ সকল মুহাদ্দিস বিভিন্ন সহীহ সনদে সংকলিত করেছেন। অথচ উপরের অনুবাদে সব কিছু বিকৃত করা হয়েছে এবং অনেক মিথ্যা কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলা হয়েছে।[৪৯১]

৪. আবূ বাক্র (রা)-এর খেজুর পাতা পরিধান

প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে একটি ভিত্তিহীন কাহিনী উদ্ধৃত করছি: "ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একজন বড় ধনাঢ্য লোক ছিলেন। যেদিন হযরত (ﷺ)-এর খেদমতে আসিয়া ইসলামে দিক্ষীত হইলেন সেইদিন হইতেই তাঁহার যাবতীয় ধন সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতে লাগিলেন। ... একদিন পরনের কাপড়ের অভাবে মসজিদে নামায পড়িতে যাইতে কিঞ্চিত দেরী হইয়াছিল। দেখিয়া হযরত (ﷺ) বলিলেন, হে আবু বকর (রা), আমি জীবিত থাকিতেই ইসলামের প্রতি আপনাদের এত অবহেলা হইতেছে, আমি অভাবে আরও কত কি হয় বলা যায় না। ...তিনি বলিলেন হুজুর আমার অবহেলার কিছুই নহে। বাস্তবিক আমার পরনে কাপড় ছিলনা, সেই হেতু আমি ছোট এক খানা কাপড়ের সহিত বালিশের কাপড় ছিঁড়িয়া খেজুর পাতা ও কাঁটা দ্বারা সেলাই করতঃ ধুইয়া ও শুকাইয়া পরিয়া আসিতে এত গৌণ হইয়াছে...। ইহার কিছুক্ষণ পরে জীব্রাইল সম্পুর্ণ খেজুর পাতার পোষাক পরিয়া হযরতের সম্মুখে হাজির হইলেন...। হযরত (ﷺ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ... আজকে খেজুর পাতার পোষাক দেখিতেছি কেন? তদুত্তরে জিব্রাইল (ﷺ) বলিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) খেজুর পত্রের সেলাই করা কাপড়ে নামায পড়িতে আসিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত ফেরেশতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ হে ফেরেশ্তাগণ, আবুবকর আমার সন্তোষ লাভের জন্য কতইনা কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। অতএব তোমরা যদি আজ আমার সন্তোষ চাও তবে এখনই আবুবকরের সম্মানার্থে সকলেই খেজুর পত্রের পোশাক পরিধান কর। নচেৎ আজই আমার দপ্তর থেকে সমস্ত ফেরেশ্তার নাম কাটিয়া দিব।' এই কঠোর বাক্য শুনিয়া আমরা সকলেই তাঁহার সম্মানার্থে খেজুর পত্রের পোশাক পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছি।"[৪৯২]

৫. আবূ বাকরের সাথে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কথা উমার বুঝতেন না

জালিয়াতদের বানানো একটি কথা: উমার (রা) বলেছেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ كُنْتُ بَيْنَهُمَا كَالزَّنْجِيِّ الَّذِيْ لاَ يَفْهَمُ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আবূ বাকরের (রা) সাথে কথা বলতেন, তখন আমি তাঁদের মাঝে অনারব হাবশীর মত হয়ে যেতাম, যে কিছুই বুঝে না।"

জালিয়াত দাজ্জালরা বলতে চায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ বাক্র (রা)-এর সাথে এমন মারেফতী ভাষায় (!) কথা বলতেন যে, উমারও (রা) তাঁদের কথা বুঝতে পারতেন না। মুহাদ্দিসগণ একমত যে এ কথাটি সনদ বিহীন ভিত্তিহীন একটি মিথ্যা কথা।[৪৯৩]

৬. উমার (রা) কতৃক নিজ পুত্র আবূ শাহমাকে দোররা মারা

প্রচলিত আছে যে, উমার (রা) তাঁর নিজ পুত্র আবূ শাহমাকে ব্যভিচারের অপরাধে ১০০ বেত্রাঘাত করেন। এতে পুত্রের মৃত্যু হয়। এ ব্যভিচার উদঘাটন, স্বীকারোক্তি, শাস্তি, পিতা-পুত্রের কথাবার্তা ইত্যাদি নিয়ে লম্বা চওড়া কাহিনী বলা হয়, যা শুনলে সাধারণ

শ্রোতাগণের চোখে পানি আসে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এগুলি ভিত্তিহীন মিথ্যা গল্প। ইবনুল জাওযী বলেন, "সাধারণ শ্রোতাদেরকে কাঁদানোর জন্য জাহিল ওয়ায়েযগণ এগুলি বানিয়েছে।"[৪৯৪]

ইতিহাসে পাওয়া যায়, উমারের পুত্র আব্দুর রাহমান আবূ শাহমা মিশরের সেনাবাহিনীতে যুদ্ধরত ছিলেন। একদিন তিনি নাবীয বা খেজুর ভিজিয়ে তৈরি করা 'শরবত' পান করেন। কিন্তু এ খেজুরের শরবতে মাদকতা এসে গিয়েছিল, ফলে আবূ শাহমার মধ্যে মাতলামি আসে। তিনি মিশরের প্রশাসক আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকট আগমন করে বলেন, আমি মাদক দ্রব্য পান করেছি, কাজেই আমাকে আপনি মাদক পানের শরীয়তী শাস্তি (বেত্রাঘাত) প্রদান করুন। আমর (রা) তাকে গৃহাভ্যন্তরে বেত্রাঘাত করেন। উমার (রা) তা জানতে পেরে আমরকে (রা) তিরস্কার করেন এবং বলেন সাধারণ মুসলিম নাগরিককে যেভাবে জনসমক্ষে শাস্তি প্রদান করা হয়, আমার পুত্রকেও সেভাবে শাস্তি প্রদান করা উচিত ছিল। আবূ শাহমা মদীনা ফিরে গেলে তিনি নিজে পুনরায় তাকে শাস্তি প্রদান করেন। এর কিছুদিন পরে আবূ শাহমা ইন্তেকাল করেন।[৪৯৫]

৭. উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের দিনে কাবাঘরে আযান শুরু

প্রচলিত আছে যে, হযরত উমার (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন, সে দিন থেকে কাবাঘরে প্রথম আযান শুরু হয়। কথাটি ভুল। উমার (রা) হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর আযানের প্রচলন হয় হিজরতের পরে মদীনায়। উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় এবং পরবর্তী প্রায় ৬ বৎসর যাবৎ আযানের কোনো প্রচলন ছিল না। প্রকৃত কথা হলো, উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায় মুসলিমগণ কাবা ঘরের পাশে নামায আদায় করতে পারতেন না। মক্কার কাফিরগণ তাতে বাধা দিত। উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি কাফিরদের বাধা প্রতিহত করে নিজে কাবার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য মুসলমানও সেখানে নামায আদায় করেন।[৪৯৬]

এ তথ্যটি কিভাবে ক্রমান্বয়ে বিকৃত হয়েছে তার একটি নমুনা দেখুন। খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার (রাহ) নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলূব' গ্রন্থে রয়েছে তাঁর মুর্শিদ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শক্কর (রহ) বলেন: "যতদিন পর্যন্ত হযরত আমিরুল মো'মেনীন ওমর এবনে খাত্তাব (রা) ইসলামে ঈমান আনেন নি ততদিন পর্যন্ত নামাজের আযান গুহায় গহ্বরে দেয়া হতো। কিন্তু যে দিন আমিরুল মো'মেনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) ঈমান আনলেন সে দিন তিনি তলোয়ার মুক্ত করে দাঁড়িয়ে হযরত বেলাল (রা)-কে বললেন, কা'বা ঘরের মেম্বারে উঠে আজান দাও। হযরত বেলাল তার নির্দেশ মতো কাজ করলেন।"[৪৯৭]

আমরা জানি যে, এ কথাগুলি সঠিক নয়। ওমরের ইসলাম গ্রহণের আগে বা পরে কখনোই মক্কায় গুহায়, গহ্বরে বা কাবাঘরে কোথাও আযান দেওয়া হয় নি। এ ছাড়া কাবা ঘরের কোনো মিম্বার ছিল না। আমরা দেখেছি যে, এ পুস্তকটি সম্ভবত খাজা নিযামউদ্দীনের নামে জাল করে লেখা। অথবা সরলতার কারণে তাঁরা যা শুনেছেন সহজেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন।

৮. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইলমের শহর ও আলী (রা) তার দরজা

আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত হাদীস:

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَــا

"আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।"

এ হাদীসটিকে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে মিথ্যা না বলে যয়ীফ বলে উল্লোখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করে নিজেই হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৯৮] ইমাম বুখারী, আবু হাতিম, ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৯৯]

৯. আলীকে (রা) দরবেশী খিরকা প্রদান

প্রচলিত একটি গল্পে বলা হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মি'রাজ হতে ফিরে আসার পরে নিজের সাহাবা (রা)-দেরকে ডেকে এরশাদ করলেন যে, আমার দরবেশী খিরকা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করবো যে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে... আবূ বাকর (রা)-কে বললেন, যদি আমি তোমাকেই এই দরবেশী খিরকা দান করি তাহলে তুমি এর হক কিভাবে আদায় করবে? ... এভাবে উমার (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন ... উসমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন... । এরপর আলী (রা)-কে প্রশ্ন করলেন। আলী (রা) উত্তরে বলেন, আমি আল্লাহর বান্দাদের গোপনীয়তা রক্ষা করব। তখন তিনি আলীকেই খিরকা প্রদান করেন..." ইত্যাদি। পুরো কাহিনীটিই ভিত্তিহীন বানোয়াট।[৫০০]

১০. আলীকে ডাক, বিপদে তোমাকে সাহায্য করবে!

মোল্লা কারী বলেন, শিয়াদের বানানো একটি ঘৃণ্য জাল ও মিথ্যা কথা:

نَادِ عَلِيًّا مُظْهِرَ الْعَجَائِبِ، تَجِدْهُ عَوْناً لَكَ فِيْ النَّوَائِبِ، بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ، بِوَلاَيَتِكَ يَا عَلِيُّ

"আলীকে ডাক, সে আশ্চর্য কর্মাদি প্রকাশ করে, তাকে তুমি বিপদে আপদে তোমার সহায়ক পাবে। হে মুহাম্মাদ, আপনার নবুয়ত দ্বারা। হে আলী, আপনার বেলায়াত দ্বারা।"[৫০১]

বস্তুত, আমাদের সমাজে প্রচলিত সকল কুসংস্কার, শির্ক ও বিদ'আতের উৎস হচ্ছে শিয়া মতবাদ ও শিয়া সম্প্রদায়। কুরআন কারীম ও সুস্পষ্ট সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বংশের ১২ বা ৭ ইমামের নামে ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করেন। ফলে এসকল নেককার মানুষের নামে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ও ঈমান বিধ্বংসী কথা তাদের মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামের শত্রুদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। তাদের হৃদয়গুলি কুরআন কারীম ও রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সুন্নাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। হৃদয়ের মণিকোঠায় বসেছেন আলী ও তাঁর বংশের ইমামগণ। তাঁদের নামে জালিয়াতগণ যা বলেছে সবই তারা ভক্তিভরে মেনে নিয়েছেন এবং এ মিথ্যাগুলির ভিত্তিতে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশনার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

এ সম্প্রদায়ের কঠিনতম অপরাধগুলির অন্যতম হলো, এরা আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামদেরকে 'ঈশ্বর' বানিয়েছে। তাঁদের মধ্যে 'ঈশ্বরত্ব' বা 'ঐশ্বরিক শক্তি' কল্পনা করেছে। এ কথাটি তাদের মধ্যে প্রচলিত একটি শিরক। যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ বারংবার শেখাচ্ছে সকল বিপদে আপদে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার, সেখানে এরা বানিয়েছে আলীর কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা। বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করাই হলো সকল শিরকের মূল। এ বিষয়ে আমি **'রাহে বেলায়াত'** নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ জঘন্য মিথ্যা কথাটির ভিত্তিতে শিয়াগণ একটি দোয়া বানিয়েছে, যা দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজে অনেক 'সুন্নী' মুসলিমের মধ্যেও প্রচলিত। এ শিরক-পূর্ণ দোয়াটি প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি: "দোয়ায়ে নাদে আলী। তাহাজ্জুদ নামাজের পর আগে পরে দরূদ শরীফ পড়ে এই দোয়া যত বেশী পারা যায় পড়ে দোয়া করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয় ও কঠিন বিপদ দূর হয়ে থাকে। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। নাদে আলিয়ান মাজহারাল আজায়েবে তাজেদহু আউনাল্লাকা ফিন্নাওয়ায়েবে ওয়াকুল্লি হাম্মিন ওয়া গাম্মিন সাইয়ানজালি বি-আজমা-তিকা ইয়া আল্লাহ বিনুবুওয়াতিকা ইয়া মুহাম্মাদ বি-বিলায়াতিকা ইয়া আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী, লা ফাতা ইল্লা আলী, লা সাই- ফা ইল্লা জুল ফাক্কারে, নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব, ওয়া বাশ্‌শিরিল মুমেনীন, ফাল্লাহু খাইরুন হাফিজাও ওয়া হুয়া আরহামার রাহিমিন।"[৫০২]

শিয়াদের রচিত এ দোয়াটি নিরেট শিরক। অথচ তা আমাদের ধার্মিক মানুষদের মধ্যে প্রচলিত। কোনো সরল প্রাণ বুযুর্গ হয়ত দোয়াটি শুনে অর্থ না জেনে বা অসাবধানতা বশত তা আমল করেছিলেন। এখন আপনি যতই বলুন একথা শিরক, একথা শিয়াদের বানানো, সকল মুহাদ্দিস এ বিষয়ে একমত... ইত্যাদি, আপনার কোনো কথাই বাজারে ঠাঁই পাবে না। একটি কথাতেই সব নষ্ট হয়ে যাবে: অমুক বুযুর্গ তা পালন করেছেন, তিনি কি কিছুই বুঝেন নি???

১১. আলী (রা)-কে দাফন না করে উটের পিঠে ছেড়ে দেওয়া

৪০ হিজরীর রামাদান মাসের ২৩ তারিখে হযরত আলী ইবনু আবূ তালিব (রা) তাঁর খেলাফতের রাজধানী কূফায় এক গুপ্তঘাতক খারিজীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ্য পুত্র হাসান ইবনু আলী (রা) তাঁর জানাযার সালাতে ইমামতি করেন। জানাযা শেষে কূফাতেই তাঁর বাড়ীর অভ্যন্তরে তাঁকে দাফন করা হয়। কারণ ইমাম হাসান ও অন্যান্যরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, সাধারণ গোরস্থানে তাঁকে দাফন করলে খারিজীগণ তাঁর মৃতদেহকে চুরি করবে ও অপমানিত করবে। এ বিষয়টি প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল।

পরবর্তী কালে শিয়াগণ এ বিষয়ে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা গল্প প্রচার করেছে। গল্পটির সার সংক্ষেপ হলো, আলী (রা)-কে দাফন না করে উটের পিঠের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। উটটি হারিয়ে যায়। ... পরবর্তী কালে 'নাজাফ'-এর তাঁর কবরের খোঁজ পাওয়া যায়।... ইত্যাদি।

এ সকল কাহিনী শুধু মিথ্যাই নয়, উপরন্তু তা আলী (রা), হাসান (রা), হুসাইন (রা) ও আলীর পরিবারের সকলের জন্যই কঠিন অবমাননাকর। ইন্তিকালের পরে মৃত দেহ দাফন করা জীবিতদের উপর ফরয। এ ফরয দায়িত্বে অবহেলা করে তাঁরা আমীরুল মুমিনীনের মৃত দেহ উটের পিঠে ছেড়ে দিবেন একথা একান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন মুর্খ ছাড়া কেউই বিশ্বাস করবে না। হাসান-হুসাইন (রা) তো দূরের কথা, একজন অতি সাধারণ মানুষও তার পিতার মৃতদেহ এভাবে ছেড়ে দিতে রাজি হবে না। সেও চাইবে যে, তার পিতার কবরটি পরিচিত থাক, যেন সে ও তার বংশধরেরা তা যিয়ারত করতে পারে...। কিন্তু সমস্যা হলো, কুরআন-সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে অতিভক্তির অন্ধকারে হৃদয়কে নিমজ্জিত করার পরে ইমামগণের নামে যা কিছু বাতিল, শরীয়ত বিরুদ্ধ, বুদ্ধি ও বিবেক বিরুদ্ধ কথা বলা হয়েছে, সবই শিয়ারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বিশ্বাস করে নিয়েছে।

এ মিথ্যাচারের ভিত্তিতে নাজাফ শহরে একটি কবরকে শিয়াগণ আলীর কবর বলে বিশ্বাস ও প্রচার করেন। আলী (রা)-এর শাহাদাতের পরে তিন শত বৎসর পর্যন্ত কেউ বলেন নি যে, আলীর কবর নাজাফে। প্রায় তিন শত বৎসর পরে বিভিন্ন জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে এ কবরটি আলীর (রা) কবর বলে পরিচিতি পেতে শুরু করে। করবটির অবস্থা অবিকল বাবরী মসজিদের স্থলে রাম জন্ম-মন্দিরের কাহিনীর মত। সকল হিন্দু গবেষক ও ঐতিহাসিক একমত যে, অযোধ্যার বাবরী মসজিদের স্থানে কোনো দিনই রাম-মন্দির ছিল না। কিন্তু এ মিথ্যা কথাটি উগ্রপন্থি হিন্দুদের প্রচারে এখন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হয়েছে। হয়ত এক সময় এখানে 'রাম-মন্দির' নির্মিত হবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করবে যে, এখানেই রামের জন্ম হয়েছিল! যেমন ভাবে কোটি কোটি শিয়া বিশ্বাস করে যে নাজাফের এ কবরটিই আলীর কবর। এজন্য তারা নাজাফ শহরকে বলে 'নাজাফ আল-আশরাফ'। মক্কা

শরীফ, মদীনা শরীফ ও নাজাফ আশ্‌রাফ। অর্থাৎ পবিত্র মক্কা, পবিত্র মদীনা ও মহা পবিত্র নাজাফ!!![৫০৩]

১২. আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য:

মুসলিম সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত একটি 'হাদীস':

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।"

হাদীসটি আমাদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ যে, সাধারণ একজন মুসলিম স্বভাবতই চিন্তা করেন যে, হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তা ও সকল হাদীগ্রন্থেই সংকলিত। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো, সিহাহ সিত্তা তো দূরের কথা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটি নেই। যয়ীফ ও জালিয়াত রাবীগণের জীবনী গ্রন্থে, কয়েকটি ফিকহী গ্রন্থে ও অপ্রসিদ্ধ দুই একটি হাদীসের গ্রন্থে এ বাক্যটি এবং এ অর্থের একাধিক বাক্য একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সনদেরই একাধিক রাবী জালিয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধ অথবা অত্যন্ত দুর্বল এবং মিথ্যা বলায় অভিযুক্ত। এজন্য আবূ বাকর বায্যার আহমদ ইবনু আমর (২৯২হি), ইবনু হায্‌ম যাহিরী আলী ইবনু আহমদ (৪৫৬), যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন।[৫০৪]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণের জন্য আমরা এ ধরনের অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করি, অথচ কুরআনে অনেক স্থানে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের মর্যাদার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত রয়েছে।

১৩. আমার আহলু বাইত নক্ষত্রতুল্য:

উপরের হাদীসের ভাষাতেই আরেকটি হাদীস:

أَهْلُ بَيْتِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"আমার আহলু বাইত অর্থাৎ বাড়ির মানুষেরা বা বংশধরেরা নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে।"

নুবাইত ইবনু শারীত (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। একাধিক তাবিয়ী তাঁর থেকে হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনা করেছেন। তাঁরই এক অধস্তন পুরুষ আহমদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনু নুবাইত তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতকে দাবী করেন যে, নুবাইতের লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি তার নিকট আছে। তিনি দাবী করেন, তিনি তার পিতা-পিতামহের মাধ্যমে এই পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছেন। এতে লিখিত হাদীসগুলির একটি এই হাদীস। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ লোকটি একজন জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিলেন। তিনি নিজে জালিয়াতি করে এ পাণ্ডুলিপিটি লিখে তার উর্ধ্বতন দাদার নামে চালান। এ হাদীসটি এবং পাণ্ডুলিপিটির সকল হাদীস জাল।[৫০৫]

১৪. আমার সাহাবীগণের বা আমার উম্মতের মতভেদ রহমত

একটি অতি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ 'হাদীস':

اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

"আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমত (করুণা)"।

কখনো কখনো বলা হয়: "আলেমদের এখতেলাফ বা মতবিরোধ রহমত" এবং কেউ বলেন: 'আমার সাহাবীগণের ইখতিলাফ রহমত।

মুহাদ্দিসগণ ঘোষণা করেছেন যে, এ বাক্যটি হাদীস হিসাবে সমাজে বহুমুখে প্রচারিত হলেও কোনো হাদীসের গ্রন্থে এই হাদীসটি সনদসহ পাওয়া যায় না। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদেও এ কথাটি বর্ণিত হয় নি। সনদবিহীনভাবে অনেকেই বিভিন্ন গ্রন্থে এই বাক্যটিকে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা সুবকী বলেছেন: "মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি হাদীস বলে পরিচিত নয়। আমি এ হাদীসের কোন সনদই পাই নি, সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট কোন রকম সনদই এ হাদীসের নেই।"[৫০৬]

ইখতিলাফ বা মতভেদ মূলত নিন্দনীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত বা প্রশংসিত হতেও পারে। আমরা ইখতিলাফের প্রশংসায় বা নিন্দায় অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এ কথাটি বলতে পারি না; কারণ তা সনদহীন ভিত্তিহীন কথা।

১৫. মুআবিয়ার কাঁধে ইয়াযীদ: বেহেশতীর কাঁধে দোযখী

খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলুব' পুস্তকে রয়েছে, ফরীদউদ্দীন গঞ্জে শক্কর বলেন: "হযরত রাসূলে মাকবুল (ﷺ) একদিন সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন, এমন সময় মো'য়াবিয়া তার পুত্র এজিদকে কাঁধে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, তাঁকে দেকে হুজুর পাক (ﷺ) মুচকি হেসে বললেন, 'দেখ-দেখ, বেহেস্তীর কাঁধে দুজখী যাচ্ছে।'..."[৫০৭]

এ কথাটি যে ভিত্তিহীন বানোয়াট তা বুঝতে বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যার সাধারণ জ্ঞান আছে

তিনিও জানেন যে, ইয়াযীদের জন্ম হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের প্রায় ১৪ বৎসর পরে।

১৬. সাহাবীগণের যুগে 'যমিন-বুসি'

খাজা নিযাম উদ্দিন আউলিয়া (রাহ) এর নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলুব' পুস্তকে রয়েছে: "একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন... এমন সময় একজন আরবী এসে জমিনে আদব-চুমু খেয়ে আরজ করলেন... ।"[৫০৮]

কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। আমরা আগেই বলেছি যে, এ বইটি পুরোটাই জালিয়াতদের রচিত বলেই প্রতীয়মান হয়। যমিন-বুসী তো দূরের কথা কদমবুসীর রীতিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে প্রচলিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে তাঁর ২৩ বৎসরের নবুয়তী যিন্দেগিতে তাঁর লক্ষাধিক সাহাবীর কেউ কেউ দু-একবার এসেছেন। কেউ কেউ সহস্রাধিকবার এসেছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল সালাম প্রদান। কখনো কখনো দেখা হলে তাঁরা সালামের পরে হাত মিলিয়েছেন, বা মুসাফাহা করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁরা একজন আরেক জনের হাতে বা কপালে চুমু খেয়েছেন বা কোলাকুলি করেছেন। কয়েকটি যয়ীফ বর্ণনায় দেখা যায় কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পায়ে চুমু খেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৩ বৎসরের নবুয়তী যিন্দেগিতে লক্ষ মানুষের অগণিতবার আগমনের ঘটনার মধ্যে মাত্র ৪/৫টি ঘটনা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল ঘটনায় কোনো সুপরিচিত সাহাবী তাঁর পদচুম্বন করেননি, করেছেন নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে আসা বেদুঈন বা ইহুদি, যারা দরবারে থাকেনি বা দরবারের আদব জানত-না।[৫০৯] আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ফাতিমা, বিলাল (রা) ও তাঁদের মতো প্রথম কাতারের শত শত সাহাবী প্রত্যেকে ২৩ বৎসরে কমপক্ষে ১০ হাজার বার তাঁর দরবারে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো একবারও তাঁর কদম মুবারকে চুমু খাননি বা সেখানে হাত রেখে সেই হাতে চুমু খাননি, তাঁর সামনে মাটিতে চুমু খাওয়া তো অনেক দূরের কথা।

ভারতের হিন্দুরা মানুষকে সাজদা, গড় বা প্রণাম করতে অভ্যস্ত ছিল। ইসলামের আগমনের পরে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও পীর, মুরব্বী বা রাজা-বাদশাহকে সাজদা করা, তাদের পায়ে মুখ দিয়ে চুমু খাওয়া বা তাদের সামনে মাটিতে চুমু খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এ রীতিটি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, একে হাদীস বলে মনে করা।

১৭. আখেরী যামানার উম্মাতের জন্য চিন্তা

আব্দুল কাদের জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' গ্রন্থের মধ্যে ঢুকানো অগণিত ভিত্তিহীন জাল হাদীসের একটি নিম্নরূপ:

غَمِّيْ لأَجْلِ أُمَّتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ

"আমার শেষ যামানার উম্মতের জন্য আমার খুবই চিন্তা!"[৫১০]

সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো সনদেই কোনো গ্রন্থে এ কথা পাওয়া যায় না। আমরা আগেই বলেছি এ বইটি পুরোটিই জাল বলে প্রতীয়মান হয়।

২. ৬. তাবেয়ীগণ বিষয়ক

তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের বুযুর্গগণের বিষয়ে অগণিত বানোয়াট কথা প্রচলিত। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিষয় উল্লেখ করছি।

১. উয়াইস কারনী (রাহ)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় ইয়ামানের "কারন" গোত্রের উয়াইস ইবনু আমির নামক এক ব্যক্তির কথা সাহাবীগণকে বলেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পরে হযরত উমারের (রা) সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে হযরত উয়াইসকে কেন্দ্র করে অনেক আজগুবি মিথ্যা কথা বানানো হয়েছে। অনেক বক্তা শ্রোতাগণকে বিমুগ্ধ করার জন্য আজগুবি কথা বানিয়েছেন। অনেক সরলপ্রাণ দরবেশ যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে কিছু আছে উয়াইস কেন্দ্রিক। আর কিছু কথা বানানো হয়েছে রাসূলুল্লাহর ﷺ নামে। এগুলি নি:সন্দেহে বেশী ভয়ঙ্কর ও কঠিনতম গোনাহের কারণ।

উয়াইস ইবনু আমির আল-কারনী (রাহ) সম্পর্কে সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত সহীহ হাদীসে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো: হযরত উমার (রা) যখন খলীফা ছিলেন (১৩- ২৩ হি) তখন তাঁর কাছে ইয়ামানের সৈন্যদল আগমণ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন? আপনাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনু আমির নামে কেউ আছেন? এভাবে একবার তিনি উয়াইসকে পেয়ে যান। তিনি বলেন: আপনি উয়াইস? উয়াইস বলেন: হাঁ, উমার বলেন: আপনি কারন গোত্রের শাখা মুরাদ গোত্রের মানুষ? তিনি বলেন: হাঁ। উমার বলেন: আপনার শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছিল এবং শুধুমাত্র নাভীর কাছে একটি দিরহাম পরিমাণ স্থান ছাড়া বাকী সব আল্লাহ ভাল করে দিয়েছেন? তিনি বলেন: হাঁ। তিনি বলেন: আপনার আম্মা আছেন? তিনি বলেন: হাঁ। তখন উমার বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ. وفي رواية: إِنَّ خَيْرَ

التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ ..... فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ

"ইয়ামানের সৈন্যদলের সাথে উয়াইস ইবনু আমির তোমাদের নিকট আগমন করবে। সে কারন গেত্রের শাখা মুরাদ গোত্রের মানুষ। তার শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছিল। আল্লাহ এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ছাড়া বাকী সব ভাল করে দিয়েছেন। তার আম্মা আছেন। সে তার আম্মার সেবা করে। সে যদি আল্লাহর কাছে কসম করে কিছু বলে তবে আল্লাহ তার কথা রাখবেন। যদি তুমি তার কাছে তোমার গোনাহ মাফের জন্য দোয়া চাইতে পার তবে চাইবে।" অন্য বর্ণনায়: "তাবেয়ীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ "উয়াইস" নামক এক ব্যক্তি।... তোমরা তাকে বলবে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইতে।"

একথা বলে হযরত উমার (রা) বলেন: আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তখন উয়াইস আল্লাহর কাছে উমারের গোনাহের ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। উমার তাঁকে বলেন: আপনি কোথায় যাবেন? তিনি বলেন: আমি কুফায় যাব। উমার বলেন: তাহলে আমি আপনার জন্য কুফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে দিই? উয়াইস বলেন: অতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে মিশে থাকাই আমার বেশি পছন্দ। পরের বছর কুফার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হজ্জে গমন করেন। তিনি খলীফা উমারের সাথে দেখা করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন: তাকে তো একটি অতি ভগ্ন বাড়ীতে অতি দরিদ্র অবস্থায় দেখে এসেছি। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপরের হাদীসটি তাকে বলেন। তখন ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কুফায় ফিরে উয়াইসের নিকট গমন করে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার অনুরোধ করেন। উয়াইস বলেন: আপনি তো হজ্জের নেক সফর থেকে ফিরে আসলেন, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আপনি কি উমারের (রা) সাথে দেখা করেছিলেন? তিনি বলেন: হাঁ। তখন উয়াইস তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে গোনাহের ক্ষমা চান। এই ঘটনার পরে মানুষেরা উয়াইস সম্পর্কে জেনে যায়। ফলে তাঁর কাছে মানুষ আসা যাওয়া করতে থাকে। তখন উয়াইস লোকচক্ষুর আড়ালে কোথাও চলে যান।

পরবর্তী প্রায় দুই দশক উয়াইস কারনী লোকচক্ষুর আড়ালে সমাজের অতি সাধারণ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেন। যে এলাকায় যখন বসবাস করতেন সেখানের মসজিদে সাধারণ মুসল্লী হিসাবে নিয়মিত নামাযে ও ওয়ায আলোচনায় বসতেন। কখনো নিজেও কিছু বলতেন। মসজিদে বসে কয়েকজনে কুরআন তিলাওয়াত করতেন বলেও জানা যায়। এভাবেই তিনি বিভিন্ন জিহাদে শরীক হতেন বলে বুঝা যায়। ৩৭ হিজরীতে হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত উয়াইস কারনী (রাহ) হযরত আলীর সেনাদলে ছিলেন। তিনি হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শহীদ হয়ে যান।[৫১১]

এ হলো তাঁর সম্পর্কে সহীহ বর্ণনা। তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত। যেমন তিনি নাকি তাঁর আম্মাকে বহন করতেন, তিনি নাকি উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র দাঁত আহত হওয়ার সংবাদে নিজের সকল দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন, ইত্যাদি। এ সকল কথার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। বলা হয়, উমার (রা) ও আলী (রা) নাকি তাঁর কাছে যেয়ে দেখা করেন বা দোয়া চান। এগুলি সবই মিথ্যা কথা। উপরের সহীহ হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে উয়াইসই উমারের (রা) দরবারে এসেছিলেন।

তবে আরো মারাত্মক হলো তাঁকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বানোয়াট কথা। যেমন বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ওফাতের পূর্বে তাঁর মুবারক পিরহান বা পোশাক উয়াইস কারনীর (রাহ) জন্য রেখে যান এবং উমার (রা) ও আলী (রা) তাঁকে সেই পোশাক পৌঁছে দেন। কথাগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ইবনু দাহিয়া, ইবনুস সালাহ, ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে, এগুলি সবই বাতিল ও বানোয়াট কথা।[৫১২]

২. হাসান বসরী (রাহ)

হাসান বসরী (২২-১০৯হি) একজন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট কথা সমাজে প্রচলিত। যেমন, 'হাসান বসরী' ও 'রাবেয়া বসরী' দুজনের কথাবার্তা, আলোচনা ইত্যাদি আমাদের সমাজে অতি পরিচিত। অথচ দুইজন সমবয়সী বা সমসাময়িক ছিলেন না। রাবেয়া বসরী ১০০ হিজরী বা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮০/১৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাসান বসরী যখন ইন্তেকাল করেন তখন রাবেয়া বসরীর বয়স মাত্র ১০/১১ বৎসর। এ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এ দুইজনকে নিয়ে প্রচলিত গল্পকাহিনীগুলি সবই বানোয়াট।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক, তাঁকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট কথা। যেমন, প্রচলিত আছে যে, হাসান বসরী আলীর (রা) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে "তরীকত" গ্রহণ করেন বা চিশতিয়া তরিকতের খিরকা, লাঠি ইত্যাদি গ্রহণ করেন। এই কথাটি ভিত্তিহীন।

হাসান বসরী (রাহ) তাবেয়ীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজাহিদ, ওয়ায়িয ও সংসারত্যগী বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্‌হ শিক্ষা দানের পাশাপাশি জাগতিক লোভ-লালসার বিরুদ্ধে এবং জীবনকে আল্লাহর ভালবাসা ও আখিরাত কেন্দ্রিক করার জন্য ওয়ায করতেন। সঙ্গীগণের সাথে বসে আখিরাতের কথা স্মরণ করে আল্লহর প্রেমে ও আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকাটি করতেন। তাঁর এসকল মাজলিসের বিশেষ প্রভাব ছিল সেই যুগের মানুষদের মধ্যে। পরবর্তী যুগের অধিকাংশ সূফী দরবেশ তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

হাসান বসরীর (রাহ) যুগে তাসাউফ, সূফী ইত্যাদি শব্দ অপরিচিত ছিল। এছাড়া প্রচলিত অর্থে তরীকতও অপরিচিত ছিল। তাঁরা মূলত কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহর মহব্বত ও আখিরাতের আলোচনা করতেন এবং বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকতেন। তরীকতের জন্য নির্দিষ্ট কোন মানুষের কাছে গমনের রীতিও তখন ছিল না। বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ীর সামগ্রিক সাহচর্যে মানুষ হৃদয়ের পূর্ণতা লাভ করত। প্রায় ৫০০ বৎসর পরে, যখন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিচ্ছিন্নতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ও তাতারদের ভয়াবহ হামলায় ছিন্নভিন্ন, তখন হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে প্রচলিত তরীকাগুলি প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করে।

কাদেরীয়া তরীকার সম্পর্ক আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ. মৃঃ ৫৬১হি/১১৬৬ খৃ) সাথে। তবে তিনি প্রচলিত কাদেরীয়া তরীকা প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত করেন নি। তাঁর অনেক পরে তা প্রচলিত হয়েছে। রিফায়ী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনু আলী রিফায়ী (রাহ, মৃঃ ৫৭৮ হি)। সোহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠাতা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রাহ. মৃ ৬৩২হি ১২৩৪খৃ)। হযরত মুঈনউদ্দীন চিশতী (রাহ) চিশতিয়া তরীকার মূল প্রচারক। তিনি ৬৩৩হি/১২৩৬খৃ ইন্তেকাল করেন। আলী ইবনু আব্দুল্লাহ শাযলী (রাহ. ৬৫৬হি/১২৫৮খৃ) শাযলীয়া তারীকা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ বুখারী বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রাহ. মৃ ৭৯১হি/১৩৮৯খৃ) নকশাবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে মাসনূন ইবাদতগুলি বেছে তার আলোকে মুসলিমগণের আধ্যাতিক উন্নতির চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে সেই অন্ধকার ও কষ্টকর দিনগুলিতে এঁরাই সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তী যুগের একটি প্রচলিত কথা হলো, চিশতীয়া তরীকা ও অন্য কিছু তরীকা হাসান বসরী (রাহ) আলীর (রা) মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে লাভ করেছেন। তিনি আলী (রা:) থেকে খিরকা ও খিলাফত লাভ করেছেন ও 'তরিকতের 'সাজ্জাদ-নশীন' হয়েছেন। কথাটি ভিত্তিহীন।

হাসান বসরী (রাহ) ২২ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন ৩৫ হিজরীতে আলী (রা) খলীফা নিযুক্ত হন এবং খিলাফতের কেন্দ্র বা রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। এরপর আর হাসান বসরী (রাহ) আলীকে (রা) দেখেন নি। তিনি আলী (রা)-এর দরবারে বসে শিক্ষা গ্রহণেরই কোনো সুযোগ পান নি। ৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রা) শহীদ হন। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, আলী (রা) তাঁর যোগ্যতম সন্তানগণ, অগণিত নেতৃস্থানীয় ভক্ত, ছাত্র ও সহচরদের বাদ দিয়ে ১৩ বছরের কিশোরকে খিরকা ও খিলাফত দিয়ে যান নি বা সাজ্জাদ-নশীন করেন নি। ইবনু দাহিয়া, ইবনুস সালাহ, যাহাবী, ইবনু হাজার, সাখাবী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এগুলি সব ভিত্তিহীন ও বাতিল কথা।[৫১৩]

২. ৭. আউলিয়া কেরাম ও বেলায়াত বিষয়ক

আল্লাহর ওলীগণের পরিচয়, কর্ম ও মর্যাদার বিষয়ে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। **এহইয়াউস সুনান** ও **রাহে বেলায়াত** পুস্তকদ্বয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা কথা মুসলিম সমাজে প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। অনেক সরলপ্রাণ নেককার বুযুর্গ সরল মনে এগুলি বিশ্বাস করেছেন। এখানে এ বিষয়ক কিছু কথা উল্লেখ করছি।

১. ওলীদের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা সত্য

প্রচলিত একটি গ্রন্থে লেখা হয়েছে: "আল্লাহ তায়ালার বন্ধুদের শানে কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের কয়েকটি বাণী:.... কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন- আল-হাদীস। অর্থ আউলিয়া-এর অলৌকিক ক্ষমতা সত্য।"[৫১৪]

এখানে এই বাক্যটি 'আল-হাদীস' বলে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতি করা হয়েছে। এছাড়াও বাক্যটির বিকৃত ও ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে আমরা দুইটি বিষয় আলোচনা করব: (১) এই বাক্যটির উৎস ও (২) এই বাক্যটির অর্থ।

প্রথমত, বাক্যটির উৎস:

كَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقٌّ

"ওলীগণের কারামত সত্য" এ বাক্যটি আলিমগণের কথা। এটি কোনো হাদীস নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই এ কথা বলেন নি বা তাঁর থেকে কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে তা বর্ণিত হয় নি। উপরন্তু 'কারামত' শব্দটিই কুরআন বা হাদীসের শব্দ নয়। নবী ও ওলীগণের অলৌকিক কর্মকে কুরআন ও হাদীসে 'আয়াত' বা চিহ্ন বলা হয়েছে। দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবী-রাসূলগণের 'আয়াত'কে 'মুজিযা' এবং ওলীগণের 'আয়াত'কে 'কারামাত' বলা শুরু হয়।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মু'তাযিলা ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওলীগণের দ্বারা অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। তাদের এই মতটি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস প্রমাণ করে যে, নবীগণ ছাড়াও আল্লাহর নেককার মানুষদেরকে আল্লাহ কখনো কখনো অলৌকিক চিহ্ন বা 'আয়াত' প্রদান করেন। এজন্য সুন্নাত-পন্থী আলিমগণ বলেন: "কারামাতুল আউলিয়া হাক্ক।"

দ্বিতীয়ত, বাক্যটির অর্থ

এভাবে আমরা দেখছি যে, এই বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী নয়; বরং আলিমগণের বক্তব্য। কাজেই বাক্যটিকে 'হাদীস' বলে জালিয়াতি করা হয়েছে। এছাড়া উপরের উদ্ধৃতিতে বাক্যটিকে ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত

জালিয়াতি ঘটেছে।

ক. 'কারামত' বনাম 'অলৌকিক ক্ষমতা':

এ বাক্যে তিনটি শব্দ রয়েছে: কারামত, আউলিয়া, হক্ক। উপরের উদ্ধৃতিতে প্রথম শব্দ 'কারামত'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অলৌকিক ক্ষমতা'। এ অনুবাদটি শুধু ভুলই নয়, বরং ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। কারামত অর্থ অলৌকিক কর্ম বা চিহ্ন, অলৌকিক ক্ষমতা নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ 'অলৌকিক ক্ষমতা' আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

'কারামত' শব্দটির মূল অর্থ 'সম্মাননা'। ইসলামী পরিভাষায় 'কারামত' অর্থ 'নবী-রাসূলগণ ব্যতীত অন্যান্য নেককার মানুষের দ্বারা সংঘটিত অলৌকিক কর্ম।' 'অলৌকিক চিহ্ন'কে 'অলৌকিক ক্ষমতা' মনে করা শিরকের অন্যতম কারণ। খৃস্টানগণ দাবি করেন, 'মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া কারো নেই, যীশু মৃতকে জীবিত করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ঈশ্বর বা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল।

কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, কোনো অলৌকিক কর্ম বা চিহ্ন কোনো নবী-রাসূল বা কেউ নিজের ইচ্ছায় ঘটাতে বা দেখাতে পারেন না; শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটতে পারে। কোনো ওলী বা নেককার ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, এ কর্মটি সম্পাদন করা সে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বা তার নিজের ক্ষমতা। এর অর্থ হলো একটি বিশেষ ঘটনায় আল্লাহ তাকে সম্মান করে একটি অলৌকিক চিহ্ন তাকে প্রদান করেছেন। অন্য কোনো সময়ে তা নাও দিতে পারেন।

একটি উদাহরণ দেখুন। নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে, ২৩ হিজরীর প্রথম দিকে উমার (রা) মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে উচ্চস্বরে বলে উঠেন: (يا سارية، الجبل) "হে সারিয়া, পাহাড়।" সে সময়ে মুসলিম সেনাপতি সারিয়া ইবনু যুনাইম পারস্যের এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার উপক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি উমারের এ বাক্যটি শুনতে পান এবং পাহাড়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন।[৫১৫]

এ ঘটনায় আমরা উমার (রা)-এর একটি মহান কারামত দেখতে পাই। তিনি হাজার মাইল দূরের যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা 'অবলোকন' করেছেন, মুখে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং সে নির্দেশনা সারিয়া শুনতে পেয়েছেন।

এ কারামতের অর্থ হলো, মহান আল্লাহ তাঁর এই মহান ওলীকে এ দিনের এ মুহূর্তে এ বিশেষ 'সম্মাননা' প্রদান করেন, তিনি দূরের দৃশ্যটি হৃদয়ে অনুভব করেন, নির্দেশনা দেন এবং তাঁর নির্দেশনা আল্লাহ সারিয়ার নিকট পৌঁছে দেন। এর অর্থ এ নয় যে, উমার (রা)-এর হাজার মাইল দূরের সব কিছু অবলোকন করার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, অথবা তিনি ইচ্ছা করলেই এভাবে দূরের কিছু দেখতে পেতেন বা নিজের কথা দূরে প্রেরণ করতে পারতেন।

এ বছরেরই শেষে ২৩ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসের ২৭ তারিখে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য যখন উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা বলেন, তখন তাঁরই পিছেন চাদর গায়ে মুসল্লীরূপে দাঁড়ানো আল্লাহর শত্রু আবূ লু'লু লুকানো ছুরি দিয়ে তাঁকে বারংবার আঘাত করে। তিনি অচেতন হয়ে পড়ে যান। চেতনা ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে কে আঘাত করল? তাঁকে বলা হয়, আবূ ল'লু। তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, আমাকে কোনো মুসলিমের হাতে শহীদ হতে হলো না। এর কয়েকদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।[৫১৬]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ প্রথম ঘটনায় হাজার মাইল দূরের অবস্থা উমারকে দেখিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনায় পাশে দাঁড়ানো শত্রুর বিষয়ে তাঁকে জানতে দেন নি। কারণ 'কারামত' কখনোই ক্ষমতা নয়, কারমাত আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সম্মাননা মাত্র।

খ. ওলী ও আউলিয়া:

'বেলায়াত' (الولاية) শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। "বেলায়েত" অর্জনকারীকে "ওলী" (الولي), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ওলীদের পরিচয় প্রদান করে কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে :

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং তাকওয়া অবলম্বন করেন।"[৫১৭]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহিমাময় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের পথে বেশি বেশি অগ্রসর হতে থাকে।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়া যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের

আকীদা বর্ণনা করে বলেন:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি ওলী)।[৫১৮]

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড হচ্ছে : ঈমান ও তাকওয়া: সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ সকল বিষয়ে যিনি যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, 'বেলায়াত' কোনো পদ-পদবী নয় এবং ইসলামের 'ওলী' বলে কোনো বিশেষ পদ বা পর্যায় নেই। প্রত্যেক মুমিনই ওলী। যে যত বেশি ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করবেন তিনি তত বেশি ওলী।

গ. হক্ক:

'কারমাতুল আউলিয়া হক্ক' বা 'ওলীগণের অলৌকিক কর্ম সত্য' অর্থ 'ওলীগণ থেকে অলৌকিক কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যদি কোনো বাহ্যত নেককার মুমিন মুত্তাকী মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা বলে বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো নেককার বুযুর্গ মানুষ থেকে কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশুদ্ধ সূত্রে জানা যায় তবে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। তা অস্বীকার করা বা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া মু'তাযিলীদের আকীদা।

'ওলীদের কারামত সত্য' বলতে দু প্রকারে ভুল অর্থ করা হয়:

প্রথমত, কেউ মনে করেন, ওলীদের নামে যা কিছু কারামত বা অলৌকিক কথা বলা হবে সবই সত্য মনে করতে হবে। কথাটি জঘন্য ভুল। বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া কোনো বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। জাল হাদীসের মত অগণিত 'জাল' কারামতির ঘটনা ওলীদের নামে সমাজে ছড়ানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কেউ মনে করেন যে, 'ওলীগণের কারামত সত্য' অর্থ ওলীগণের কারামত থাকতেই হবে বা কারামতই ওলীগণের আলামত বা চিহ্ন। এ ধারণাটি কঠিন ভুল। বাহ্যিক আমল ছাড়া 'ওলী'-র পরিচয়ের জন্য কোনো চিহ্ন, মার্কা বা সার্টিফিকেট নেই। কোনো 'কারামত' বা অলৌকিকত্ব কখনোই বেলায়াতের মাপকাঠি নয়। আল্লাহর প্রিয়তম ওলীর কোনো প্রকার কারামত নাও থাকতে পারে। আমরা জানি আল্লাহর প্রিয়তম ওলী সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশেরই কোনো কারামত বর্ণিত হয় নি। আবার পাপী বা কাফির মুশরিক থেকেও অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হতে পারে। সর্বোপরি কারামতের অধিকারী ওলীও কোনো বিশেষ পদমর্যাদার ব্যক্তি নন বা পদস্খলন থেকে সংরক্ষিত নন। কর্মে ত্রুটি হলে তিনি শাস্তিভোগ করবেন। কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় কারামতের অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছেন।[৫১৯]

২. ওলীগণ মরেন না:

আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য:

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ يَمُوْتُوْنَ، بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ

প্রচলিত একটি পুস্তকে এ বাক্যটির অনুবাদ লেখা হয়েছে: "নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে"-আল হাদীস।[৫২০]

এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' পুস্তকে এই হাদীসটি অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ لاَ يَمُوْتُوْنَ، بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ

"মুমিনগণের কোন মৃত্যু নেই বরং তাঁরা স্থানান্তরিত হয় ধ্বংসশীল ইহজগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে।"

দুটি কথাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জঘন্য মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সনদেও তা বর্ণিত হয় নি।

আমরা জানি যে, প্রতিটি মানুষই মৃত্যুর মাধ্যমে "ধ্বংসশীল ইহ জগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে স্থানান্তরিত হয়।" এখানে কারো কোনো বিশেষত্ব নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা শহীদগণের পারলৌকিক বিশেষ জীবন প্রমাণিত। সহীহ হাদীসের আলোকে নবীগণের পারলৌকিক বিশেষ জীবন প্রমাণিত। এছাড়া অন্য কোনো নেককার মানুষের পারলৌকিক বিশেষ কোনো জীবন প্রমাণিত নয়। আলিমগণ, ওলীগণ, মুআযযিনগণ... ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নেককার মানুষের মৃত্যু পরবর্তী 'হায়াত' বা জীবন সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই সনদ বিহীন, ভিত্তিহীন কথা।[৫২১]

৩. ওলীগণ কবরে সালাত আদায়ে রত

ওলীগণের পারলৌকিক জীবন বিষয়ক আরেকটি জাল কথা

اَلأَنْبِيَاءُ وَالأَوْلِيَاءُ يُصَلُّوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَمَا يُصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ

"নবীগণ ও ওলীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে সালাত আদায় করেন, যেমন তাঁরা তাঁদের বাড়িতে সালাত আদায় করেন।" [৫২২]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, নবীগণের ক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ। তবে এখানে 'ওলীগণ' শব্দটির সংযোগ বানোয়াট।

৪. ওলীগণ আল্লাহর সুবাস

প্রচলিত একটি পুস্তকে লিখিত হয়েছে: "আল-আউলিয়াও রায়হানুল্লাহ- আল হাদীস। অর্থ আউলিয়া আল্লাহর সুবাস"[৫২৩]

এ কথাটিও আল্লার রাসূলের (ﷺ) নামে বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদে এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। ওলীগণকে আল্লাহর সুবাস বলায় কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহর রিযককে আল্লাহর সুবাস বলা হয়েছে, সন্তানকেও আল্লাহর সুবাস বলা হয়েছে।[৫২৪] কিন্তু এ কথাটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলতে হলে সহীহ সনদে তা বর্ণিত হতে হবে।

৫. ওলীগণ আল্লাহর জুব্বার অন্তরালে

প্রচলিত একটি পুস্তকে লিখিত হয়েছে: "ইন্না আউলিয়াই তাহ্তা কাবাই লা ইয়ারিফুহুম গাইরী ইল্লা আউলিয়াই।- হাদীসে কুদসী। অর্থ: নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ আমার জুব্বার অন্তরালে অবস্থান করেন, আমি ভিন্ন তাঁদের পরিচিতি সম্বন্ধে কেহই অবগত নহে, আমার আউলিয়াগণ ব্যতীত।"[৫২৫]

এ কথটিও একটি ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জাল কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ, এমনকি মাউযূ বা জাল সনদেও এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। বিভিন্ন সনদ বিহীন ভিত্তিহীন কথার মত এই কথাটিও পরবর্তী যুগে সমাজের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর নবম-দশম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম ভিত্তিহীন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে সনদ বিহীন ভাবে এই কথাটি তাদের পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।[৫২৬]

৬. ওলীদের খাস জান্নাত: শুধুই দীদার

আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, আল্লাহর খাস ওলীগণ জান্নাতের নেয়ামতের জন্য ইবাদত করেন না, বরং শুধুই 'মহব্বত' বা 'দীদারের' জন্য। এই অবস্থাকে 'সর্বোচ্চ' অবস্থা বলে মনে করা হয়। এ মর্মে একটি জাল হাদীস:

إِنَّ للهِ جَنَّةً لاَ فِيْهَا حُوْرٌ وَلاَ قَصْرٌ وَلاَ عَسَلٌ وَلاَ لَبَنٌ

"আল্লাহর এমন একটি জান্নাত আছে যেখানে হুর, অট্টালিকা, মধু এবং দুগ্ধ নেই। (বরং শুধু দীদারে ইলাহী-মাওলার দর্শন)।"

কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সনদবিহীন একটি জাল কথা।[৫২৭]

৭. ওলী-আল্লাহদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত সবই হারাম!

উপরের অর্থেই আরেকটি বানোয়াট কথা:

اَلدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الآخِرَةِ، وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ اللهِ

"আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া হারাম আর দুনিয়া-ওয়ালাদের জন্য আখিরাত হারাম। আর আল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারাম।" (অর্থাৎ উভয়কে হারাম না করে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না)

৬ষ্ঠ শতকের আলিম শীরাওয়াইহি ইবনু শাহরদার দাইলামী (৫০৯ হি) তার 'আল-ফিরদাউস'-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর পুত্র শাহরদার ইবনু শীরওয়াইহি আবূ মানসূর দাইলামী তার 'মুসনাদুল ফিরদাউস' গ্রন্থে হাদীসের একটি সনদ উল্লেখ করেছেন। সনদের অধিকাংশ রাবীই একেবারে অজ্ঞাত পরিচয়। অন্যরা দুর্বল। এজন্য হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করা হয়েছে।[৫২৮]

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, (১) আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া হারাম এবং (২) আল্লাহ-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া আখিরাত উভয়ই হারাম। এ কথা দুটি কুরআন কারীম ও অগণিত সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহ ঠিক এর বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম রাসূল (ﷺ) ও শ্রেষ্ঠতম আল্লাহ-ওয়ালা সাহাবীগণসহ সকল আল্লাহওয়ালা ও আখিরাত-ওয়ালাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সৌন্দর্য ও আনন্দ হারাম করেন নি বলে ঘোষণা করেছেন: "আপনি বলুন: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য ও পবিত্র আনন্দ ও মজার বস্তুগুলি বের (উদ্ভাবন) করেছেন তা হারাম বা নিষিদ্ধ করলো কে? আপনি বলুন: সেগুলি মুমিনদের জন্য পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতে শুধুমাত্র তাদের জন্যই।"[৫২৯]

কুরআন কারীমে 'আল্লাহওয়ালা' ও 'আখেরাতওয়ালা'দিগকে দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদা এভাবে দোয়া করতেন। আর আখেরাতের নেয়ামত তো আল্লাহওয়ালা ও আখেরাতওয়ালাদের মূল কাম্য।

মূল কথা হলো, আল্লাহওয়ালা হতে হলে, জান্নাতের নিয়ামতের আশা আকাঙ্খা বর্জন করতে হবে, এ ধারণাটিই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী। কোনো কোনো নেককার মানুষের মনে এইরূপ ধারণা আসতে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ সর্বদা জান্নাতের নিয়ামত চেয়েছেন, সাহাবীগণকে বিভিন্ন নিয়ামতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সর্বোপরি মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ মর্যাদার নবী-ওলীগণ এবং সাধারণ ওলীগণ সকলের জন্য জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন।

৮. শরীয়ত, তরীকত, মারেফত ও হাকীকত

এগুলি আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত চারিটি পরিভাষা। কুরআন-হাদীসে "শরীয়ত" শব্দটিই মূলত ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের চারিটি পর্যায়, স্তর বা বিভাজন অর্থে তরীকত, মারেফত ও হাকীকত পরিভাষাগুলি কুরআন বা হাদীসে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ সকল পরিভাষা বিভাজন করেছেন। জালিয়াতগণ এ বিষয়েও হাদীস বানিয়েছে। মিথ্যাবাদীরা বলেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا

"শরীয়ত একটি বৃক্ষ, তরীকত তার শাখা-প্রশাখা, মারিফাত তার পাতা এবং হাকীকত তার ফল।"[৫৩০]

মিথ্যাচারিদের আল্লাহ লাঞ্চিত করুন। তাদের বানানো আরেকটি কথা:

اَلشَّرِيْعَةُ أَقْوَالِيْ وَالطَّرِيْقَةُ أَفْعَالِيْ وَالْحَقِيْقَةُ حَالِيْ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ

"শরীয়ত আমার কথাবার্তা, তরীকত আমার কাজকর্ম, হাকীকত আমার অবস্থা এবং মারিফাত আমার মূলধন।"[৫৩১]

৯. ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদ

কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলেন:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ... جِهَادُ الْقَلْبِ/ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ

"আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। ... বড় জিহাদ হলো মনের সাথে জিহাদ বা নিজের প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম।"

ইবনু তাইমিয়া হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। ইরাকী, সয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি দুর্বল সনদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সহীহ সনদে কথাটি ইবরাহীম ইবনু আবী আবলা (১৫২ হি) নামক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন যে, হাদীসটি মূলত এ তাবিয়ীর বক্তব্য। অনেক সময় দুর্বল রাবীগণ সাহাবী বা তাবিয়ীর কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেন।[৫৩২]

১০. প্রবৃত্তির জিহাদই কঠিনতম জিহাদ

আমাদের সমাজে এই অর্থে আরেকটি 'হাদীস' প্রচলিত:

أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوَى

"সবচেয়ে কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ।"

কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়। তাঁর কথা হিসেবে কোনো সনদেই তা বর্ণিত হয় নি। প্রসিদ্ধ তাবি-তাবিয়ী ইবরাহীম ইবনু আদহাম (১৬১হি) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত।[৫৩৩]

উল্লেখ্য যে, এ অর্থের কাছাকাছি সহীহ হাদীস রয়েছে। ফুদালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের ওয়াযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ (وفي رواية: فِي طَاعَةِ اللَّهِ)

"আর মুজাহিদ তো সে ব্যক্তি যে আল্লাহর জন্য/ আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে।"[৫৩৪]

দুঃখজনক যে, বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে সংকলিত সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে ভিত্তিহীন বানোয়াট কথাগুলি আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলি।

১১. আলিম বনাম আরিফ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ইসলামী ইলমের অধিকারীকে 'আলিম' বলা হয়। 'মারিফাত' অর্থে 'তত্ত্বজ্ঞান', 'গুপ্তজ্ঞান' বা

বিশেষজ্ঞান' বুঝানো, 'আরিফ' বলতে 'তত্ত্বজ্ঞানী' বুঝানো এবং 'আলিম' ও 'আরিফ' এর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোনো কিছু বলা হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা। এরূপ একটি জাল হাদীস:

اَلْعَالِمُ يَتَنَقَّشُ وَالْعَارِفُ يَصْقِلُ

"আলিম নকশা অঙ্কিত করে এবং আরিফ (খোদাতত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী) তা পরিষ্কার করে।"[৫৩৫]

১২. আল্লাহর স্বভাব গ্রহণ কর

সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত একটি ভিত্তিহীন সনদবিহীন জাল 'হাদীস':

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلاَقِ اللهِ

"তোমরা আল্লাহর স্বভাব গ্রহণ কর বা আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হও।"[৫৩৬]

১৩. একা হও আমার নিকটে পৌঁছ

تَجَرَّدْ تَصِلْ إِلَيَّ

"একা হও আমার নিকট পৌঁছাবে।"[৫৩৭]

উপরের কথাগুলি সবই সনদহীন, ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও এই কথাগুলি বর্ণিত হয়নি।

১৪. সামা বা প্রেম-সঙ্গীত শ্রবণ কারো জন্য ফরয...

'সামা' (সেমা) অর্থ 'শ্রবণ"। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে 'সামা' বলতে কুরআন শ্রবণ ও রাসূলে আকরামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বোঝান হতো। এগুলিই তাঁদের মনে আল্লাহ-প্রেমের ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করার জন্য গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গানবাজনার সীমিত প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসাবে একে জায়েয বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনই এসকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয়নি।

ক্রমান্বয়ে 'সামা' বলতে 'গান-বাজনা' বুঝানো হতে থাকে। আর গানের আবেশে উদ্বেলিত হওয়া ও নাচানাচি করাকে 'ওয়াজদ' অর্থাৎ 'আবেগ, উত্তেজনা, উন্মত্ততা (passion, ardor) বলা হতো। এই 'সামা' বা সঙ্গীত ও 'ওয়াজদ' অর্থাৎ গানের আবেশে তন্ময় হয়ে নাচানাচি বা উন্মত্ততা ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে সূফী সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোনো সূফী খানকা বা সূফী দরবার কল্পনা করা যেত না। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (৫০৫হি) ও অন্য কোনো কোনো আলিম সূফীগণের প্রতি ভক্তির কারণে এইরূপ গান বাজনা ও নর্তন কুর্দনকে জায়েয বা শরীয়ত-সঙ্গত ও বিদ'আতে হাসানা বলে দাবি করেছেন।[৫৩৮]

এদিকে যখন সামা-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেল নেককার মানুষদের মাঝে তখন জালিয়াতগণ তাদের মেধা খরচের একটি বড় ক্ষেত্র পেয়ে গেল। তারা সামা, ওয়াজদ ইত্যাদির পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বানিয়ে প্রচার করে। যেমন বলা হয়েছে: "হুযুর (ﷺ) এরশাদ করেছেন:

اَلسَّمَاعُ لِقَوْمٍ فَرْضٌ وَلِقَوْمٍ سُنَّةٌ وَلِقَوْمٍ بِدْعَةٌ، وَالْفَرْضُ لِلْخَوَاصِّ، وَالسُّنَّةُ لِلْمُحِبِّيْنَ وَالْبِدْعَةُ لِلْغَافِلِيْنَ

"সামা হলো কারো জন্য ফরয, কারো জন্য সুন্নাত এবং কারো জন্য বিদ'আত। ফরয হলো খাস লোকদের জন্য, সুন্নাত হলো প্রেমিকদের জন্য এবং বিদ'আত হলো গাফিল বা অমনোযোগীদের জন্য।"[৫৩৯]

এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানানো একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা, যা কোনো যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও কোথাও বর্ণিত হয় নি।

১৫. যার ওয়াজদ বা উন্মত্ততা নেই তার ধর্মও নেই, জীবনও নেই

গানের মাজলিসে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে অচেতন হওয়া বা নাচানাচি করাকে ইশকের বড় নিদর্শন বলে গণ্য করা হতো। জালিয়াতরা এ বিষয়ে কিছু হাদীস বানিয়েছে। এরূপ একটি 'হাদীস' উল্লেখ করা হয়েছে:

مَنْ لاَ وَجْدَ لَهُ لاَ حَيَاةَ لَهُ/ لاَ دِيْنَ لَهُ

"যার 'ওয়াজদ' বা উত্তেজনা-উন্মত্ততা নেই তার জীবন নেই/ধর্ম নেই।"[৫৪০]

এ কথাটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সনদহীন বানোয়াট কথা।

১৬. যে গান শুনে আন্দোলিত না হয় সে মর্যাদাশালী নয়

এ বিষয়ে অন্য একটি জাল হাদীস প্রসিদ্ধ। এই হাদীসটির একটি সনদও আছে। সনদের মূল রাবী মিথ্যাবাদী জালিয়াত। এই হাদীসে বলা হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট একটি প্রেমের কবিতা পাঠ করা হয়। গানে বলা হয়: 'প্রেমের সর্প আমার কলিজায় দংশন করেছে। এর কোনো চিকিৎসক নেই, ঔষধও নেই। শুধু আমার প্রিয়তম ছাড়া। সেই আমার অসুস্থতা এবং সেই আমার ঔষধ।' এই কবিতা শুনে তিনি উত্তেজিত উদ্বেলিত হয়ে নাচতে বা দুলতে থাকেন। এমনকি তাঁর চাদরটি গা থেকে পড়ে যায়। তাঁর সাথে সাহাবীগণও এভাবে নাচতে বা দুলতে থাকেন... । এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ السَّمَاعِ

"সামার (শ্রবণের) সময় যে আন্দোলিত হয় না সে মর্যাদাশালী নয়।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ হাদীসটি জঘন্য মিথ্যা ও জাল কথা।[৫৪১]

১৭. গওস, কুতুব, আওতাদ, আকতাব, আবদাল, নুজাবা

আমাদের সমাজে ধার্মিক মানুষদের মধ্যে বহুল প্রচলিত পরিভাষার মধ্যে রয়েছে, গওস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, আকতাব ইত্যাদি শব্দ। আমরা সাধারণভাবে আওলিয়ায়ে কেরামকে বুঝাতে এ সকল শব্দ ব্যবহার করি। এছাড়া এ সকল পরিভাষার বিশেষ অর্থ ও বিশেষ বিশেষ পদবীর কথাও প্রচলিত। আরো প্রচলিত আছে যে, দুনিয়াতে এতজন আওতাদ, এতজন আবদাল, এতজন কুতুব, এতজন গাওস ইত্যাদি সর্বদা বিরাজমান...। এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে বানোয়াট কথা। একমাত্র 'আবদাল' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

'গওস' কুতুব, আওতাদ... ইত্যাদি সকল পরিভাষা, পদ-পদবী ও সংখ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সকল বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো কিছুই সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। শুধুমাত্র 'আবদাল' শব্দটি একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

'আবদাল' শব্দটি 'বদল' শব্দের বহুবচন। আবদাল অর্থ বদলগণ। একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক নেককার মানুষ আছেন যাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে তার 'বদলে' অন্যকে আল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত করেন। এজন্য তাদেরকে 'আবদাল' বা 'বদলগণ' বলা হয়।

এ বিষয়ে বর্ণিত প্রতিটি হাদীসেরই সনদ দুর্বল। কোনো সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। কোনো সনদ বিচ্ছিন্ন। কোনো সনদে দুর্বল রাবী রয়েছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস 'আবদাল' বিষয়ক সকল হাদীসকে এককথায় ও ঢালাওভাবে মুনকার, বাতিল বা মাউযূ বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্য অনেক মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে এগুলিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের বিস্তারিত আলোচনা ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসগুলির পর্যালোচনা করে আমার কাছে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দুইটি বিষয় 'আবদাল' শব্দটির ভিত্তি প্রমাণ করে। **প্রথমত,** এ বিষয়ক বিভিন্ন হাদীস। **দ্বিতীয়ত,** দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর অনেক তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী, মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, এই শব্দটির ভিত্তি ও উৎস রয়েছে।

অন্যান্য সকল বিষয়ের মত 'আবদাল' বিষয়েও অনেক মিথ্যা কথা 'হাদীস' বলে প্রচারিত হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি এ বিষয়ক নিম্নের তিনটি হাদীসকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

প্রথম হাদীসঃ শুরাইহ ইবনু উবাইদ (১০১হি) নামক একজন তাবিয়ী বলেন, আলী (রা)-এর সাথে যখন মুয়াবিয়া (রা)-এর যুদ্ধ চলছিল, তখন আলীর (রা) অনুসারী ইরাকবাসীগণ বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি মুয়াবিয়ার অনুসারী সিরিয়াবাসীগণের জন্য লানত বা অভিশাপ করুন। তখন তিনি বলেন, না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

الأَبْدَالُ (البُدَلاءُ) (يَكُونُونَ) بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلاً يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ.

"আবদাল (বদল-গণ) সিরিয়ায় থাকবেন। তাঁরা ৪০ ব্যক্তি। যখনই তাঁদের কেউ মৃত্যু বরণ করেন তখনই আল্লাহ তাঁর বদলে অন্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেন। তাদের কারণে আল্লাহ বৃষ্টি প্রদান করেন। তাঁদের কারণে শত্রুর উপর বিজয় দান করেন। তাদের কারণে সিরিয়া-বাসীদের থেকে তিনি আযাব দূরীভুত করবেন।"

এই হাদীসের সনদের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক গৃহীত। শুধুমাত্র শুরাইহ ইবনু উবাইদ ব্যতিক্রম। তাঁর হাদীস বুখারী ও মুসলিমে নেই। তবে তিনিও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই হাদীসটির সনদ সহীহ। কোনো কোনা মুহাদ্দিস সনদটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেছেন। তাঁরা বলেন, শুরাইহ বলেন নি যে, আলীর মুখ থেকে তিনি কথাটি শুনেছেন। বরং তিনি শুধু ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এতে মনে হয়, শুরাইহ সম্ভবত অন্য কারো মাধ্যমে ঘটনাটি শুনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। তবে বিষয়টি নিশ্চিত নয়। সিফফীনের যুদ্ধের সময় শুরাইহ কমবেশি ৩০ বৎসর বয়সী ছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে আলী (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করা বা এই ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অসম্ভব ছিল না। এজন্য বাহ্যত হাদীসটির সনদ অবিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়।

যিয়া মাকদিসী উল্লেখ করেছেন যে, অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সনদে এই হাদীসটি আলীর (রা) নিজের বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এই হাদীসটি আলীর (রা) বক্তব্য বা মাউকূফ হাদীস হিসেবে সহীহ।[৫৪২]

দ্বিতীয় হাদীস: তাবিয়ী আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু কাইস বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الأَبْدَالُ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاثُونَ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، عَزَّ وَجَلَّ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ، تَعَالَى، مَكَانَهُ رَجُلاً.

"এ উম্মাতের মধ্যে 'বদল'গণ (আবদাল) ত্রিশ ব্যক্তি। এরা দয়াময় আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর মত। যখন এদের কেউ মৃত্যু বরণ করেন, তখন আল্লাহ তা'লা তার বদলে অন্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেন।"

এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু কাইসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ আছে। ইজলী ও আবূ যুর'আ তাঁকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আহমদ হাদীসটিকে মুনকার, অর্থাৎ আপত্তিকর বা দুর্বল বলেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করেছেন।[৫৪৩]

তৃতীয় হাদীস: আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَنْ تَخْلُوَ الأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمنِ فَبِهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَبْدَلَ الله مَكَانَهُ آخَرَ

"যমীন কখনো ৪০ ব্যক্তি থেকে শুন্য হবে না, যাঁরা দয়াময় আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের মত হবেন। তাঁদের কারণেই তোমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হও, এবং তাঁদের কারণেই তোমরা বিজয় লাভ কর। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করলে আল্লাহ তাঁর বদলে অন্য ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।"

হাদীসটি তাবারানী সংকলন করেছেন। সনদের একাধিক বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আপত্তি আছে। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। তবে আল্লামা হাইসামী হাদীসটিকে 'হাসান' বলে গণ্য করেছেন।[৫৪৪]

উপরের তিনটি হাদীস ছাড়াও 'আবদাল' বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি হাদীস পৃথকভাবে যয়ীফ বা অত্যন্ত যয়ীফ হলেও সামগ্রিকভাবে আবদালের অস্তিত্ব প্রমাণিত। স্বভাবতই এ প্রমাণিত বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক জাল ও বানোয়াট কথাও বলা হয়েছে। আবদাল বা বদলগণের দায়িত্ব, পদমার্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বানোয়াট কথা রয়েছে।

'আবদাল' বা বদলগণের নিচের পদে ও উপরে অনেক বানোয়াট পদ-পদবীর নাম বলা হয়েছে। যেমন ৩০০ জন নকীব/ নুকাবা, ৭০ জন নাজীব/ নুজাবা, ৪০ জন বদল/আবদাল, ৪ জন আমীদ/উমুদ, ১ জন কুতুব বা গাউস... ইত্যাদি। 'আবদাল' ছাড়া বাকী সকল নাম বা পদ-পদবী ও সংখ্যা সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- থেকে বর্ণিত কোনো একটি সহীহ বা যয়ীফ সনদেও কুতুব, গাওস, নজীব, নকীব ইত্যাদির কথা কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। এছাড়া এদের দেশ, পদ মর্যাদা, দায়িত্ব, কর্ম ইত্যাদি যা কিছু বলা হয়েছে সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে সহীহ বা যয়ীফ সনদে কিছুই বর্ণিত হয় নি, যদিও গত কয়েক শতাব্দীতে কোনো কোনো আলিম এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন।[৫৪৫]

এখানে এ সম্পর্কিত দুটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি: (১) আবদালের পরিচয় ও (২) আবদালের দায়িত্ব।

ক. আবদালের পরিচয়:

আবদালের পরিচয় সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। আবদাল বা বদলগণ নিজেদেরকে বদল বলে চিনতে বা বুঝতে পারেন বলেও কোনো হাদীসে কোনোভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে বাহ্যিক নেক আমল দেখে দ্বিতীয় শতক থেকে নেককার মানুষকে আবদালের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হতো। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে এ বিষক কিছু বাহ্যিক আমলের কথা বলা হয়েছে। একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوْهَا بِصَلاَةٍ وَلاَ بِصَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ (بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ)... وَلَكِنْ ... بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيْحَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ (سَلاَمَةِ الصُّدُوْرِ وَسَخَاوَةِ الأَنْفُسِ وَالرَّحْمَةِ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ

"তাঁরা এ মর্যাদা বেশি বেশি (নফল) সালাত, সিয়াম বা দান-সাদকা করে লাভ করেন নি.. বরং বদান্যতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও সকল মুসলিমের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও নসীহতের দ্বারা তা লাভ করেছেন।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৫৪৬]

বিভিন্ন যয়ীফ হাদীস এবং তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের বক্তব্যের আলোকে আল্লামা সাখাবী, সুয়ূতী, আজলূনী প্রমুখ আলিম বদলগণের কিছু আলামত উল্লেখ করেছেন: অন্তরের প্রশস্ততা, বদান্যতা, ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, হারাম থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর দ্বীনের জন্য ক্রোধান্বিত হওয়া, কাউকে আঘাত না করা, কেউ ক্ষতি করলে তার উপকার করা, কেউ কষ্ট দিলে তাকে ক্ষমা

করা, উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য প্রতিদিন দোয়া করা, নিঃসন্তান হওয়া, কাউকে অভিশাপ না দেওয়া... ইত্যাদি।[৫৪৭]

খ. আবদালের দায়িত্ব

আমাদের মধ্যে আরো প্রচলিত যে, গাওসের অমুক দায়িত্ব, কুতবের অমুক দায়িত্ব, আবদালের অমুক দায়িত্ব... ইত্যাদি। এগুলিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। অগণিত বুযুর্গ ও নেককার মানুষ সরল বিশ্বাসে এ সকল ভিত্তিহীন শোনা কথা সঠিক মনে করেন এবং বলেন। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, আবদাল ব্যতীত বাকি সকল পদ-পদবী ও পরিভাষাই ভিত্তিহীন। আর আবদালের ক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে 'তাঁদের কারণে বা তাদের জন্য আল্লাহ বৃষ্টি দেন ইত্যাদি।" এ কথাটির দুটি অর্থ রয়েছে:

প্রথমত: তাদের নেক আমলের বরকত লাভ

নেককার মানুষের নেক আমলের কারণে আল্লাহ জাগতিক বরকত প্রদান করেন। সহীহ হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে দুই ভাই ছিলেন। এক ভাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করতেন এবং অন্য ভাই অর্থোপার্জনের কর্মে নিয়োজিত থাকতেন। পেশাজীবী ভাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে তার অন্য ভাই সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, সে তাকে কর্মে সাহায্য করে না। তখন তিনি বলেন:

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

"হতে পারে যে, তুমি তার কারণেই রিয্ক প্রাপ্ত হচ্ছ।"[৫৪৮]

দ্বিতীয়ত: তাঁদের দোয়া লাভ

দ্বিতীয় অর্থ হলো, তাদের দোয়ার কারণে আল্লাহ রহমত ও বরকত প্রদান করবেন। আল্লাহর তাঁর প্রিয় নেককার বান্দাদের দোয়া কবুল করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আবদাল বিষয়ক একাধিক যয়ীফ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এদের দোয়ার বরকত মানুষ লাভ করবে। নেককার মানুষদের প্রকৃতিই হলো যে, তাঁরা সদা-সর্বদা সকল মুসলমানের ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকত মুসলিম উম্মাহ লাভ করে।

এখানে তিনটি ভুল ও বিকৃত অর্থ সমাজে প্রচলিত:

প্রথমত, দোয়া কবুলের বাধ্যবাধকতা

অনেকে ধারণা করেন 'আবদাল' বা এ প্রকারের কোনো নেককার মানুষ দোয়া করলে আল্লাহ শুনবেনই। কাজেই আল্লাহ খুশি থাকুন আর বেজার থাকুন, আমি কোনো প্রকারে অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে দোয়া আদায় করে নিতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। এই ধারণা শুধু ভুলই নয়, উপরন্তু ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ও শির্কমূলক।

প্রথমত, কে বদল বা আবদাল তা আমরা কেউই জানি না। এ বিষয়ে সবই ধারণা ও কল্পনা। দ্বিতীয়ত, কারো দোয়া কবুল করা বা না করা একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম হাবীব ও খালীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ﷺ) মনের অব্যক্ত আশাটিও পূরণ করেছেন। আবার তিনি তাঁর মুখের দোয়াও কবুল করেন নি। তিনি একজন মুনাফিকের জন্য ক্ষমার দোয়া করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ কবুল করেন নি। উপরন্তু বলেছেন, ৭০ বার এভাবে দোয়া করলেও তা কবুল হবে না। একজন কারামত প্রাপ্ত-ওলী, আল্লাহর মর্যির বাইরে দোয়া করেছিলেন বলে তাকে কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।[৫৪৯]

দ্বিতীয়ত, দোয়া কবুলের মাধ্যম বা ওসীলা

'তাঁর কারণে বা মাধ্যমে তুমি রিযিক পাও', 'তাদের কারণে বা মাধ্যমে তোমরা বৃষ্টি পাও...' ইত্যাদি কথার একটি বিকৃত ও ইসলামী আকীদা বিরোধী ব্যাখ্যা হলো, এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের দোয়া বা সুপারিশ ছাড়া বোধহয় আল্লাহ এগুলি দিবেন না। এরা বোধহয় রাজা-বাদশাহের মন্ত্রীদের মত, তাঁদের সুপারিশ ছাড়া চলবে না। পৃথীবিতে রাজা, শাসক ও মন্ত্রীদের কাছে কোনো আবেদন পেশ করতে হলে তাদের একান্ত আপনজনদের মাধ্যমে তা পেশ করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার চেয়ে এদের মাধ্যমে চাওয়া হলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

এই ধারণাগুলি সুস্পষ্ট শির্ক। পৃথিবীর বাদশা আমাকে চেনেন না, আমার সততা ও আন্তরিকতার কথা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর কোনো প্রিয়পাত্র হয়ত আমাকে চেনেন। তার সুপারিশ পেলে বাদশাহর মনে নিশ্চয়তা আসবে যে, আমি তাঁর দয়া পাওয়ার উপযুক্ত মানুষ। আল্লাহ তা'আলার বিষয় কি তদ্রূপ? তিনি কি আমাকে চেনেন-না? আল্লাহর কোনো ওলী, কোনো প্রিয় বান্দা কি আমাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি চেনেন? না বেশি ভালবাসেন? অথবা বেশি করুণা করতে চান? এছাড়া পৃথিবীর বাদশাহ বা বিচারকের মানবীয় দুর্বলতার কারণে পক্ষপাতিত্বের বা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভয় আছে, সুপারিশের মাধ্যমে যা দূরীভুত হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে কি এমন কোনো ভয় আছে?

কে আল্লাহর কাছে মাকবুল ও প্রিয় তা কেউই বলতে পারে না। আমরা আগেই দেখেছি, নেককার মানুষদের প্রকৃতিই হলো যে, তাঁরা সদা সর্বদা সকল মুসলমানের ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এই দোয়ার বরকত মুসলিমগণ লাভ করেন। এছাড়া কোনো মুসলিমকে ব্যক্তিগতভাবে, অথবা মুসলিম সমাজকে সমষ্টিগতভাবে কোনো নির্ধারিত নেককার ব্যক্তির কাছে যেয়ে দোয়া চেতে হবে, এ কথা কখনোই এ সকল হাদীসের নির্দেশনা নয়। ইসলামের বরকতময় যুগগুলিতে

সাহাবী, তাবিয়ী,তাবি-তাবিয়ী বা তৎকালীণ মানুষেরা কখনোই এরূপ করেন নি।

তৃতীয়ত, দায়িত্ব বা ক্ষমতা

অনেকে মনে করেন, আবদাল বা আউলিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ বৃষ্টি, বিজয় ইত্যাদির দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন। এরা নিজেদের সুবিধামত তা প্রদান করেন। এই ধারণাটি হিন্দু ও মুশরিকদের দেব-দেবতায় বিশ্বাসেরই মত শিরক। এ বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ কোনো জীবিত বা মৃত কোনো নবী, ওলী বা কোনো মানুষকেই কোনো দায়িত্ব বা অধিকার প্রদান করেন নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় বা মনে করা হয় সবই জঘন্য মিথ্যা কথা ও কুরআন ও হাদীসের অগণিত স্পষ্ট কথার বিপরীত কথা।

আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কোনো ক্ষমতা দেন নি। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে কোনোরূপ কোনো দায়িত্ব প্রদান করেন নি।

মুসলিম সমাজের অনেকেই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এরপর মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাকে হয়ত কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর মনগড়াভাবে এদের কাছে চাইতে থাকেন। আর এ সকল জঘন্য শির্ককে সমর্থন করার জন্য কোনো কোনো জ্ঞানপাপী উপরের 'আবাদল' বিষয়ক হাদীসগুলি বিকৃত করে ব্যবহার করেন।

১৮. আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) কেন্দ্রিক

মুসলিম উম্মার ইতিহাসের অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞানতা ও বহির্শত্রুর আক্রমনের যুগের, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ ও সূফী ছিলেন হযরত আব্দুল কাদির জীলানী। তিনি ৪৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯০ বৎসর বয়য়ে (৫৬১ হি/১১৬৬খৃ) ইন্তেকাল করেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন বড় ফকীহ ছিলেন। এছাড়া তাসাউফের বড় সাধক ও ওয়ায়িয ছিলেন। তাঁর ওয়াযের প্রভাবে অগণিত মানুষ সেই অন্ধকার যুগে আল্লাহর দ্বীনের পথে ফিরে আসেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অনেক কারামত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর ছাত্রগণ বা নিকটবর্তীগণ, যেমন যাহাবী, সাম'আনী ও অন্যান্যরা তাঁর বিশুদ্ধ জীবনী রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি নিজে অনেক গ্রন্থ লিখে হাম্বলী মযহাব অনুসারে মুসলিমগণের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষা প্রদান করেন। যদিও তিনি তৎকালীন মাযহাবী কোন্দোলের প্রভাবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁকে অনুসারীদেরকে জাহান্নামী ফিরকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন[৫৫০], তবুও হানাফীগণ-সহ সকল মাযহাবের মানুষই তাঁকে ভক্তি করেন।

পরবর্তী যুগে তাঁর নামে অগণিত আজগুবি ও মিথ্যা কথা কারামতের নামে বানানো হয়। এসকল কথা যেমন ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, তেমনি তা ইসলামী ধ্যানধারণার পরিপন্থী। তবে এখানে আমাদের আলোচ্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক মিথ্যা কথা। আব্দুল কাদির জীলানীকে (রাহ) কেন্দ্র করে মিথ্যাবাদীদের বানোয়াট কথার একটি হলো, মি'রাজের রাত্রিতে নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল কাদিরের কাঁধে পা রেখে আরশে উঠেছিলেন। কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানোয়াট জঘন্য মিথ্যা কথা। কোনো হাদীসের গ্রন্থেই এর অস্তিত্ব নেই। আর যে কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নি, কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই বা সনদ নেই, সে সকল আজগুবি বানোয়াট কথা একজন মুমিন কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলতে পারেন সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। যেখানে সাহাবীগণ তাঁদের মুখস্থ ও জানা কথা সামান্য কমবেশি হওয়ার ভয়ে বলতে সাহস পেতেন না, সেখানে নির্বিচারে যা শুনছি তাই তাঁর নামে বলে কিভাবে কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে মুখ দেখাব!

২. ৮. ইল্ম ও আলিমদের ফযীলত বিষয়ক

জ্ঞানার্জনের নির্দেশে এবং আলিম ও তালিব-ইলম বা শিক্ষার্থীদের মর্যাদা বর্ণনায় অনেক আয়াতে-কুরআনী ও সহীহ হাদীস রয়েছে। অপরদিকে ইলমের ফযীলত বর্ণনায় অনেক মিথ্যা হাদীস বানানো হয়েছে। অনেক নির্বোধ নেককার (!) মানুষ মানুষকে জ্ঞানার্জনে উৎসাহ দানের জন্যও অনেক মিথ্যা হাদীস বানিয়েছেন। কি জঘন্য অপরাধ! তারা ভেবেছেন, কুরআনের বাণী ও সহীহ হাদীসে বোধহয় যথেষ্ট হচ্ছে না, আরো কিছু বানোয়াট ফযীলতের হাদীস না বললে হয়ত মানুষেরা ইলম শিখতে আসবে না। যেহেতু আলিমরাই হাদীস প্রচার করেন, সেহেতু অনেক সময় অনেক আলিম সুন্দর অর্থবোধক এ সকল জাল হাদীসকে বিচার না করেই বর্ণনা করেছেন। একারণে ইল্ম ও আলিমদের ফযীলত বিষয়ক অনেক জাল হাদীসই সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সকল মিথ্যা হাদীস জানা ও তা বলা থেকে বিরত থাকা আমাদের সকলের কর্তব্য। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

১. কিছু সময় চিন্তা হাজার বৎসর এবাদত থেকে উত্তম

এসকল বানোয়াট হাদীসের মধ্যে রয়েছে:

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ /سَبْعِيْنَ سَنَةً /أَلْفِ عَامٍ

"এক মুহূর্ত বা কিছু সময় চিন্তা-মুরাকাবা করা এক বৎসর ইবাদত করা থেকে উত্তম"। কেউ বলেছেন: ৭০ বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম। আর কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন: হাজার বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি জাল বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে তা মিথ্যা। কথাটি পূর্ববতী কোনো আলিমের উক্তি মাত্র।[৫৫১]

২. শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম

ইলেমের ফযীলতে বানানো অন্য একটি জাল হাদীস:

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

"শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম।"

সাখাবী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস জানিয়েছেন যে, কথাটি খুব সুন্দর শোনালেও তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়। যারকাশী বলেছেন: বাক্যটি আসলে হযরত হাসান বসরীর (রাহ) উক্তি।[৫৫২]

৩. আমার উম্মতের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত

আলিম ও ধার্মিকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

"আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের মত।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এই বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়, বরং তাঁর নামে প্রচালিত একটি ভিত্তিহীন, সনদহীন মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা।[৫৫৩] অনেক ওয়ায়িয এই মিথ্যা হাদীসকে কেন্দ্র করে বানোয়াট গল্প বলেন যে, হযরত মূসার (আ:) সাথে নাকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল! নাউযু বিল্লাহ! কি জঘন্য বানোয়াট কথা!!

এখানে উল্লেখ্য যে, আলিমদের ফযীলতে অন্য অনেক হাদীস রয়েছে যাতে আলিমদেরকে নবীদের কাছের মর্যাদার অধিকারী বলা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য (হাসান) একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ

"আলিমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।"

তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। আমাদের উচিত বানোয়াট কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলে গোনাহগার না হয়ে এ সকল গ্রহণযোগ্য হাদীস আলোচনা করা।

৪. আলিমের চেহারার দিকে তাকান

আলিমদের ফযীলতে বানানো অন্য একটি জাল হাদীস:

نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً صِيَاماً وَقِيَاماً

"আলিমের চেহারার দিকে তাকান আল্লাহর কাছে ৬০ বৎসরের সিয়াম (রোযা) ও কিয়াম (তাহাজ্জুদের) ইবাদতের চেয়ে অধিক প্রিয়।"

অন্য শব্দে বলা হয়েছে:

النَظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ

"আলিমের চেহারার দিকে তাকান একটি এবাদত।"

এই দুটি বাক্যের কোনটিই হাদীস নয়। মুহাদ্দিসগণ বাক্যদুটিকে মিথ্যা বা বানোয়াট হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫৪]

৫. আলেমের ঘুম ইবাদত

এ ধরণের আরেকটি জাল 'হাদীস':

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادة

"আলিমের ঘুম ইবাদত।"

মোল্লা আলী কারী বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা (মারফূ হাদীস) হিসেবে এই বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই।"[৫৫৫]

৬. মুর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম

অনুরূপ আরেকটি ভিত্তিহীন জাল কথা:

نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ/أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ

"মুর্খের ইবাদতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম।"

দুটি বাক্যই জাল। সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ কোনো সনদেই এই কথা দুটির কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে কাছাকাছি অর্থে একটি যয়ীফ হাদীস আছে:

نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ خَيْر مِن صَلاة عَلَى جَهْل

"ইলম-সহ নিদ্রা যাওয়া মুর্খতা-সহ সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।"[৫৫৬]

৭. আলিমের সাহচর্য এক হাজার রাকাত সালাতের চেয়ে উত্তম

এ বিষয়ে অন্য একটি বানোয়াট হাদীস:

حُضُور مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ من صلاة ألفِ ركعةٍ

"একজন আলিমের মাজলিসে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাক'আত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।"

মুহাদ্দিসগণ বাক্যটিকে মিথ্যা হাদীস বলে গণ্য করেছেন।[৫৫৭] এই জাল হাদীসটির উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আরেকটি কথা তৈরি করা হয়েছে: 'ওলীদের সাহচর্যে এক মুহূর্ত থাকা একশত বৎসর রিয়াহীন নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।" সৎ ও নেককার মানুষদের সাহচর্যে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন ও হাদীসে এর বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাহচর্যের এ ফযীলত বানোয়াট।

৮. আসরের পরে লেখাপড়া না করা

আমাদের দেশে অনেক আলিম ও মাদ্রাসা-ছাত্রের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, আসরের পরে লেখাপড়া করলে চোখের ক্ষতি হয়। একটি বানোয়াট হাদীস থেকে ধারণাটির উৎপত্তি। উক্ত বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَحَبَّ كَرِيْمَتَيْهِ فلا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

"যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে।"

কথাটি হাদীস নয়। এর কোন ভিত্তি নেই। কম আলোতে, অন্ধকারে বা আলো-আঁধারিতে লেখাপড়া করলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তারগণ এ বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন হাদীসে নেই।[৫৫৮]

৯. চীনদেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর

আমাদের দেশের বহুল পরিচিত একটি কথা:

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

"চীনদেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর।"

অধিকাংশ মুহাদ্দিস একে জাল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ একে অত্যন্ত দুর্বল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিচারে দেখা যায় দুইজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী, যারা মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতেন শুধুমাত্র তারাই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে প্রচার করেছেন।[৫৫৯]

১০. রাতের কিছু সময় ইলম চর্চা সারা রাত জেগে ইবাদতের চেয়ে উত্তম

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে: "বোখারী শরীফের আরও একটি হাদীসে আছে:

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا

অর্থাৎ: হযরত (দ:) বলিয়াছেন, রাত্রির এক ঘন্টা পরিমাণ (দ্বীনী) এলেম শিক্ষা করা সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া এবাদত করার চেয়েও ভাল।"[৫৬০]

এই কথাটি সহীহ বুখারীতে তো দূরের কথা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বাণী হিসাবে সংকলিত হয় নি। ইমাম দারিমী তার সুনান গ্রন্থে অত্যন্ত দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সনদে সাহাবী ইবনু আব্বাসের (রা) বাণী হিসাবে কথাটি সংকলন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে এ অর্থে যা কিছু বলা হয়েছে সবই জাল ও বানোয়াট।[৫৬১]

১১. ইলম, আমল ও ইখলাসের ফযীলত

ইলম, আমল ও ইখলাসের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। সেগুলির পাশাপাশি কিছু জাল হাদীস সমাজে প্রচলিত। যেমন:

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَى/هَلْكَى إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكَى إِلاَّ الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ غَرْقَى إِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ

"সকল মানুষ মৃত/ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত, শুধু আলিমগণ ছাড়া। আলিমগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শুধু আমলকারীগণ ছাড়া। আমলকারীগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত/ডুবন্ত শুধু মুখলিসগণ ছাড়া। মুখলিসগণ কঠিন ভয়ের মধ্যে।"

মুহাদ্দিস একমত যে, এ কথাগুলি জাল। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয় নি। দরবেশ হূত বলেন: "সামারকানদী তার 'তানবীহুল গাফিলীন' পুস্তকে এ 'হাদীস'টি উল্লেখ করেছে। আর ওয়ায়েযগণ তা নিয়ে মাতামাতি করেন।

এ পুস্তকটিতে অনেক মিথ্যা ও মাউযূ হাদীস রয়েছে। এজন্য পুস্তকটির উপর নির্ভর করা যায় না।"[৫৬২]

১২. ইল্‌ম সন্ধান করা পূর্বের পাপের মার্জনা

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে নিম্নের হাদীসটি সংকলন করেছেন:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى

"যদি কোনো ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ (বা পাপমোচনকারী) হবে।"[৫৬৩]

ইমাম তিরমিযী ছাড়াও দারিমী, তাবারানী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। সকলেই 'অন্ধ আবূ দাউদ' নুফাই ইবনুল হারিস-এর মাধ্যমে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তিনি ১৫০ হিজরীর দিকে ইন্তিকাল করেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, এ ব্যক্তি হাদীসের নামে মিথ্যা বলতেন।

সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তাবিয়ী কাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, প্রসিদ্ধ তাবে-তাবেয়ী হাম্মাম ইবনু ইয়হইয়া (১৬৫ হি) বলেন, 'অন্ধ আবূ দাউদ' আমাদের নিকট এসে হাদীস বলতে থাকেন। তিনি সাহাবী বারা ইবনু আযিব (৭৩ হি), সাহাবী যাইদ ইবনু আরকাম (৬৮ হি) প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করেন। তিনি দাবি করেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ১৮ জন সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেছেন। তখন আমরা প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুহাদ্দিস কাতাদার নিকট তার বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন লোকটি মিথ্যা বলছে। সে এ সকল সাহাবীকে দেখে নি বা তাদের থেকে কোনো কিছু শুনে নি। কারণ কয়েক বছর আগে মহামারীর সময়েও তাকে আমরা দেখেছি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াতে।[৫৬৪]

ইমাম বুখারী, আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবু হাতিম রাযী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। এই ব্যক্তিটি ছাড়া অন্য কেউ কোনো সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। এই ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাকে আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ নামক এক ব্যক্তি বলেছেন, তাকে তার পিতা সাখবারাহ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই কথাটি বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ নামক ব্যক্তিটিও অপরিচিত। অন্ধ আবূ দাউদ ছাড়া আর কেউ তার নাম উল্লেখ করেন নি বা তাকে চিনেন বলে উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে এ 'সাখবারাহ' নামক সাহাবীর কথাও এই 'অন্ধ আব্দুল্লাহ' ছাড়া কেউ কখনো উল্লেখ করেন নি। এই নামে কোনো সাহাবী ছিলেন বলে অন্য কোনো সূত্র থেকে জানা যায় না।[৫৬৫]

হাদীসটি উল্লেখ করে উপরের বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করে ইমাম তিরমিযী বলেন: "এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। আবূ দাউদ দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ এবং তার পিতার বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এ অন্ধ আবূ দাউদের বিষয়ে কাতাদা এবং অন্যান্য আলিম কথা বলেছেন।[৫৬৬]

ইমাম তিরমিযী এখানে হাদীসটির সনদ দুর্বল বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। দুর্বলতার পর্যায় উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি যে, দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের এক প্রকার 'জাল' হাদীস। যে দুর্বল হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত সেই দুর্বল হাদীসকে জাল হাদীস বলে গণ্য করা হয়। এ কারণে পরবর্তী কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে 'জাল' বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

فِيْهِ أَبُوْ دَاوُدَ الأَعْمَى وَهُوَ كَذَّابٌ

"এর সনদে অন্ধ আবূ দাউদ রয়েছেন যিনি একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী।"[৫৬৭]

১৩. খালি পায়ে ভাল কাজে বা ইলম শিখতে যাওয়া

ইলম শিক্ষার জন্য বা কোনো ভাল কাজে পথ চলার জন্য খালি পায়ে চললে বেশি সাওয়াব হবে বলে কিছু কথা প্রচলিত আছে। এগুলি সবই বাতিল কথা ও জাল হাদীস।[৫৬৮]

১৪. ইলম যাহির ও ইলম বাতিন

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুল বাতিন বা বাতিনী ইলমকে যাহেরী ইলম থেকে পৃথক বা গোপন কোন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলি সবই বানোয়াট ও মিথ্যা।[৫৬৯]

আমাদের সমাজে এ বিষয়ে সত্য ও মিথ্য অনেক সময় মিশ্রিত হয়েছে এবং অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে বিকৃত অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা জানি যে, মানুষের জ্ঞানের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো কোনো কিছু 'জানা'। দ্বিতীয় পর্যায় হলো,

এই 'জানা' মনের গভীরে বা অবচেতনে বিশ্বাসে পরিণত হওয়া। যেমন, একজন মানুষ জানেন যে, 'ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর', অথবা 'ধুমপানে বিষপান'। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধুমপান করেন। কিন্তু তিনি কখনই বিষপান করেন না। কারণ তার এই জ্ঞান সুগভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়নি। যখন তা বিশ্বাসে পরিণত হবে তখন তিনি আর ধুমপান করতে পারবেন না, যেমন তিনি বিষপান করতে পারেন না।

ধর্মীয় বিধিবিধানের বিষয়েও জ্ঞানের এইরূপ দুইটি পর্যায় রয়েছে। একজন মানুষ জানেন যে প্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলে তিনি পুড়ে যাবেন। একারণে তিনি কখনোই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিবেন না। তাকে ধাক্কা দিয়ে আগুনে ফেলতে গেলেও তিনি প্রাণপণে বাধা দিবেন। আবার এই মানুষটিই 'জানেন' ও 'বিশ্বাস করেন' যে, 'নামায কাযা করলে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে পুড়তে হবে', কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি 'নামায কাযা' করেন। কারণ তার এই 'জ্ঞান' ও 'বিশ্বাস' প্রকৃত পক্ষে মনের গভীরে বা অবচেতন মনের গভীর বিশ্বাসের জ্ঞানে পরিণত হয় নি। যখন এই জ্ঞানটি তার গভীর বিশ্বাসের জ্ঞানে পরিণত হবে তখন তিনি কোনো অবস্থাতেই নামায কাযা করতে পারবেন না, যেমনভাবে তিনি কোনো অবস্থাতেই আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। তিনি জাহান্নামের আগুন হৃদয় দিয়ে অবলোকন ও অনুভব করতে পারবেন।

এজন্য আমরা জানি যে, একজন সাধারণ ধার্মিক মুসলিম, যিনি সাধারণভাবে ফজরের নামায জামাতে আদায় করেন, তিনি যদি রাতে দেরি করে ঘুমাতে যান তাহলে হয়ত ফজরের জামাতের জন্য তার ঘুম ভাঙ্গবে না। কিন্তু এই ব্যক্তিরই যদি ভোর ৪টায় ট্রেন বা গাড়ি থাকে তাহলে কয়েকবার রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কারণ গাড়ি ফেল করলে কিছু অসুবিধা হবে বা ক্ষতি হবে এই জ্ঞানটি তার অবচেতন মনের বা 'কালবের' জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু নামাযের জামাত ফেল করলে কিছু ক্ষতি হবে এই জ্ঞানটি সেই প্রকারের গভীর জ্ঞানে পরিণত হয়নি। যখন তা এরূপ গভীর জ্ঞানে বা 'কালবেরর জ্ঞানে' পরিণত হবে তখন ফজরের জামাতের জন্যও তার বারবার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানের পালন ও আচরণই জ্ঞানকে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে যায়। সকল ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। 'ধুমপানে বিষপান' এই জ্ঞানটিকে যদি কারো মনে বারংবার উপস্থিত করা হয়, সে তা পালন করে, ধুমপানের অপকারিতার দিকগুলি বিস্তারিত পাঠ করে, এ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়, তবে এক পর্যায়ে এই জ্ঞান তার গভীর জ্ঞানে পরিণত হবে এবং তিনি ধূমপান পরিত্যাগ করবেন। অনুরূপভাবে 'গীবত জাহান্নামের পথ' এই জ্ঞানটি যদি কেউ বারংবার আলোচনা করেন, এই বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলি বারংবার পাঠ করেন, আখিরাতের গভীর বিশ্বাসে তিনি এর শাস্তি মন দিয়ে অনুভব করেন... তবে এক পর্যায়ে তিনি 'গীবত' পরিত্যাগ করবেন। তার মনই তাকে 'গীবত' করতে বাধা দিবে।

আমরা জানি যে, দুই পর্যায়ের জ্ঞানই জ্ঞান। প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ বান্দাদের হিসাব নিবেন। যে ব্যক্তি জেনেছে যে, নামায কাযা করা হারাম, কিন্তু তার পরও সে তা কাযা করেছে, তার জন্য তার কর্মের শাস্তি পাওনা হবে। আর জ্ঞান যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন তা মানুষের জন্য আল্লাহর পথে চলাকে অতি সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলে। হাদীস শরীফে জ্ঞানকে এই দিক থেকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِى الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ

"অনেক মানুষ কুরআন পাঠ করে; কিন্তু তা তাদের গলার নিচে নামে না (হৃদয়ে গভীর জ্ঞানে পরিণত হয় না)। কিন্তু যখন তা অন্তরে পৌঁছে যায় এবং গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তা তার কল্যাণ করে।"[৫৭০]

প্রখ্যাত তাবিয়ী হাসান বসরী (১১০ হি) বলেছেন:

الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَتِلْكَ (فَذَلِكَ) حُجَّةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ (ابْنِ آدَمَ)، وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ.

"ইলম বা জ্ঞান দুই প্রকারের: (১) জিহ্বার জ্ঞান, যা আদম সন্তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর প্রমাণ ও (২) অন্তরের জ্ঞান। এই জ্ঞানই উপকারী জ্ঞান।"[৫৭১]

হাসান বসরীর এ উক্তিটির সনদ নির্ভরযোগ্য। তবে অন্য সনদে এ 'উক্তিটি' হাসান বসরীর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বর্নিত হয়েছে। এক সনদে পরবর্তী এক রাবী দাবি করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপরের বাক্যটি বলেছেন। অন্য সনদে পরবর্তী রাবী দাবি করেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, জাবির (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উপরের বাক্যটি বলেছেন। এ দুটি সনদকে কোনো কোনো আলিম দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আল্লামা মুনযিরী হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭২]

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী সংকলিত একটি হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেছেন:

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا

الْبُلْعُومُ

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে ইলম-এর দুটি পাত্র সংরক্ষণ করেছি। একটি পাত্র প্রচার করেছি। অন্য পাত্রটি যদি প্রচার করি তবে আমার গলা কাটা যাবে।"[৫৭৩]

এ হাদীসটিকে কেউ কেউ ইলমুল বাতিন-এর প্রতি ইঙ্গিত বলে বুঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে এখানে আবূ হুরাইরা (রা) উমাইয়া যুগের যালিম শাসকদের বিষয়ে ইঙ্গিত করছেন। খিলাফতে রাশিদার পরে যালিম শাসকদের আগমন, দ্বীনি বিষয়ে অবহেলা ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং ইয়াযীদ ও অন্যান্য যালিম শাসকের নামও বলেছিলেন। আবূ হুরাইরা এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী উমাইয়া যুগে এ বিষয়ক হাদীসগুলি বলার ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা বলতেন।[৫৭৪]

এভাবে মুহাদ্দিসগণ একমত করেছেন যে, 'ইলমুল বাতিন' শব্দ কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া ইলম যাহির ও ইলম বাতিনের বিভাজনও কোনো হাদীসে করা হয় নি। "ইলমু যাহির" ও "ইলম বাতিন" পরিভাষায় দুটির উদ্ভাবন ও বিভাজন বিষয়ক সকল কথাই শিয়াদের জালিয়াতি ও অপপ্রচার। তবে পরবর্তী যুগের অনেক সুন্নী আলিম ও বুজুর্গ "ইলম যাহির" ও "ইলম বাতিন" পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তারা উপরের হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান 'ইলমুল ক্বাল্ব' বা অন্তরের জ্ঞানকে অনেক সময় 'ইলমুল বাতিন' বলে অভিহিত করেছেন। এ জ্ঞান কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান বা শরীয়তের জ্ঞান থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং এ জ্ঞান হলো কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের প্রকৃত ও কাঙ্খিত পর্যায়। কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান অবিরত চর্চা, পালন ও অনুশীলনের মাধ্যমে যখন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে এবং অবচেতন মন থেকে মানুষের র্কম নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে 'ইলুমুল ক্বালব' বা 'ইলমুল বাতিন' বলা হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই "ইলম" বা জ্ঞান একই, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান। এ জ্ঞান যদি "যাহির" অর্থাৎ মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গ জিহ্বায়, মুখে বা কথায় অবস্থান করে তবে তাকে "ইলমুলয যাহির" বা প্রকাশ্য অঙ্গের ইলম" বলা হয়। আর যদি তা আভ্যন্ত রীণ অঙ্গ বা "কালব"-এ অবস্থান করে তবে তাকে "ইলমুল বাতিন" বা লুক্কয়িত অঙ্গের ইলম বলা হয়। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে "যাহির" ও "বাতিন" শব্দদ্বয় ইলমের বিশেষণ নয়, বরং ইলমের ইযাফত বা অবস্থান বুঝায়। কিন্তু শিয়াদের প্রচারণা ও সাধারণ আলিম ও বুজুর্গগণের অসতর্কতায় যাহির ও বাতিন শব্দদ্বয়কে ইলমের বিশেষণ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মনে করা হয়েছে যে, ইলমই দু প্রকারের এক প্রকারের ইলম যাহির বা প্রকাশ্য যা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি পাঠে জানা যায়। আরেক প্রকারের ইলম বাতিন বা লুক্কয়িত, এ ইলম বই পত্র পড়ে জানা যায় না, বরং অন্য কোনোভাবে জানতে হয়।

এভাবে ইলম যাহির ও ইলম বাতিন নামে অনেক প্রকারের ইসলাম বিরোধী কুসংস্কার মুসলিম সমাজে ছড়ানো হয়েছে। ইলম বাতিনকে গোপন কিছু বিষয় বা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের বাইরে অর্জনীয় কোনো বিষয় বলে দাবি করা হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু হাদীসও জালিয়াতগণ তৈরি করেছে। 'ইলমু বাতিন ইলমু যাহির থেকে পৃথক বা গোপন কোনো ইলম' এই অর্থে প্রচলিত সকল কথাই জাল। এই জাতীয় কয়েকটি জাল হাদীস উল্লেখ করছি:

১৫. বাতিনী ইলম গুপ্ত রহস্য নবী-ফিরিশতাগণও জানে না!

জালিয়াতগণ হাসান বসরী পর্যন্ত জাল সনদ তৈরি করে বলেছে, হাসান বসরী (২২-১০৯হি) বলেছেন, আমি সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (৩৬ হি) জিজ্ঞাসা করলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? তিনি বলেন, আমি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইলম বাতিন কী? আল্লাহ বলেন,

يَا جِبْرِيْلُ، هُوَ سِرٌّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَحِبَّائِيْ وَأَوْلِيَائِيْ وَأَصْفِيَائِيْ أُوْدِعُهُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

"হে জিবরীল, তা হলো, আমার ও আমার প্রিয়পাত্র ও অলীগণের মধ্যকার গোপন বিষয়। আমি তা তাদের অন্তরের মধ্যে প্রদান করি। কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা কোনো নবী-রাসূলও তা জানতে পারেন না।"

৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতকের আলিম শীরাওয়াইহি ইবনু শাহরদার দাইলামী (৫০৯ হি) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-ফিরদাউস'-এ এই কথাটিকে হাদীস হিসাবে সংকলিত করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইবনু ইরাক কিনানী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস হাদীসটির জালিয়াতি উদ্ঘাটন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালিয়াতি করতেন বলে প্রমাণিত। শুধু তাই নয়। জালিয়াতগণের কাজে কিছু ভুল থেকে যায়। এখানে তারা বলেছে, হাসান বসরী হুযাইফাকে (রা) প্রশ্ন করেছিলেন। অথচ প্রকৃত পক্ষে হাসান বসরী জীবনে হুযাইফাকে দেখেনও নি, তার নিকট থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা তো দূরের কথা।[৫৭৫]

১৬. বাতিনী ইলম গুপ্ত রহস্য আল্লাহ ইচ্ছামত নিক্ষেপ করেন

এই জাতীয় আরেকটি জাল ও বাতিল কথা হলো:

عَلْمُ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، يَقْذِفُهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

"বাতিনী ইল্‌ম আল্লাহর গুপ্ত রহস্যগুলির একটি এবং আল্লাহর বিধানাবলির একটি। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার অন্তরে চান তা নিক্ষেপ করেন।"

হাদীসটির একটি সনদ আছে। সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবীগণের সমষ্টি। আল্লামা যাহাবী, সুয়ূতী, ইবনু ইরাক প্রমুখ হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, আল্লামা সুয়ূতী নিজে হাদীসটিকে জাল হিসাবে চিহ্নিত করে তার 'যাইলুল লাআলী' নামক জাল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থে তা সংকলন করেছেন। কিন্তু আবার তিনি তাঁর 'আল-জামি আস-সগীর' নামক পুস্তকে হাদীসটি 'যয়ীফ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি দাবি করেছেন যে, 'আল-জামি আস-সাগীর' পুস্তকে তিনি কোনো জাল হাদীস উল্লেখ করবেন না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল প্রাজ্ঞ আলেমেরই ভুল হতে পারে এবং কারো কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না।[৫৭৬]

এই বাতিল কথাটি কেউ কেউ অন্যভাবে বলেছেন:

عِلْمُ الْبَاطِنِ سِرٌّ مِنْ سِرِّيْ أَجْعَلُهُ فِيْ قَلْبِ عِبَادِيْ وَلاَ يَقِفُ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِيْ

"বাতিনী ইল্‌ম আমার গুপ্ত রহস্যসমূহের একটি আমি আমার বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করি। আর আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।"[৫৭৭]

১৭. মানুষই আল্লাহর গুপ্ত রহস্য

একটি জাল 'হাদীসে কুদসী'-তে বলা হয়েছে:

اَلإِنْسَانُ سِرِّيْ وَأَنَا سِرُّهُ

"মানুষ আমার গুপ্তরহস্য এবং আমি মানুষের গুপ্ত রহস্য।"

কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন, সনদবিহীন বানোয়াট কথা।[৫৭৮]

১৮. বাতিনী ইলম লুক্কায়িত রহস্য শুধু আল্লাহওয়ালারই জানেন

এই অর্থে আরেকটি অত্যন্ত দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য বা জাল কথা:

إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُوْنِ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ الْعُلَمَاءُ بِاللهِ فَإِذَا نَطَقُوْا بِهِ لاَ يُنْكِرُهُ إِلاَّ أَهْلُ الْغِرَّةِ بِاللهِ

"ইলমের মধ্যে এমন এক ইলম রয়েছে যা গোপনীয় বস্তুর মত। যে ইলম আল্লাহওয়ালা আলেমগণ ছাড়া কেউ জানে না। তাঁরা যখন তা উচ্চারণ করেন তখন আল্লাহর সম্পর্কে ধোকাগ্রস্ত ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না।"

দাইলামী ও অন্যান্য আলিম এই হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে নাসর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হারিস নামক এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সূত্রে বলেছেন, এই ব্যক্তি বলেছেন, তাকে আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ আবুস সালত হারাবী বলেছেন, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে, ইবনু জুরাইজ থেকে, আতা থেকে, আবূ হুরাইরা থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...।

হাদীসটির রাবী নাসর ইবনু মুহাম্মাদ অজ্ঞাত পরিচয়। তার উস্তাদ হিসাবে উল্লিখিত আব্দুস সালাম ইবনু সালিহ অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যার প্রকারভেদ অনুচ্ছেদে আমরা তার বিষয়ে আলোচনা করেছি। একমাত্র এ মিথ্যাবাদী ছাড়া অন্য কারো সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হয় নি।[৫৭৯]

১৯. মি'রাজের রাতে ত্রিশ হাজার বাতিনী ইলম গ্রহণ

আমরা আগেই বলেছি যে, বুজুর্গগণের নামে জাল গ্রন্থ রচনা বা তাদের গ্রন্থের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকানো জালিয়াতগণের প্রিয় কর্ম। শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ)-এর নামে প্রচলিত 'সিররুল আসরার' নামক পুস্তকে নিম্নরূপে লেখা হয়েছে: "এই একান্ত গুপ্ত ত্রিশ হাজার এলম মেরাজ শরীফের রাতে আল্লাহ তাআলা হুযুর (ﷺ)-এর কলব মোবারকে আমানত রাখেন। হুযুর (ﷺ) তাঁর অত্যাধিক প্রিয় সাহাবা এবং আসহাবে সুফ্ফাগণ ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ লোকের নিকট সেই পবিত্র আমানত ব্যক্ত করেন নি।..."[৫৮০]

যারা শাইখ আব্দুল কাদির (রাহ)–এর নামে এ জাল কথা প্রচার করেছে সে জালিয়াতগণকে আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রদান করবেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে কী জঘন্য ডাহা মিথ্য কথা! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন প্রিয় সাহাবী বা একজন সুফ্ফাবাসী থেকেও এইরূপ কোনো কথা সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

২০. রাসূলুল্লাহর (ﷺ) বিশেষ বাতিনী ইলম

জালিয়াতদের বানানো একটি কথা যা হাদীস বলে প্রচলিত:

لِيْ مَعَ اللهِ وَقْتٌ لاَ يَسَعُ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

"আল্লাহর সাথে আমার এমন একটি সময় আছে, যেখানে কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা বা প্রেরিত নবীর স্থান সংকুলান হয় না।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি ভিত্তিহীন সনদহীন একটি জাল কথা, যদিও সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে তা প্রচলন পেয়েছে। সূফী-দরবেশগণ সরল মনে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন। ফলে জালিয়াতগণ তাদের মধ্যে জাল কথা ছড়াতে বেশি সক্ষম হতো।[৫৮১]

২১. আলিম বা তালিব-ইলম গ্রামে গেলে ৪০ দিন কবর আযাব মাফ:

প্রচলিত একটি সনদবিহীন জাল হাদীস:

إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا بِقَرْيَةٍ فَإِنَّ اللهَ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

"কোনো আলিম বা তালিব-ইলম কোনো গ্রাম দিয়ে গমন করলে মহান আল্লাহ ৪০ দিনের জন্য সে গ্রামের গোরস্থানের আযাব উঠিয়ে নেন।"

কথাটি বানোয়াট ও মিথ্যা।[৫৮২]

২২. আলিমের সাক্ষাত/মুসাফাহা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সাক্ষাত/মুসাফাহার মত

প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

مَنْ زَارَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) زَارَنِيْ وَمَنْ صَافَحَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) صَافَحَنِيْ وَمَنْ جَالَسَ عَالِماً/ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا (فَكَمَنْ) جَالَسَنِيْ وَمَنْ جَالَسَنِيْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا أَجْلَسَهُ اللهُ تَعَالَى مَعِيْ غَداً فِيْ الجَنَّةِ/ أَجْلَسَهُ رَبِّيْ مَعِيْ فِيْ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

"যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/আলিমগণের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাৎ করল, যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/ আলিমগণের সাথে মুসাফাহা করল, সে যেন আমার সাথেই মুসাফাহা করল, যে ব্যক্তি কোনো একজন আলিম/আলিমগণের মাজলিসে বসল, সে যেন আমার মাজলিসেই বসল। আর যে দুনিয়াতে আমার মাজলিসে বসেছে মহান আল্লাহ তাকে আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) আমার সাথে জান্নাতে বসাবেন।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে কথাটি জাল ও মিথ্যা।[৫৮৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন ও হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: (১) ইলম শিক্ষা করা, (২) নেককার মানুষদের সাহচর্যে থাকা এবং (৩) নেককার মানুষেদের আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও তাঁদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা। এ তিনটি ইবাদত মুমিনের নাজাতের অন্যতম ভিত্তি। আলিমগণের সাহচর্য থেকেই এই তিনটি ইবাদত পালন করা যায়।

আলিমের নিজস্ব কোনো ফযীলত নেই। তাঁর ফযীলত নির্ভর করবে তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে যতটুক ইলম ও আমল গ্রহণ করবেন তার উপর। অর্থাৎ আলেমের ফযীলত দুটি: ইলম ও আমল। নেককার আলেমের সাহচর্যের গুরুত্ব তিনটি: নেককার মানুষের সাহচর্যের সাধারণ মর্যাদা, নেককার মানুষের মহব্বতের সাধারণ মর্যাদা ও ইলম শিক্ষার সুযোগ...। এছাড়া আলেমের পিছনে সালাত আদায়, মাজলিসে বসা, সাক্ষাত করা, মুসাফাহা করা ইত্যাদির বিশেষ ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই ভিত্তিহীন ও জাল কথা।

২৩. যে দিন আমি নতুন কিছু শিখিনি সে দিন বরকতহীন

প্রচলিত একটি বাতিল কথা যা হাদীস নামে প্রচলিত:

إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لاَ أَزْدَادُ فِيْهِ عِلْماً يُقَرِّبُنِيْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَلاَ بُوْرِكَ لِيْ فِيْ طُلُوْعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

"যদি আমার জীবনে এমন একটি দিন আসে যে দিনে আমি আল্লাহর নৈকট্য প্রদানকারী কোনো ইলম বৃদ্ধি করতে পারি নি, সে দিনের সূর্যোদয়ে আমার জন্য কোনো বরকত না হোক্।"

হাদীসটি আবূ নু'আইম ইসপাহানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ নামক দ্বিতীয় শতকের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকাম বলেন ইবনু শিহাব যুহরী তাকে এই হাদীসটি বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে আয়েশা থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে। আবূ নু'আইম বলেন: "এই হাদীসটি একমাত্র হাকাম ছাড়া কেউ বর্ণনা করে নি।"[৫৮৪]

হাকাম নামক এই ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, লোকটি একজন জালিয়াত ও জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম আবূ হাতিম রাযী বলেন, লোকটি জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। ইমাম দারাকুতনী, ইবনু আদী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেন, এই লোকটি কঠিন জালিয়াত ছিল। সে একটি জাল পাণ্ডুলিপি বানিয়ে তাতে ৫০টিরও অধিক জাল হাদীস লিখে সেগুলি ইমাম যুহরীর নামে সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবের সূত্রে প্রচার

করে। এগুলি সবই জাল ও ভিত্তিহীন। এছাড়া আরো অনেক জাল সনদ তৈরি করে সে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। সকল মুহাদ্দিস একমত যে লোকটি পরিত্যক্ত, মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত।[৫৮৫]

এ বাক্যটি অন্য ভাবেও বর্ণিত:

إِذَا أَتَى عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزْدَدْ فِيْهِ خَيْراً يُقَرِّبُنِيْ إِلَى اللهِ فَلاَ بُوْرِكَ لِيْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ

"যদি আমার জীবনে এমন একটি দিন আসে যে দিনে আমি আল্লাহর নিকটবর্তী করার মত কোনো একটি ভাল কর্ম বৃদ্ধি করতে পারি নি, সে দিনে আমার জন্য কোনো বরকত না হোক্।"

এ বাক্যটিও উপরের জালিয়াত হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। এর সনদে হাকামের পরে আরো জালিয়াত ও দুর্বল রাবী রয়েছে। সম্ভবত পরবর্তী কোনো দুর্বল রাবী বাক্যটিকে একটু পরিবর্তিত করে ফেলেছে।[৫৮৬]

২৪. কুরআন দিয়ে হাদীস বিচার

ইসলামী ইলম-এর মূল উৎস দুইটি: কুরআন ও হাদীস। আমরা দেখেছি যে, হাদীসের জ্ঞান কুরআনের জ্ঞানের অতিরিক্ত। তা কুরআনের ব্যাখ্যা হতে পারে বা কুরআনের সংযোজন হতে পারে। প্রথম পর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, এ মূলনীতির ভিত্তিতেই সাহাবীগণের যুগ থেকে সকল যুগে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা, সূত্র, উৎস, অর্থ ইত্যাদি বিচার করেছেন। এ ক্ষেত্রেও জালিয়াতগণ বিভিন্ন রকমের জালিয়াতি করেছে। এ সকল জালিয়াতির উদ্দেশ্য হলো, 'ডকুমেন্টারী' নিরীক্ষা না করে 'মনমর্জিমত' 'অর্থ' বিচার করে হাদীস 'গ্রহণ' বা বর্জন করা। কেউ 'কুরআন দিয়ে হাদীস বিচার' করার পক্ষে জাল হাদীস বানিয়েছে। কেউ 'ভাল-মন্দ' অর্থ দেখে হাদীস বিচারের জন্য জাল হাদীস বানিয়েছে। কেউ নির্বিচারে 'ভক্তিভরে' হাদীস গ্রহণ করার জন্য জাল হাদীস বানিয়েছে। এ জাতীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

إِذَا رُوِيَ عَنِّيْ حَدِيْثٌ (إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ حَدِيْثاً) فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ، وَإِنْ خَالَفَهُ فَرُدُّوْهُ

"যখন তোমাদেরকে আমার থেকে কোনো হাদীস বলা হবে, তখন তোমরা তা আল্লাহর কিতাবের উপরে পেশ করবে (কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখবে।) যদি তা আল্লাহর কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা তার বিরোধী হয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করবে।"

এ 'হাদীস'টি এবং এ অর্থে বর্ণিত বিভিন্ন 'বাক্য' সবই ভিত্তিহীন। এ অর্থের অধিকাংশ বক্তব্যই সনদবিহীন মিথ্যা কথা। দু একটি বাক্য এ অর্থে সনদসহও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির সনদে মাতরূক, মুনকার বা 'পরিত্যক্ত' ও মিথ্যায় অভিযুক্ত রাবী বিদ্যমান। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে ইসলামের গোপন শত্রু যিনদীকগণ এ সকল হাদীস তৈরি করে প্রচার করে।

স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো হাদীসই কুরআন 'বিরোধী' হয় না। তবে 'ডকুমেন্টারী' প্রমাণ ছাড়া যদি 'কুরআন' দিয়ে হাদীস বিচার করা হয় তবে প্রত্যেকেই তার নিজ 'বুদ্ধি' বা 'মর্জি' দিয়ে হাদীস বিচার করবে। একজন সহজেই বলতে পারবে যে, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা নেই, বা 'তিন ওয়াক্তের কথা আছে' কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হাদীসগুলি কুরআন বিরোধী, কাজেই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অন্যজন বলবে, বৎসরপূর্তির পরে 'যাকাত' প্রদানের বিধান কুরআন বিরোধী। আরেকজন সহজেই বলতে পারবে, 'উকাশার প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী' কুরআনের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কাজেই তা সহীহ। অথবা কুরআনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে, কাজেই 'আপনি না হলে বিশ্ব সৃষ্টি করতাম না' হাদীসটি সহীহ। অথবা কুরআনে সাহাবীদের প্রশংসা করা হয়েছে, কাজেই 'আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য' হাদীসটি সহীহ। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের মর্জি মত দাবি দাওয়া করতে থাকত এবং মুসলিম উম্মাহ অন্তহীন বিভ্রান্তির আবর্তে পড়তেন। এই উদ্দেশ্যেই যিনদীকগণ এই হাদীসগুলি বানিয়েছিল। তবে মুহাদ্দিসগণের সনদ নিরীক্ষার ফলে তাদের জালিয়াতি ধরা পড়েছে।[৫৮৭]

২৫. 'ভাল' অর্থ দেখে হাদীস বিচার

দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

مَا جَاءَكُمْ عَنِّيْ مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُوْلُهُ وَمَا أَتَاكُمْ مِنْ شَرٍّ فَإِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ الشَّرَّ

"আমার পক্ষ থেকে কোনো 'কল্যাণ' বা 'ভালো' তোমাদের কাছে পৌছালে আমি বলি অথবা না–ই বলি, আমি তা বলি (তোমরা তা গ্রহণ করবে)। আর তোমাদের নিকট কোনো 'খারাপ' বা 'অকল্যাণ' পৌছালে (তা গ্রহণ করবে না); কারণ আমি 'খারাপ' বলি না।"

এই অর্থের অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَصَدِّقُوْهُ وَخُذُوْا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ

"যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো হাদীস তোমাদেরকে বলা হবে যা 'হক্ক' বা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন তোমরা তা গ্রহণ করবে- আমি তা বলি অথবা নাই বলি।"

এইরূপ 'ভালমন্দ' অর্থ বিচার করে হাদীস গ্রহণের বিষয়ে আরো কয়েকটি 'হাদীস' বর্ণিত হয়েছে। এই অর্থে বর্ণিত কিছু হাদীস সন্দেহাতীতভাবে জাল ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত। এগুলির সনদে সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবী বিদ্যমান। আর কিছু হাদীস অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত, যেগুলিকে কেউ 'যয়ীফ' বলেছেন এবং কেউ 'মাউযূ' বলেছেন।

আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে 'অর্থ' বিচার করা হয়। তবে যে কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে সর্ব-প্রথম বিচার্য হলো, কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন বলে প্রমাণিত কিনা। তিনি বলুন অথবা না বলুন, হক্ক, সত্য বা ভালর সাথে মিল হলেই তা 'নির্বিচারে' 'হাদীস' বলে গ্রহণ করার অর্থই হলো তিনি যা বলেন নি তা তাঁর নামে বলার পথ প্রশস্ত করা। আর অগণিত হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ক 'দুর্বল' হাদীসগুলিকেও অর্থগতভাবে বাতিল বলে গণ্য করেছেন। অনেক দুর্বল রাবী ভুল বশত এক হাদীসের সনদ অন্য হাদীসে জুড়ে দেন, মতন পাল্টে ফেলেন। এজন্য কখনো কখনো দুর্বল বা অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর হাদীসও অর্থ বিচারে মাউযূ বা বাতিল বলে গণ্য করা হয়।[৫৮৮]

২৬. ভক্তিতেই মুক্তি!

সাধারণ মানুষ যাতে 'নির্বিচারে' জাল হাদীসগুলি গ্রহণ করে, এজন্য জালিয়াতগণ 'ভক্তিতেই মুক্তি' মর্মে অনেক হাদীস বানিয়েছে। যেমন:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ فَأَخَذَ بِهِ إِيْمَاناً بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللهُ ثَوَابَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ/ وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ حَدَّثَهُ كَاذِباً

"যদি কারো নিকট কোনো 'ফযীলতের' বা সাওয়াবের কথা পৌঁছে এবং সে তা বিশ্বাস করে এবং সাওয়াবের আশায় তা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তাকে সেই সাওয়াব দান করবেন; যদিও প্রকৃত পক্ষে তা সঠিক না হয়। অথবা তাকে যে কথাটি বলেছে সে যদি মিথ্যাবাদীও হয়।"

অনুরূপ আরেকটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضِيْلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَنَلْهَا

"যদি কারো কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফযীলত বা সাওয়াবের কথা পৌঁছে, কিন্তু সে তা সত্য বলে মেনে না নেয়, তবে সে সেই ফযীলতটি লাভ করবে না।"

দাজ্জালদের বানানো আরেকটি বানোয়াট কথা:

لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللهُ بِهِ

"যদি তোমাদের কেউ কোনো পাথরের ব্যাপারেও ভাল ধারণা পোষণ করে, তবে সে পাথর দ্বারাও আল্লাহ তার উপকার করবেন।"

এ কথাগুলি এবং এ অর্থে বর্ণিত সকল কথাই জঘন্য মিথ্যা, যা মিথ্যাবাদী দাজ্জাদলগণ বানিয়েছে এবং এগুলির জন্য সনদও বানিয়েছে। তবে সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার জন্য সনদ বলার অপরিহার্যতার রীতি প্রচলনের ফলে মুসলিম উম্মাহ এদের জালিয়াতি থেকে আত্মরক্ষার পথ পেয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ দেখেছেন যে, এ সকল হাদীসের প্রত্যেকটির সনদেই মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বিদ্যমান। এজন্য তাঁরা এ সকল হাদীস জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এগুলিকে 'অত্যন্ত দুর্বল' বলে উল্লেখ করে এগুলির সহীহ হাদীস সম্মত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[৫৮৯]

২. ৯. ঈমান বিষয়ক

১. স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংশ

একটি অতি প্রচলিত বাক্য:

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ

"দেশপ্রেম ঈমানের অংশ।"

হাদীস হিসেবে কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট।[৫৯০]

এছাড়া কথাটির অর্থও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ততটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাজেই একে আলিমগণের কথা বা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলে চালানোরও যৌক্তিকতা নেই। ঈমান ও ইসলাম ঐ সব কর্মের সমষ্টি যা মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় করতে পারে বা অর্জন করতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে বা জন্মগতভাবে সে সকল বিষয় অর্জিত হয় তাকে ঈমানের বা ইসলামের অংশ বলা হয় না। কারণ এগুলি ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন কর্ম নয়। জন্মস্থান, আবাসস্থল, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, সন্তান, পরিজন ও পিতামাতার প্রতি ভালবাসা একটি প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে এদের প্রতি ভালবাসা অনুভব করে। এগুলি কোনটিই

ঈমানের অংশ নয়। এজন্য পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাকে ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হয়েছে, পিতামাতার ভালবাসাকে নয়। অনুরূপভাবে দেশের প্রতি, আবাসস্থলের প্রতি, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি মুসলিমের অনেক দায়িত্ব রয়েছে, যা তিনি ইচ্ছাধীন কর্মের মাধ্যমে পালন করবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক ভালবাসাকে ঈমানের অংশ বলা ইসলামী ধারণার সাথে পুরোপুরি মেলে না।

কেউ যদি প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে, নিজ সন্তান, স্ত্রী, পিতামাতা, আবাসস্থল বা দেশকে ভাল না বাসে তাহলে আমরা তাকে অপ্রকৃতিস্থ, পাগল ইত্যাদি বলব। আর যদি এ অবস্থা তাকে উপর্যুক্ত দায়িত্বাদি পালন থেকে বিরত রাখে তাহলে আমরা তাকে পাপী ও আল্লাহর অবাধ্য বলব।

২. প্রচলিত 'পাঁচ' কালিমা

আমাদের দেশে ইসলামী ঈমান-আকীদার বিবরণের ক্ষেত্রে 'পাঁচটি কালিমা'র কথা প্রচলিত আছে। এছাড়া ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সাল নামে দুইটি ঈমানের কথা আছে। কায়েদা, আমপারা, দ্বীনিয়াত ও বিভিন্ন প্রচলিত বই পুস্তকে এই কালিমাগুলি রয়েছে। এগুলিকে অত্যন্ত জরুরী মনে করা হয় এবং বিশেষভাবে মুখস্থ করা হয়। এই বাক্যগুলির অর্থ সুন্দর। তবে সবগুলি বাক্য এভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। এগুলিকে সব কুরআনের কথা বা হাদীসের কথা মনে করলে ভুল হবে।

(১) কালিমায়ে শাহাদত

কুরআন ও হাদীসে ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসের মূল হিসাবে দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশে 'কালিমা শাহাদত' হিসাবে পরিচিত। এই কালিমায় আল্লাহর তাওহীদ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কালিমা শাহাদতই হাদীস শরীফে ঈমানের মূল বাক্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের (নামাযের) 'তাশাহ্হুদের' মধ্যে বাক্যদ্বয় এভাবে একত্রে বলা হয়েছে:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ (উপাস্য) নেই এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

এই 'কালিমা' বা বাক্যটি দুইটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম বাক্য: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ (উপাস্য) নেই।"

এ প্রথম বাক্যটির ক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই।"

দ্বিতীয় বাক্য: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আযানের মধ্যে এ বাক্যদ্বয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসে (أشهد) অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' কথাটি পুনরাবৃত্তি না করে শুধুমাত্র (**وَأَنَّ**) 'এবং নিশ্চয়' বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বাক্যদ্বয়ের শুরুতে (أشهد) বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ

দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে অনেক হাদীসে (أن محمدا رسول الله) 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' কথাটির পরিবর্তে (أن محمدا عبده ورسوله) 'মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'- বলা হয়েছে। এছাড়া কোনো কোনো হাদীসে 'সাক্ষ্য প্রদান' শব্দের পরিবর্তে 'বলা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা এ কালেমাটিকে নিম্নের বিভিন্ন রূপে দেখতে পাই[৫৯১]:

(১) প্রথম রূপ: أشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وأشهد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(২) দ্বিতীয় রূপ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(৩) তৃতীয় রূপ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(৪) চতুর্থ রূপ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(৫) পঞ্চম রূপ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورَسُولُه

বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম গ্রহণের সময়ে এ উপরে উল্লিখিত এ সকল বাক্যের কোনো একটি পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতেন।[৫৯২]

(২) কালিমায়ে তাইয়েবা

আমাদের দেশে কালিমা তাইয়েবা বা 'পবিত্র বাক্য' বলতে বুঝানো হয় তাওহীদ ও রিসালাতের একত্রিত ঘোষণা:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

"তুমি কি দেখ নি, কিভাবে আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করেছেন: একটি 'কালিমায়ে তাইয়েবা' বা পবিত্র বাক্য একটি পবিত্র বৃক্ষের মত, তার মূল প্রতিষ্ঠিত এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে প্রসারিত।"[৫৯৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মুফাস্সির থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে 'কালিমা তাইয়েবা' বলতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তাওহীদের এ বাক্যটিকে বুঝানো হয়েছে।[৫৯৪] কিন্তু (লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) দুইটি বাক্য একত্রিতভাবে কোনো হাদীসে কালিমা তাইয়েবা হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি।

আমরা দেখেছি যে, কালিমা শাহাদাতকে অনেক সময় "শাহাদাত" শব্দ উহ্য রেখে নিম্নরূপে বলা হয়েছে:

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

কিন্তু মাঝখানে (وَأَنَّ) বাদ দিয়ে উভয় অংশ একত্রে

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

এভাবে 'কালিমা' হিসাবে সহীহ হাদীসে কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায় না। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এভাবে এ বাক্যদ্বয় একত্রে আরশের গায়ে লিখা ছিল। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এ হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট। কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর ঝাণ্ডা বা পতাকার গায়ে লিখা ছিল:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

এ অর্থের হাদীসগুলির সনদে দুর্বলতা আছে।[৫৯৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, কালিমা তাইয়িবার দুটি অংশ পৃথকভাবে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। উভয় বাক্যই কুরআনের অংশ এবং ঈমানের মূল সাক্ষ্যের প্রকাশ। উভয় বাক্যকে একত্রে বলার মধ্যে কোনো প্রকারের অসুবিধা নেই। তাবেয়ীগণের যুগ থেকেই কালিমা শাহাদতের মূল ঘোষণা হিসাবে এ বাক্যটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কুরআন কারীমে 'কালিমাতু তাকওয়া' 'তাকওয়ার বাক্য' বলা হয়েছে[৫৯৬]। এর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী আতা আল-খুরাসানী (১৩৫ হি) বলেন: কালিমায়ে তাকওয়া হলো (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)[৫৯৭]

(৩) কালিমায়ে তাওহীদ

কালিমায়ে তাওহীদ নামে আমাদের দেশে নিম্নের বাক্যটি প্রচলিত:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَاحِداً لاَ ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

এ বাক্যটির অর্থ সুন্দর। তবে এ বাক্যটির কোনোরূপ গুরুত্ব এমনকি এর কোনো প্রকারের উল্লেখ বা অস্তিত্ব কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না।

(৪) কালিমায়ে তামজীদ

কালেমায়ে তামজীদ হিসাবে নিম্নের বাক্যটি প্রচলিত:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ نُوْراً يَهْدِيْ اللهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَشَاءُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

এ বাক্যটির অর্থও সুন্দর। কিন্তু এভাবে এ বাক্যটি বলার কোনো নির্দেশনা, এর কোনো গুরুত্ব বা অস্তিত্ব কুরআন বা হাদীসে পাওয়া যায় না।

(৫) কালিমায়ে রাদ্দে কুফর

কালেমায়ে রাদ্দে কুফর নামে কয়েকটি বাক্য প্রচলিত আছে, যেমন:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً وَنُؤْمِنَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَعْلَمُ بِهِ وَمَا لاَ أَعْلَمُ بِهِ وَأَتُوْبُ وَآمَنْتُ وَأَقُوْلُ أَنْ لاَ إِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

বাক্যগুলির অর্থ ভাল। কিন্তু বাক্যগুলি এভাবে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না এবং এই বাক্যের কোনো বিশেষ গুরুত্বও

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(৬) ঈমানে মুজমাল

ইমানে মুজমাল নামে প্রচলিত বাক্যটির অর্থ সুন্দর ও সঠিক। তবে এরূপ কোনো বাক্য কোনোভাবে কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি।

(৭) ঈমানে মুফাস্‌সাল

ঈমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَن تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপরে, তাঁর ফিরিশতাগণের উপরে, তাঁর কেতাবগুলির উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে, শেষ দিবসের (আখেরাতের) উপরে, এবং তুমি ঈমান আনবে তাকদীরের উপরে: তার ভাল এবং তার মন্দের উপরে।"[৫৯৮]

ঈমানের এ ছয়টি রুকন বা স্তম্ভের কথা কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, 'ঈমানে মুফাস্‌সালের মধ্যে আখিরাতের বিশ্বাসকে পৃথক দুটি বাক্যাংশে প্রকাশ করা হয়েছে (ইয়াওমিল আখির) ও (বা'সি বা'দাল মাউত): শেষ দিবস ও মৃত্যুর পরে উত্থান। উভয় বিষয় একই।

২. ১০. সালাত বিষয়ক

২. ১০. ১. পবিত্রতা বিষয়ক

১. 'কুলুখ' ব্যবহার না করলে গোর আযাব হওয়া

প্রচলিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে: "হাদীসে আছে, যাহারা বাহ্য-প্রস্রাবের পর কুলুখ ব্যবহার না করিবে তাহাদের ন্যায় কঠিন গোর আযাব কাহারও হইবে না"[৫৯৯]

কথাটি এভাবে ঠিক নয়। এভাবে একে হাদীস বললে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে মিথ্যা বলা হবে। সম্ভবত এখানে একটি সহীহ হাদীসের অনুবাদ বিকৃত ভাবে করা হয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্র না হওয়া কবর আযাবের অন্যতম কারণ। একটি হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ

"কবরের অধিকাংশ শাস্তি পেশাব থেকে।"[৬০০]

উপরের কথাটি সম্ভবত এই হাদীসের বিকৃত অনুবাদ। এ হাদীস এবং এ অর্থের অন্য সকল হাদীসে পেশাব থেকে ভালভাবে পবিত্র হতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কোনো হাদীসেই বলা হয় নি যে, 'কুলুখ' ব্যবহার না করলে কোনো অন্যায় হবে বা শাস্তি হবে।

মূল বিষয় হলো, মলমূত্র ত্যাগের পর পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া ইসলামের অন্যতম বিধান। হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জার সময় কখনো শুধুমাত্র পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পানি ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো পাথর ও পানি দু'টিই ব্যবহার করতেন। সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই ইস্তিঞ্জা করেছেন। পানি ও পাথর (কুলুখ) উভয়ই ব্যবহার করা উত্তম। তা না হলে শুধুমাত্র পানি ব্যবহার করা ভাল। তা না হলে শুধুমাত্র পাথর বা কুলুখ ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এতেও মূল ওয়াজিব আদায় হবে এবং কোনোরূপ অপরাধ বা গোনাহ হবে না। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে বিষয়গুলি জানা যায়।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। মলমূত্র পরিত্যাগের পরে পবিত্র হওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো মলমূত্র ত্যাগের পরে বসা অবস্থাতেই পানি অথবা পাথর অথবা উভয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে ময়লা স্থানকে পরিষ্কার করা। একে আরবীতে ইসতিনজা বা ইসতিজমার বলা হয়। পবিত্রতার দ্বিতীয় পর্যায় হলো সতর্কতা বা সন্দেহমুক্ত হওয়া। এর অর্থ হলো, পেশাব শেষে ইসতিনজার পরেও উঠে দাঁড়ালে বা হাঁটতে গেলে দুই এক ফোটা পেশাব বেরিয়ে আসতে পারে বলে ভয় পেলে গলা খাঁকারি দিয়ে বা কয়েক পা হাঁটাচলা করে সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়া। আরবীতে একে 'ইসতিবরা' বলা হয়।

হাদীস শরীফে প্রথম পর্যায়ে ইসতিনজার জন্য পানি ও পাথর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে পেশাবের পরে বসা অবস্থাতেই তিনবার পুরুষাঙ্গ টান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৬০১] এ ছাড়া আর কোনো বিষয় হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ইস্তিঞ্জার সময় পাথর বা 'কুলুখ' ব্যবহার করতে গিয়ে কখনো উঠে দাঁড়াননি, হাঁটাচলা, লাফালাফি, গলাখাকারি ইত্যাদি কিছুই করেননি। পেশাব ও পায়খানা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বসা অবস্থাতেই পাথর বা পানি, অথবা প্রথমে পাথর এবং তারপর পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছেন।

পরবর্তী যুগের আলিমগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য এরূপ হাঁটা চলার বিধান দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের তবিয়ত বিভিন্ন প্রকারের। যদি কারো একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে বা দুই এক পা হেঁটে, গলাখাকারি দিয়ে বা এধরনের কোনো কাজের মাধ্যমে তারা 'পেশাব একদম শেষ হয়েছে' –এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। আর যার মনে হবে যে, বসা অবস্থাতেই

সে পরিপূর্ণ পাক হয়ে গিয়েছে তার জন্য সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[৬০২]

কাজেই কুলুখ করা বলতে যদি আমরা 'কুলুখ নিয়ে হাঁটাচলা করা' বুঝি, অথবা দাবি করি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এইরূপ হাঁটাচলা করেছেন বা করতে বলেছেন তাহলে তাঁর নামে মিথ্যা দাবি করা হবে।

২. বেলালের ফযীলতে কুলুখের উল্লেখ

প্রচলিত একটি বইয়ে রয়েছে: "হযরত (ﷺ) একদিন বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বিলাল! আমি মিরাজের রাত্রিতে বেহেস্তের মধ্যে তোমার পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। বলত এরূপ পুণ্যের কোন্ কাজ তোমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে? তদুত্তোরে বিলাল (রা) বলিলেন, **আমি বাহ্য-প্রসাবের পর কুলুখ ব্যবহার করি,** পবিত্রতার দিকে লক্ষ রাখি ও সদা সর্বদা অজুর সহিত থাকি। হুজুর (ﷺ) বলিলেন ইহাইতো সকল নেক কাজের মূল।"[৬০৩]

বিভিন্ন হাদীসে বেলালের এই মর্যাদার বিষয়ে তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: ওযু করলেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করা, আযান দিলেই দুই রাক'আত সালাত আদায় করা এবং ওযু ভাঙ্গলেই ওযু করা। প্রথম বিষয়টি বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি ইবনু খুযাইমা, হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলিত একটি হাদীসে রয়েছে।[৬০৪] কুলুখের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায় না।

এখানে লক্ষণীয় যে, সাহাবীগণ সকলেই মল-মূত্র পরিত্যাগের পরে কুলুখ ব্যবহার করতেন। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে পানি ব্যবহার করার বা পানি ও কুলুখ উভয়ই ব্যবহার করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৩. খোলা স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করা

প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হাদীসে আছে যারা খোলা জায়গায় বসিয়া বাহ্য-প্রসাব করিবে, ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে বদদোয়া করিতে থাকিবেন"।[৬০৫]

কথাটি এভাবে সঠিক নয়। খোলা বলতে মাথার উপরে খোলা বা চারিপার্শে খোলা কোনো স্থানে মলমুত্র পরিত্যাগ করলে এইরূপ বদদোয়ার কথা কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে বলে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও জানতে পারি নি। মলমুত্র ত্যাগের সময় সতর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত রাখা জরুরী। অন্য মানুষকে সতর দেখিয়ে মলমুত্র ত্যাগ করতে, মলমুত্র ত্যাগের সময় কথা বলতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। এ ছাড়া মানুষের রাস্তায়, মানুষের পানির ঘাটে বা পুকুরে এবং মানুষের ব্যবহারের ছায়ায় মলত্যাগকে হাদীস শরীফে অভিশাপের বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০৬]

৪. ফরয গোসলে দেরি করা

গোসল ফরয হলে তা দেরি করলে পাপ হবে বা সেই অবস্থায় মাটির উপর হাঁটলে মাটি অভিশাপ দিবে ইত্যাদি সকল কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

গোসল ফরয হলে তা যথাসম্ভব দ্রুত সেরে নেওয়া উত্তম। তবে গোসলের মূল প্রয়োজন সালাত আদায় বা কুরআন পাঠের জন্য। এছাড়া মুমিন গোসল ফরয থাকা অবস্থায় সকল কর্ম, যিক্‌র ও দোয়া করতে পারেন। কাজেই নামাযের ক্ষতি না হলে গোসল দেরি করলে গোনাহ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক সময় প্রথম রাত্রিতে গোসল ফরয হলেও গোসল না করে শুয়ে পড়তেন এবং শেষ রাত্রিতে গোসল করতেন বলে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৬০৭]

৫. শবে বরাত বা শবে কদরের গোসল

এ দু রাতে গোসল করার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা সবই বানোয়াট। এ দু রাত্রিতে গোসলের ফযীলতে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। পরর্বতীতে এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলি উল্লেখ করার আশা রাখি।

৬. ওযু, গোসল ইত্যাদির নিয়্যাত

নিয়্যাত নামে 'নাওয়াইতু আন...' বলে যা কিছু প্রচলিত আছে সবই পরবর্তী যুগের আলিমদের বানানো কথা। এগুলিকে হাদীস মনে করলে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ নিয়্যাত পাঠ করেছেন বা এভাবে নিয়্যত করতে বলেছেন বলে মনে করলে বা দাবি করলে তা ভিত্তিহীন মিথ্যা দাবি হবে।

নিয়্যাত অর্থ উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা (inteneion)। উদ্দেশ্যের উপরেই ইবাদতের সাওয়াব নির্ভর করে। নিয়্যাত মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরীণ সংকল্প বা ইচ্ছা, যা মানুষকে উক্ত কর্মে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে। নিয়্যাত করতে হয়, বলতে বা পড়তে হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, নামায, রোযা ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেননি। তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-সহ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম ও ফকীহ কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেননি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেননি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম এগুলি বানিয়েছেন। তাঁরাও বলেছেন যে, মনের মধ্যে উপস্থিত নিয়্যাতই মূল, তবে এগুলি মুখে উচ্চারণ করলে মনের নিয়্যাত একটু দৃঢ় হয়। এজন্য এগুলি বলা ভালো। তাঁদের এ ভালোকে অনেকেই স্বীকার করেননি।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওযু, নামায, রোযা ইত্যাদি যে কোনো ইবাদতের জন্য মুখে নিয়্যাত করাকে খারাপ বিদ'আত হিসাবে নিন্দা করেছেন এবং কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। আমি **"এহ্ইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৬০৮]

৭. ওযুর আগের দোয়া

আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে ওযুর পূর্বে পাঠ করার জন্য নিম্নের দোয়াটি শেখানো হয়েছে[৬০৯]:

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى دِيْنِ الإِسْلاَمِ، الإِسْلاَمُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ وَالإِسْلاَمُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

এ দোয়াটি বানোয়াট। বিভিন্ন হাদীসে ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে 'বিসমিল্লাহ ওয়া আল-হামদু লিল্লাহ' (আল্লাহর নামে ও প্রশংসা আল্লাহ নিমিত্ত) বলার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে উপরের দোয়াটির কথা কোনো হাদীসে আছে বলে জানা যায় না।

৮. ওযুর ভিতরের দোয়া

বিভিন্ন পুস্তকে ওযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় পাঠের জন্য বিশেষ দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাত ধোয়ার দোয়া, কুল্লি করার দোয়া, নাক পরিষ্কার করার দোয়া ... ইত্যাদি। এই দোয়ার ভিত্তি যে হাদীসটির উপরে সেই হাদীসটি বানোয়াট। ইমাম দারাকুতনী, ইমাম নববী, ইমাম সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সকলেই হাদীসটিকে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৬১০]

৯. ওযুর সময়ে কথা না বলা

ওযুর সময়ে কথা বলা যাবে না, বা কথা বললে কোনোরূপ অন্যায় হবে এ মর্মে কোনো হাদীস নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা কোনো কোনো আলিমের কথা মাত্র।

১০. ওযুর পরে সূরা 'কাদ্‌র' পাঠ করা

সহীহ হাদীসে ওযুর পরে পাঠ করার জন্য একাধিক দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থে আমি দোয়াগুলি সনদ সহ আলোচনা করেছি। আমাদের দেশে অনেক পুস্তকে এ সকল সহীহ দোয়ার বদলে কিছু বানোয়াট কথা লেখা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে লেখা আছে: "অজু করিবার পর ছুরা ক্বদর পাঠ করিলে সিদ্দীকের দরজা হাছিল হইবে। (হাদীছ)"[৬১১]। 'আলীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওসীয়ত' নামক জাল হাদীসটিতে এইরূপ কিছু কথার উল্লেখ আছে। ওসীয়তটির বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ১০. ২. মসজিদ ও আযান বিষয়ক

১. মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো, সালাত আদায় করা, আল্লাহর যিকির করা, দ্বীনের আলোচনা করা ইত্যাদি। মসজিদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

"এগুলিতো শুধু আল্লাহর যিক্‌র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য"[৬১২]

মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং হারানো বা পলাতক কিছু খোঁজ করতে, উচ্চস্বরে কথা বলতে বা চিৎকার করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।[৬১৩] এ ছাড়া সাধারণ জাগতিক কথাবার্তা বলার কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ মসজিদের মধ্যেই কবিতা পাঠ করতেন, জাহিলী যুগের গল্প-কাহিনীন আলোচনা করতেন। জাবির (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ وَيَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে স্থানে ফজরের সালাত আদায় করতেন সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠতেন। তাঁর বসা অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম কথাবার্তা বলতেন, জাহেলী যুগের কথা আলোচনা করতেন, কবিতা পাঠ করতেন এবং হাসতেন। আর তিনি শুধু মুচকি হাসতেন।"[৬১৪]

আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি জাল হাদীসে মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়ার কথা' বলার কঠিন নিন্দা করা হয়েছে। একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمِ الدُّنْيَا فِيْ الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً

"যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে 'দুনিয়াবী কথা' বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বৎসরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দিবেন।" আল্লামা সাগানী, তাহের ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস একবাক্যে হাদীসটিকে জাল বলেছেন। মোল্লা কারী বলেন: "এই কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল, তেমনি এর অর্থও বাতিল বা ইসলাম বিরোধী।"[৬১৫]

অনুরূপ আরেকটি জাল ও বানোয়াট কথা:

اَلْحَدِيْثُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيْمَةُ الْحَشِيْشَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ পশু ঘাস-খড় খায়।"

একই অর্থে আরেকটি জাল ও ভিত্তিহীন কথা

اَلْكَلاَمُ فِيْ الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

"মসজিদে কথাবার্তা নেক আমল খায়, যেরূপ আগুন কাঠ খায়।"

কোনো কোনো প্রসিদ্ধ আলিম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এই বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইরাকী, ফাইরোযআবাদী, তাহের ফাতানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একমত যে, এই বাক্যটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি কথা যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বলা হয়েছে।[৬১৬]

২. মসজিদে বাতি জ্বালানো ও ঝাড়ু দেওয়া

মসজিদ পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি সাধারণভাবে নেক কর্ম। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও বিশেষ পুরস্কারের নামে কিছু জাল হাদীস বানানো হয়েছে। মসজিদে বাতি জ্বালালে এত এত সাওয়াব, বা এত হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করবে, এত হজ্জ বা এত উমরার সাওয়াব মিলবে... ইত্যাদি সকল কথা বানোয়াট।[৬১৭]

৩. আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চোখে বুলানো

আমাদের দেশে অনেক ধার্মিক মুসলমান আযানের সময় "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি শুনলে দুই হাতের আঙুলে চুমু খেয়ে তা দিয়ে চোখ মুছেন। এই মর্মে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসকে সত্য মনে করেই তাঁরা এই কাজ করেন।

এ বানোয়াট হাদীসটি বিভিন্ন ভাবে প্রচারিত। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আযানের এ বাক্যটি শুনে নিজে মুখে বলবে:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে", আর এ কথা বলার সাথে দু হাতের শাহাদত আঙ্গুলের ভিতরের দিক দিয়ে তার দু চক্ষু মুছবে তার জন্য শাফায়াত পাওনা হবে।

কেউ কেউ বলেন: আযানের এই বাক্যটি শুনলে মুখে বলবে:

مَرْحَباً بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

"মারহাবা! আমার প্রিয়তম ও আমার চোখের শান্তি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহকে", এরপর তার বৃদ্ধাঙ্গলিদ্বয়কে চুমু খাবে এবং উভয়কে তার দু চোখের উপর রাখবে। যদি কেউ এরূপ করে তবে কখনো তার চোখ উঠবে না বা চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে না।

এ জাতীয় সকল কথাই বানোয়াট। কেউ কেউ এ সকল কথা আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, "আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণনা প্রমাণিত হলে তা আমল করার জন্য যথেষ্ট হবে।" তবে হাদীসটি আবু বাকর (রা) থেকেও প্রমাণিত নয়। ইমাম সাখাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের অন্যতম হানাফী ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সুফী আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ লিখেছেন, তাঁর উস্তাদ ও প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাওসারীর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মুল্লা আলী কারী এ বিষয়ে ইমাম সাখাবীর বিস্তারিত আলোচনা জানতে পারেন নি। ফলে তার মনে দ্বিধা ছিল। প্রকৃত বিষয় হলো, হযরত আবু বাকর (রা) বা অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটির কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় নি। মুহাদ্দিসগণ একমত হয়েছেন যে, এ বিষয়ক সকল বর্ণনা বানোয়াট।[৬১৮]

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

প্রথমত, রোগমুক্তি, সুস্থতা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন 'আমল' অনেক সময় অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণ করা হয়। এজন্য এই প্রকারের 'আমল' করে ফল পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, এগুলি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কেউ রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে কোনো শরীয়ত

সম্মত আমল করতে পারেন। তবে বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া এইরূপ 'আমল'-কে হাদীস বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মহব্বত করা ঈমানের অংশ ও অত্যন্ত বড় নেককর্ম। যদি কেউ এই জাল হাদীসটির জালিয়াতি অবগত না হওয়ার কারণে এর উপর আমল করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম শুনে হৃদয়ে মহব্বত ও ভালবাসা নিয়ে এভাবে আঙুলে চুমু খান, তবে তিনি এই জাল হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব না পেলেও, মূল মহব্বতের সাওয়াব পাবেন, ইনশা আল্লাহ। তবে জেনেশুনে জাল হাদীসের উপর আমল করা জায়েয নয়।

তৃতীয়ত, এই জাল হাদীসের পরিবর্তে মুমিন একটি সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে পারেন। দু হাতের আঙ্গুল দিয়ে চোখ মুছার বিষয়টি বানোয়াট হলেও উপরের বাক্যগুলি মুখে বলার বিষয়ে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ মুআযযিনকে শুনে বলে:

أَشْهَدُ (وَأَنَا أَشْهَدُ) أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا

"এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আছি আল্লাহকে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি কেউ এভাবে উপরের বাক্যগুলি বলে, তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[৬১৯]

৪. আযানের জাওয়াবে 'সাদাকতা ও বারিরতা'

ফজরের আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' শুনলে উত্তরে বলা হয়: "সাদাকতা ও বারিরতা (বারারতা)'। এ কথাটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মুয়াযযিনকে যখন আযান দিতে শুনবে তখন মুয়াযযিন যা যা বলবে তোমরা তাই বলবে।"[৬২০] অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম। তখন বিলাল দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। বিলাল আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এ ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬২১]

উপরের হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, আযান শ্রবণকারী তাই বলবেন। কোনো ব্যতিক্রম বলতে বলা হয়নি। তবে মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলো, মুয়াযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে, শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন: "এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৬২২]

তাহলে, উপরের দুটি বাক্য ছাড়া বাকি সকল বাক্য মুয়ায্যিন যেভাবে বলবেন, 'জওয়াব দানকারীও' ঠিক সেভাবেই বলবেন। 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বাক্যটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এর জওয়াবেও এ বাক্যটিই বলতে হবে। এ বাক্যটির জন্য ব্যতিক্রম কিছু বলতে হবে তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। এজন্য মুল্লা আলী কারী "সাদাকতা ওয়া বারিরতা" বাক্যটিকে জাল হাদীসের তালিকাভুক্ত করে বলেছেন: "শাফেয়ী মযহাবের লোকেরা এ বাক্যটি বলা মুস্তাহাব বলেছেন, তবে হাদীসে এর কোন অস্তিত্ব নেই।"[৬২৩]

৫. আযানের দোয়ার মধ্যে 'ওয়াদ দারাজাতার রাফীয়াহ'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে ; কারণ 'ওসীলা' হলো জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।"[৬২৪]

অন্যান্য হাদীসে তিনি 'ওসীলা' প্রার্থনার নিম্নরূপ পদ্ধতি শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوْداً (الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ) الَّذِي وَعَدْتَهُ

"হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আসন্ন সালাতের প্রতিপালক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদকে (ﷺ) ওসীলা এবং মহামর্যাদা এবং তাঁকে উঠান সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।"

তিনি বলেছেন, "মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি উপরের বাক্যগুলি বলবে, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে।"[৬২৫]

ইমাম বুখারীসহ সকল মুহাদ্দিস এভাবেই দোয়াটি সংকলন করেছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত আযানের দোয়ার মধ্যে দুটি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে, যা উপরের দোয়াটিতে নেই। প্রথম বাক্যটিতে (**والفضيلة** : ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে '**والدرجة الرفيعة**'(এবং সুউচ্চ মর্যাদা) বলা এবং দ্বিতীয় বাক্যটি দোয়ার শেষে : '**إنك لا تخلف الميعاد**' (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা। দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৬২৬] আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হাদীস নির্ভর। ইবনু হাজার, সাখাবী, যারকানী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এই বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াহ) বানোয়াট।[৬২৭]

৬. আযানের দুআয়: "ওয়ারযুকনা শাফাআতাহু"

কেউ কেউ আযানের দুআর মধ্যে আরেকটি বাক্য সংযোজন করে বলেন: (وارزقنا شفاعته): "এবং আমাদেরকে তাঁর শাফাআত রিযক দান করুন/ প্রদান করুন"। এ বাক্যটিও একেবারে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদেও আযানের দুআর মধ্যে এ বাক্যটি বর্ণিত হয় নি। আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফাআতের রিযক লাভের জন্য দুআ করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তবে দুটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়।

প্রথমত: মাসনূন দুআর মধ্যে অতিরিক্ত কোনো শব্দ বা বাক্য সংযোজন বা পরিবর্তন হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে এবং সাহাবীগণ এরূপ কর্মের প্রতিবাদ করতেন। **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত কখন কোন্ দুআ করলে আল্লাহ সবচেয়ে খুশি হন এবং মুমিনের সবচেয়ে বেশি লাভ হয় তা সবচেয়ে ভাল জানতেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। কাজেই তাঁর শেখানো কোনো দুআর মধ্যে পরিবর্তন বা সংযোজনের অর্থ হলো তাঁর দুআটিকে অসম্পূর্ণ বলে ধারণা করা বা মাসনূন দুআতে পরিপূর্ণ ফযীলত, বরকত বা কামালাত লাভ হলো না বলে কল্পনা করা। এতে সুন্নাতকে অপছন্দ করা হয় ও বিদআতের উৎপত্তি হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: (مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ): যে আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে বা অসম্পূর্ণ মনে করবে সে আমার সাথে সম্পর্কিত নয়।"[৬২৮]

দ্বিতীয়ত, আযানের দুআয় শাফাআত প্রার্থনা সংযোজন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতিশ্রুতিতে অনাস্থা প্রমাণ করে। কারণ তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর শেখানো বাক্যে তাঁর জন্য "ওয়াসীলা" প্রার্থনা করবে তাঁর শাফাআত তার জন্য ওয়াজিব হবে। কাজেই মুমিন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মাসনূন দুআ পাঠ করে দৃঢ় আশা করবেন যে, তাঁর জন্য শাফাআত পাওনা হলো।

৭. আযানের সময় কথা বলার ভয়াবহ পরিণতি!

আযানের সময় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা বুঝাতে এ 'হাদীসটি' বলা হয়:

مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الإِيْمَانِ

যে ব্যক্তি আযানের সময় কথা বলবে, তার ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ভয় আছে।

আল্লামা সাগানী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, বাক্যটি হাদীসের নামে বানানো ভিত্তিহীন জাল কথা। আযানের সময় কথা বলা যাবে না মর্মে কোনো নির্দেশনা হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৬২৯]

২. ১০. ৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বিষয়ক

১. সালাতের ৫ প্রকার ফযীলত ও ১৫ প্রকার শাস্তি

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাত যথাসময়ে আদায় করা মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। সালাতই মুমিনের পরিচয় এবং ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য। সালাত পরিত্যাগকারী 'কাফিরদের দলভুক্ত' বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতেরই হিসাব গ্রহণ করা হবে। এভাবে অগণিত সহীহ হাদীস থেকে আমার ফরয সালাতের গুরুত্ব ও সালাতে অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি জানতে পারি।

কিন্তু সাধারণ মানুষদের অবাক করার জন্য জালিয়াতগণ এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, সমাজে প্রচলিত অনেক গ্রন্থেই কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিবর্তে এই সকল বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথাগুলি লেখা হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের ক্যালেণ্ডার, পোস্টার ইত্যাদিতেও এই সকল বানোয়াট কথাগুলি লিখে প্রচার করা হয়। এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ জাল হাদীস আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। এই জাল হাদীসটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

যে ব্যক্তি যথারীতি ও গুরুত্ব সহকারে নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক তাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করবেন: রুজী রোজগার ও জীবনের সংকীর্ণতা হতে তাকে মুক্ত করবেন, তার উপর হতে কবরের আযাব উঠিয়ে দিবেন, কিয়ামতের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দান করবেন, সে ব্যক্তি পুলছেরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত পার হয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে সে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার

দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময় তিন প্রকার কবরে এবং তিন প্রকার কবর হতে বের হওয়ার পর। এ পনের বা চৌদ্দ প্রকারের শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রায় সকল প্রচলিত নামায শিক্ষা, আমলিয়াত ইত্যাদি বইয়ে পাওয়া যায়। এজন্য এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাগুলি লিখে বইয়ের কলেবর বাড়াচ্ছি না।

এই দীর্ঘ হাদীসটি পুরোটিই ভিত্তিহীন ও জাল। কোনো হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম তাদের ওয়ায নসীহত মূলক গ্রন্থে অন্য সকল প্রচলিত কথার সাথে এই কথাগুলিও হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ইমামগণ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, এই কথাগুলি বাতিল ও জাল কথা। কোন্ ব্যক্তি এই জালিয়াতি করেছে তাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, সয়ূতী, ইবনু ইরাক প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৬৩০]

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী (রাহ) তার 'ফাযায়েলে নামায' গ্রন্থে এ জাল হাদীসটি আরবী ইবারত-সহ পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীসটি উল্লেখ করার আগে বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, এ কথাটি নাকি হাদীসে আছে.... । হাদীসটি উল্লেখ করার পরে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, ইমাম যাহাবী, ইমাম সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটি জাল ও বাতিল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এর সনদের জালিয়াতদের পরিচয়ও তাঁরা তুলে ধরেছেন।[৬৩১]

এভাবে আল্লামা যাকারিয়া (রাহ) হাদীসটির জালিয়াতির বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁর আমানত আদায় করেছেন। কিন্তু অনুবাদে এই আমানত রক্ষা করা হয় নি। আল্লামা যাকারিয়া (রাহ) -এর এই আলোচনা অনুবাদে উল্লেখ করা হয় নি। অনুবাদের শুরুতে বলা হয়েছে: "এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে.." । শেষে শুধুমাত্র লেখা হয়েছে 'যাওয়াজির ইবন হাজার মাক্কী (রাহ)' । এতে সাধারণ পাঠক একে নির্ভরযোগ্য হাদীস বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (ﷺ)-এর কথা বলেই বিশ্বাস করছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কোনো জাল হাদীসকে 'জাল' বলে উল্লেখ না করে 'হাদীস' বলে বর্ণনা করা কঠিন হারাম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

২. সালাত মুমিনদের মি'রাজ

একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন সনদহীন জাল হাদীস

اَلصَّلاَةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায মুমিনদের মিরাজ।"[৬৩২]

এখানে লক্ষণীয় যে, এ অর্থের কাছাকাছি অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। মুমিন সালাতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করেন, সালাতে দাঁড়ালে আল্লাহ মুমিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন... ইত্যাদি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এগুলির পরিবর্তে অনেকে এই ভিত্তিহীন কথাটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বলে তাঁর নামে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হয়ে যান।

৩. ৮০ হুক্বা বা ১ হুকবা শাস্তি

"মাজালিসুল আবরার নামক কেতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই লোক সময়মত নামায পড়িল না, নামাযের ওয়াক্ত শেষ হইবার পরে কাযা পড়িল, সেই লোকও জাহান্নামে ৮০ হুকবা শাস্তি ভোগ করিবে। ৮০ বৎসরে এক হুকবা আর ৩৬০ দিনে এক বৎসর। ৩৬০ * ৮০ = ২৮,৮০০ দিন। অতএব তাকে ২৮,৮০০ দিন এক ওয়াক্ত নামায না পড়িবার জন্য দোজখের আগুনে জ্বলিতে হইবে। আর আখেরাতের দিন হইবে দুনিয়ার এক সহস্র বৎসরের তুল্য। এই হিসাবে এক ওয়াক্ত নামায তরককারীকে দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর জাহান্নামের আগুনে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"[৬৩৩]

শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধালভী (রাহ) এই হাদীসটিকে তার 'ফাযায়েলে নামায গ্রন্থে নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضَى عُذِّبَ فِيْ النَّارِ حُقْباً، وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، وَالسَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْماً، كُلُّ يَوْمٍ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ.

"যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করল না, এবং এরপর সে কাযা করল, তাকে জাহান্নামে এক হুক্বা শাস্তি প্রদান করা হবে। এক হুকবা ৮০ বৎসর এবং এক বৎসর ৩৬০ দিন এবং প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বৎসরের সমান।"

হাদীসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন:

كذا في مجالس الأبرار. قلت: لم أجده فيما عندي من كتب الحديث ...

"মাজালিসুল আবরার নামক গ্রন্থে এভাবে লিখা হয়েছে। আমার বক্তব্য হলো, আমার নিকটে যত হাদীসের পুস্তক রয়েছে সেগুলির কোনো পুস্তকেই আমি এ হাদীসটি দেখতে পাই নি।..."[৬৩৪]

আর তাঁর মত একজন মুহাদ্দিস যে হাদীস কোনো হাদীসের গ্রন্থে খুঁজে পান নি সেই হাদীসের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বস্তুত, হাদীসটি ভিত্তিহীন ও সনদহীন একটি বানোয়াট কথামাত্র। কোথাও কোনো প্রকার সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সনদেও এই কথাটি সংকলিত হয়নি। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে শেষ যুগের কোনো কোনো আলিম তা নিজ গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে সংকলন

করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ কথাটি যে কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই এবং 'মাজালিসুল আবরার'-এর লেখক সনদবিহীনভাবে তা উল্লেখ করেছেন, তা জানা সত্ত্বেও অনেক ভাল আলিম ওয়াযে-আলোচনায় এবং লিখনিতে এ 'হাদীস' ও অনুরূপ অনেক জাল ও দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেন। মানুষের হেদায়েতের আগ্রহেই তাঁরা তা করেন। মনে হয়, তাঁরা চিন্তা করেন, কুরআন কারীমের হাজার হাজার আয়াত এবং প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হাজার হাজার সহীহ হাদীস মানুষদের হেদায়াত করতে আর সক্ষম নয়। কাজেই এগুলির পাশাপাশি কিছু দুর্বল (!) হাদীসও আমাদের না বলে উপায় নেই!! অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, জাল বলে সন্দেহকৃত হাদীস উল্লেখ করাও হাদীস জালিয়াতির মতই কঠিনতম পাপ। আমরা কি অন্যের হেদায়তের আগ্রহে নিজেদের জন্য জাহান্নাম ক্রয় করব?!

৪. জামাতে সালাত আদায়ে নবীগণের সাথে হজ্জ

জামাতে সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কুরআনে মুমিনগণকে একত্রে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগণিত সহীহ হাদীসে জামাতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামাত ছেড়ে একা সালাত আদায়কারীকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আযান শোনার পরেও যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা ভয়ের ওযর ছাড়া জামাতে না এসে একা সালাত আদায় করবে তার সালাত কবুল হবে না বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

'জামাতে সালাত আদায়ের' বিধান সম্পর্কে ফিকহী পরিভাষাগত মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কেউ বলেছেন ওয়াজিব ও কেউ বলেছেন ফরয। এই মতভেদ একান্তই পরিভাষাগত। কারণ সকলেই একমত যে, পুরুষের জন্য ওযর ছাড়া ফরয সালাত একা আদায় করলে কঠিন গোনাহ হবে। সালাত হবে কি না সে বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে।

এ সকল সহীহ হাদীসের পাশাপাশি জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস তৈরি করেছে। আর এ বিষয়েও সহীহ হাদীসগুলি বাদ দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব জাল হাদীসই বই পুস্তকে লেখা হয় ও ওয়াযে বলা হয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে সারারাত্র তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের সাওয়াব হবে, ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে আল্লাহর দায়িত্বে থাকা যাবে ... ইত্যাদি। কিন্ত এ সকল 'সামান্য' সাওয়াবের কথায় মন না ভরায় জালিয়াতগন বানিয়েছে:

مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا حَجَّ مَعَ آدَمَ خَمْسِيْنَ حَجَّةً..

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করল সে যেন আদম (আ) এর সাথে ৭০ বার হজ্জ করল ...।" এভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তের সাথে একজন নবীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে...।[৬৩৫]

অনুরূপ বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: যে ব্যক্তি ফজর ও ইশার সালাত জামাতে আদায় করল, সে যেন আদমের (আ) পিছনে সালাত আদায় করল...। এভাবে এক এক সালাতের জন্য এক এক নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে...।[৬৩৬]

৫. মুত্তাকি আলিমের পিছনে সালাত নবীর পিছনে সালাত

জামাতে সালাত আদায়ের কারণে সাওয়াব বৃদ্ধির কথা সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। বিভিন্ন হাদীসে কুরআনের তিলাওয়াত ও জ্ঞানে পারদর্শী, হাদীসের জ্ঞানে পারদর্শী, হিজরত ও অন্যান্য নেক আমলে অগ্রবর্তী ব্যক্তিগণকে ইমামতি প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ইমামের 'তাকওয়া' বা 'ইলমের' কারণে মুক্তাদিগণের 'সাওয়াব' বা 'বরকত' বেশি হবে, এইরূপ অর্থে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এই অর্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই অত্যন্ত যয়ীফ অথবা বানোয়াট। এইরূপ একটি ভিত্তিহীন কথা:

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ

"যে ব্যক্তি কোনো মুত্তাকি আলিমের পিছনে সালাত আদায় করল, সে যেন একজন নবীর পিছনে সালাত আদায় করল।"

ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'-র প্রণেতা আল্লামা আলী ইবনু আবী বাক্র মারগীনানী (৫৯২ হি) জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এই কথাটিকে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই কথাটি কোনো হাদীস নয়। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে তা কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এজন্য আল্লমা যাইলায়ী, ইরাকী, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, সাখাবী, তাহের ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, আজলূনী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই কথাটিকে জাল হাদীস হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছেন।[৬৩৭]

৬. আলিমের পিছনে সালাত ৪৪৪০ গুণ সাওয়াব

এই জাতীয় আরেকটি বানোয়াট কথা হলো,

اَلصَّلاَةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ صَلاَةً

'আলিমের পিছনে সালাতে ৪৪৪০ গুণ সাওয়াব।'[৬৩৮]

৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাক'আত সংখ্যার কারণ

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাক'আত সংখ্যা ১৭ হলো কেন, ফজর ২ রাক'আত, যুহর ৪ রাক'আত, আসর ৪ রাক'আত, মাগরিব

৩ রাক'আত ও ইশা ৪ রাক'আত হলো কেন, বিত্র ৩ রাক'আত হলো কেন, ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সকল কথাই ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ওয়াক্তের সালাতকে বিভিন্ন নবীর আদায় করা বা প্রতিষ্ঠিত বলে যে সকল গল্প বলা হয় সবই ভিত্তিহীন। এ জাতীয় অনেক ভিত্তিহীন কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত। এখানে একটি গল্প উল্লেখ করছি।

আমাদের দেশে অতি প্রসিদ্ধ কোনো কোনো পুস্তকে লেখা হয়েছে: "বেতের নামায ওয়াজিব হইবার কারণ এই যে, এরশাদুত্বালেবীন কিতাবে লিখিত আছে হযরত (ﷺ) মেরাজ শরীফে যাইবার সময়ে যখন বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়াছিলেন তখন সমস্ত পয়গম্বরের রুহ মোবারক হযরত (ﷺ)-এর সাক্ষাত ও আশীর্বাদের জন্য আসিলে জিব্রাইল (আ) এর আদেশানুযায়ী হযরত (ﷺ) ইমাম হইয়া এক রাকাত নামায পড়িলেন। তার পর মিকাইল (আ) ৭০ হাজার ফেরেশতা লইয়া হযরত (ﷺ)-এর মোলাকাত ও দোয়ার প্রত্যাশী হইলে জিব্রাইল (আ)-এর আদেশ অনুযায়ী রাসূল (ﷺ) পূনরায় আরও এক রাকাত নামায পড়িলেন। ইহার পর ইস্রাফীল (আ) ৭০ হাজার ফেরেশতা লইয়া হযরত (ﷺ)-এর দোওয়ার প্রত্যাশী হইলে জিব্রাইল (আ)-এর হুকুম অনুযায়ী আবার হযরত (ﷺ) তাহাদিগকে মুক্তাদি করিয়া এক রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর আজরাঈল (আ) বহু ফেরেশতা লইয়া এরূপ বাসনা করিয়া উপস্থিত হইলে জিব্রাইল (আ) বলিলেন, হে প্রিয় পয়গম্বর আপনি ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দোওয়া কুনুত পাঠ করান। হযরত (ﷺ) তাহাই করিলেন সুতারং ঐ তিন রাকাত নামাযই আমাদের উপর ওয়াজিব হইয়াছে এবং বেতের নামাযে দোওয়া কুনূত পড়াও ওয়াজেব হইয়াছে।"[৬৩৯]

কোনো কোনো জালিয়াত ঘুরিয়ে বলেছে যে, তিনি মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ) এর জন্য এক রাক'আত, তাঁর নিজের জন্য আরেক রাক'আত এবং শেষে আল্লাহর নির্দেশে তৃতীয় রাক'আত সালাত আদায় করেন। ...[৬৪০]

৮. উমরী কাযা

সালাত মুমিনের জীবনের এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই বা কাফ্ফারা নেই। যতক্ষণ হুশ বা চেতনা থাকবে সালাত আদায় করতেই হবে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, দৌড়িয়ে, হেঁটে, ইশারায় বা যেভাবে সম্ভব সালাত আদায় করতে হবে। চেতনা রহিত হলে সালাত মাফ হয়ে যাবে।

কোনো বিশেষ কারণে একান্ত বাধ্য হয়ে দুই এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে গেলে কাযা করতে হবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ওয়াক্তের সালাতের কাযা করার কোনোরূপ বিধান হাদীস শরীফে দেওয়া হয় নি। কারণ, কোনো মুসলিম সালাত পরিত্যাগ করতে পারে, এইরূপ চিন্তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না। সাহাবীগণ বলতেন, একজন মুসলিম অনেক পাপ করতে পারে, কিন্তু মুসলিম কখনো সালাত পরিত্যাগ করতে পারে না।

পরবর্তী যুগের মুসলিম ফকীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করলে সে ব্যক্তি কাফির বা অমুসলিমে পরিণত হবে। কেউ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি 'সালাতের' গুরুত্ব পুরোপুরি স্বীকার করেন, কিন্তু অলসতা হেতু সালাত ত্যাগ করেছেন, তিনি 'কাফিরের মত' কঠিন পাপী বলে গণ্য হবেন, কিন্তু 'কাফির' বা অমুসলিম বলে গণ্য হবেন না। আর যদি কেউ মনে করেন যে, ৫ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় না করেও তিনি নামাযী মুসলমানদের মতই মুসলমান, তাহলে সেই ব্যক্তি সালাতের গুরুত্ব অস্বীকার করার কারণে প্রকৃত কাফির বলে গণ্য হবেন।

সর্বাবস্থায় সকলেই একমত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ সময়ের সালাত পরিত্যাগ করলে পরে সে সালাতের 'কাযা' করার বিষয়ে হাদীসে কোনোরূপ বিধান দেওয়া হয় নি। তবে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু জাল হাদীস তৈরি করেছে। এছাড়া সমাজে কিছু প্রচলিত ভিত্তিহীন কথাবার্তাও এ বিষয়ে প্রচলিত আছে। দুইটি ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। প্রথমত, উমরী কাযা ও দ্বিতীয়ত, কাফ্ফারা বা এস্কাত। এ বিষয়ে জালিয়াতদের বানানো একটি হাদীস:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ تَرَكْتُ الصَّلاَةَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَاقْضِ مَا تَرَكْتَ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ أَقْضِيْ؟ فَقَالَ: صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً مِثْلَهَا، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَبْلُ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ بَلْ قَبْلُ

"এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি সালাত পরিত্যাগ করেছি। তিনি বলেন, তুমি যা পরিত্যাগ করেছ তা 'কাযা' কর। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কিভাবে তা 'কাযা' করব? তিনি বলেন, প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতের সাথে অনুরূপ সালাত আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আগে, না পরে? তিনি বলেন, না, বরং আগে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এই হাদীসটি জাল, ভিত্তিহীন ও বাতিল।[৬৪১] যদি কোনো মুসলমান দীর্ঘদিন সালাতে অবহেলার পরে অনুতপ্ত হয়ে নিয়মিত সালাত শুরু করেন, তখন তার প্রধান দায়িত্ব হবে বিগত দিনগুলির পরিত্যক্ত সালাতের জন্য বেশি বেশি করে কাঁদাকটি ও তাওবা করা। এর পাশাপাশি, অনেক ফকীহ বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পরিত্যক্ত সালাতগুলি নির্ধারণ করে তা 'কাযা' করবেন। এভাবে 'উমরী কাযা' করার কোনো নির্ধারিত বিধান কুরআন বা হাদীসে নেই। এ হলো সাবধানতামূলক কর্ম। আশা করা যায় যে, তাওবা ও কাযার মাধ্যমে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

৯. কাফ্ফারা ও এস্কাত

ইসলামে সিয়াম বা রোযার জন্য কাফ্ফারার বিধান রয়েছে। কোনো মুসলিম অপারগতার কারণে সিয়াম পালন করতে না পারলে এবং কাযার ক্ষমতাও না থাকলে তিনি তার প্রতিটি ফরয সিয়ামের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবেন। বিভিন্ন

হাদীসের আলোকে প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে একটি ফিত্‌রার পরিমাণ খাদ্য প্রদানের বিধান দিয়েছেন ফকীহগণ।

কিন্তু সালাতের জন্য এরূপ কোনো কাফ্‌ফারার বিধান হাদীসে নেই। কারণ সিয়ামের ক্ষেত্রে যে অপারগতার সম্ভাবনা রয়েছে, সালাতের ক্ষেত্রে তা নেই। যতক্ষণ চেতনা আছে, ততক্ষণ মুমিন ইশারা-ইঙ্গিতে যেভাবে পারবেন সেভাবেই তার সাধ্যানুসারে সালাত আদায় করবেন। কাজেই অপারগতার কোনো ভয় নেই। আর দীর্ঘস্থায়ীভাবে চেতনা রহিত হলে সালাতও রহিত হবে।

তবুও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ সাবধানতামূলকভাবে সালাতের জন্যও কাফফারার বিধান দিয়েছেন। নিয়মিত সালাত আদায়কারী কোনো মুমিন যদি মৃত্যুর আগে অসুস্থতার কারণে কিছু সালাত আদায় করতে না পারেন, তবে মৃত্যুর পরে তার জন্য সিয়ামের মত প্রত্যেক সালাতের বদলে একটি করে 'ফিতরা' প্রদানের বিধান দিয়েছেন।

কেউ কেউ এই বিধানকে আবার আজীবন সালাত পরিত্যাগকারী ও সালাতকে অবজ্ঞা ও উপহাসকারীর জন্যও প্রয়োগ করেছেন। এরপর খাদ্যের বদলে কুরআন প্রদানের এক উদ্ভট বিধান দিয়েছেন। প্রচলিত একটি পুস্তকে এ বিষয়ে লিখা হয়েছে: "এস্কাত করিবার নিয়ম এই যে, প্রথমত মুর্দার বয়স হিসাব করিবে। তম্মধ্য হইতে পুরুষের বার বছর ও স্ত্রী লোকের ৯ বছর (নাবালেগী) বয়স বাদ দিয়া বাকী বয়সের প্রত্যেক বৎসর ৮০ তোলা সেরের ওজনের ১০ মন ও ১০ সের ময়দার মূল্য ধরিয়া । ঐ মূল্যের পরিবর্তে নিজে এক জেলদ কোরআন শরীফ সকলের সম্মুখে কোন গরীব মিছকীনের নিকট হাদিয়া করিয়া দিবে। এবং সকলের মোকাবেলা বলিবে যে, অমুকের উপরোক্ত হুকুকের জন্য খোদায়ী পাওনা এত হাজার, এত শত, এত মণ ময়দার পরিবর্তে এই কালামুল্লাহ তোমার নিকট হাদীয়া করলাম। ঐ গরীব বা মিছকীন দুইজন সাক্ষীর মোকাবিলা উহা কবুল করিলে ঐ কালামুল্লাহ তাহারই হইয়া গেল এবং ময়দা আদায় করা তাহার উপর ওয়াজিব হইয়া গেল।"[৬৪২]

এ উদ্ভট নিয়মটি শুধু বানোয়াটই নয়, আল্লাহর দ্বীনের সাথে চরম উপহাস! এর চেয়ে বড় উপহাস আর কি হতে পারে!! আজীবন সালাত অবমাননা করে, সালাতকে নিয়ে অবজ্ঞা উপহাস করে, মরার পরে এক জিলদ 'কুরআন' ফকীরকে দিয়েই মাফ!!!

২. ১০. ৪. সুন্নাত-নফল সালাত বিষয়ক

ফরয সালাত যেমন মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তেমনি নফল সালাতও সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। ফরযের অতিরিক্ত কর্মকে "নফল" বলা হয়। কিছু সময়ে কিছু পরিমাণ "নফল" সালাত পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ দিয়েছেন, বা তিনি নিজে তা পালন করেছেন। এগুলিকে 'সুন্নাত'ও বলা হয়। যে সকল নফল সালাতের বিষয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলিকে "সন্নাতে মুয়াক্কাদাহ" ও অন্যগুলিকে সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। এ ধরণের কিছু সুন্নাত সালাত সম্পর্কে হাদীসে বেশি গুরুত্ব প্রদানের ফলে কোন ইমাম ও ফকীহ তাকে ওয়াজিব বলেছেন।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাধারণভাবে যত বেশি পারা যায় নফল সালাত আদায়ের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لله؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

"তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[৬৪৩]

অন্য এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন:

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[৬৪৪]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

اَلصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ

"সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে।" হাদীসটি হাসান।[৬৪৫]

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বা স্থানে বিশেষ সালাতের বিশেষ ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে আল্লামা মাওসিলীর আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে, সহীহ হাদীস থেকে নিম্নলিখিত বিশেষ সুন্নাত-নফল সালাতের কথা জানা যায়: ফরয সালাতের আগে পরে সুন্নাত সালাত, তারাবীহ, দোহা বা চাশত, রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল ওযু, ইসতিখারার সালাত, কুসূফের সালাত, ইসতিসকার সালাত ও সালাতুত তাসবীহ। এছাড়া পাপ করে ফেললে দু রাক'আত সালাত আদায় করে তাওবা করার কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে 'সালাতুল হাজাত' বর্ণিত হয়েছে।

সুন্নাত-নফল সালাতের বিষয়ে এত সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে।

অন্যান্য জাল হাদীসের মতই এগুলিতে অনেক আকর্ষণীয় অবান্তর সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। জালিয়াতগণ দুটি ক্ষেত্রে কাজ করেছে। প্রথমত, সহীহ হাদীসে উল্লিখিত সুন্নাত-নফল সালাতগুলির জন্য বানোয়াট ফযীলত, সূরা বা পদ্ধতি তৈরি করেছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়, স্থান বা কারণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সালাতের উদ্ভাবন করে সেগুলির কাল্পনিক সাওয়াব, ফযীলত বা আসরের কাহিনী বানিয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত এ বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা বা জাল হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত সুন্নাত-নফল সালাত বিষয়ক বানোয়াট হাদীসগুলি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। শুধুমাত্র এ সকল সালাত বিষয়ক মনগড়া পদ্ধতিগুলি আলোচনা করব। এরপর জালিয়াতগণ মনগড়াভাবে যে সকল সালাত ও তার ফযীলতের কাহিনী বানিয়েছে সেগুলি উল্লেখ করব।

১. বিভিন্ন সালাতের জন্য নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত নির্ধারণ করা

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত এ সকল সালাতের কোনো সালাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াত নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। এ সকল সালাতের জন্য নির্ধারিত সূরা পাঠের বিষয়ে, বা অমুক রাকাতে অমুক সূরা বা অমুক আয়াত এতবার পাঠ করতে হবে বলে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট কথা। কাজেই ইসতিখারার সালাতের প্রথম রাক'আতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা, তাহাজ্জুদের সালাতে প্রথম রাকাতে অমুক সূরা, দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা বা আয়াত, চাশতের সালাতে প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আতে অমুক সূরা বা আয়াত ... শবে কদরের রাতের সালাতে অমুক অমুক সূরা বা আয়াত পড়তে হবে.... ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট।

যে কোনো সূরা বা আয়াত দিয়ে এ সকল সালাত আদায় করা যাবে। কোনো নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের কারণে এ সকল সালাতের সাওয়াব বা বরকতের কোনো হেরফের হবে না। সূরা বা আয়াতের দৈর্ঘ্য, মনোযোগ, আবেগ ইত্যাদির কারণে সাওয়াবের কমবেশি হয়।

২. তারাবীহের সালাতের দোয়া ও মুনাজাত

রামাদানের কিয়ামুল্লাইলকে 'সালাতুত তারাবীহ' বা 'বিশ্রামের সালাত' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে তিনি নিজে ও সাহাবীগণ রামাদান ও অন্যান্য সকল মাসেই মধ্যরাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত ৪/৫ ঘন্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একাকি কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ আদায় করতেন। উমার (রা) এর সময় থেকে মুসলিমগণ জামাতে তারাবীহ আদায় করতেন। সাধারণত ইশার পর থেকে শেষরাত্র বা সাহরীর পূর্ব সময় পর্যন্ত ৫/৬ ঘন্টা যাবৎ তাঁরা একটানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারাবীহের সালাত আদায় করতেন।

যেহেতু এভাবে একটানা কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা খুবই কষ্টকর, সেহেতু পরবর্তী সময়ে প্রতি ৪ রাক'আত সালাত আদায়ের পরে প্রায় ৪ রাক'আত সালাতের সম পরিমাণ সময় বিশ্রাম নেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়। এজন্যই পরবর্তীকালে এই সালাত 'সালাতুত তারাবীহ' বলে প্রসিদ্ধ হয়।

এই 'বিশ্রাম' সালাতের বা ইবাদতের কোনো অংশ নয়। বিশ্রাম না করলে সাওয়াব কম হবে বা বিশ্রামের কমবেশির কারণে সাওয়াব কমবেশি হবে এইরূপ কোনো বিষয় নয়। বিশ্রাম মূলত ভালভাবে সালাত আদায়ের উপকরণ মাত্র। বিশ্রামের সময়ে মুসল্লী যে কোনো কাজ করতে পারেন, বসে বা শুয়ে থাকতে পারেন, অন্য নামায আদায় করতে পারেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন বা দোয়া বা যিকর-এ রত থাকতে পারেন। এ বিষয়ে কোনো নির্ধারিত কিছুই নেই।

গত কয়েক শতাব্দী যাবত কোনো কোনো দেশে প্রতি চার রাক'আত পরে একটি নির্ধারিত দোয়া পাঠ করা হয় এবং একটি নির্ধরিত মুনাজাত করা হয়। অনেক সময় দোয়াটি প্রতি ৪ রাক'আত অন্তে পাঠ করা হয় এবং মুনাজাতটি ২০ রাক'আত অন্তে পাঠ করা হয়। দোয়াটি নিম্নরূপ:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ (وَالْهَيْبَةِ) وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لا يَنَامُ وَ) لا يَمُوتُ (أَبداً أَبَداً)، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ (رَبُّنَا وَ) رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ، (لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، نَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِك مِنْ النَّارِ)

মুনাজাতটি নিম্নরূপ:

اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এ দোয়া ও মুনাজাতের কথাগুলি ভাল, তবে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) শেখানো বা আচরিত নয়। তারাবীহের বিশ্রামের সময়ে এগুলি পড়লে কোনে বিশেষ সাওয়াব হবে বলে কোনো সহীহ, যয়ীফ বা জাল হাদীসেও বলা হয় নি। এমনকি অন্য কোনো সময়ে তিনি এ বাক্যগুলি এভাবে বলেছেন বা বলতে শিখিয়েছেন বলে বর্ণিত হয় নি। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বা অন্য কোনো ইমাম তারাবীহে এ দুআ-মুনাজাত পড়তে বলেন নি। ১০০০ হিজরী পর্যন্ত রচিত হানাফী ফিকহের কোনো গ্রন্থে এ দুআ ও মুনাজাতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি জাল হাদীসে উপরের দোয়াটির অনুরূপ একটি দোয়া পাওয়া যায়। এ জাল হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর কিছু ফিরিশতা একটি নূরের সমুদ্রে এই দোয়াটি পাঠ করেন... যে ব্যক্তি কোনো দিবসে, মাসে বা বৎসরে এ দোয়াটি পাঠ করবে সে এত এত পুরস্কার

লাভ করবে।[৬৪৬]

আমাদের উচিত এ সকল বানোয়াট দোয়া না পড়ে এ সময়ে দরুদ পাঠ করা। অথবা কুরআন তিলাওয়াত বা মাসনূন যিক্‌র-এ মশগুল থাকা।

কোনো কোনো প্রচলিত পুস্তকে তারাবীহের দু রাকাত অন্তে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতে বলা হয়েছে[৬৪৭]:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الإِحْسَانِ أَحْسِنْ إِلَيْنَا بِإِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এ দোয়াটিও ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

৩. সালাতুল আওয়াবীন

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হুযাইফা (রা) বলেন, "আমি নবীজী (ﷺ)-র কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত নফল সালাতে রত থাকলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬৪৮]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।" হাদীসটি সহীহ। হযরত হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ের নামাযও রাতের নামায বা তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে।[৬৪৯]

বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবেয়ীগণকে এই সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।[৬৫০]

এ সকল হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে মুমিন কিছু নফল সালাত আদায় করবেন। যিনি যত বেশি সালাত আদায় করবেন তিনি তত বেশি সাওয়াব লাভ করবেন। এই সময়ের সালাতের রাক'আত সংখ্যা বা বিশেষ ফযীলতে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

কিছু জাল বা অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে এই সময়ে ৪ রাক'আত, ৬ রাক'আত, ১০ বা ২০ রাক'আত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি এ সময়ে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধে জিহাদ করার সাওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে তাঁর ৫০ বৎসরের গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অথবা তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অন্য বর্ণনায় – সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। যে ব্যক্তি এই সময়ে ১০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তাঁর জন্য জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি এ সময়ে ২০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, তাঁর জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন। এসকল হাদীস সবই বানোয়াট বা অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এ সময়ে ৬ রাক'আত নামায আদায় করলে ১২ বৎসরের সাওয়াব পাওয়ার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৫১]

আমাদের দেশে এ ৬ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পরে কোন্ সূরা পাঠ করতে হবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী বলেছেন, সালাতুল মাগরিবের পর থেকে সালাতুল ইশা পর্যন্ত যে নফল সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'।[৬৫২] বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চাশতের নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৬৫৩]

৪. সালাতুল হাজাত

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে 'সালাতুল হাজাত' বা 'প্রয়োজনের সালাত' বিষয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে বা কোনো মানুষের কাছে কারো কোনো প্রয়োজন থাকলে সে ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং এর পর একটি দোয়া পাঠ করে আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রার্থনা করবে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী ফাইদ ইবনু আব্দুর রাহমান দুর্বল রাবী। এজন্য হাদীসটি দুর্বল। এ ব্যক্তিকে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস মুনকার, মাতরূক ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৬৫৪]

আমাদের দেশে 'সালাতুল হাজাত' নামে আরো অনেক বানোয়াট পদ্ধতি প্রচলিত। যেমন: "হাজতের (খেজের আ.)-এর নামাজ। এই নামাজ ২ রাকাত। ... মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য খেজের (আ) জনৈক বোজর্গ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরুন দশবার.... ইত্যাদি।" এগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।[৬৫৫]

৫. সালাতুল ইসতিখারা

ইস্তিখারার জন্য সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওযু করে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি 'ইলমিকা...' দোয়াটি পাঠ করতে হবে।[৬৫৬] কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতি ও দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পুস্তকে বলা হয়েছে: 'কোনো জিনিসের ভাল মন্দ জানিতে হইলে এশার নামাজের পর এস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া নিয়া পরে কয়েক মর্তবা দুরূদ শরীফ পাঠ করিয়া 'ছুবহানাক লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ...' ১০০ বার পাঠ করিয়া আবার ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া পাক ছাপ বিছানায় শুইয়া থাকিবে...।[৬৫৭]

অন্য পুস্তকে বলা হয়েছে: "হযরত আলী (কার্রা) বলিয়াছেন যে, স্বপ্নে কোন বিষয়ের ভালমন্দ জানিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মে রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে দুই রাকাত করিয়া ছয় রাকাত নামায পড়িবে। প্রথম রাকতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা ওয়াশ্‌শামছে ৭ বার ....।"[৬৫৮]

এ সকল কথা ও পদ্ধতি সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। আমরা বুঝি না, সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে এ সকল বানোয়াট পদ্ধতি আমরা কেন উল্লেখ করি?

৬. হালকী নফল

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পরে বিত্‌র আদায় করতেন। এরপর দুই রাক'আত নফল সালাত আদায় করতেন। একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিত্‌র-এর পরে দুই রাক'আত নফল সালাত আদায় করলে 'তাহাজ্জুদ' বা কিয়ামুল্লাইলের সাওয়াব পাওয়া যায়।[৬৫৯]

হাদীস দ্বারা এতটুকুই প্রমাণিত। এ বিষয়ক প্রচলিত জাল ও ভিত্তিহীন কথার মধ্যে রয়েছে: "বেতের নামাজ পড়ার পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করিলে একশত রাকাত নামাজ পড়ার ছওয়াব হাসিল হয়। প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সূরা একলাছ ৩ বার করিয়া পাঠ করিয়া নামাজ আদায় করিতে হয়...। এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা বলে প্রতীয়মান হয়।[৬৬০]

৭. আরো কিছু বানোয়াট 'নামায'

বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মনগড়া ও ভিত্তিহীন ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে আরো কিছু 'নামায' প্রচলিত রয়েছে সমাজে। এগুলির মধ্যে রয়েছে 'হেফজুল ঈমান নামাজ', কাফফারা নামাজ, বুজুর্গী নামাজ, দৌলত লাভের নামাজ, শোকরের নামাজ, পিতামাতর হকের নামাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি।[৬৬১]

৮. সপ্তাহের ৭ দিনের সালাত

সপ্তাহের ৭ দিনের দিবসে বা রাতে নির্ধারিত নফল সালাত ও তার ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা। মুমিন নিয়মিত তাহাজ্জুদ, চাশত ইত্যাদি সালাত আদায় করবেন। এছাড়া যথাসাধ্য বেশি বেশি নফল সালাত তিনি আদায় করবেন। এগুলির জন্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবের আশা করবেন। কিন্তু জালিয়াতগণ কাল্পনিক সাওয়াব ও ফযীলতের কাহিনী দিয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছে, যাতে সপ্তাহের প্রত্যেক দিনে ও রাতে বিশেষ বিশেষ সালাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত্রির নফল নামায, শুক্রবার দিবসের নফল নামায, শনিবার রাত্রির নফল নামায, শনিবার দিনের নামায .... ইত্যাদি নামে প্রচলিত সবই বানোয়াট কথা।

যেমন, আনাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর নামে হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবারের রাত্রিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করবে.... এতে জান্নাতে বালাখানা, ইত্যাদি অপরিমেয় সাওয়াব লাভ করবে। শুক্রবার দিবসে অমুক সময়ে অমুক পদ্ধতিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করবে... এতে এত এত পুরস্কার লাভ করবে...। শনিবার রাত্রিতে যে ব্যক্তি এত রাক'আত সালাত অমুক পদ্ধতিতে আদায় করবে সে অমুক অমুক পুরস্কার লাভ করবে। শনিবার দিবসে অমুক সময়ে অমুক পদ্ধতিতে এত রাক'আত সালাত আদায় করলে অমুক অমুক ফল পাওয়া যাবে ....।

এ ভাবে সপ্তাহের ৭ দিনের দিবসে ও রাত্রিতে বিভিন্ন পরিমাণে ও পদ্ধতিতে, বিভিন্ন সূরা বা দোয়া সহকারে যত প্রকারের সালাতের কথা বলা হয়েছে সবই বানোয়াট ও জাল কথা।

আমাদের দেশে প্রচলিত বার চাঁদের ফযীলত, নেক আমল, ওযীফা ইত্যাদি সকল পুস্তকেই এই সব মিথ্যা কথাগুলি হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মুহাদ্দিসগণ সকলেই এগুলির জালিয়াতির বিষয়ে একমত।

অনেক সময় অনেক বড় আলিমও জনশ্রুতির উপরে অনেক কথা লিখে ফেলেন। সবার জন্য সব কথা 'তাহকীক' বা বিশ্লেষণ

করা সম্ভব হয় না। সপ্তাহের ৭ দিন বা রাতের নামাযও কোনো কোনো বড় আলিম উল্লেখ করেছেন। তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার, জোযকানী, ইবনুল জাওযী, সুয়ূতী, মুহাম্মাদ তাহের ফাতানী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হাই লাখনবী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আজলূনী, শাওকানী প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।[৬৬২]

সালাত বা নামায সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। মুমিন যত বেশি পারবেন তত বেশি নফল সালাত আদায় করতে চেষ্টা করবেন। তবে এর সাথে কোনো মনগড়া পদ্ধতি যোগ করা বা মনগড়া ফযীলতের বর্ণনা দেওয়া বৈধ নয়।

২. ১১. বার চাঁদের সালাত ও ফযীলত বিষয়ক

বৎসরের বার মাসে ও বিভিন্ন মাসের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির সালাত ও সেগুলির নামে আজগুবি ও উদ্ভট সব ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে হাদীস বানিয়েছে জালিয়াতগণ। প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' জাতীয় গ্রন্থগুলি এই সব বাতিল কথায় ভরা। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি আরবী মাসগুলির উল্লেখ করে, সে বিষয়ক সহীহ ও বানোয়াট কথাগুলি উল্লেখ করছি। যদিও আমরা 'সালাত' অধ্যায়ে রয়েছি, তবুও আমি সালাতের পাশাপাশি এ সকল মাসের সিয়াম ও অন্যান্য ফযীলত বিষয়ক কথাগুলিও উল্লেখ করব; যাতে পাঠক একই স্থানে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সহজে জানতে পারেন।

২. ১১. ১. মুহাররাম মাস

ক. সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের আলোকে মুহার্‌রাম মাস

আরবী পঞ্জিকার প্রথম মাস মুহাররাম মাস। সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা এই মাসের ফযীলত বা মর্যাদা সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলি জানতে পারি:

প্রথমত, এই মাসটি বৎসরের চারিটি 'হারাম' মাসের অন্যতম। এই মাসগুলি ইসলামী শরীয়তে বিশেষভাবে সম্মানিত। এগুলিতে সাধারণ ঝগড়াঝাটি বা যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেছেন: "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারিটি নিষিদ্ধ মাস। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এই নিষিদ্ধ মাসগুলির মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না...।"[৬৬৩]

এই মাসগুলি হলো: মুহার্‌রাম, রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ মাস।

দ্বিতীয়ত, এ মাসকে সহীহ হাদীসে 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ মাসের নফল সিয়াম সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

"রামাদানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহার্‌রাম মাস।"[৬৬৪]

তৃতীয়ত, এই মাসের ১০ তারিখ 'আশূরা'র দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আশূরার সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

"এই দিনের সিয়াম গত এক বৎসরের পাপ মার্জনা করে।"[৬৬৫]

এ দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সিয়াম পালন করতেন, উম্মতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ১০ তারিখের সাথে সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও সিয়াম পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।[৬৬৬]

চতুর্থত, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই দিনে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গী বনী ইসরাঈলকে ফির্‌আউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং ফির'আউন ও তার সঙ্গীদেরকে ডুবিয়ে মারেন।[৬৬৭]

সহীহ হাদীস থেকে মুহার্‌রাম মাস ও আশুরা সম্পর্কে শুধু এতটুকুই জানা যায়। পরবর্তীকালে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনী এক্ষেত্রে প্রচলিত হয়েছে। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়:

প্রথম বিষয়: এই দিনটিকে ইহূদীগণ সম্মান করত। এ কারণে ইহূদীদের মধ্যে এই দিনটি সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে ইসরাঈলী রেওয়ায়াত হিসাবে সেগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। প্রথম যুগে মুসলিমগণ এগুলি সত্য বা মিথ্যা বলে বিশ্বাস না করে ইসরাঈলী কাহিনী হিসাবেই বলেছেন। পরবর্তী যুগে তা 'হাদীসে' পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের অর্ধ শতাব্দী পরে ৬১ হিজরীর মুহার্‌রাম মাসের ১০ তারিখে আশূরার দিনে তাঁর প্রিয়তম নাতি হযরত হুসাইন (রা) কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। এই ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। হুসাইন (রা)-এর পক্ষের ও বিপক্ষের অনেক বিবেকহীন দুর্বল ঈমান মানুষ 'আশূরার' বিষয়ে অনেক 'হাদীস' বানিয়েছে। কেউ দিনটিকে 'শোক

দিবস' হিসেবে এবং কেউ দিনটিকে 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালনের জন্য নানা প্রকারের কথা বানিয়েছেন। তবে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে এ সকল জালিয়াতি ধরা খুবই সহজ ছিল।

মুহার্‌রাম ও আশূরা সম্পর্কে প্রচলিত অন্যান্য কথাবার্তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: **প্রথমত,** যে সকল 'হাদীস' কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করলেও, কেউ কেউ তা দুর্বল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এবং যে সকল 'হাদীস' অত্যন্ত দুর্বল সনদে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এগুলি বলেছেন। **দ্বিতীয়ত,** সকল মুহাদ্দিস যে সকল হাদীসকে 'জাল' ও ভিত্তিহীন বলে একমত পোষণ করেছেন।

জাল বা দুর্বল হাদীস ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত

১. অত্যন্ত দুর্বল সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর তাওবা কবুল করেন।
২. অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দিনে নূহ (আ) এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামে।
৩. অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দিনে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।
৪. মুহার্‌রাম মাসে বা আশূরার দিনে দান-সাদকার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয় নি। তবে অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে একজন সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আশুরার দিনে সিয়াম পালন করলে যেহেতু এক বৎসরের সাওয়াব পাওয়া যায়, সেহেতু এই দিনে দান করলেও এক বৎসরের দানের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এই দিনে দানের বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা।[৬৬৮]
৫. একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ سَنَتِهِ كُلِّهَا

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে তার পরিবারের জন্য প্রশস্তভাবে খরচ করবে, আল্লাহ সারা বৎসরই সেই ব্যক্তিকে প্রশস্ত রিযক প্রদান করবেন।"

হাদীসটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। বিভিন্ন সনদের কারণে বাইহাকী, ইরাকী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে 'জাল' হিসেবে গণ্য না করে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার হাদীসটিকে 'অত্যন্ত আপত্তিকর ও খুবই দুর্বল' বলেছেন। অপরদিকে ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু তাইমিয়া প্রমুখ মুহাদ্দিস একে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক সনদই অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার ফলে একাধিক সনদে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় না। এছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহূদীরা আশুররা দিনে উৎসব- আনন্দ করে- তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে, এই দিনে সিয়াম পালন করবে এবং উৎসব বা আনন্দ করবে না।[৬৬৯]

৬. অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِالإِثْمِدِ، لَمْ تَرْمُدْ عَيْنُهُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে 'ইসমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে কখনোই তার চোখ উঠবে না।"

উপরের হাদীসটির মতই এই হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সনদেই অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে হাদীসটিকে 'দুর্বল' হিসাবে গণ্য করলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীগণ আশুরার দিনে সুরমা মাখার বিদ'আতটি চালু করেন। এই কথাটি তাদেরই বানানো। কোনো দুর্বল রাবী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করেছেন।[৬৭০]

খ. মুহাররাম মাস বিষয়ক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা

উপরের কথাগুলি কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল বলে গণ্য করলেও কেউ কেউ তা 'দুর্বল' বলে গণ্য করেছেন। নিচের কথাগুলি সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে জাল বলে স্বীকার করেছেন। এগুলিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি: প্রথমত, মুহার্‌রাম বা আশুরার সিয়ামের ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা, দ্বিতীয়ত, আশুরার দিনের বা রাতের জন্য বা মুহাররম মাসের জন্য বিশেষ সালাত ও তার ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা এবং তৃতীয়ত, আশুরার দিনে অতীত ও ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে বলে জাল কথা।

১. মুহার্‌রাম বা আশূরার সিয়াম

আশুরার সিয়াম পূর্ববর্তী এক বৎসরের গোনাহের কাফ্‌ফারা হবে বলে সহীহ হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি। জালিয়াতগণ আরো অনেক কথা এ সম্পর্কে বানিয়েছে। প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি:

"হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি মহররমের মাসে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ৩০ দিন রোযা রাখার সমান ছওয়াব দিবেন। আরও হাদীছে আছে- যে ব্যক্তি আশুরার দিন একটি রোযা রাখিবে সে দশ হাজার ফেরেশতার, দশ

হাজার শহীদের ও দশ হাজার হাজীর ছওয়াব পাইবে। আরও হাদীছে আছে- যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে স্নেহ-পরবশ হইয়া কোন এতীমের মাথায় হাত ঘুরাইবে, আল্লাহতাআলা ঐ এতীমের মাথার প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে তাহাকে বেহেশতের এক একটি 'দরজা' প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি উক্ত তারিখের সন্ধ্যায় রোযাদারকে খানা খাওয়াইবে বা ইফতার করাইবে, সে ব্যক্তি সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদীকে খানা খাওয়াইবার ও ইফতার করাইবার ন্যায় ছওয়াব পাইবে।

হযরত (ﷺ) আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে রোযা রাখিবে, সে ৬০ বৎসর রোযা নামায করার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে। যে ব্যক্তি ঐ তারিখে বিমার পোরছী করিবে, সে সমস্ত আওলাদে আদমের বিমার-পোরছী করার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।... তাহার পরিবারের ফারাগতি অবস্থা হইবে। ৪০ বৎসরের গুনাহর কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।... (হাদীস)"[৬৭১]

অনুরূপ আরেকটি মিথ্যা কথা: "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহররম মাসের প্রথম ১০ দিন রোজা রাখিবে, সে ব্যক্তি যেন ১০ হাজার বৎসর যাবত দিনের বেলা রোজা রাখিল এবং রাত্রিবেলা ইবাদতে জাগরিত থাকিল। ... মহররম মাসে ইবাদতকারী ব্যক্তি যেন ক্বদরের রাত্রির ইবাদতের ফযীলত লাভ করিল।... তোমরা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় মাস মহররমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও। যেই ব্যক্তি মহররম মাসের সম্মান করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে জান্নাতের মধ্যে সম্মানিত করিবেন এবং জাহান্নামের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন... মহররমের ১০ তারিখে রোজা রাখা আদম (আ) ও অন্যান্য নবীদের উপর ফরজ ছিল। এই দিবসে ২০০০ নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ২০০০ নবীর দোয়া কবুল করা হইয়াছে ...।"[৬৭২]

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এগুলি সবই বানোয়াট কথা ও জাল হাদীস।[৬৭৩]

২. মুহার্রাম মাসের সালাত

মুহার্রাম মাসের কোনো দিবসে বা রাত্রে এবং আশুরার দিবসে বা রাত্রে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের কোনো প্রকার নির্দেশনা বা উৎসাহ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ক সকল কথাই বানোয়াট। আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো পুস্তকে মুহার্রাম মাসের ১ম তারিখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে বিশেষ দোয়া পাঠের বিশেষ ফযীলতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৬৭৪]

৩. আশুরার দিনে বা রাতে বিশেষ সালাত

আশুরার সিয়ামের উৎসাহ দেওয়া হলেও, হাদীসে আশুরার দিনে বা রাত্রে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের বিধান দেওয়া হয় নি। তবে জালিয়াতগণ অনেক কথা বানিয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ... অথবা আশুরার রাত্রিতে এত রাকাত সালাত অমুক অমুক সূরা এতবার পাঠ করে আদায় করবে ... সে এত পুরস্কার লাভ করবে। সরলপ্রাণ মুসলিমদের মন জয় করার জন্য জালিয়াতগণ এ সকল কথা বানিয়েছে, যা অনেক সময় সরলপ্রাণ আলিম ও বুযুর্গকেও ধোঁকা দিয়েছে।[৬৭৫]

৪. আশুরায় অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলির বানোয়াট ফিরিস্তি

মিথ্যাবাদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে জালিয়াতি করে বলেছে:

১. আশুরার দিনে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন।
২. এ দিনে তিনি পাহাড়, পর্বত, নদনদী.... সৃষ্টি করেছেন।
৩. এ দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন।
৪. এ দিনে তিনি লাওহে মাহফূয সৃষ্টি করেছেন।
৫. এ দিনে তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন।
৬. এ দিনে তিনি আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন।
৭. এ দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন।
৮. এ দিনে তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন।
৯. এ দিনে তিনি জিবরাঈলকে (আ) সৃষ্টি করেছেন।
১০. এ দিনে তিনি ফিরিশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন।
১১. এ দিনে তিনি আদমকে (আ) সৃষ্টি করেছেন।
১২. এ দিনে তিনি আদমকে (আ) জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।
১৩. এ দিনে তিনি ইদরীসকে (আ) আসমানে উঠিয়ে নেন।
১৪. এ দিনে তিনি নূহ (আ)-কে নৌকা থেকে বের করেন।
১৫. এ দিনে তিনি দায়ূদের (আ) তাওবা কবুল করেছেন।
১৬. এ দিনে তিনি সুলাইমান (আ)-কে রাজত্ব প্রদান করেছেন।
১৭. এ দিনে তিনি আইউব (আ)-এর বিপদ-মসিবত দূর করেন।
১৮. এ দিনে তিনি তাওরাত নাযিল করেন।

১৯. এ দিনে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন... খলীল উপাধি লাভ করেন।
২০. এ দিনে ইবরাহীম (আ) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পান।
২১. এ দিনে ইসমাঈল (আ) কে কুরবানী করা হয়েছিল।
২২. এ দিনে ইউনূস (আ) মাছের পেট থেকে বাহির হন।
২৩. এ দিনে আল্লাহ ইউসূফকে (আ) জেলখানা থেকে বের করেন।
২৪. এ দিনে ইয়াকুব (আ) দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান।
২৫. এ দিনে ইয়াকূব (আ) ইউসূফের (আ) সাথে সম্মিলিত হন।
২৬. এ দিনে হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছেন।
২৭. এ দিনে কেয়ামত সংঘঠিত হবে....।

কেউ কেউ বানিয়েছে: মুহার্‌রামের ২ তারিখে নূহ (আ) প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছন, ৩ তারিখে ইদরিসকে (আ) আসমানে উঠানো হয়েছে, ৪ তারিখে ইবরাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে..... ইত্যাদি ইত্যাদি....।

এইরূপ অগণিত ঘটনা এই মাসে বা এই দিনে ঘটেছে এবং ঘটবে বলে উল্লেখ করেছে জালিয়াতরা তাদের এ সকল কল্প কাহিনীতে। মোট কথা হলো, আশুরার দিনে মূসা (আ) ও তাঁর সাথীদের মুক্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আদমের (আ) এর তাওবা কবুল, নূহ (আ) এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামা ও ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করার কথা অনির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী থেকে বর্ণিত। আশুরা বা মুহার্‌রাম সম্পর্কে আর যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা ও বাতিল কথা। দুঃখজনক হলো, আমাদের সমাজে মুহার্‌রাম বা আশূরা বিষয়ক বই পুস্তকে, আলোচনা ও ওয়াযে এই সমস্ত ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়।[৬৭৬]

২. ১১. ২. সফর মাস

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, মুহার্‌রাম মাসের জন্য কোনো বিশেষ সালাত নেই, তবে এই মাসে বিশেষ সিয়ামের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে এবং এ জন্য বিশেষ সাওয়াব ও ফযীলত রয়েছে। পক্ষান্তরে সফর মাসের জন্য কোনো বিশেষ সালাতও নেই, সিয়ামও নেই। এই মাসের কোনো দিবসে বা রাত্রে কোনো প্রকারের সালাত আদায়ের বিশেষ সাওয়াব বা ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। অনুরূপভাবে এই মাসের কোনো দিনে সিয়াম পালনেরও কোনো বিশেষ ফযীলত কোনো হাদীসে বর্নিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

এই মাসকে কেন্দ্র করেও অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এগুলিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমত, সফর মাসের 'অশুভত্ব' ও 'বালা-মুসিবত' বিষয়ক, দ্বিতীয়ত, সফর মাসের প্রথম তারিখে বা অন্য সময়ে বিশেষ সালাত ও তৃতীয়ত, আখেরী চাহার শোম্বা বা সফর মাসের শেষ বুধবার বিষয়ক।

প্রথমত, সফর মাসের অশুভত্ব বা এ মাসের বালা-মুসিবত

কোনো স্থান, সময়, বস্তু বা কর্মকে অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলময় বলে মনে করা ইসলামী বিশ্বাসের ঘোর পরিপন্থী একটি কুসংস্কার। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। এখানে লক্ষণীয় যে, আরবের মানুষেরা জাহেলী যুগ থেকে 'সফর' মাসকে অশুভ ও বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন,

لاَ طِيَرَةَ ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ

"...কোনো অশুভ-অযাত্রা নেই, কোনো ভুত-প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই।..."[৬৭৭]

অথচ এর পরেও মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ সকল কুসংস্কার থেকে যায়। শুধু তাই নয়, এ সকল কুসংস্কারকে উস্কে দেওয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। তারা জালিয়াতি করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে বলেছে, এই মাস বালা মুসিবতরে মাস। এই মাসে এত লক্ষ এত হাজার ... বালা নাযিল হয়। ... এ মাসেই আদম ফল খেয়েছিলেন। এমাসেই হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহের কাওম ধ্বংস হয়। এ মাসেই ইব্রাহীমকে আগুনে ফেলা হয়। .... এই মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যথিত হতেন। এই মাস চলে গেলে খুশি হতেন....। তিনি বলতেন:

مَنْ بَشَّرَنِيْ بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ (بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ)

"যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ প্রদান করব।" .... ইত্যাদি অনেক কথা তারা বানিয়েছে। আর অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গও তাদের এ সকল জালিয়াতি বিশ্বাস করে ফেলেছেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসিবত বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন মিথ্যা।[৬৭৮]

দ্বিতীয়ত, সফর মাসের ১ম রাতের সালাত

উপরোক্ত মিথ্যা কথাগুলির ভিত্তিতেই একটি ভিত্তিহীন 'সালাতের' উদ্ভবান করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি সফর মাসের

১ম রাত্রিতে মাগরিবের পরে ... বা ইশার পরে.. চার রাক'আত সালাত আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা আয়াত এতবার পাঠ করে .... তবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার পাবে... ইত্যাদি। এগুলি সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা, যদিও অনেক সরলপ্রাণ আলেম ও বুযুর্গ এগুলি বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে বা ওয়াযে উল্লেখ করেছেন।[৬৭৯]

তৃতীয়ত, সফর মাসের শেষ বুধবার

বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন এবং এ দিনে সবচেয়ে বেশি বালা মুসিবত নাযিল হয়। এ সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গ বিশ্বাস করেছেন। যেমন: "সফর মাসে একলাখ বিশ হাজার 'বালা' নাজিল হয় এবং সবদিনের চেয়ে 'আখেরী চাহার শুম্বা-'তে (সফর মাসে শেষ বুধবার) নাজিল হয় সবচেয়ে বেশী। সুতরাং ঐ দিনে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকাত নামাজ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ বালা হতে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাকে হেফাজতে রাখবেন... ।"[৬৮০]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা। তবে আমাদের দেশে 'আখেরী চাহার শুম্বা'-র প্রসিদ্ধি এ কারণে নয়, অন্য কারণে। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি পুনারায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতাই তিনি পরের মাসে ইন্তিকাল করেন। এজন্য মুসলমানেরা এই দিনে তাঁর সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন।

এ বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি: "হযরত নবী করীম (ﷺ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ কিছু খানা খাইয়া মসজিদে নববীতে হাযির হইয়া নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা) খুশীতে ৭ সহস্র দীনার এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) ৫ সহস্র দীনার, হযরত ওসমান (রা) ১০ সহস্র দীনার, হযরত আলী (রা) ৩ সহস্র দীনার এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। হযরত নবী করীম (ﷺ) এর এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেন নাই। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে ওজু-গোসল করতঃ ইবাদৎ বান্দেগী করা উচিৎ এবং হযরত নবী করীম (ﷺ) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সাওয়াব রেছানী করা কর্তব্য... ।"[৬৮১]

উপরের এ কাহিনীটিই কমবেশি সমাজে প্রচলিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে এ ঘটনার কোনো প্রকারের উল্লেখ পাইনি। হাদীস তো দূরের কথা কোনো ইতিহাস বা জীবনী গ্রন্থেও আমি এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাই নি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 'সফর মাসের শেষ বুধবার' পালনের রেওয়াজ বা এ কাহিনী প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নেই।

ক. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বশেষ অসুস্থতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি। কবে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিক দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ) বলেন:

اُبْتُدِئَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَكْوَاهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ فِيْهِ ... فِيْ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ صَفَرٍ، أَوْ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[৬৮২]

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[৬৮৩]

কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন।[৬৮৪]

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি কোন তারিখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১লা রবিউল আউয়াল, কেউ বলেছেন, ২রা রবিউল আউয়াল এবং কেউ বলেছেন, ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তি কাল করেন।

সর্বাবস্থায়, কেউ কোনোভাবে বলছেন না যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে কোনো দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই, ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী সংকলিত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ... لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ (لَعَلِّى أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ) ... ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আমার গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ মশক পানি ঢাল...; যেন আমি আরাম বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে পানি ঢাললাম...। এরপর তিনি মানুষদের নিকট বেরিয়ে যেয়ে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদেরকে খুতবা প্রদান করলেন বা ওয়ায করলেন।"[৬৮৫]

এখানে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই অসুস্থতা ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, যেন কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং মসজিদে যেয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নসীহত করতে পারেন।

এ গোসল করার ঘটনাটি কত তারিখে বা কী বারে ঘটেছিল তা হাদীসের কোনো বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসের সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তিকালের আগের বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ইন্তেকালের ৫ দিন আগে।[৬৮৬] ১২ই রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ই রবিউল আউয়াল।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এজন্য সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান-সাদকা করার এ সকল কাহিনীর কোনোরূপ ভিত্তি নেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, সেহেতু সে ঘটনা উদযাপন করা বা পালন করার প্রশ্ন ওঠে না। এরপরেও আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি বৎসর সে দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা বা 'আনন্দ দিবস' বা 'শোক দিবস' উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবনে অনেক আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদা করেছেন। কোনো কোনো ঘটনায় তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময়ে সে দিন বা মুহূর্তকে তারা বাৎসরিক 'আনন্দ দিবস' হিসেবে উদযাপন করেন নি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ বা সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ কোনো দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এগুলিতে বিশেষ ইবাদত বিশেষ সাওয়াবের কারণ বলে মনে করার সুযোগ নেই।

খ. আখেরী চাহার শোম্বার নামায

উপরের আলোচনা থেকে আমার জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ বুধবারের কোনো প্রকার বিশেষত্ব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এই দিনে কোনোরূপ ইবাদত, বন্দেগী, সালাত, সিয়াম, যিকির, দোয়া, দান, সদকা ইত্যাদি পালন করলে অন্য কোনো দিনের চেয়ে বেশি বা বিশেষ কোনো সাওয়াব বা বরকত লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এজন্য আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী লিখেছেন যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে যে বিশেষ নফল সালাত বিশেষ কিছু সুরা, আয়াত ও দোয়া পাঠের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৬৮৭]

২. ১১. ৩. রবিউল আউয়াল মাস

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম ও ওফাতের মাস হিসাবে রবিউল আউয়াল মাস মুসলিম মানসে বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এই মাসের ফযীলত, ও আমল বিষয়ক হাদীস আলোচনা করার আগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম ও ইন্তিকাল সম্পর্কে হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক চাই।

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম দিন ও তারিখ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্ম বার, জন্ম দিন, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ বিষয়ক হাদীস ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে। এখানে সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচনা করছি।

সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টরূপে জান যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন।[৬৮৮] হাদীসে নববী থেকে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনে হিশাম, ইবনে সা'দ, ইবনে কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন :

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররাম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ বিন আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০হি) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আব্বাস ও জুবাইর বিন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন : "মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী হযরত জুবাইর বিন মুতয়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম (৪৫৬ হি) ও মুহাম্মাদ ইবনে ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বার (৪৬৩ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনে দেহিয়া (৬৩৩ হি) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর" -এ এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল। এ মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ বিন আলী আল বাকির (১১৪ হি) থেকে বর্ণিত। ১ম-২য় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির বিন শারাহিল শাবী (১০৪ হি.) থেকেও মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন উমর আল-ওয়াকিদী (২০৭ হি) এ মত গ্রহণ করেছেন। ইবনে সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতুল কুবরা"-য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৬৮৯]

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (১৫১ হি) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।"[৬৯০] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এ মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[৬৯১]। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এ মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই মতটি বর্ণিত।

(৮). অন্য মতে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্ম তারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

(৯). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল।

(১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ।

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনে বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এ মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়্যত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়্যত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৬৯২]

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ওফাত দিবস

বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ইন্তিকাল করেন।[৬৯৩] কিন্তু এ সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসের ১১ তারিখে ইন্তিকাল করেন।[৬৯৪] এ একক বর্ণনাটি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর সকল ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস একমত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু কোন্ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিদায় হজ্জে ৯ই যিলহাজ্জ আরাফায় অবস্থানের দিনটি ছিল শুক্রবার।[৬৯৫] এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে বছর যিলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার।

আমরা জানি যে, বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে তিনি যিলহাজ্জ মাসের বাকি দিনগুলি এবং মুহার্‌রাম ও সফর মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং রবিউল আউয়াল মাসে তিনি ইন্তিকাল করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের এই দিনের পরে ৮০ বা ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। এরপর রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬৯৬]

ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরীর তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছেঃ ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল, ১২ই রবিউল আউয়াল ও ১৩ই রাবিউল আউয়াল।[৬৯৭]

সাধারণভাবে পরবর্তী কালে ১২ তারিখের মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এখানে একটি কঠিন সমস্যা রয়েছে। আমরা জানি যে, আরবী মাস ৩০ বা ২৯ দিন হয় এবং সাধারণত কখনোই পরপর তিনটি মাস ৩০ বা ২৯ দিনের হয় না। উপরের হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, যিলহাজ্জ মাস শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার। আর বৃহস্পতিবার ১লা যিলহাজ্জ হলে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ কোনোভাবেই সোমবার হতে পারে না।

যিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও সফর তিনটি মাসই ৩০ দিনে ধরলে ১লা রবিউল আউয়াল হয় বুধবার। দুইটি ৩০ ও একটি ২৯ ধরলে ১লা রবিউল আউয়াল হয় মঙ্গলবার। দুইটি ২৯ ও একটি ৩০ ধরলে হয় ১লা রবিউল আউয়াল হয় সোমবার। আর তিনটি মাসই ২৯ দিন ধরলে ১লা রবিউল আউয়াল হয় রবিবার। আর কোনো হিসাবেই ১২ তারিখ সোমবার হয় না।

এই সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য কেউ কেউ ১৩ তারিখের কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনটি মাসই ৩০ দিনের ছিল এবং মদীনায় একদিন পরে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। দুটি ব্যখ্যাই দূরবর্তী।[৬৯৮]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা সুলাইমান ইবনু তারখান আত-তাইমী (৪৬-১৪৩ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর অসুস্থতার শুরু হয় ২২ সফর শনিবার। ১০ দিন অসুস্থতার পর ২রা রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তিকাল করেন।"[৬৯৯]

তাঁর এই মত অনুসারে সে বৎসরে যিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও সফর তিনটি মাসই ২৯ দিন ছিল, যা সাধারণত খুবই কম ঘটে। এ জন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক ও গবেষক ১লা রবিউল আউয়ালের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে আল্লামা সুহাইলী, ইবনু হাজার প্রমুখ গবেষক মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ২ তারিখের মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনটি কারণে তাঁরা এই মতটি গ্রহণ করেছেন। প্রথমত, তাবিয়ীগণের যুগ থেকে সহীহ সনদে কথাটি পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই মতটি বিদায় হজ্জের পরে তাঁর ৮০ বা ৮১ দিন জীবিত থাকার বর্ণনাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয়ত, যারা ১২ বলেছেন তাদের কথার একটি দূরবর্তী ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, আরবীতে (ثاني شهر) কে (ثاني عشر) বা 'মাসের দুই'-কে 'দশের দুই' (১২) পড়ার একটি সম্ভাবনা থাকে। কেউ হয়ত ২-কে ১২ পড়েছিলেন ও লিখেছিলেন এবং অন্যরা তার অনুসরণ করেছেন।[৭০০]

তৃতীয়ত, হাদীসের আলোকে রবিউল আউয়াল মাসের ফযীলত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর জন্ম বা ওফাতের মাস হিসাবে রবিউল আউয়াল মাসের কোনো উল্লেখ হাদীস শরীফে নেই। এই মাসের কোনো বিশেষ ফযীলত বা বিশেষ আমল কোনো কিছুই হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

এ বিষয়ক মিথ্যা গল্প কাহিনীর মধ্যে রয়েছেঃ "এই মাসের ১২ তারিখে বুজুর্গ তাবেয়ী'গণ হযরত রাসূলে কারীম (ﷺ) এর রূহের মাগফিরাতের জন্য ২০ রাকয়া'ত নফল নামায পড়িতেন। এই নামায দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে আদায় করিতেন এবং প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পড়িতেন। নামায শেষে আল্লাহর হাবীবের প্রতি সাওয়াব রেছানী করিতেন। তাহারা ইহার বরকতে খাবের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে দর্শন লাভ করিতেন এবং দোজাহানের খায়ের ও বরকত লাভ করিতেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কোন মু'মিন ব্যক্তি নিম্নের দরূদ শরীফ এই মাসের যে কোন তারিখে এশার নামাযের পরে ১১২৫ বার পাঠ করিলে আল্লাহর রহমতে সে ব্যক্তি হযরত নবী করীম (ﷺ) কে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিবে।..."[৭০১]

এরূপ আরো অনেক ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে দেখা যায়।[৭০২] এগুলি সবই বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের পরবর্তী তিন যুগ, সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের মধ্যে এই মাসটির কোনো পরিচিতিই ছিল না। এই মাসটি যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম মাস সেই কথাটিই তখনো প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

৪০০ হিজরীর দিকে সর্বপ্রথম মিসরের ফাতেমীয় শিয়া শাসকগণ এই মাসে 'মীলাদ' বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জন্ম দিবস পালনের প্রচলন করে। ৬০০ হিজরীতে ইরাকের ইরবিল শহরে ৮ ও ১২ই রবিউল আউয়াল 'মীলাদ' বা ঈদে মীলাদুন্নবী বা নবীজীর জন্ম উদযাপন শুরু হয়। অপরদিকে ভারত ও অন্যান্য দেশে ১২ই রবিউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকাল উপলক্ষ্যে 'ফাতেহা' বা 'ফাতেহায়ে দোয়াজদহম' উদযাপন শুরু হয়। এ বিষয়ক সকল তথ্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে।

২. ১১. ৪. রবিউস সানী মাস

রবিউস সানী বা রবিউল আখের মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এই মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পরে, ৫৬১ হিজরীর রবিউস সানী মাসের ১০ তারিখে হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রাহ) ইন্তিকাল করেন। আমাদের দেশে অনেকে এই উপলক্ষ্যে ১১ই রবিউস সানী গেয়ারভী শরীফ বা ফাতেহায়ে ইয়াযদহম উদযাপন করেন।

স্বভাবতই এর সাথে হাদীসের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। এমনকি জন্ম বা মৃত্যু উদযাপন করা বা জন্ম তারিখ বা মৃত্যু তারিখ উপলক্ষ্যে দোয়া খায়ের বা সাওয়াব রেসানী করার কোনো নির্দেশনা, প্রচলন বা উৎসাহ কোনো হাদীসে নেই। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাঁর অনেক মেয়ে, ছেলে, চাচা, চাচাতো ভাই, দুধ ভাই ও আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ওলী সাহাবীগণ ইন্তিকাল করেছেন। তিনি কখনো কারো মৃত্যুর পরের বৎসরে, বা পরবর্তী কোনো সময়ে মৃত্যুর দিনে বা অন্য কোনো সময়ে কোনো ফাতেহা বা কোনো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন নি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইন্তিকালের পরে তাঁর কন্যা ফাতিমা, জামাতা আলী, দৌহিত্র হাসান-হুসাইন, উম্মুল মুমিনীনগণ, খলিফায়ে রাশিদগণ, অন্যান্য সাহাবীগণ, তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণ কেউ কখনো তাঁর ইন্তিকালের দিনে বা অন্য কোনো সময়ে কোনোরূপ ফাতেহা, দোয়া বা কোনো অনুষ্ঠান করেন নি।

রবিউস সানী মাসের ফযীলত, আমল ইত্যাদি নামে যা কিছু প্রচলিত রয়েছে সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন "রবিউস-সানী মাসের প্রথম তারিখে রাত্রিবেলা চার রাকয়া'ত নফল নামায আদায় করিতে হয়। উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাছ পড়িতে হয়। এই নামায আদায়কারীর আমল নামায় ৯০ হাজার বৎসরের সাওয়াব লিখা হইবে এবং ৯০ হাজার বৎসরের গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"[৭০৩] এইরূপ আরো অনেক আজগুবি মিথ্যা কথা প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে দেখা যায়।[৭০৪]

২. ১১. ৫. জমাদিউল আউয়াল মাস

জমাদিউল আউয়াল (জুমাদা আল-উলা) মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এই মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন: "রাসূলে করীম (ﷺ) এর সাহাবীগণ এই মাসের প্রথম তারিখে দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ২০ রাকয়া'ত নামায আদায় করিতেন এবং ইহার প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে একবার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিতেন। নামাযের পরে নিম্নের দরূদ শরীফ ১০০ বার পাঠ করিতেন। এই নামাযীর আমল নামায় অসংখ্য নেকী লিখা হইবে এবং তাহার সমস্ত নেক নিয়ত পূর্ণ করা হইবে। .... কোন ব্যক্তি এই মাসের প্রথম তারিখে দিনের বেলা দুই রাকয়া'তের নিয়তে মোট ৮ রাকয়া'ত নামায আদায় করিলে এবং উহার প্রত্যেক রাকয়া'তে ১১ বার করিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিলে....।"[৭০৫] এই জাতীয় অনেক আজগুবি, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা আমাদের দেশে প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' ও এই ধরনের পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।

২. ১১. ৬. জমাদিউস সানী মাস

জমাদিউস সানী বা জমাদিউল আখের (জুমাদা আল-আখেরা) মাসের কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য, ফযীলত বা এই মাসের কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, দোয়া, যিক্‌র বা বিশেষ কোনো আমল হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেমন, "জমাদিউস সানী মাসের পহেলা তারিখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ দুই রাকয়াতের নিয়তে মোট ১২ রাকয়া'ত নামায আদায় করিতেন। ইহার প্রত্যেক রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সুরা ইখলাছ পড়িতেন। আবার কেহ কেহ সূরা ইখলাছের পরে ৩ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করিতেন। এই নামাযে অসংখ্য নেকী লাভ হয়।..."[৭০৬]

এ সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা।

২. ১১. ৭. রজব মাস

রজব মাসকে নিয়ে যত বেশি মিথ্যা হাদীস তৈরি করা হয়েছে, তত বেশি আর কোনো মাসকে নিয়ে করা হয় নি। সফর, রবিউল

আউয়াল, রবিউস সানী, জমাদিউল আউয়াল ও জমাদিউস সানী এই ৫ মাসের ফযীলত বা খাস ইবাদত বিষয়ক যা কিছু বানোয়াট কথাবার্তা তা মূলত গত কয়েক শত বৎসর যাবত ভারতীয় উপমহাদেশেই প্রচলিত হয়েছে। ৫ম/৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত মাউযূ হাদীস বা ফযীলতের বইগুলিতেও এ সকল মাসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ সকল যুগে যে সকল নেককার সরলপ্রাণ বুযুর্গ ফযীলত ও আমলের বিষয়ে সত্য-মিথ্যা সকল কথাই জমা করে লিখতেন তাদের বই-পুস্তকেও এই মাসগুলির কোনো প্রকারের উল্লেখ নেই। তাঁরা মূলত রজব মাস দিয়েই তাদের আলোচনা শুরু করতেন এবং মুহার্‌রাম মাস দিয়ে শেষ করতেন।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রজব মাস ইসলামী শরীয়তের 'হারাম' অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ' বা 'সম্মানিত' মাসগুলির অন্যতম। জাহিলী যুগ থেকেই আরবরা 'ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়ত' অনুসারে এই মাসগুলির সম্মান করতো। তবে ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ প্রবেশ করে। জাহিলী যুগে আরবরা এই মাসকে বিশেষ ভাবে সম্মান করত। এই মাসে তারা 'আতীরাহ' নামে এক প্রকারের 'কুরবানী' করতো এবং উৎসব করত। হাদীস শরীফে তা নিষেধ করা হয়েছে।[৭০৭]

'হারাম' মাস হিসাবে সাধারণ মর্যাদা ছাড়া 'রজব' মাসের মর্যাদায় কোনো সহীহ হাদীসে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় নি। এই মাসের কোনোরূপ মর্যাদা, এই মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া, তিলাওয়াত বা কোনো বিশেষ ইবাদতের বিশেষ কোনো ফযীলত আছে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনোরূপ কোনো হাদীস সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। পরবর্তী যুগের তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণ থেকে সামান্য কিছু কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক জাল ও বানোয়াট কথা প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশে সাধারণভাবে ২৭ শে রজব ছাড়া অন্য কোনো দিবস বা রাত্রি কেন্দ্রিক জাল হাদীসগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয়, সেহেতু ২৭শে রজবের বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা ও বাকি বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনার ইচ্ছা করছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

প্রথমত, সাধারণভাবে রজব মাসের মর্যাদা

সাধারণভাবে 'রজব' মাসের মর্যাদা, এ মাসে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে এবং এ মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সালাত, সিয়াম, দান, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত করলে কী অকল্পনীয় পরিমাণে সাওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া যাবে তার বর্ণনায় অনেক জাল হাদীস বাননো হয়েছে। আমাদের দেশের প্রচলিত 'বার চাঁদের ফযীলত' ও আমল-ওযীফা বিষয়ক বইগুলিতে এগুলির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন, অন্য মাসের উপর রজবের মর্যাদা তেমনি, যেমন সাধারণ মানুষের কথার উপরে কুরআনের মর্যাদা...। এই মাসে নূহ (আ) ও তাঁর সহযাত্রীগণ নৌকায় আরোহণ করেন...। এই মাসেই নৌকা পানিতে ভেসেছিল ...। এই মাসেই রক্ষা পেয়েছিল। এ মাসেই আদমের তাওবা কবুল হয়। ইউনূস (আ)-এর জাতির তাওবা কবুল করা হয়। এ মাসেই ইবরাহীম (আ) ও ঈসা (আ) এর জন্ম। এ মাসেই মূসার জন্য সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত হয়। .... এই মাসের প্রথম তারিখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন। এই মাসের ২৭ তারিখে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। ... এই মাসের ২৭ তারিখে তিনি মেরাজে গমন করেন। ... এই মাসে সালাত, সিয়াম, দান-সাদকা, যিক্‌র, দরুদ, দোয়া ইত্যাদি নেক আমল করলে তার সাওয়াব বৃদ্ধি পায় বা বহুগুণ বেড়ে যায়...। ইত্যাদি সবই ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা ও জাল হাদীস।[৭০৮]

পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গের আমল ও ফাযাইল বিষয়ক গ্রন্থে এগুলির সমাবেশ রয়েছে। তবে আমাদের সমাজের সাধারণ ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে এগুলির প্রচলন কম। এজন্য এগুলির বিস্তারিত আলোচনা বর্জন করছি।

দ্বিতীয়ত, রজব মাসের সালাত

রজব মাসে সাধারণভাবে এবং রজব মাসের ১ তারিখ, ১ম শুক্রবার, ৩, ৪, ৫ তারিখ, ১৫ তারিখ, ২৭ তারিখ, শেষ দিন ও অন্যান্য বিশেষ দিনে বা রাতে বিশেষ সালাত আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি ও সেগুলির অভাবনীয় পুরস্কারের ফিরিস্তি দিয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচারিত হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের আমল, ওযীফা ও ফাযাইল বিষয়ক পুস্তকাদিতে এবং আমাদের দেশের বার চান্দের ফযীলত, আমল-ওযীফা ও অন্যান্য পুস্তকে এগুলির কিছু কথা পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এগুলির প্রচলন কম। এজন্য এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করছি না। মুহাদ্দিসগণ এক্ষেত্রে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন তা বলেই শেষ করছি। আল্লামা ইবনু রাজাব, ইবনু হাজার, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস একবাক্যে বলেছেন, রজব মাসে বিশেষ কোনো সালাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো সময়ে কোনো সালাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও বানোয়াট।[৭০৯]

তৃতীয়ত, রজব মাসের দান, যিকর ইত্যাদি

রজব মাসের দান, যিক্‌র, দরূদ, দোয়া ইত্যাদি নেক আমলের বিষয়েও একই কথা। রজব মাসে এ সকল আমল করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে বা সাধারণ সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে এই মর্মে যা কিছু বর্ণিত ও প্রচলিত হয়েছে সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন।[৭১০]

চতুর্থত, রজব মাসের সিয়াম

সবচেয়ে বেশি জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে রজব মাসের সিয়াম পালনের বিষয়ে। বিভিন্নভাবে এই মাসে সিয়াম পালনের

উৎসাহ দিয়ে জালিয়াতগণ হাদীস জাল করেছে। কোনো কোনো জাল হাদীসে সাধারণভাবে রজব মাসে সিয়াম পালন করলে কত অভাবনীয় সাওয়াব তা বলা হয়েছে। কোনোটিতে রজব মাসের নির্ধারিত কিছু দিনের সিয়াম পালনের বিভিন্ন বানোয়াট সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। কোনোটিতে রজব মাসে ১ টি সিয়ামের কি সাওয়াব, ২টি সিয়ামের কি সাওয়াব, ৩টির কি সাওয়াব.... ৩০টি সিয়ামের কত সাওয়াব ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, রজব মাসের সিয়ামের বিশেষ সাওয়াব বা রজব মাসের বিশেষ কোনো দিনে সিয়াম পালনের উৎসাহ জ্ঞাপক সকল হাদীসই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো কথাই নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি।[৭১১]

পঞ্চমত, লাইলাতুর রাগাইব

রজব মাস বিষয়ক জাল হাদীসের মধ্যে অন্যতম হলো 'লাইলাতুর রাগাইব' ও সেই রাত্রির বিশেষ সালাত বিষয়ক জাল হাদীস। মুহাদ্দিসগণ একমত যে এই রাত্রির নামকরণ, ফযীলত, এই রাত্রির সালাতের ফযীলত, রাক'আত সংখ্যা, সূরা কিরাআত, পদ্ধতি সব কিছুই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা। কিন্তু বিষয়টি অনেক মুসলিম দেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে।

প্রথমে কিছু জালিয়াত এ রাত্রিটির নামকরণ ও এ বিষয়ক কিছু আজগুবি গল্প বানায়। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি আকর্ষণীয় ওয়াযে পরিণত হয়। জাল হাদীসের একটি বৈশিষ্ট্য, তা সাধারণ মানুষের চিত্তাকর্ষক হয় এবং কোনো একটি জাল হাদীস একবার 'বাজার পেলে' তখন অন্যান্য জালিয়াতও বিভিন্ন সনদ বানিয়ে তা বলতে থাকে। এভাবে অনেক জাল হাদীস সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। সালাতুর রাগাইব বিষয়ক হাদীসগুলিও সেরূপ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে এই জাল হাদীসগুলি প্রচারিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করলে সাধারণ মুসল্লীগণ অনেক দেশে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ঘটা করে সালাতুর রাগাইব পালন করতে শুরু করেন। এ সকল সমাজে 'লাইলাতুর রাগাইব' আমাদের দেশের 'লাইলাতুল বারাত'-এর মতই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়।

এই বানোয়াট সালাতটি আমাদের দেশে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এজন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। এর সার সংক্ষেপ হলো, রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাত্রি হলো 'লাইলাতুর রাগাইব' বা 'আশা-আকাঙ্খা পূরণের রাত'। রজবের প্রথম বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করে, বৃহস্পতিবার দিবাগত শুক্রবারের রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাক'আত সালাত নির্ধারিত সূরা, আয়াত ও দোয়া-দরূদ দিয়ে আদায় করবে। .... তাহলে এই ব্যক্তি এত এত.... পুরস্কার লাভ করবে।... এর সাথে আরো অনেক কল্প কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে এ সকল জাল হাদীসে।

এ সকল হাদীসের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে মুহাদ্দিসগণ সেগুলির সূত্র ও উৎস নিরীক্ষা করে এর জালিয়াতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল মুহাদ্দিস একমত যে, 'লাইলাতুর রাগাইব' ও 'সালাতুর রাগাইব' বিষয়ক সকল কথা মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট।[৭১২]

ষষ্ঠত, রজব মাসের ২৭ তারিখ

বর্তমানে আমাদের সমাজে ২৭শে রজব মি'রাজ-এর রাত বলেই প্রসিদ্ধ। সেই হিসেবেই আমাদের দেশের মুসলিমগণ এই দিনটি উদযাপন করে থাকেন। কিন্তু এই প্রসিদ্ধির আগেও রজব মাসের ২৭ তারিখ বিষয়ক আরো অনেক কথা প্রচলিত হয়েছিল এবং এই তারিখের দিবসে ও রাতে ইবাদত বন্দেগির বিষয়ে অনেক জাল কথা প্রচলিত হয়েছিল। প্রথমে আমরা 'লাইলাতুল মি'রাজ' সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এরপর এই দিন সম্পর্কে প্রচলিত বানোয়াট ও জাল হাদীসগুলি আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

ক. লাইলাতুল মি'রাজ

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিভিন্নভাবে কুরআন কারীমে ও অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে প্রায় অর্ধশত সাহাবী থেকে মিরাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবীগণ কখনো তাঁকে তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নও করেছেন বলে জানা যায় না। পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদেরও একই অবস্থা ; তাঁরা এ সকল হাদীস সাহাবীদের থেকে শিখছেন, কিন্তু তাঁরা তারিখ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না। কারণ, তাঁদের কাছে তারিখের বিষয়টির কোনো মূল্য ছিল না, এসকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বৎসর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং প্রায় ২০টি মত রয়েছে।

মাসের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন রবিউল আউআল মাসের ২৭ তারিখ। কেউ বলেছেন রবিউস সানী মাসে, কেউ বলেছেন রজব মাসে, কেউ বলেছেন, রমযান মাসে, কেউ বলেছেন শাওয়াল মাসে, কেউ বলেছেন যিলকাদ মাসে এবং কেউ বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসে। তারিখের বিষয়ে আরো অনেক মতবিরোধ আছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন নি। পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ মি'রাজের তারিখ বিষয়ক মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কাসতালানী (৯২৩হি.), মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ শামী (৯৪২ হি.), আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি) ও অন্যান্যরা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[৭১৩]

এত মতবিরোধের কারণ হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি এবং সাহাবীগণও কিছু বলেননি। তাবে-তাবেয়ীদের যুগে

তারিখ নিয়ে কথা শুরু হয়, কিন্তু কেউই সঠিক সমাধান না দিতে পারায় তাঁদের যুগ ও পরবর্তী যুগে এত মতবিরোধ হয়। এই মতবিরোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কয়েক শতক আগেও 'শবে মি'রাজ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না।

এভাবে আমরা দেখছি যে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মি'রাজ হয়েছিল, বা এই তারিখটি 'লাইলাতুল মি'রাজ', এই কথাটি তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণের অনেক মতের একটি মত মাত্র। এই কথাটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এই তারিখে মি'রাজ হওয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই ঐতিহাসিকগণের মতামত অথবা বানোয়াট কথাবার্তা।

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোনো কোনো জাল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, রজব মাসের ২৭ তারিখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেন, নবুয়ত লাভ করেন ... ইত্যাদি। এগুলিও বাতিল ও মিথ্যা কথা।

খ. ২৭ শে রজবের ইবাদত

মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগি করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ বা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজের রাত কোন্টি তাই হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা কী-ভাবে আসে। তবে ২৭ শে রজবের দিনে এবং রাতে ইবাদত বন্দেগির ফযীলতের বিষয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচলিত আছে। এ সকল জাল হাদীসে মি'রাজের রাত হিসেবে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির দিবস হিসেবে বা একটি ফযীলতের দিন হিসেবে '২৭শে রজব'-কে বিশেষ মর্যাদাময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এইরূপ একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

إِنَّ فِيْ رَجَبٍ يَوْماً وَلَيْلَةً مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَقَامَ لَيَالِيْهَا وَهِيَ لِثَلاَثَةٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْهِ مُحَمَّدٌﷺ، وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ فِيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"রজব মাসের মধ্যে একটি দিন আছে, কেউ যদি সে দিনে সিয়াম পালন করে এবং সে দিনের রাত দাঁড়িয়ে (সালাতে) থাকে তাহলে সে ১০০ বৎসর সিয়াম পালন করার ও রাত জেগে সালাত আদায়ের সাওয়াব লাভ করবে। সে দিনটি রজব মাসের ২৭ তারিখ। এ দিনেই মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুয়ত লাভ করেন, এ দিনেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল মুহাম্মাদ (ﷺ) উপর অবতরণ করেন।"[৭১৪]

অন্য একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِماً حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوْبَ سِتِّيْنَ سَنَةً وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ بُعِثَ فِيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ.

"যদি কেউ রজব মাসের ২৭ তারিখে রাত্রিতে ১২ রাক'আত সালাত আদায় করে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে, সালাত শেষ হলে সে বসা অবস্থাতেই ৭ বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে এবং এরপর ৪ বার 'সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম' বলে, অতঃপর সকালে সিয়াম শুরু করে, তবে আল্লাহ তার ৬০ বৎসরের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। এই রাতেই মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুয়ত পেয়েছিলেন।"[৭১৫]

অন্য একটি জাল হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ:

بُعِثْتُ نَبِيًّا فِيْ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّيْنَ شَهْراً

"রজব মাসের ২৭ তারিখে আমি নবুয়ত পেয়েছি। কাজেই যে ব্যক্তি এই দিনে সিয়াম পালন করবে তার ৬০ মাসের গোনাহের কাফফারা হবে।"[৭১৬]

আরেকটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, "ইবনু আব্বাস (রা) ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ শুরু করতেন। যোহর পর্যন্ত সালাতে রত থাকতেন। যোহরের পরে অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন... এবং আসর পর্যন্ত দোয়ায় রত থাকতেন...। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।"[৭১৭] এগুলি সবই জঘন্য মিথ্য কথা।

২৭শে রজবের ফযীলতে এবং এ দিনে ও রাতে সালাত, সিয়াম, দোয়া ইত্যাদি ইবাদতের ফযীলতে অনুরূপ আরো অনেক মিথ্যা কথা জালিয়াতগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে প্রচার করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, ২৭শে রজব সম্পর্কে হাদীস নামে যা কিছু প্রচলিত সবই ভিত্তিহীন, বাতিল ও জাল। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি, মুহাদ্দিসগণ একমত যে, রজব মাস এবং এ মাসের কোনো দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলতের বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীসই ভিত্তিহীন। ২৭ শে রজব বিষয়ক হাদীসগুলিও এ সকল বাতিলের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হাজার আসকালানী, মোল্লা আলী কারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আজলূনী, আব্দুল হাই লাখনবী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ

করেছেন যে, ২৭শে রজবের ফযীলত, এই তারিখের রাত্রে ইবাদত বা দিনের সিয়াম পালনের বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট, জাল ও ভিত্তিহীন।[৭১৮]

২. ১১. ৮. শাবান মাস

প্রথমত, সহীহ্ হাদীসের আলোকে শাবান মাস

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সফর থেকে রজব পর্যন্ত ৬ মাসের কোনো বিশেষ ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শা'বান মাস তদ্রূপ নয়। সহীহ্ হাদীসে শাবান মাসের নিম্নলিখিত ফযীলতগুলি প্রমাণিত:

১. এই মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বেশি বেশি সিয়াম পালন করতে ভালবাসতেন। তিনি সাধারণত এই মাসের অধিকাংশ দিন একটানা সিয়াম পালন করতেন বলে বুখারী ও মুসলিম সংকলিত সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বুখারী ও মুসলিমের কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি শা'বান মাস পুরোটাই নফল সিয়ামে কাটাতেন। তিনি এই মাসে কিছু সিয়াম পালন করতে সাহাবীগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন।[৭১৯]

২. আহমদ, নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলিত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বা হাসান পর্যায়ের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শা'বান মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়; এজন্য এই মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন করা উচিত।[৭২০]

৩. শা'বান মাসের মধ্যম রজনী বা ১৫ই শা'বানের রাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন বলে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

এ সকল সহীহ ও হাসান হাদীসের পাশাপাশি এই মাসের ফযীলত ও ইবাদতের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচলিত রয়েছে। এই জাল হাদীসগুলিকে আমার দু ভাগে ভাগ করতে পারি: ১ সাধারণভাবে শাবান মাস বিষয়ক ও ২. শাবান মাসের মধ্যম রজনী বা 'শবে বরাত' বিষয়ক। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিষয়টিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এজন্য প্রথম বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে আমরা দ্বিতীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, শাবান মাস বিষয়ক জাল ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা

'বার চান্দের ফযীলত' জাতীয় কোনো কোনো পুস্তকে শা'বান মাসের প্রথম রজনীতে বিশেষ সূরা বা আয়াত দিয়ে কয়েক রাক'আত সালাত আদায়ের কথা, ফাতিমার (রা) জন্য বখশিশ করার কথা, শা'বান মাসে নির্ধারিত পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠের বিশেষ ফযীলতের কথা, শাবান মাসের যে কোনো জুমুআর দিবসে বিশেষ সূরা দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েক রাক'আত সালাত আদায়ের কথা এবং সেগুলির কাল্পনিক সাওয়াবের কথা লিখা হয়েছে।[৭২১] এগুলি সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। শা'বান মাসে নফল সিয়াম পালন ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের বিশেষ ইবাদতের কথা কোনো হাদীসে বলা হয় নি।

তৃতীয়ত, শবে বরাত বিষয়ক সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস

'মধ্য শাবানের রজনী' বা 'শবে বারাত' বিষয়ক সকল সহীহ, যয়ীফ ও জাল হাদীস সনদ সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি **"কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল"** নামক গ্রন্থে। এখানে আমি এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলি আলোচনা করতে চাই। প্রসঙ্গত এ বিষয়ক সহীহ ও যয়ীফ হাদীসগুলির বিষয়েও কিছু কথা আসবে।

১. মধ্য শাবানের রাত্রির বিশেষ মাগফিরাত

এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"আল্লাহ তা'য়ালা মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং অংশীবাদী (মুশরিক) ও বিদ্বেষ পোষনকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"

এ অর্থের হাদীস কাছাকাছি শব্দে ৮ জন সাহাবী: আবূ মূসা আশআরী, আউফ ইবনু মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও আবূ বাকর সিদ্দীক (ﷺ) থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৭২২] এ সকল হাদীসের সনদ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা উপর্যুক্ত গ্রন্থে করেছি। এগুলির মধ্যে কিছু সনদ দুর্বল ও কিছু সনদ 'হাসান' পর্যায়ের। সামগ্রিক বিচারে হাদীসটি সহীহ। শাইখ আলবানী বলেন, "হাদীসটি সহীহ। তা অনেক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা একটি অন্যটিকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করে।..."[৭২৩]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রিটি একটি বরকতময় রাত এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু এ ক্ষমা অর্জনের জন্য শিরক ও বিদ্বেষ বর্জন ব্যতীত অন্য কোনো আমল করার প্রয়োজন আছে কি না তা এই হাদীসে উল্লেখ নেই।

২. মধ্য শাবানের রাত্রিতে ভাগ্য লিখন

কিছু কিছু হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মওত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। হাদীসগুলির সনদ বিস্তারিত আলোচনা করেছি উপর্যুক্ত পুস্তকটিতে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[৭২৪]

এ বাণীর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শা'বানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। ইকরিমাহ বলেন, এই রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।[৭২৫]

মুফাস্‌সিরগণ ইকরিমার এ মত গ্রহণ করেন নি। ইমাম তাবারী বিভিন্ন সনদে ইকরিমার এ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করার পরে তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইকরিমার এ মত ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, সঠিক মত হলো, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র'-কে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ যে রাত্রিতে কুরআন কারীম অবতীর্ণ করেছেন সে রাত্রিকে এক স্থানে লাইলাতুল কাদ্‌র বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলে অভিহিত করেছেন[৭২৬]। অন্যত্র এ রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এবং এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাদান মাসের মধ্যে; কারণ অন্যত্র আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন।[৭২৭] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মুবারক রজনী রামাদান মাসে, শাবান মাসে নয়।[৭২৮]

পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণ ইমাম তাবারীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, 'মুবারক রজনী' বলতে এখানে 'মহিমান্বিত রজনী' বা 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে 'লাইলাতুম মুবারাকা' এবং 'লাইলাতুল কাদ্‌র' একই রাতের দুটি উপাধি। দুটি কারণে মুফাস্‌সিরগণ ইকরিমার তাফসীরকে বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন:

প্রথমত, ইকরিমার মতটি কুরআনের স্পষ্ট বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যত্র বলেছেন যে, একটি মুবারক রাত্রিতে ও একটি মহিমান্বিত রাত্রিতে তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। এ সকল আয়াতের সমন্বিত স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহ রামাদান মাসের এক রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছেন এবং সে রাতটি বরকতময় ও মহিমান্বিত। মুবারক রজনীকে শবে বরাত বলে দাবী করলে এ আয়াতগুলির স্পষ্ট অর্থ বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বাতিল করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা 'মুবারক রজনী'-র ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ রাতটি হলো 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বা 'মহিমান্বিত রজনী'। সাহাবীগণের মধ্য থেকে ইবনু আব্বাস (রা) ও ইবনু উমার (রা) থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। তাবেয়ীগণের মধ্যে থেকে আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামী (৭৪ হি), মুজাহিদ বিন জাব্‌র (১০২ হি), হাসান বসরী (১১০ হি), ক্বাতাদা ইবনু দি'আমা (১১৭ হি) ও আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম মাদানী (১৮২ হি) বিশেষ ভাবে উলেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ লাইলাতুল কাদ্‌র।[৭২৯]

৩. মধ্য-শাবানের রাত্রিতে দোয়া-মুনাজাত

মধ্য শাবানের রজনীর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের হাদীসগুলিতে এ রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ রাতে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আকুতি জানানো এবং জীবিত ও মৃতদের পাপরাশি ক্ষমালাভের জন্য প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থে কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে কিছু হাদীস দুর্বল এবং কিছু হাদীস জাল।

৪. অনির্ধারিত সালাত ও দোয়া

মধ্য শাবানের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণিত কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে সালাত আদায় ও দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস এই রাত্রির সালাতের জন্য কোনো নির্ধারিত রাক'আত, নির্ধারিত সূরা বা নির্ধারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র সাধারণভাবে এ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ আদায় ও দোয়া করার বিষয়টি এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়। এই অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলি প্রায় সবই বানোয়াট পর্যায়ের। দু-একটি হাদীস বানোয়াট না বলে যয়ীফ বা দুর্বল বলে গণ্য করা যায়।

৫. নির্ধারিত রাক'আত, সূরা ও পদ্ধতিতে সালাত

শবে বরাত বিষয়ক অন্য কিছু হাদীসে এ রাত্রিতে বিশেষ পদ্ধতিতে, বিশেষ সুরা পাঠের মাধ্যমে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাকাত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই অর্থে বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। হিজরী চতুর্থ শতকের পরে রাসুলুলাহ (ﷺ) -এর নামে বানিয়ে এগুলি প্রচার করা হয়েছে। এখানে এই জাতীয় কয়েকটি জাল ও বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করছি।

১. ৩০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস

"যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে প্রত্যেক রাকাতে ৩০বার সুরা ইখলাস পাঠের মাধ্যমে ৩০০ রাকাত সালাত আদায় করবে জাহান্নামের আগুন অবধারিত এমন ১০ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" হাদীসটি ইবনুল ক্বাইয়্যিম বাতিল বা ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে উলেখ করেছেন।[৭৩০]

২. ১০০ রাক'আত, প্রতি রাক'আতে ১০ বার সুরা ইখলাস

মধ্য শাবানের রজনীতে এই পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন হিজরী চতুর্থ শতকের পরে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, ৪৪৮ হি. সনে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রথম এই রাত্রিতে এই পদ্ধতিতে সালাত আদায়ের প্রচলন শুরু হয়।[৭৩১] এ সময়ে বিভিন্ন মিথ্যাবাদী গল্পকার ওয়ায়েয এই অর্থে কিছু হাদীস বানিয়ে বলেন। এই অর্থে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

এর প্রথমটি হযরত আলী ইবনু আবি তালেব (রা) -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে প্রচারিতঃ যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকাত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহা ও ১০বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে সে উক্ত রাতে যত প্রয়োজনের কথা বলবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন। লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগা লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরির্বতন করে সৌভাগ্যবান হিসেবে তার নিয়তি নির্ধারণ করা হবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাছে ৭০ হাজার ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যারা তার পাপ রাশি মুছে দেবে, বছরের শেষ পর্যন্ত তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন রাখবে, এছাড়াও আলাহ তায়ালা 'আদন' জান্নাতে ৭০ হাজার বা ৭লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা বেহেশতের মধ্যে তার জন্য শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করবে এবং তার জন্য বৃক্ষরাজি রোপন করবে... । যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে এবং পর কালের শান্তি কামনা করবে আলাহ তায়ালা তার জন্য তার অংশ প্রদান করবেন।

হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে বানোয়াট ও জাল। এর বর্ণনাকারীগণ কেউ অজ্ঞাত পরিচয় এবং কেউ মিথ্যাবাদী জালিয়াত হিসেবে পরিচিত।[৭৩২]

এ বিষয়ক দ্বিতীয় জাল হাদীসটিতে বানোয়াটকারী রাবীগণ ইবনু উমার (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে বর্ণনা করেছেঃ "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে এক শত রাকাত সালাতে এক হাজার বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন, তন্মধ্যে ত্রিশজন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ত্রিশজন তাকে দোযখের আগুন থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ প্রদান করবে, ত্রিশজন তাকে ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং দশজন তার শত্রুদের ষড়যন্ত্রের জবাব দেবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের অধিকাংশ রাবী অজ্ঞাতপরিচয়। বাকীরা মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।[৭৩৩]

এ বিষয়ক তৃতীয় জাল হাদীসটিতে মিথ্যাবাদীগণ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আল বাকের (১১৫ হি) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর বরাতে বর্ণনা করেছেঃ "যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ১০০ রাকাত সালাতে ১০০০ বার সুরা ইখলাছ পাঠ করবে তার মৃত্যুর পূর্বেই আলাহ তায়ালা তার কাছে ১০০ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন। ৩০ জন তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিবে, ৩০ জন তাকে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দিবে, ৩০ জন তার ভুল সংশোধন করবে এবং ১০ জন তার শত্রুদের নাম লিপিবদ্ধ করবে।"

এ হাদীসটিও বানোয়াট। সনদের কিছু রাবী অজ্ঞাতপরিচয় এবং কিছু রাবী মিথ্যাবাদী হিসাবে সুপরিচিত।।[৭৩৪]

১০০ রাকাত সংক্রান্ত এ বিশেষ পদ্ধতিটি হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন গল্পকার ওয়ায়েযীনদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং যুগে যুগে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় ওয়ায়েযগণ এই সালাতের পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যেক দুই রাকাতের পরে "তাসবীহুত তারাবীহ"র প্রচলন করেন এবং ১০০ রাকাত পূর্ণ হওয়ার পর কতিপয় সাজদা, সাজদার ভিতরে ও বাহিরে কতিপয় দোয়া সংযুক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৬ হি) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস সমুহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, মধ্য শাবানের রাতে পঞ্চাশ সালামে ১০০ রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর ১০ বার সুরা ইখলাস পাঠ করতে হবে। প্রত্যেক দুই রাকাত পর তাসবীহুত তারাবীহ পাঠ করবে, এর পর সাজদা করবে। সাজদার মধ্যে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর সাজদা থেকে মাথা তুলবে এবং নবী (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাঠ করবে ও কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং তাতে কিছু নির্ধারিত বানোয়াট দোয়া পাঠ করবে।[৭৩৫]

৩. ৫০ রাক'আত

ইমাম যাহাবী এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট হাদীস হিসেবে হাদীসটির বর্ণনাকারী অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আলমীলী আত তাবারীর জীবনীতে উলেখ করেছেন। উক্ত মুহাম্মাাদ বিন সাঈদ এ হাদীসটি তার মতই অজ্ঞাত রাবী মুহাম্মদ বিন আমর আল বাজালী এর সনদে হযরত আনাস (রা) থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাতে ৫০ রাকাত সালাত

আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে যত প্রকার প্রয়োজনের কথা বলবে তার সবটুকুই পূরণ করে দেয়া হবে। এমনকি লাওহে মাহফুযে তাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হলেও তা পরিবর্তন করে তাকে সৌভাগ্যবান করা হবে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার কাছে ৭ লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার নেকী লিপিবদ্ধ করবে, অপর ৭লক্ষ ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মাণ করবে ..... এবং ৭০ হাজার একত্ববাদীর জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে... । ইমাম যাহাবী এই মিথ্যা হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বানোয়াট করেছে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে লাঞ্চিত করুন ।[৭৩৬]

৪. ১৪ রাক'আত

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর সনদে হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসুলুলাহ্ (ﷺ) কে মধ্য শাবানের রাতে ১৪ রাকাত সালাত আদায় করতে দেখেছি। সালাত শেষে বসে তিনি ১৪ বার সূরা ফাতিহা, ১৪ বার সূরা ইখলাছ, ১৪ বার সূরা ফালাক, ১৪ বার সূরা নাস, ১ বার আয়াতুলকুরসী এবং সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, এ সব কাজের সমাপ্তির পর আমি তাঁকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন: তুমি আমাকে যে ভাবে করতে দেখেছ এভাবে যে করবে তার আমল নামায় ২০টি ক্ববুল হজ্বের সাওয়াব লিখা হবে এবং ২০ বছরের ক্ববুল সিয়ামের সাওয়াব লিখা হবে। পরদিন যদি সে সিয়াম পালন করে তবে দুই বছরের সিয়ামের সাওয়াব তার আমল নামায় লিখা হবে।

হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম বায়হাক্বী বলেন: ইমাম আহমদ বলেছেন যে, এ হাদীসটি আপত্তিকর, পরিত্যাক্ত, জাল ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীসটির সনদে অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারীগণ রয়েছে।[৭৩৭]

অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করার বিষয়ে ইমাম বাইহাকীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ুতী বলেন: হাদীসটি বানোয়াট, এর সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। .... সনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুহাজির রয়েছেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন: মুহাম্মদ বিন মুহাজির হাদীস বানোয়াট-কারী।[৭৩৮]

৫. ১২ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে ৩০ বার সূরা ইখলাস:

জালিয়াতগণ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত একটি জাল সনদ তৈরী করে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছে: "যে ব্যক্তি মধ্য শা'বানের রাতে ১২ রাকাত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে ৩০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে তার অবস্থান সে অবলোকন করবে এবং তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন দশ ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।"

এ হাদীসের সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। এছাড়াও সনদের মধ্যে কতিপয় দুর্বল ও পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।[৭৩৯]

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, মধ্য শা'বানের রাতে নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট সূরার মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট রাকাত সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদীস সমূহ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কতিপয় নেককার ও সরলপ্রাণ ফকীহ ও মুফাস্‌সির তাঁদের রচনাবলিতে এগুলির জালিয়াতি ও অসারতা উল্লেখ ব্যতীতই এসকল ভিত্তিহীন হাদীস স্থান দিয়েছেন। এমনকি কেউ কেউ এগুলোর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া প্রদান করেছেন ও তদনুযায়ী আমল করেছেন, যা পরবর্তীতে এই রীতি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি) মধ্য শাবানের রাতে সালাত আদায়ের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসগুলির অসারতা উল্লেখপূর্বক বলেন, সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, যারা সুন্নাতের ইলমের সন্ধান পেয়েছেন তারা এগুলো দ্বারা প্রতারিত হন কি করে! এ সালাত চতুর্থ হিজরী শতকের পর ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে যার উৎপত্তি হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। এব্যাপারে অসংখ্য জাল হাদীস তৈরী করা হয়েছে যার একটিও সঠিক বা নির্ভরযোগ্য নয়।[৭৪০] তিনি আরো বলেন, হে পাঠক, এ সকল ভিত্তিহীন মিথ্যা হাদীস 'কুতুল কুলুব', 'ইহয়িয়া-উ- উলুমিদ্দীন' ও ইমাম সা'লাবীর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকার কারণে আপনারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হবেন না।[৭৪১] ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ আজলুনীও (১১৬২ হি) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৭৪২]

আল্লামা শাওকানী (১২৫০ হি) শবে বরাতের রাত্রিতে আদায়কৃত এই সালাত সংক্রান্ত হাদীসের ভিত্তিহীনতা উল্লেখ পূর্বক বলেন, এ সকল হাদীস দ্বারা এক দল ফকীহ প্রতারিত হয়েছেন। যেমন 'ইহয়িয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থকার ইমাম গাযালী ও অন্যান্যরা। এমনিভাবে কতিপয় মুফাস্‌সিরও প্রতারিত হয়েছেন। এ সালাতের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের জাল হাদীস রচিত হয়েছে। এ সকল হাদীস মাউযূ বা বানোয়াট হওয়ার অর্থ হলো, এই রাত্রিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাক'আত সালাত আদায়ের প্রচলন বাতিল ও ভিত্তিহীন। তবে কোনো নির্ধারিত রাক'আত, সূরা বা পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাধারণ ভাবে এই রাত্রিতে ইবাদত বা দোয়া করার বিষয়ে দুই একটি যয়ীফ হাদীস রয়েছে।"[৭৪৩]

তৃতীয়ত, আরো কিছু জাল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস

১. মধ্য শাবানের রাতে কিয়াম ও দিনে সিয়াম

ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে নিম্নলিখিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلا كَذَا أَلا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

"আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (সালাতে- দোয়ায়) দণ্ডায়মান থাক এবং দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ; ঐ দিন সুর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিয্ক অনুসন্ধানকারী আছে কি? আমি তাকে রিয্ক প্রদান করব। কোন দুর্দাশাগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।"

এ হদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর উস্তাদ হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি ইবনু আবি সাব্‌রাহ থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ থেকে, তিনি মুয়াবিয়া বিন আব্দুল্লাহ বিন জাফর থেকে, তিনি তাঁর পিতা আব্দুলাহ বিন জাফর থেকে, তিনি হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭৪৪]

ইবনু মাজাহ কর্তৃক সংকলিত হওয়ার কারণে হাদীসটি আমাদের সমাজে বহুল পরিচিত, প্রচারিত ও আলোচিত। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল পর্যায়ের বলে চিহ্নিত করেছেন।

এ হাদীসটি একমাত্র ইবনু আবি সাব্‌রাহ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এ হাদীস আলী ইবনু আবি তালিব থেকে তাঁর কোন ছাত্র বর্ণনা করেননি। আব্দুলাহ বিন জাফর বিন আবি তালিব থেকেও তাঁর কোন ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এমনকি মুয়াবিয়া ও ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ থেকেও তাঁদের কোনো ছাত্র হাদীসটি বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র ইবনু আবি সাব্‌রাহ দাবী করেছেন যে, তিনি ইবরাহীম থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবি সাব্‌রাহ (১৬২ হি) -এর পূর্ণনাম আবু বকর বিন আব্দুলাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি সাব্‌রাহ। তিনি মদীনার একজন বড় আলিম ও ফক্বীহ ছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক নিরীক্ষা ও বিচারের মাধ্যমে হাদীসের ইমামগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিতেন। অসংখ্য ইমাম তাঁকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আহমদ, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, বুখারী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান ও হাকিম নাইসাপূরী অন্যতম।[৭৪৫]

এরই আলোকে আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমদ বিন আবি বকর আল-বুসীরী (৮৪০ হি) বলেন, ইবনু আবি সাব্‌রাহর দুর্বলতার কারণে এ সনদটি দুর্বল। ইমাম আহমদ ও ইবনু মাঈন তাঁকে হাদীস বানোয়াটকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৭৪৬] শাইখ আলবানী বলেছেন, অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট। তিনি আরো বলেন, সনদটি বানোয়াট।[৭৪৭]

২. দুই ঈদ ও মধ্য-শাবানের রাত্রিভর ইবাদত

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيْدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ

যে ব্যক্তি মধ্য শাবানের রাত ও দুই ঈদের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবেনা যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।[৭৪৮]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী উপর্যুক্ত ঈসা ইবনু ইবরাহীম ইবনু তাহমান বাতিল হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে সুপরিচিত। ইমাম বুখারী, নাসায়ী, ইয়াহয়িয়া বিন মাঈন ও আবু হাতিম রাযি ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে তাকে পরিত্যক্ত বা মিথ্যাবাদী রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ঈসা ইবনু ইবরাহীম নামক এই ব্যক্তি তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করেছেন সেই 'সালামা বিন সুলাইমান' দুর্বল রাবী বলে পরিচিত। আর তার উস্তাদ হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেই 'মারওয়ান বিন সালিম' মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত।[৭৪৯] এভাবে আমরা দেখছি যে, এই হাদীসটির সনদের রাবীগণ অধিকাংশই মিথ্যাবাদী বা অত্যন্ত দুর্বল। এরা ছাড়া কেউ এই হাদীস বর্ণনা করেননি। কাজেই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের।

এখানে উল্লেখ্য যে, আবূ উমামা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে একাধিক দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যে ব্যাক্তি দুই ঈদের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তরের মৃত্যু হবেনা যে দিন সকল অন্তর মরে যাবে।' এ সকল বর্ণনায় দুই ঈদের রাতের সাথে মধ্য শাবানের রাতকে কেউ যুক্ত করেন নি।[৭৫০]

৩. পাঁচ রাত্রি ইবাদতে জাগ্রত থাকা

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা) এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الْخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

"যে ব্যক্তি পাঁচ রাত (ইবাদতে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হবে: যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, আরাফার রাত্রি, ঈদুল আযহার রাত্রি, ঈদুল ফিতরের রাত্রি ও মধ্য শাবানের রাত্রি।"

হাদীসটি ইস্পাহানী তার 'তারগীব' গ্রন্থে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ-এর সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। সুওয়াইদ, আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল'আম্মী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ওয়াহ্ব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে, তিনি মুয়ায ইবনু জাবাল থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-'আম্মী (১৮৪হি) নামক ব্যক্তি মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইমাম বুখারী, নাসাঈ, ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন, আহমদ ইবনু হাম্বাল, আবূ হাতিম রাযী, আবূ দাউদ ও অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এই ব্যক্তির মিথ্যাবাদিতার বিষয় উল্লেখ করেছেন। এজন্য এ হাদীসটি মাওযূ বা জাল হাদীস বলে গণ্য। ইবনুল জাওযী, ইবনু হাজার আসকালানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৭৫১]

৪. এই রাত্রিতে রহমতের দরজাগুলি খোলা হয়

আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইরাক (৯৬৩ হি) তাঁর মাউযূ বা জাল হাদীস সংকলনের গ্রন্থে ইবনু আসাকির-এর বরাত দিয়ে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস হিসেবে নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উবাই ইবনু কা'ব (রা) এর সূত্রে কথিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

"মধ্য শাবানের রাতে জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আগমন করে বলেন, আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ুন এবং আপনার মাথা ও হস্তদ্বয় উপরে উঠান। আমি বললাম, হে জিবরাঈল, এটি কোন্ রাত? তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ, এই রাতে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দেওয়া হয়। ... তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকী গোরস্তানে গমন করেন। তিনি যখন সেখানে সাজদারত অবস্থায় দোয়া করছিলেন, তখন জিবরাঈল সেখানে অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলুন। তিনি তখন তাঁর মস্তক উত্তোলন করে দেখেন যে, রহমতের দরজাগুলি খুলে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক দরজায় একজন ফিরিশতা ডেকে বলছেন, এই রাত্রিতে যে সাজদা করে তার জন্য মহা সুসংবাদ...।"

হাদীসটি উদ্ধৃত করে ইবনু ইরাক উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীস একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে সূত্রের রাবীগণ সকলেই অজ্ঞাতপরিচয় এবং হাদীসটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হিসেবে বিবেচিত।[৭৫২]

৫. পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না

আবূ উমামার (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে কথিত আছে,

خَمْسُ لَيَالٍ لاَ تُرَدُّ فِيْهِنَّ الدَّعْوَةُ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ

"পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয়না। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শাবানের রাত, জুমআর রাত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত।"

এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম ইবনু আসাকির (৫৭১ হি) তার 'তারীখ দিমাশক' গ্রন্থে আবু সাঈদ বুনদার বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ রূইয়ানির সূত্রে, তিনি ইবরাহীম বিন আবি ইয়াহয়িয়া থেকে, তিনি আবু কা'নাব থেকে, তিনি আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর "আল জামে আল সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসটি যয়ীফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৭৫৩] নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে বানোয়াট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৭৫৪] কারণ এ হাদীসের মূল ভিত্তি হলো ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া (১৮৪ হি) নামক একজন মুহাদ্দিস। ইমাম মালিক, আহমদ, বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, নাসাঈ, দারাকুতনী, যাহাবী, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে রাফিযী শিয়া, মুতাযিলী ও ক্বাদরিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং মিথ্যাবাদী ও অপবিত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী প্রথম বয়সে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিধায় কোনো কোনো শাফিয়ী মুহাদ্দিস তাঁর দুর্বলতা কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করেন। তবে শাফিয়ী মাযহাবের অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ এবং অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস এক কথায় তাকে মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফিয়ী নিজেও তার এই শিক্ষকের দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি পরবর্তী জীবনে তার সূত্রে কোনো হাদীস বললে তার নাম উল্লেখ না করে বলতেন, আমাকে বলা হয়েছে, বা শুনেছি বা অনুরূপ কোনো বাক্য ব্যবহার

করতেন।[৭৫৫] এই হাদীসটির ক্ষেত্রেও ইমাম শাফিয়ী বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আগের যুগে বলা হতো, পাঁচ রাতে দোয়া করা মুস্তাহাব....। ইমাম শাফিয়ী বলেন, এ সকল রাতে যে সব আমলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে আমি মুসতাহাব মনে করি।[৭৫৬]

এছাড়া সনদের অন্য রাবী আবু সাঈদ বুনদার বিন উমরও মিথ্যাবাদী ও হাদীস জালকারী বলে পরিচিত।[৭৫৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, হাফিয আব্দুর রায্যাক সান'আনী এই হাদীসটি অন্য একটি সনদে হযরত ইবনু উমারের (রা) নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন।[৭৫৮] আব্দুর রায্যাক সান'আনী বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, তিনি বায়লামানীকে বলতে শুনেছেন, তার পিতা বলেছেন, ইবনু উমার বলেছেন, পাঁচ রাতের দোয়া বিফল হয় না। ...."

এ সনদে আব্দুর রায্যাককে যিনি হাদীসটি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। পরবর্তী রাবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান বিন বায়লামানী হাদীস-জালিয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৭৫৯] উক্ত মুহাম্মাদের পিতা, সনদের পরবর্তী রাবী আব্দুর রাহমান বিন বায়লামানীও দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য রাবী।[৭৬০]

৬. শবে বরাতের গোসল

শবে বরাত বিষয়ক প্রচলিত মিথ্যা কথাগুলির অন্যতম হলো এই রাতে গোসল করার ফযীলত। বিষয়টি যদিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও জঘন্য বানোয়াট কথা, তবুও আমাদের সমাজে তা অত্যন্ত প্রচলিত। আমদের দেশের প্রচলিত প্রায় সকল পুস্তকেই এই জাল কথাটি লিখা হয় এবং ওয়াযে আলোচনায় বলা হয়। প্রচলিত একটি বই থেকে উদ্ধৃত করছি: "একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি উক্ত রাত্রিতে এবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করিবে, সেই ব্যক্তির গোসলের প্রত্যেকটি বিন্দু পানির পরিবর্তে তাহার আমল নামায় ৭০০ (সাতশত) রাকাত নফল নামাযের ছওয়াব লিখা যাইবে। গোসল করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজুর নামায পড়িবে।..."[৭৬১]

এ মিথ্যা কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কঠিন শীতের দিনেও অনেকে গোসল করেন। উপরন্তু ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার আশায় শরীর ও মাথা ভাল করে মোছেন না। এর ফলে অনেকে, বিশেষত, মহিলারা বড় চুলের কারণে ঠাণ্ডা-সর্দিতে আক্রান্ত হন। আর এ কষ্ট শরীয়তের দৃষ্টিতে পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, সুন্নাতের আলোকে এই রাতে গোসল করে ইবাদত করা আর ওযু করে ইবাদত করার মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই। অনুরূপভাবে এই রাতে গোসল করা এবং অন্য কোনো রাতে গোসল করার মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই।

৭. এই রত্রিতে নেক আমলের সুসংবাদ

এ বিষয়ে আমাদের দেশের প্রচলিত একটি কথা:

طُوْبَى لِمَنْ يَعْمَلُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْراً

"মহা সুসংবাদ তার জন্য সে শাবান মাসের মধ্যম রজনীতে নেক আমল করে...।" এ কথাটি উপরে উল্লিখিত উবাই ইবনু কা'র (রা) এর নামে প্রচারিত জাল হাদীসটি থেকে গ্রহণ করা।

৮. এই রাত্রিতে হালুয়া-রুটি বা মিষ্টান্ন বিতরণ

এই রত্রিতে হালুয়া-রুটি তৈরি করা, খাওয়া, বিতরণ করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা ইত্যাদি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কর্ম। এই রাত্রিতে এ সকল ইবাদত করলে কোনো বিশেষ সাওয়াব বা অতিরিক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে এই মর্মে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি।

৯. ১৫ই শা'বানের দিনে সিয়াম পালন

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাবান মাসের বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন, এমনকি প্রায় সারা মাসই সিয়ামরত থাকতেন। আমরা আরো দেখেছি যে, শা'বান মাসের মধ্যম রজনীর ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এই রাত্রিতে সাধারণভাবে দোয়া-ইসতিগফার বা সালাত আদায়ের উৎসাহ জ্ঞাপক কিছু যয়ীফ বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হাদীস রয়েছে। কিন্তু পরদিন সিয়াম পালনের বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস পাওয়া যায় না। ইবনু মাজাহ সংকলিত আলী (রা)-এর নামে বর্ণিত হাদীসটিতে সিয়াম পালনের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। শবে বরাতের রাতে ১৪ রাক'আত সালাত আদায় বিষয়ক হাদীসেও পরদিন সিয়াম পালনের ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি জাল। এ বিষয়ক আরেকটি জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত:

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ أَبَداً

"যে ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করবে, জাহান্নামের আগুন কখনোই তাকে স্পর্শ করবে না।"[৭৬২]

১০. প্রচলিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তার নমুনা

আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে মিশ্রিত করেন। অনেক সময় সহীহ

হাদীসের অনুবাদে অনেক বিষয় প্রবেশ করান যা হাদীসের নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। অনেক সময় নিজেদের খেয়াল-খুশি মত বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের নাম ব্যবহার করেন। এগুলির বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের লেখকগণের পরিশ্রম কবুল করুন, তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। শবে বরাত বিষয়ক কিছু ভিত্তিহীন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। প্রায় সকল পুস্তকেই এ কথাগুলি কম বেশি লিখা হয়েছে।

"হাদীসে আছে, যাহারা এই রাত্রিতে এবাদত করিবে আল্লাহ তাআলা আপন খাছ রহমত ও স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদের শরীরকে দোজখের অগ্নির উপর হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কখনও দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না। হযরত (ﷺ) আরও বলেন- আমি জিবরাইল (আঃ) এর নিকট শুনিয়াছি, যাহারা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে, তাহারা শবে ক্বদরের এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে।

আরও একটি হাদীসে আছে, হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে এবাদতকারী আলেম, ফাজেল, অলী, গাউছ, কুতুব, ফকীর, দরবেশ ছিদ্দীক, শহীদ, পাপী ও নিষ্পাপ সমস্তকে আল্লাহ তা'আলা মার্জনা করিবেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, বখীল, শরাবখোর, যেনাকার, নেশাখোর, ও পিতা-মাতাকে কষ্টদাতা- এই কয়জনকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করিবেন না। আরও একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা শাবানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ৩০০ খাছ রহমতের দরজা খুলিয়া দেন ও তাঁহার বান্দাদের উপর বে-শুমার রহমত বর্ষণ করিতে থাকেন।

কালইউবী কিতাবে লিখিত আছে,- একদিন হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে খোদাতাআলা! এ যামানায় আমার চেয়ে বুযর্গ আর কেহ আছে কি? তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়ই। সম্মুখে একটু গিয়াই দেখ। ইহা শুনিয়া ঈসা (আ) সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলেন ..... তখন বৃদ্ধ বলিলেন, আমি এতদ্দেশীয় একজন লোক ছিলাম। আমার মাতার দোওয়ায় আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বুযুর্গী দিয়াছেন। সুতরাং আজ ৪০০ বৎসর ধরিয়া আমি এই পাথরের ভিতরে বসিয়া খোদা তাআলার এবাদত করিতেছি এবং প্রত্যহ আমার আহারের জন্য খোদা তাআলা বেহেশত হইতে একটি ফল পাঠাইয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া হযরত ঈসা (আঃ) ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ... তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে ঈসা (আ)! জানিয়া রাখ যে, শেষ যমানার নবীর উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনরই তারিখের রাত্রে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে ও সেদিন রোযা রাখিবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার নিকট এই বৃদ্ধের চেয়েও বেশী বুযুর্গ এবং প্রিয় হইতে পারিবে। তখন ঈসা (আ) কাঁদিয়া বলিলেন, হে খোদা তাআলা! তুমি আমাকে যদি নবী না করিয়া আখেরী যমানার নবীর উম্মত করিতে তাহা হইলে আমার কতই না সৌভাগ্য হইত! যেহেতু তাঁহার উম্মত হইয়া এক রাত্রিতে এত ছওয়াব কামাই করিতে পারিতাম। ...

হাদীসে আছে, শাবানের চাঁদের চৌদ্দই তারিখের সূর্য অস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া ৪০ বার পাঠ করিলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

... দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে ... সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকাতেই সূরা এখলাছ দশবার করিয়া পাঠ করিবে ও এই নিয়মেই নামায শেষ করিবে। হাদীসে শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদের চারিটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন ও তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

তৎপর ঐ রাত্রিতে দুই দুই রাকাত করিয়া আরও চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে। ... প্রত্যেক রাকাতে সূরা ক্বদর একবার ও সূরা এখলাছ পঁচিশবার পাঠ করিবে এবং এই নিয়মে নামায শেষ করিবে।

হাদীস শরীফে আছে,- মাতৃগর্ভ হইতে লোক যেরূপ নিষ্পাপ হইয়া ভুমিষ্ট হয়, উল্লিখিত ৪ রাকাত নামায পড়িলেও সেইরূপ নিষ্পাপ হইয়া যাইবে। (মেশকাত) হাদীস শরীফে আছে,- যাহারা এই নামায পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়ো দিবেন। (তিরমিজী) আরও হাদীসে আছে,- যাহারা উক্ত রাত্রে বা দিনে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হযরত (ﷺ) এর উপর পাঠ করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর দোজখ হারাম করিবেন। হযরত (দঃ) ও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন। (সহীহ বোখারী) আর যাহারা উক্ত রাত্রিতে সূরা দোখান সাতবার ও সূরা ইয়াসীন তিনবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাদের তিনটি মকছুদ পুরা করিবেন। যথাঃ- (১) হায়াত বৃদ্ধি করিবেন। (২) রুজি-রেজক বৃদ্ধি করিবেন। (৩) সমস্ত পাপ মার্জনা করেবেন।"[৭৬৩]

উপরের কথাগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা যে, গ্রন্থকার এখানে মেশকাত, তিরমিযী ও বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভিত্তিহীন কিছু কথার জন্য, যে কথাগুলি এই গ্রন্থগুলি তো দূরের কথা কোনো হাদীসের গ্রন্থেই নেই। এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন সরলপ্রাণ বাঙালি পাঠক। বস্তুত এই পুস্তকটি এবং এই জাতীয় প্রচলিত পুস্তকগুলি জাল ও মিথ্যা কথায় ভরা। আমাদের সমাজে জাল হাদীসের প্রচলনের জন্য এরাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

২. ১১. ৯. রামাদান মাস

রামাদান মাসের ফযীলত, গুরুত্ব, ইবাদত, লাইলাতুল কাদর-এর গুরুত্ব, ইবাদত ইত্যাদি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে এক্ষেত্রেও জালিয়াতগণ তাদের মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন। অগণিত সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জাল হাদীস

তারা বানিয়েছেন। অনেক সময় তারা প্রসিদ্ধ সহীহ্ হাদীসের মধ্যে কিছু জাল কথা ঢুকিয়ে প্রচার করে। যেহেতু মূল ফযীলত প্রমাণিত, সেহেতু এ সকল জাল হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা করছি না। প্রচলিত কয়েকটি ভিত্তিহীন ও জাল কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

১. আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি ও আযাব-মুক্তি

রামাদান, সিয়াম, সাহরী খাওয়া, ইফতার করা ইত্যাদির গুরুত্ব, মর্যাদা, সাওয়াব ও বরকতের বিষয়ে অগণিত সহীহ্ হাদীস রয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির বদলে অনেক আজগুবি বাতিল, ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ الصُّيَّامِ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ

"যখন রমজান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা মাখলুকাতের (তাঁর সিয়াম পালনকারী সৃষ্টির) প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করেন, আর আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, সে কোন সময় শাস্তি ভোগ করিবে না।"[৭৬৪]

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি বানোয়াট ও জাল।[৭৬৫]

২. সাহরীর ফযীলত ও সাহরী ত্যাগের পরিণাম

সাহরী খাওয়ার উৎসাহ প্রদান করে একাধিক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্তত এক চুমুক পানি পান করে হলেও সাহরী খেতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহরীকে বরকতময় আহার বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইহূদী ও খৃস্টানদের সিয়ামের সাথে আমাদের সিয়ামের পার্থক্য সাহরী।

কিন্তু এ সকল সহীহ্ বা হাসান হাদীসের পাশাপাশি কিছু অতিরঞ্জিত বানোয়াট হাদীসও প্রচলিত হয়েছে। যেমন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন ... ছেহেরীর আহারের প্রতি লোকমার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এক বৎসরের ইবাদতের সাওয়াব দান করিবেন। ... যে সেহরী খাইয়া রোজা রাখিবে সে ইহূদীদের সংখ্যানুপাতে সাওয়াব লাভ করিবে। ... তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি সেহরী খাওয়া হইতে বিরত থাকিবে, তাহার স্বভাব চরিত্র ইহূদীদের ন্যায় হইয়া যাইবে।..."[৭৬৬]

এ সকল কথা সবই জাল ও বানোয়াট কথা বলেই প্রতীয়মান হয়।

৩. লাইলাতুল কাদ্‌র বনাম ২৭ শে রামাদান

কুরআন-হাদীসে 'লাইলাতুল কাদরের' মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'লাইলাতুল কাদ্‌র'কে নির্দিষ্ট করে দেন নি। রামাদান মাসের শেষ দশ রাত এবং বিশেষ করে শেষ দশ রাতের মধ্যে বেজোড় রাতগুলিতে লাইলাতুল কাদ্‌র সন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণের কেউ কেউ ২৭শে রামাদান লাইলাতুল কাদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বর্ণিত হয় নি। কাজেই '২৭শে রামাদানের' ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট বা বিকৃত।

এ জাতীয় কিছু বাতিল কথা: "হাদীসে আছে,- যে ব্যক্তি রমযানের ২৭শে তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত বন্দেগী করিবে। আল্লাহ তাআলা তাহার আমল নামায় এক হাজার বৎসরের এবাদতের ছওয়াব লিখিয়া দিবেন। আর বেহেশতে তাহার জন্য অসংখ্য ঘর নির্মাণ করাইবেন। ... আবূ বকর ছিদ্দীকের প্রশ্নের উত্তরে রাছূল (ﷺ) বলিয়াছিলেন: রমযানের ২৭ তারিখেই শবে কদর জানিও। ... রমযান মাসের ২৭শে তারিখের সূর্যাস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দোওয়া ৪০ বার পাঠ করলে ৪০ বৎসরের ছগীরা গুনাহ মার্জিত হইবে।"[৭৬৭]

অনুরূপ বানোয়াট কথা: "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি রমজান মসের ২৭ তারিখের রজনীকে জীবিত রাখিবে, তাহার আমলনামায় আল্লাহ ২৭ হাজার বৎসরের ইবাদতের তুল্য সাওয়াব প্রদান করিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে অসংখ্য মনোরম বালাখান নির্মাণ করিবেন যাহার সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নন।[৭৬৮]

৪. লাইলাতুল কাদ্‌রের গোসল

শবে বরাতের ন্যায় কাদ্‌রের রাত্রিতেও গোসল করার বিষয়ে জাল হাদীস আমাদের সমাজে প্রচলিত। যেমন: "যাহারা শবে-কৃদরের এবাদতের নিয়্যতে সন্ধ্যায় গোসল করিবে তাহাদের পা ধৌত করা শেষ না হইতেই পূর্বের পাপ মার্জিত হইয়া যাইবে।"[৭৬৯]

লাইলাতুল কাদ্‌র-এ গোসলের ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। তবে যযীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাদান মাসের শেষ ১০ রাতের প্রত্যেক রাতে মাগরিব ও ইশার সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে গোসল করতেন। এইরূপ গোসলের ফযীলতে আর কোনো কিছু জানা যায় না।[৭৭০]

৫. লাইলাতুল কাদ্‌রের সালাতের নিয়্যাত

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, 'নাওয়াইতু আন...' বলে যত প্রকারের নিয়্যাত আছে সবই বানোয়াট। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, আমাদের দেশে শবে বরাত, শবে কদর ইত্যাদি রাতে বা কোনো মর্যাদাময় দিনে নফল সালাত আদায়ের জন্য বিভিন্ন বানোয়াট নিয়্যাত প্রচলিত আছে। কোনো নফল সালাতের জন্যই কোনো পৃথক 'নিয়্যাত' নেই। লাইলাতুল কাদ্‌র বা যে কোনো রাতের সালাতের নিয়্যাত হবে 'সালাতুল লাইল' বা 'কিয়ামুল্লাইল'-এর। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুমিন দুই দুই রাক'আত করে নফল সালাতের নিয়্যাত বা উদ্দেশ্য মনে নিয়ে যত রাক'আত পারেন সালাত আদায় করবেন। যদি রাতটি সত্যই আল্লাহর নিকট 'লাইলাতুল কাদ্‌র' বলে গণ্য হয় তাহলে বান্দা লাইলাতুল কাদ্‌রের সাওয়াব লাভ করবে। মুখে 'আমি লাইলাতুল কাদ্‌রের নামায পড়ছি...' ইত্যাদি কথা বলা অর্থহীন ও ভিত্তিহীন।

৬. লাইলাতুল কাদ্‌রের রাতের সালাতের পরিমাণ ও পদ্ধতি

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে লাইলাতুল কাদরে 'কিয়াম' বা 'কিয়ামুল্লাইল' করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিয়ামুল্লাইল অর্থ রাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করা। এর জন্য কোনো বিশেষ রাক'আত সংখ্যা, সূরা, আয়াত, দোয়া বা পদ্ধতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সুদীর্ঘ কিরাআতে এবং সুদীর্ঘ রুকু ও সাজদার মাধ্যমে কিয়ামুল্লাইল করতেন। এজন্য সম্ভব হলে দীর্ঘ কিরাআত ও দীর্ঘ রুকু-সাজদা সহকারে সালাত আদায় করা উত্তম। না পারলে ছোট কিরাআতে রাক'আত সংখ্যা বাড়াবেন। মুমিন তার নিজের সাধ্য অনুসারে সূরা, তাসবীহ, দোয়া ইত্যাদি পাঠ করবেন। প্রত্যেকে তার কর্ম অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

কাজেই 'লাইলাতুল কাদরের সালাতের রাক'আত সংখ্যা, সূরার নাম, সালাতের পদ্ধতি, সালাতের মধ্যে বা পরে বিশেষ দোয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় সবই মনগড়া এবং বাতিল কথা।[৭৭১] অনেক প্রকারের মনগড়া কথা 'বাজারে' প্রচলিত। একটি মনগড়া পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট কিছু জাল হাদীস একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি।

"শবে-ক্বদরের নামাজ পড়িবার নিয়মঃ এই রাত্রিতে পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট ১২ রাকাত নফল নামায আছে। ঐ রাত্রিতে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে প্রথমে নিয়্যত করিবে, যথাঃ- "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ক্বেবলারোখ দাঁড়াইয়া শবে-ক্বদরের দুই রাকাত নামায পড়িতেছি।" নিয়্যত ও তাকবীরে-তাহরীমা অন্তে-ছুবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও 'ছুরা ফাতেহার' পর প্রত্যেক রাকাতে 'ছুরা ক্বদর' একবার, 'ছুরা এখলাছ' তিনবার পাঠ করিবে এবং এইরূপে নামায শেষ করিবে।

হাদীছে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে সমস্ত শবে-ক্বদরের ছওয়াব বখশিশ করিবেন এবং হযরত ইদ্রীস, হযরত শোয়াইব, হযরত আইয়ুব, হযরত ইউছুফ, হযরত দাউদ ও হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালাম এর সমস্ত পুণ্যের ছওয়াব তাহাদের আমলনামায় লিখিয়া দিবেন ও তাহাদের দোওয়া মকবুল হইবে এবং তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে এই পৃথিবীর সমতুল্য একটি শহর দান করিবেন।

অতঃপর দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নফল নামায পড়িবে। প্রথমতঃ নিয়্যত করিবে। নিয়্যত ও তাকবীরের তাহরীমা পাঠান্তে প্রত্যেক রাকাতে 'ছুরা ফাতেহার' পর 'ছুরা ক্বদর' একবার ও 'ছুরা এখলাছ' ২৭বার পড়িবে। ইহাও খেয়াল রাখিবে যে, প্রথমতঃ নিয়্যত করিয়া প্রথম রাকাতে 'ছুরা ফাতেহার' পূর্বে ছুবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ পড়িতে হয়। কিন্তু তৎপর যত রাকাতই হউক না কেন প্রত্যেক রাকাতে ছুরা ফাতেহার পূর্বে কেবল মাত্র বিছমিল্লাহ পড়িতে হইবে এবং উল্লিখিত নিয়মেই পড়িয়া নামায শেষ করিবে।

হাদীসে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে এইরূপ নিষ্পাপ করিয়া দিবেন, যেমন অদ্যই মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়াছে। আর বেহেশতে তাহাদের জন্য হাজার বালাখানা তৈয়ার হইবে। - (মেশকাত) তৎপর দুই দুই রাকাত করিয়া চারি রাকাত নামায পড়িবে। প্রথমতঃ নিয়্যত করিবে, নিয়্যত ও তাকবীরে-তাহরীমার পাঠান্তে ছোবহানাকা, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ও ছুরা ফাতেহার পরে প্রত্যেক রাকাতে, ছুরা ক্বদর তিনবার ও ছুরা এখলাছ ৫০ বার পড়িবে এবং এইরূপে নামায শেষ করিয়া ছেজদায় গিয়া ঐ দোওয়া একবার পড়িবে- যাহা সূর্যাস্ত যাইবার কালে পড়িবার জন্য লিখা হইয়াছে। হাদীছে আছে, যাহারা এই নামায পড়িবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাহাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন ও তাহাদের দোওয়া খোদা তাআলার দরবারে মকবুল হইবে।"[৭৭২]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। 'মেশকাত' তো দূরের কথা কোনো হাদীস-গ্রন্থেই এ সকল কথা পাওয়া যায় না।

৭. লাইলাতুল কাদ্‌রের কারণে কদর বৃদ্ধি

আমাদের দেশে প্রচলিত একটি পুস্তকে নিম্নের হাদীসটি লিখা হয়েছে:

مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ رَفَعَ اللهُ قَدْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদ্‌র পাবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার কদর বা মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।"[৭৭৩]

এ হাদীসটি জাল ও ভিত্তিহীন বলেই প্রতীয়মান হয়।

৮. জুমু'আতুল বিদা বিষয়ক জাল কথা

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, জুমু'আর দিন 'সাইয়েদুল আইয়াম' বা সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সূর্যের নিচে এর চেয়ে উত্তম দিবস আর নেই।[৭৭৪] অনুরূপভাবে 'রামাদান' শ্রেষ্ঠ ও বরকতময় মাস।[৭৭৫] কাজেই রামাদান মাসের জুমু'আর দিনটির মর্যাদা সহজেই অনুমেয়।

মুমিন স্বভাবতই প্রত্যেক জুমু'আর দিনে সুন্নাত সম্মত নেক আমলগুলি বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করেন। একইভাবে রামাদানের প্রত্যেক দিনেই মুমিন সাধ্যমত নেক কর্মের চেষ্টা করেন। আর রামাদানের জুমু'আর দিনে উভয় প্রকারের চেষ্টা একত্রিত হয়। রামাদান মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফযীলত পূর্ণ দিন হলো শেষ দশ দিন। এ ছাড়া রামাদানের শেষে রামাদান চলে যাচ্ছে বলে মুমিনের কিছু অতিরিক্ত আগ্রহ বাড়াই স্বাভাবিক।

এ ছাড়া রামাদান মাসের শেষ জুমু'আর বা অন্য কোনো জুমা'আর দিনের কোনো বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস বর্নিত হয় নি। তবে জালিয়াতগণ রামাদানের শেষ জুমু'আর দিনের বা 'বিদায়ী জুমু'আর' বিশেষ কিছু ফযীলত বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এই দিনে কাযা সালাত বা উমরী কাযা আদায়ের ফযীলত ও এই দিনের বিশেষ দোয়া বিষয়ক কিছু জাল ও বানোয়াট কথা। যেমন:

مَنْ قَضَى صَلاَةً مِنَ الْفَرَائِضِ (الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةَ) فِيْ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَابِراً لِكُلِّ صَلاَةٍ فَائِتَةٍ فِيْ عُمُرِهِ إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً

"যদি কোনো ব্যক্তি রামাদান মাসের শেষ জুমু'আর দিনে এক ওয়াক্ত (অন্য জাল বর্ণনায় ৫ ওয়াক্ত) কাযা সালাত আদায় করে তবে ৭০ বৎসর পর্যন্ত তার সকল কাযা সালাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ কথাটি জাল ও মিথ্যা কথা।[৭৭৬]

বাহ্যত এই জাল হাদীসটির প্রচলন ঘটেছে বেশ দেরি করে। ফলে ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে যারা জাল হাদীস সংকলন করেছেন তারা তা উল্লেখ করেন নি। ১০ হিজরী শতক থেকে মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস এর জালিয়াতির বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আল্লামা শাওকানী (১২৫০হি) বলেন: "এই কথাটি যে বাতিল তাতে কেনো সন্দেহ নেই। আমি কোনো মাউদূ হাদীসের গ্রন্থেও এই হাদীসটি পাই নি। কিন্তু আমাদের যুগে আমাদের সানআ (ইয়ামানের রাজধানী) শহরে অনেক ফকীহ ও ফিক্হ অধ্যয়নকারীদের মধ্যে তা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এদের অনেকেই এর উপর আমল করে। জানি না কে এই জাল কথাটি বানিয়েছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদীদের অপমানিত করুন।"[৭৭৭]

কোনো কোনো আলিম জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এ জাল ও ভিত্তিহীন কথাটি তাদের গ্রন্থে লিখেছেন। ৭ম-৮ম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা হুসামুদ্দীন হুসাইন ইবনু আলী সাগনাকী (৭১০ হি) হেদায়া'-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আন-নিহায়া' নামক গ্রন্থে এই কথাটিকে 'হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করছেন। 'আন-নিহায়া' হেদায়ার অন্যতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ। পরবর্তী ব্যাখ্যাকারগণ এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে হেদায়ার পরবর্তী অনেক ব্যাখ্যাকার এই জাল কথাটি 'হাদীস' হিসেবে লিখেছেন। অনেক সময় বড় আলিমদের প্রতি মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাদের সকল কথা নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি করে। তাঁদের গ্রন্থে এই হাদীস উদ্ধৃত থাকাতে অনেক সাধারণ মানুষ এই জাল কথাটিকে সঠিক বলে মনে করতে পারেন; এজন্য মোল্লা আলী কারী বলেন:

بَاطِلٌ قَطْعاً لأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لاَ يَقُوْمُ مَقَامَ فَائِتَةِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لاَ عِبْرَةَ بِنَقْلِ النِّهَايَةِ وَلاَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوْا مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَلاَ أَسْنَدُوْا الْحَدِيْثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِيْنَ

"এ কথাটি নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ এ কথাটি মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের বিরোধী। মুসলিম উম্মাহ একমত যে, কোনো একটি ইবাদত কখনোই অনেক বৎসরের পরিত্যক্ত ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না বা ক্ষতিপূরণ করতে পারে না। এরপর 'নেহায়া'-র রচয়িতা এবং হেদায়ার অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের উদ্ধৃতির কোনো মূল্য নেই; কারণ তাঁরা মুহাদ্দিস ছিলেন না এবং তারা কোনো হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েও এই হাদীসটি উল্লেখ করেন নি।"[৭৭৮]

আল্লামা আলী কারীর এই কথার টীকায় বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন:

أَحْسَنْتَ، أَحْسَنْتَ، جَزَاكَ اللهُ خَيْراً عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"অত্যন্ত ভাল কথা বলেছেন! অত্যন্ত ভাল কথা বলেছেন!! রাসূলুল্লাহর (ﷺ) হাদীসে পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।"[৭৭৯]

৯. প্রচলিত কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তার নমুনা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমাদের দেশে প্রচলিত পুস্তকাদিতে অনেক সময় লেখকগণ সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে যয়ীফ ও জাল হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়াও বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধকে একসাথে এমনভাবে সংমিশ্রণ করেন যে, পূরা কথাটি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে মিথ্যায় পরিণত হয়। হাদীস-গ্রন্থের উদ্ধৃতিও অনেক সময় মনগড়াভাবে দেওয়া হয়। একটি পুস্তকে বলা হয়েছে:

"হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, যাহারা শবে-ক্বদরে বন্দেগী করিবে তাহারা শত বৎসরের নেকীর ছওয়াব পাইবে। হযরত (ﷺ) আরও

বলিয়াছেন, যাহারা শবে-ক্বদরে এবাদত করিয়াছে দোজখের আগুন তাহাদের উপর হারাম হইবে। আর একটি হাদীসে আছে- যদি তোমরা তোমাদের গোরকে আলোকময় পাইতে চাও, তবে শবে-ক্বদরে জাগরিত থাকিয়া এবাদত কর। আরও হাদীসে আছে- যাহারা শবে-ক্বদরে জাগিয়া এবাদত করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাদের ছগীরা, কবীরা সমস্ত পাপই মার্জনা করিবেন ও কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে কিছুতেই নিরাশ করিবেন না। আর একটি হাদীসে আছে,- যে ব্যক্তি শবে-ক্বদর পাইবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে বেহেশতে লইবার জন্য জামিন হইব। ....."

"হাদীসে আছে: একদিন হযরত মূছা (আ) আল্লাহ তায়ালাকে প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি উম্মতে মোহাম্মদীকে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস দান করিয়াছ? তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মতকে উৎকৃষ্ট রমযান মাস দান করিয়াছি। মুছা (আ) বলিলেন, প্রভু, সেই মাসের কি ফযীলত ও মরতবা তাহা আমাকে শুনাও। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মূছা! রমযান মাসের ফযীলত ও মরতবার কথা কতই শুনাইব তবে সামান্য এতটুকুতেই বুঝিতে পারিবে যে, উহার মর্যাদা কি পরিমাণ! তোমাদের সাধারণের মধ্যে আমার মর্যাদা ও সম্মান যেরূপ অতুলনীয়, অন্যান্য মাস হইতে রমযান মাসের মর্যাদাও তেমনি অতুলনীয় জানিবে। (তিরমিযি)" ....

হযরত (ﷺ) বলেছেন, যাহারা নিজের পরিবার পরিজনসহ সন্তোষের সহিত রমজান মাসের ৩০টি রোযা রাখিয়াছে, হালাল জিনিস দ্বারা ইফতার করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে ঐ প্রকার ছওয়াব দিবেন, যেমন তাহারা মক্কা শরীফে ও মদীনা শরীফে রোযা রাখিয়াছে। হাদীসে আছে, যাহারা উক্ত স্থানসমূহে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ৭০ হাজার হজ্জের, ৭০ হাজার ওমরার ও ৭০ হাজার রমযান মাসের ছওয়াব দিবেন ও পৃথিবীতে যত ঈমানদার বান্দা আছেন, সমস্তের নেকীর ছওয়াব দিবেন আর ঐ পরিমান পাপও তাহাদের আমলনামা হইতে কাটিয়া দিবেন। আর সপ্ত-আকাশে যত ফেরেস্তা আছে, তাহাদের সমস্তের পূণ্যের ছওয়াব তাহাদের আমলনামায় লিখিয়া দিবেন। (তিরমিজী)"[৭৮০]

এ সকল কথা এভাবে সুনান তিরমিযী তো দূরের কথা, অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারিনি। শুধুমাত্র মক্কা মুকাররামায় রামাদান পালনের বিষয়ে দু একটি যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত গ্রন্থকার এখানে ইবনু মাজাহ সংকলিত নিম্নের হাদীসটির 'ইচ্ছামত' অনুবাদ করেছেন:

ইবনু মাজাহ বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমার বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-আম্মী বলেছেন, তার পিতা থেকে, সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে, ইবনু আব্বাস থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً

"যে ব্যক্তি মক্কায় রামাদান মাস পাবে, সিয়াম পালন করবে এবং যতটুকু তার জন্য সহজসাধ্য হবে ততটুকু কিয়ামুল্লাইল পালন করবে, আল্লাহ তার জন্য অন্যত্র এক লক্ষ রামাদান মাসের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। এবং আল্লাহ তার জন্য প্রতি দিবসের পরিবর্তে একটি দাসমুক্তি এবং প্রতি রাতের পরিবর্তে একটি দাসমুক্তি, এবং প্রতি দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়াসাওয়ার পাঠানো এবং প্রতি দিনের জন্য একটি নেকি এবং প্রতি রাতের জন্য একটি নেকি লিপিবদ্ধ করবেন।"[৭৮১]

এ হাদীসটি একমাত্র আব্দুর রাহীম ইবনু যাইদ আল-আম্মী (১৮৪ হি) নামক এ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বর্ণনা করে নি। এ আব্দুর রাহীম একজন মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত রাবী বলে প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত ও পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৭৮২]

২. ১১. ১০. শাওয়াল মাস

প্রথমত, সহীহ হাদীসের আলোকে শাওয়াল মাস

শাওয়াল মাস হজ্জের মাসগুলির প্রথম মাস। এই মাস থেকে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। এছাড়া সহীহ হাদীস দ্বারা এই মাসের একটি ফযীলত প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"যে ব্যক্তি রামাদান মাসের সিয়াম পালন করবে। এরপর সে শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করবে, তার সারা বৎসর সিয়াম পালনের মত হবে।"[৭৮৩]

কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে পুরো শাওয়াল মাস সিয়াম পালনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি রামাদান এবং শাওয়াল মাস এবং (সপ্তাহে) বুধবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭৮৪]

এ ছাড়া শাওয়াল মাসের আর কোনো ফযীলত প্রমাণিত নয়। মুমিন এ মাসে তার তাহাজ্জুদ, চাশত, যিক্‌র ওযীফা ইত্যাদি সাধারণ ইবাদত নিয়মিত পালন করবেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। অতিরিক্ত এই ছয়টি সিয়াম পালন করবেন। এছাড়া এই মাসের জন্য বিশেষ সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া, দান বা অন্য কোনো নেক আমল, অথবা এই মাসে কোনো নেক আমল করলে বিশেষ সাওয়াবের বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত বা কথিত সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এগুলির অনেক কথা সাধারণভাবে শাওয়াল মাসের ফযীলত ও ছয় রোযার বিষয়ে বানানো হয়েছে। আর কিছু কথা শাওয়াল মাসের প্রথম দিন বা ঈদুল ফিতরের দিনের বিশেষ নামায বা আমলের বিষয়ে বানানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শাওয়াল মাস বিষয়ক কিছু জাল হাদীস

১. ৬ রোযা ও অন্যান্য ফযীলত

এ সকল বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: "হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন : যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে নিজেকে গুনাহের কার্য হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতের মধ্যে মনোরম বালাখানা দান করিবেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসের প্রথম রাত্রিতে বা দিনে দুই রাকয়াতের নিয়তে চার রাকয়াত নামায আদায় করিবে এবং উহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর ২১ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে; করুণাময় আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জাহান্নামের ৭টি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং জান্নাতের ৮টি দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আর মৃত্যুর পূর্বে সে তাহার বেহেশতের নির্দিষ্ট স্থান দর্শন করিয়া লইবে।... অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করিবে সে ব্যক্তি শহীদানের মর্যাদায় ভূষিত হইবে।..."[৭৮৫]

এগুলি সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা হাদীসের নামে বলা হয়েছে।

শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়ামের ফযীলত সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জেনেছি। এ বিষয়ে অতিরঞ্জিত অনেক জাল কথাও প্রচলন করা হয়েছে। যেমনঃ "হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাস্তির শৃংখল ও কঠোর জিঞ্জিরের আবেষ্টনী হইতে নাজাত দিবেন.. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাউয়াল মাসের ৬টি রোজা রাখিবে, তাহার আমলনামায় প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে সহস্র রোজার সাওয়াব লিখা হইবে।"... "রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজা রাখেন আল্লাহ পাক তার জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেন।...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, আল্লা-তায়ালা তার আমল নামায় সমস্ত মুহাম্মদী নেককার লোকের সাওয়াব লিখেন এবং সে হযরত সিদ্দিক আকবার (রা)-এর সঙ্গে বেহেস্তে স্থান পাবে।...যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজা রাখে আল্লাহ তায়ালা তাকে লাল-ইয়াকুত পাথরের বাড়ী দান করবেন এবং প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে দুধ ও মধুর নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। ফেরেশতারা তাকে আসমান হতে ডেকে বলবেন, হে আল্লাহর খাস-বান্দা, আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। শাওয়াল মাসে লূতের (আ) কওম ধ্বংস হয়েছিল, নূহের (আ)কওম ডুবেছিল, হুদের (আ) কওম ধ্বংস হয়েছিল...."[৭৮৬]

ইত্যাদি অসংখ্য মিথ্যা কথা দুঃসাহসের সাথে নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহ(ﷺ) -এর নামে বলা হয়েছে। আমাদের সম্মানিত লেখকগণ একটুও চিন্তা ও যাচাই না করেই সেগুলি তাঁদের পুস্তকে লিখেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

২. ঈদুল ফিতরের দিনের বা রাতের বিশেষ সালাত

শাওয়ালের ১ম তারিখ ঈদুল ফিতর। একাধিক যয়ীফ হাদীসে ঈদুল ফিতরের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ইবাদতের কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি, রাক'আত, সূরা ইত্যাদি বলা হয় নি।

ঈদের দিনে সালাতুল ঈদ ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ নফল সালাতের কোনো নির্দেশনা কোনো সহীহ হাদীসে নেই। তবে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু হাদীস রচনা করেছে। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের দিনের বা রাতের ৪ রাক'আত সালাত বিষয়ক একটি জাল হাদীস পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ক আরো একটি প্রচলিত জাল হাদীস উল্লেখ করছি: "যিনি আমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, জিবরাঈল আমাকে ঈসরাফীলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের রাত্রে ১০০ রাক'আত সালাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাক'আতে ১ বার সূরা ফাতিহা এবং ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, এরপর রুকতে এবং সাজদায় ... অমুক দোয়া ১০ বার পাঠ করবে, এরপর সালাত শেষে ১০০ বার ইসতিগফার পাঠ করবে। এরপর সাজদায় যেয়ে বলবে....। যদি কেউ এইরূপ করে তাহলে সাজদা থেকে ওঠার আগেই তার পাপ ক্ষমা করা হবে, রামাদানের সিয়াম কবুল করা হবে.... ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৭৮৭]

৩. ঈদুল ফিতরের পরে ৪ রাক'আত সালাত

ঈদুল ফিতরের দিনে কোনো বিশেষ সালাতের বিশেষ সাওয়াব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু জালিয়াতগণ সালাতুল ঈদ আদায়ের পরে ৪ রাক'আত সালাতের বিশেষ ফযীলতের কাল্পনিক কাহিনী বানিয়েছে। একটি জাল হাদীস নিম্নরূপ:

"যদি কেউ সালাতুল ঈদ আদায় করার পরে ৪ রাক'আত সালাত আদায় করে, প্রত্যেক রাকা'আতে অমুক অমুক সূরা পাঠ করে, তবে সে যেন আল্লাহর নাযিল করা সকল কিতাব পাঠ করল, সকল এতিমকে পেটভরে খাওয়াল, তেল মাখালো, পরিষ্কার

করল। তার ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে, তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়া হবে... ।"[৭৮৮]

২. ১১. ১১. যিলকাদ মাস

যুলকা'দা মাসের সাধারণ দুটি মর্যাদা রয়েছে: **প্রথমত,** তা ৪টি হারাম মাসের একটি। **দ্বিতীয়ত,** তা হজ্জের মাসগুলির দ্বিতীয় মাস। এ ছাড়া এই মাসের বিশেষ কোনো ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচার করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরমান, তোমরা যিলক্বদ মাসকে সম্মান করিবে, যেহেতু ইহা মর্যাদাবান মাসসমূহের মধ্যে প্রথম মাস। ... যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের ভিতরে একদিন রোজা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি ঘন্টার পরিবর্তে একটি হজ্জের সাওয়াব তাহাকে দান করিবেন।... যেই ব্যক্তি এই মাসের যে কোন জুমুয়ার দিবসে দুই দুই রাকয়া'তের নিয়তে চার রাকয়া'ত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রতি রাকয়া'তে সূরা ফাতিহার পরে ১০ বার করিয়া সূরা ইখলাছ পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সাওয়াব দান করিবেন। ... যেই ব্যক্তি যিলক্বদ মাসের প্রত্যেক রজনীতে দুই রাকয়া'ত করিয়া নামায আদায় করিবে এবং ইহার প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাছ তিনবার করিয়া পাঠ করিবে, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির আমলনামায় একজন হাজী ও একজন শহীদের পূণ্যের তুল্য সাওয়াব দান করিবেন এবং রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করিবে।..." "... এই মাসের রোজাদারের প্রত্যেক নিঃশ্বাসে একটি গোলাম আজাদ করবার সাওয়াব প্রদান করেন। ... এই মাসকে গনীমত মনে করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি এই মাসে একদিন এবাদত করে উহা হাজার বৎসর হতেও উৎকৃষ্ঠ। ... যিলক্বদ মাসের সোমবারের রোজা হাজার বৎসরের এবাদত হতেও উৎকৃষ্ঠ। ... এই চাঁদে যে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক তার জন্য প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে এক একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব দান করবেন। ... ইত্যাদি ইত্যাদি.... ।"[৭৮৯]

এগুলি সবই দুঃসাহসিক নির্লজ্জ জালিয়াতগণের কথা, যা তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বানিয়ে প্রচার করেছে এবং জাহান্নামে নিজেদের আবাসস্থল তৈরি করেছে। দুঃখজনক হলো, অনেক আলিম বা লেখক যাচাই বাছাই না করেই এই সমস্ত আজগুবি মিথ্যা কথাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বলে উল্লেখ করছেন। অন্তত কোন্ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত তা যাচাই করলেও এগুলির জালিয়াতি ধরা পড়ে যেত। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

২. ১১. ১২. যিলহাজ্জ মাস

প্রথমত, সহীহ হাদীসের আলোকে যিলহাজ্জ মাস

যুলহাজ্জ বা যিলহাজ্জ মাস ৪টি হারাম মাসের অন্যতম। এই মাসেই হজ্জ আদায় করা হয় এবং এই মাসেই ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। এই মাসের প্রথম ১০ দিনে বেশি বেশি নেক কর্ম করতে সহীহ হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন: "যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর নিকট তত প্রিয় নয়।"[৭৯০] যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দশ দিনের প্রতি দিনের সিয়াম এক বৎসরের সিয়ামের তুল্য এবং প্রত্যেক রাত লাইলাতুল কাদ্‌রের তুল্য।[৭৯১] অন্য একটি দুর্বল হাদীসে বলা হয়েছে, এই দশ দিনের নেক আমলের ৭০০ গুণ সাওয়াব প্রদান করা হয়।[৭৯২] অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, কথিত আছে যে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এক হাজার দিনের সমান এবং বিশেষত আরাফার দিন ১০ হাজার দিনের সমান।[৭৯৩]

যুলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থানের মাধ্যমে হজ্জের মূল দায়িত্ব পালন করেন। যারা হজ্জ করছেন না তাদের জন্য এই দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এই দিনের সিয়ামের বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তা বিগত বৎসর ও পরবর্তী বৎসরের পাপ মার্জনা করে।"[৭৯৪]

দ্বিতীয়ত, যিলহাজ্জ মাস বিষয়ক কিছু বানোয়াট কথা

এ সকল সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের পাশাপাশি এই মাসের ফযীলতে অনেক জাল হাদীস সমাজে প্রচালিত রয়েছে। এ সকল জাল হাদীসে এই মাসের জন্য বিশেষ বিশেষ সালাত ও সিয়ামের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এই মাসের ১ম দশ দিনের ফযীলতের বিষয়েও অনেক জাল কথা তারা বানিয়েছে।

১. যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিন

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের অংশ হিসেবে এ দিনটির ফযীলত রয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ অন্য ফযীলত প্রচার করেছে:

وُلِدَ إِبْرَاهِيْمُ فِيْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ ذِيْ الْحِجَّةِ فَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَصَوْمِ سَبْعِيْنَ سَنَةً (فَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً)

"যিলহাজ্জ মাসের প্রথম তারিখে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই যে ব্যক্তি এই দিনে সিয়াম পালন করবে সে ৭০

বৎসর সিয়াম পালনের সাওয়াব পাবে... তার ৮০ বৎসরের পাপের মার্জনা হবে... ।"[৭৯৫]

২. যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ, ইয়াওমুত তারবিয়া

যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখকে 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বলা হয়। এই দিনে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। হাজীগণ এই দিনে হজ্জের জন্য মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য এই দিনের বিশেষ কোনো আমল নেই। যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের অংশ হিসেবে এর মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ এই তারিখের দিবসের ও রাতের জন্য বিশেষ সালাত ও সিয়ামের কাহিনী রচনা করেছে। ইতোপূর্বে শবে বরাত বিষয়ক জাল হাদীস আলোচনার সময় 'তারবিয়ার' রাত বা যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকার বিষয়ে কয়েকটি জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীস আমরা দেখতে পেয়েছি। আরেকটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَعْطَاهُ اللهُ مِثْلَ ثَوَابِ أَيُّوْبَ عَلَى بَلاَئِهِ

"যে ব্যক্তি তারবিয়ার দিনে (যিলহাজ্জের ৮ তারিখে) সিয়াম পালন করবে আল্লাহ্ তাকে সেই পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন, যে পরিমাণ সাওয়াব আইয়ূব (আ) তার বালা-মুসিবতের কারণে লাভ করেছিলেন।"[৭৯৬]

৩. যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ, আরাফার দিন

আরাফার দিনে সিয়াম পালনের ফযীলত আমরা জানতে পেরেছি। হাজীগণ ব্যতীত অন্য মুসলিমের জন্য এই তারিখের দিনে বা রাতে আর কোনো বিশেষ সালাত, দোয়া, যিকির বা অন্য কোনা নেক আমলের নির্ধারিত বিধান বা পদ্ধতি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। জালিয়াতগণ এ দিনের সালাত, যিক্র, দোয়া ইত্যাদির বিষয়েও অনেক জাল কথা প্রচার করেছে।

৪. যিলহাজ্জ মাসের বানোয়াট সালাত

আমরা দেখেছি যে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন ও রাত অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ণ। এই সময়ে নফল সালাত, সিয়াম, যিক্র, দোয়া, দান ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত বন্দেগি যথাসাধ্য বেশি বেশি করে পালন করা দরকার। যে যতটুকু করতে পারবেন ততটুকুর সাওয়াব পাবেন। এসকল দিনে বা যিলহাজ্জ মাসের কোনো দিন বা রাতের জন্য কোনোরূপ বিশেষ সালাত বা সালাতের বিশেষ পদ্ধতি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট। যেমন:

১. যিলহাজ্জ মাসের প্রথম রাত্রির সালাত: ২ রাক'আত বা বেশি রাক'আত ... সালাত, অমুক অমুক সূরা দ্বারা ... ইত্যাদি।
২. যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ 'ইয়াওমুত তারবিয়ার' রাতের সালাত: ২/৪ ... ইত্যাদি রাক'আত সালাত, অমুক অমুক সূরা দিয়ে...।
৩. যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ 'ইয়াওমুত তারবিয়ার' দিবসের সালাত: ৬/৮ ...ইত্যাদি রাক'আত সালাত, অমুক অমুক সূরা দিয়ে...।
৪. আরাফার রাতের সালাত, ১০০ রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা... অত বার ... ইত্যাদি।
৫. আরাফার দিনের সালাত, ২/৪... ইত্যাদি রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা... অত বার ... ইত্যাদি।
৬. ঈদুল আযহার বা কুরবানীর দিনের রাতের সালাত, ১২/... ইত্যাদি রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা অত বার....।
৭. কুরবানীর দিন বা ঈদুল আযহার দিনের সালাত, ঈদুল আযহার পরে ২ রাক'আত সালাত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা অত বার...।
৮. যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিনের সালাত, দুই রাক'আত, প্রত্যেক রাক'আতে অমুক সূরা ও অমুক আয়াত অত বার ...।

এ সকল বানোয়াট সালাতের মধ্যে বা শেষে কিছু দোয়া বা যিক্র-এর কথাও উল্লেখ করেছে জালিয়াতগণ। তারা এ সকল সালাতের জন্য আকর্ষণীয় ও আজগুবি অনেক সাওয়াব ও ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছে।[৭৯৭]

৫. যিলহাজ্জ মাসের বানোয়াট সিয়াম

যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন এবং বিশেষত আরাফার দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ সাওয়াব ও মর্যাদার কথা সহীহ ও যয়ীফ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু জালিয়াতগণ ভাবে যে, এ সকল সাওয়াবে মুসলমানদের তৃপ্তি হবে না, এজন্য উদ্ভট সব ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে এ সকল দিনে ও অন্যান্য দিনে সিয়াম পালনের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস বানিয়েছে।

৬. যিলহাজ্জের শেষ দিন ও মুহার্‌রামের প্রথম দিনের সিয়াম

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِيْ الْحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَقَدْ خَتَمَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ بِصَوْمٍ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ بِصَوْمٍ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِيْنَ سَنَةً

"যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিন এবং মুহার্‌রাম মাসের প্রথম দিন সিয়াম পালন করল, সেই ব্যক্তি তার বিগত বছরকে সিয়াম দ্বারা সমাপ্ত করলো এবং আগত বছরকে সিয়াম দ্বারা স্বাগত জানালো। কাজেই আল্লাহ তার ৫০ বৎসরের কাফফারা বা পাপ

মার্জনা করবেন।"[৭৯৮]

এরূপ আরো অনেক আজগুবি সনদহীন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।[৭৯৯]

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জালিয়াতদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখানোর একটি বড় ক্ষেত্র হলো সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন প্রকারের নেক আমলের ফযীলতের বিষয়ে জাল হাদীস তৈরি করা। এর বড় কারণ হলো, এই ধরনের জাল কথা সহজেই সরলপ্রাণ মুসলমানদের মন আকৃষ্ট করে এবং এগুলি দিয়ে সহজেই সরলপ্রাণ বুযুর্গ ও লেখকগণকে ধোকা দেওয়া যায়। তাঁরা আমল ভালবাসেন এবং আমলের ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলি সরল মনে গ্রহণ করেন।

এই জাতীয় জাল কথা প্রচলিত হওয়ার কারণও এই। অন্যান্য জাল কথার চেয়ে আমলের ফযীলত বিষয়ক জাল কথা প্রসিদ্ধি লাভের কারণ হলো, অনেক বুযুর্গ ওয়ায়েয, দরবেশ বা লেখক এগুলির মধ্যে ফযীলতের আধিক্য দেখে সরল মনে এগুলিকে গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য এগুলি মুখে বলেছেন বা বইয়ে লিখেছেন। আর, একবার একজন লিখলে সাধারণত পরবর্তী লেখকগণ সেগুলি থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করতে থাকেন। অনেকেই যাচাই বাছাই করার সময় পান না। অনেকে ভাবেন, যাই হোক, এর দ্বারা তো কিছু মানুষ আমল করছে। ভালই তো!!

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, অনেক নেককার বুযুর্গ এগুলির উপর আমল করেছেন, অনেকে ফল ও প্রভাব লাভ করেছেন। অনেকে এগুলি তাদের ওয়াযে বলেছেন বা বইয়ে লিখেছেন- তাঁরা কি সবাই গোনাহগার হবেন?

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, এ সকল জাল হাদীসে সাধারণত, সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া, দান ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নেক আমলের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মুমিনের দায়িত্ব হলো, নফল সালাত, সিয়াম, যিক্‌র, দোয়া ইত্যাদি সকল প্রকার দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক নেক আমল নিয়মিত পালন করা। এ হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তার সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি তাবিয়ী ও বুযুর্গগণের রীতি ও তরিকা। এরপর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মর্যাদাময় দিন ও রাতগুলিতে অতিরিক্ত ইবাদতের চেষ্টা করা। এ সকল মিথ্যা ও জাল হাদীস সাধারণত মুমিনকে সহীহ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত ইবাদত থেকে দূরে নিয়ে যায়, অকারণ পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে এবং সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন রীতি পদ্ধতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। এ ছাড়া যে কোনো কথা শুনে বা পড়েই তাকে হাদীস বলে মেনে নেওয়া, হাদীসের কোন্ গ্রন্থে সংকলিত আছে তা অন্তত যাচাই করার চেষ্টা না করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নির্দেশনার বিরোধী ও দ্বীনের বিষয়ে অবহেলার শামিল। এরপরও যারা অসাবধানতা, সরলতা বা অজ্ঞতা বশত এগুলিকে সঠিক মনে করে এগুলির উপর আমল করেছেন, তারা এ সকল জাল হাদীসে বর্ণিত জাল ও বানোয়াট সাওয়াব পাবেন না, তবে মূল নেক আমালের সাধারণ সাওয়াব লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

কিন্তু যদি কেউ এগুলিকে জাল বলে জানার বা শোনার পরেও এগুলি বলেন, লিখেন বা পালন করেন, এ বিষয়ে কোনো তাহকীক বা যাচাই করতে আগ্রহী না হন, তবে অবশ্যই তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হবেন।

২. ১২. মৃত্যু, জানাযা ইত্যাদি বিষয়কঃ

১. প্রতিদিন ২০ বার মৃত্যুর স্মরণে শাহাদতের মর্যাদা

আমাদের দেশের ওয়াযে ও পুস্তকে বহুল প্রচলিত একটি কথা:

يَكُوْنُ مَعَ الشُّهَدَاءِ مَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِيْنَ مَرَّةً

"যে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রতিদিন বিশবার স্মরণ করবে সে শহীদগণের সঙ্গী হবে বা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।"

মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটি সনদবিহীন বানোয়াট কথা।[৮০০]

২. মৃত্যুর কষ্টের বিস্তারিত বিবরণ

মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কষ্ট বা 'সাকারাতুল মাওত' বিষয়ক কিছু কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণার বিস্তারিত বিবরণ, তুলনা, উদাহরণ, প্রত্যেক অঙ্গের সাথে আত্মার কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ক প্রচলিত হাদীসগুলি কিছু বানোয়াট ও কিছু অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৮০১]

৩. ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) যখন তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি বলেন, হে ইবরাহীম, মৃত্যুকে কেমন বোধ করলে? তিনি বলেন, আমার অনুভব হলো যে, আমার চামড়া টেনে তুলে নেওয়া হচ্ছে। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করা হয়েছিল তার পরেও এইরূপ...।

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি মিথ্যা ও জাল।[৮০২]

৪. চারিদিক থেকে জানাযা বহন বা মৃতের অনুগমন

আমাদের মধ্যে অতি প্রচলিত রেওয়াজ হলো, মৃতদেহ দাফনের জন্য বহন করার সময় একই ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে চারিদিক থেকে

বহন করেন। এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "যদি কেউ চারিদিক থেকে মৃতের অনুগমন করেন বা চারিদিক থেকে মৃতের খাটিয়া বহন করেন তাহলে আল্লাহ তার চল্লিশটি কবীরা গোনাহ ক্ষমা করবেন।"

ইবনুল জাওযী, আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই অর্থের হাদীসকে মাউযূ বা মুনকার ও অত্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে সুয়ূতী, ইবনু ইরাক প্রমুখ মুহাদ্দিস এই অর্থের হাদীসকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।[৮০৩]

৫. নেককার মানুষদের পাশে কবর দেওয়া

একটি প্রচলিত জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

اِدْفَنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّي بِجَارِ السُّوْءِ كَمَا يَتَأَذَّي الْحَيُّ بِجَارِ السُّوْءِ

"তোমাদের মৃতদেরকে নেককার মানুষদের মাঝে দাফন করবে; কারণ জীবিত মানুষ যেমন খারাপ প্রতিবেশির দ্বারা কষ্ট পায়, মৃত মানুষও তেমনি খারাপ প্রতিবেশি দ্বারা কষ্ট পায়।"

হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদি রাবী বিদ্যমান।[৮০৪]

৬. কবর যিয়ারতের ফযীলত

কবর যিয়ারত করা একটি সুন্নাত নির্দেশিত নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে মাঝে মাঝে কবর যিয়ারত করতেন। এছাড়া তিনি আখেরাতের স্মরণ, মৃত্যুর স্মরণ ও মৃতব্যক্তির সালাম ও দোয়ার জন্য কবর যিয়ারত করতে উম্মতকে অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন।[৮০৫]

এই সাধারণ সাওয়াব ছাড়া যিয়ারতের বিশেষ সাওয়াবের বিষয়ে কিছু জাল হাদীস প্রচলিত আছে। যেমন: "যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতা, মাতা, ফুফু, খালা বা কোনো আত্মীয়ের কবর যিয়ারত করে তবে তার জন্য একটি মাবরূর হজ্জের সাওয়াব লিখা হবে.... ।"[৮০৬]

৮. শুক্রবারে কবর যিয়ারতের বিশেষ ফযীলত

কবর যিয়ারত যে কোনো দিনে যে কোনো সময়ে করা যেতে পারে। কোনো বিশেষ দিনে বা বিশেষ সময়ে কবর যিয়ারতের জন্য বিশেষ ফযীলতের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত হাদীস:

مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا كُلَّ جُمْعَةٍ، غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَارًّا

"যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যেক শুক্রবারে তার পিতামাতার বা একজনের কবর যিয়ারত করে তবে তার পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তাকে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে।"

হাদীসটি ইমাম তাবারানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তাঁরা হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান ইবনু আব্দুর রাহমান-এর সূত্রে সংকলন করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান ইয়াহইয়া ইবনুল আলা আল-বাজালী থেকে, তিনি আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মাখারিক থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে, তিনি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু নু'মান অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। তার উস্তাদ হিসেবে উল্লিখিত ইয়াহইয়া ইবনুল আলা আল-বাজালী পরিত্যক্ত ও মিথ্যায় অভিযুক্ত রাবী। ইমাম আহমদ, ওকী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে স্পষ্টভাবে মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে অভিহিত করেছেন। তার উস্তাদ হিসেবে উল্লিখিত 'আব্দুল কারীম'ও অত্যন্ত দুর্বল রাবী হিসেবে পরিচিত। এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষত ইয়াহইয়া নামক এই মিথ্যাবাদী রাবীর কারণে হাদীসটি জাল বলে গণ্য হয়।[৮০৭]

৭. কবর যিয়ারতের সময় সূরা ইয়াসীন পাঠ

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কবর যিয়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) "আস-সালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মু'মিনীন..." বা অনুরূপ বাক্য দ্বারা কবরবাসীকে সালাম প্রদান করতেন। এবং সালামের সাথেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে দোয়া করতেন। তিনি সাহাবীগণকে এভাবে সালাম-দোয়া করতে শিক্ষা দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একরাতে তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে হাত তুলে মৃতদের জন্য দোয়া করেন।[৮০৮]

এভাবে সালাম ও দোয়া ছাড়া কবর যিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত বা কোনো সূরা পাঠের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। কোনো কোনো ফকীহ যিয়ারতের পূর্বে আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস ইত্যাদি পাঠ করার কথা বলেছেন। তবে এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ক জাল হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ (عِنْدَهُ) "يس" غُفِرَ لَهُ (بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ)

"যদি কেউ তার পিতামাতা বা উভয়ের একজনের কবর শুক্রবারে যিয়ারত করে এবং (তার কাছে) সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। (পঠিত আয়াত বা অক্ষরের সংখ্যায় তাকে ক্ষমা করা হবে)।"

ইবনু আদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁরা আমর ইবনু যিয়াদ নামক এক রাবীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন। এই ব্যক্তি বলেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনু সুলাইম বলেন, আমাদেরকে হিশাম ইবনু উরওয়া বলেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে, তিনি আবূ বাকর (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে...।

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী 'আমর ইবনু যিয়াদ'-ক মুহাদ্দিসগণ জালিয়াত ও হাদীস চোর বলে স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইবনু আদী, যাহাবী, ইবনুল জাওযী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। ইমাম সুয়ূতী এ হাদীসকে শুক্রবারে কবর যিয়ারত বিষয়ক হাদীসের সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আব্দুর রাঊফ মুনাবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন, প্রথমত, উভয় হাদীসের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, উভয় হাদীসের সনদেই জালিয়াত রাবী রয়েছে। জাল হাদীসের ক্ষেত্রে একাধিক হাদীসের সমন্বিত অর্থ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে না।[৮০৯]

৮. কবর যিয়ারতের সময় সূরা ইখলাস পাঠ

প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে রয়েছে: "কবরস্থানে যেয়ে সূরা ইখলাস **১১** বার পাঠ করে মৃত ব্যক্তিগণের রূহের উপর বখশিয়া দিলে সেই ব্যক্তি কবরস্থানের সমস্ত কবরবাসীর সম সংখ্যক নেকী লাভ করবে"। মূলত কথাটি একটি জাল হাদীসের প্রচলিত অনুবাদ। জাল হাদীসটিতে বলা হয়েছে:

مَنْ مَرَّ بِالْمَقَابِرِ فَقَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ

"যদি কেউ গোরস্থানের নিকট দিয়ে গমন করার সময় ২১ বার 'সূরা ইখলাস' পাঠ করে তার সাওয়াব মৃতগণকে দান করে তবে মৃতগণের সংখ্যার সমপরিমাণ সাওয়াব তাকে প্রদান করা হবে।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি জাল ও বানোয়াট।[৮১০]

৯. মৃত্যুর সময় শয়তান পিতামাতার রূপ ধরে বিভ্রান্তির চেষ্টা করে

সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট শয়তান তার পিতামাতার রূপ ধরে আগমন করে এবং তাকে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। ইমাম সুয়ূতী, ইবনু হাজার মাক্কী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এ বিষয়ে কোনো কথা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৮১১]

১০. গায়েবানা জানাযা আদায় করা

যে মৃতব্যক্তির মৃত্যুর স্থানে একবার জানাযার সালাত আদায় করা হয়েছে তার জন্য পুনরায় 'গায়েবী জানাযা' আদায় করার পক্ষে কোনোরূপ হাদীস বর্ণিত হয় নি। বরং এই কর্মটি সুন্নাত বিরোধী একটি কর্ম। **"এহইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৮১২]

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নামে প্রচলিত 'রাহাতিল কুলুব' নামক পুস্তকে আছে যে, ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশক্কর বলেন: "গায়েবানা জানাজার নামাজ পড়ার বিধান রয়েছে। কেননা আমীরুল মুমেনীন হযরত হামযাহ ও অন্যান্যরা যখন শহীদ হলেন তখন হুজুর পাক (ﷺ) তাঁদের জন্য গায়েবানা জানাজার নামাজ পাঠ করেছিলেন। এমনকি প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পড়েছিলেন।"[৮১৩]

এসকল কথা কি সত্যিই খাজা নিজামউদ্দীন (রাহ) লিখেছেন, না তাঁর নামে জালিয়াতি করা হয়েছে তা আমরা জানি না। তবে সর্বাবস্থায় এগুলি একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। একজন সাধারণ মুসলিমও জানেন যে, হামযা (রা) উহদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

১১. মৃত লাশকে সামনে রেখে উপস্থিতগণকে প্রশ্ন করা

আমাদের দেশে অনেক সময় সালাতুল জানাযা আদায়ের পূর্বে বা পরে মৃতদেহ সামনে রেখে উপস্থিত মুসল্লীগণকে প্রশ্ন করা হয়, লোকটি কেমন ছিল? সকলেই বলেন: ভাল ছিল... ইত্যাদি। এই কর্মটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। হাদীস শরীফে এরূপ কোনো কর্মের উল্লেখ নেই। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি মানুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রশংসা করেন তবে তা সেই ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর বলে গণ্য হবে।[৮১৪]

১২. মৃতকে কবরে রাখার সময় বা পরে আযান দেওয়া

প্রচলিত আরেকটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কর্ম হলো মৃতকে কবরে রাখার সময় বা পরে আযান দেওয়া। কোনো সহীহ যয়ীফ বা মাউযূ হাদীসেও এইরূপ কোনো কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হয় নি। এমনকি নামাযের ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোনো কারণে আযান দেওয়ার কোনো প্রকারের ফযীলতও কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

১৩. ভূত-প্রেতের ধারণা

আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও ইসলাম বিরোধী ধারণা হলো ভুত-প্রেতের ধারণা। মৃত মানুষের আত্মা ভুত বা প্রেত হয়ে বা অন্য কোনোভাবে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, অবস্থান করে, ভাল বা মন্দ করতে পারে... ইত্যাদি সকল কথাই জঘন্য মিথ্যা ও ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত কথা। এই জাতীয় বাতিল কথা হলো, মৃতের আত্মা তার মৃত্যুর স্থানের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়... ইত্যাদি।

১৪. মৃত্যুর পরে লাশের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা

মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ মুহূর্তগুলিতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনানোর বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮১৫] কিন্তু মৃত্যুর পরে লাশের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করার বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হয় নি।

১৫. লাশ বহনের সময় সশব্দে কালিমা, দোয়া বা কুরআন পাঠ

এটি একটি বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সুন্নাতের বিপরীত কর্ম। লাশ বহনের সময় পরিপূর্ণ নীরবতাই সুন্নাত। মনের গভীরে শোক ও মৃত্যু চিন্তা নিয়ে নীরবে পথ চলতে হবে। পরস্পরে কথাবার্তা বলাও সুন্নাত বিরোধী। ইমাম নববী বলেন, লাশ বহনের সময় সম্পূর্ণ নীরব থাকাই হলো সুন্নাত সম্মত সঠিক কর্ম যা সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের মানুষদের রীতি ছিল। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী বলেন:

وَيُطِيلُ الصَّمْتَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلاثَةٍ: عِنْدَ الْقِتَالِ، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ، وَالذِّكْرِ؛ وَلأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ مَكْرُوهًا .

"লাশের অনুগমনকারী তার নীরবতাকে প্রলম্বিত করবে। এ সময় সশব্দে যিকর করা মাকরূহ। কাইস ইবনু উবাদাহ বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করতে অপছন্দ করতেন: যুদ্ধ, জানাযা এবং যিক্‌র। এছাড়া লাশ বহনের সময় সশব্দে যিক্‌র করা ইহূদী-নাসারাগণের অনুকরণ; এজন্য তা মাকরূহ।"[৮১৬]

১৬. কবরের নিকট দান-সাদকা করা

হাদীস শরীফে সন্তানকে তার মৃত পিতামাতার জন্য দান-সাদকা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দান কবরের নিকট করলে কোনো অতিরিক্ত সাওয়াব বা সুবিধা আছে বলে কোনো হাদীসে কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে দান করার একই অবস্থা।

১৭. সন্তান ছাড়া অন্যদের দান সাদকা

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, সন্তান-সন্তুতি বা পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেউ দান করলে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবেন বলে কোনো হাদীসে কোনোভাবে বর্ণিত হয় নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় বা করা হয় সবই আলিমদের মতামত ভিত্তিক, অথবা মনগড়া ও বানোয়াট।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুমিনগণের দায়িত্ব হলো মৃত মুমিনগণের জন্য দোয়া ও ইসতিগফার করা। আর সন্তানদের দায়িত্ব হলো মৃত পিতামাতার জন্য দোয়া ও ইসতিগফার ছাড়াও দান করা। সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য মানুষ দোয়া করলে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবেন বলে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিশ্চিত জানতে পারি। কিন্তু সন্তান ছাড়া কেউ দান করলে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবেন বলে কোনো সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি।

তবে অধিকাংশ আলিম মনে করেন যে, সন্তানের দানের সাওয়াব যেহেতু মৃত ব্যক্তি লাভ করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু আমরা আশা করতে পারি যে, অন্যান্য মানুষের দানের সাওয়াবও মৃত ব্যক্তি পেতে পারেন। কোনো কোনো আলিম বলেন যে, এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের বাইরে আশা পোষণের কোনো ভিত্তি বা যুক্তি নেই। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোনো মুসলিম যে কেনো মৃত মুসলিমের জন্য দোয়া করবেন। আর সন্তানসন্ততি পিতামাতার জন্য দোয়া ছাড়াও দান করবে। আমাদের এর বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[৮১৭]

অধিকাংশ আলিমের 'আশা' মেনে নিলেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। যেহেতু কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারছি যে, দোয়া ও ইসতিগফার করলেই মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবেন এবং দোয়ার বিনিময়েই তাকে নেকি ও সাওয়াব দান করা হবে, সেহেতু কুরআন-হাদীসের নির্দেশের বাইরে দান করার প্রয়োজনীয়তা কী? যখন আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, 'হে আল্লাহ, অমুক ব্যক্তিকে আপনি ক্ষমা করুন, তাঁকে মর্যাদা দান করুন... ইত্যাদি' বলে দোয়া করলেই সেই ব্যক্তি উপকৃত হবেন, তখন আমাদের প্রয়োজন কী যে আমরা বলব: "হে আল্লাহ, আমার এই দানের সাওয়াব অমুককে প্রদান করুন এবং এর বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করুন, মর্যাদা বা নেকি দান করুন"?

সম্ভবত আমরা মনে করি যে, দান-সাদকাসহ দোয়া করলে মৃতব্যক্তি বেশি সাওয়াব লাভ করবে। 'গাইবী' বিষয়ে নিজেরা 'মনে' করার চেয়ে 'ওহী'-র উপর নির্ভর করা উত্তম। কুরআন ও হাদীসে দোয়া ও ইসতিগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে আজীবন অগণিত মুমিন-মুমিনার জন্য দোয়া ও ইসতিগফার করেছেন, কিন্তু কখনোই শেখান নি যে, কবর যিয়ারত বা অন্য সময়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া-ইসতিগফারের পূর্বে, পরে বা অন্য সময়ে কিছু দান-সাদকা বা খানা বিতরণ করা ভাল। তিনি নিজেও কখনো তা করেন নি এবং কাউকে তা শিক্ষাও দেননি। সাহাবীগণও মৃতদের জন্য দোয়া-ইসতিগফার করেছেন এবং কবর যিয়ারত করেছেন, কিন্তু কখনোই কবরের পাশে বা অন্য কোথাও মৃতদের 'সাওয়াব রেসানী'-র জন্য দান-খয়রাত করেছেন বলে সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। আমাদের উচিত সুন্নাতের শিক্ষার মধ্যে থাকা। সকল মুমিনই নিজের সাওয়াব অর্জন, বিপদ মুক্তি ও বরকতের জন্য সর্বদা বেশি বেশি দান-সাদকা করতে চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি সন্তান-সন্ততি তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য দোয়া, ইসতিগফার ও দান করবে। আর অন্য সকল মুসলমান সকল মৃত মুমিন-মুমিনার জন্য দোয়া ও ইসতিগফার করবে।

১৮. মৃতের জন্য জীবিতের হাদিয়া

প্রচলিত ওয়ায-আলোচনায় একটি হাদীসে বলা হয় যে, মৃতব্যক্তি হলো ডুবন্ত মানুষের মত, জীবিতদের পক্ষ থেকে কুরআন, কালিমা, দান-খাইরাত ইত্যাদির সাওয়াব 'হাদিয়া' পাঠালে সে উপকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটিতে শুধু দোয়া-ইসতিগফারের কথা বলা হয়েছে, বাকি কথাগুলি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মূল হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বাইহাকী তৃতীয় শতকের এজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী মুহাম্মাদ ইবনু জাবির ইবনু আবী আইয়াশ আল-মাসীসীর সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। এই ব্যক্তি বলেন, তাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, তাকে ইয়াকূব ইবনু কা'কা বলেছেন, মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا الْمَيِّتُ فِيْ الْقَبْرِ إِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيْقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَإِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ الاسْتِغْفَارُ لَهُمْ

"ডুবন্ত ত্রাণপ্রার্থী ব্যক্তির যে অবস্থা, অবিকল সেই অবস্থা হলো কবরের মধ্যে মৃতব্যক্তির। সে দোয়ার অপেক্ষায় থাকে, যে দোয়া কোনো পিতা, মাতা, ভাই বা বন্ধুর পক্ষ থেকে তারা কাছে পৌঁছাবে। যখন এরূপ কোনো দোয়া তার কাছে পৌঁছে তখন তা তার কাছে দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সকল সম্পদের চেয়ে প্রিয়তর বলে গণ্য হয়। এবং মহিমাময় পরাক্রমশালী আল্লাহ পৃথিবীবাসীদের দোয়ার কারণে কবরবাসীদেরকে পাহাড় পরিমাণ (সাওয়াব) দান করেন। আর মৃতদের প্রতি জীবিতদের হাদিয়া হলো তাদের জন্য ইসতিগফার বা ক্ষমা-প্রার্থনা করা।"

ইমাম বাইহাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু জাবির ইবনু আবী আইয়াশ নামক এই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সূত্রে কোনোভাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয় নি।[৮১৮] ইমাম যাহাবী এই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন: "এই ব্যক্তির কোনো পরিচয়ই আমি জানতে পারি নি। এই ব্যক্তি বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত আপত্তিকর বা খুবই দুর্বল (**منكر جدا**)।"[৮১৯]

১৯. মৃতের জন্য খানাপিনা, দান বা দোয়ার অনুষ্ঠান

মৃত ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পরে ৩য় দিন, ৭ম দিন, ৪০তম দিন, অন্য যে কোনো দিনে, মৃত্যু দিনে বা জন্ম দিনে খানাপিনা, দান-সাদকা, দোয়া-খাইর ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত রীতি। তবে রীতিটি একেবারেই বানোয়াট। এ সকল দিবসে মৃতের জন্য কোনো অনুষ্ঠান করার বিষয়ে কোনো প্রকার হাদীস বর্ণিত হয় নি। কোনো মানুষের মৃত্যুর পরে কখনো কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান করার কোনো প্রকারের নির্দেশনা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। সদা সর্বদা বা সুযোগমত মৃতদের জন্য দোয়া করতে হবে। সন্তানগণ দান করবেন। এবং সবই অনানুষ্ঠানিক। এ বিষয়ে 'এহইয়াউ সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৮২০]

২০. অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকারের খতম

খতমে তাহলীল, খতমে তাসমিয়া, খতমে জালালী, খতমে খাজেগান, খতমে ইউনূস ইত্যাদি সকল প্রকার 'খতম' পরবর্তী কালে বানানো। এ বিষয়ে হাদীস নামে প্রচলিত বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে: "হাদীস শরীফে আছে, হযরত (ﷺ) ফরমাইয়াছেন, যখন কেহ নিম্নোক্ত কলেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িয়া কোন মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখশিশ করিয়া দিবে, তখন নিশ্চয়ই খোদাতাআলা উহার উছিলায় তাহাকে মার্জনা করিয়া দিবেন ও বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন।"[৮২১] এগুলি সবই বানোয়াট কথা।

২১. মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম

আমাদের দেশের অতি প্রচলিত কর্ম কারো মৃত্যু হলে তার জন্য কুরআন খতম করা। এ কর্মটি কোনো হাদীস ভিত্তিক কর্ম নয়। কোনো মৃত মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ কখনো কুরআন খতম করেন নি। এছাড়া কারো জন্য কুরআন খতম করলে তিনি সাওয়াব পাবেন এইরূপ কোনো কথাও কোনো সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন ও হাদীসে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সন্তানগণকে মৃত পিতামাতার জন্য দান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ, সিয়াম পালন, হজ্জ ও উমরা পালনের কথাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন খতম, তাসবীহ তাহলীল পাঠ ইত্যাদি ইবাদতের কোনো নির্দেশনা হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, যেহেতু দান, সিয়াম, হজ্জ, উমরা ও দোয়ার দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু আশা করা যায় যে, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদি ইবাদত দ্বারাও তারা উপকৃত হবেন। তবে এজন্য আনুষ্ঠানিকতা, খতম ইত্যাদি সবই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

২২. দশ প্রকার লোকের দেহ পচবে না

প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নিম্নলিখিত দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পচবে না: ১-পয়গম্বর, ২-শহীদ, ৩- আলেম, ৪- গাজী, ৫- কুরআনের হাফেয, ৬- মোয়াযযিন, ৭- সুবিচারক বাদশাহ বা সরদার, ৮-সূতিকা রোগে মৃত রমণী, ৯-বিনা অপরাধে যে নিহত হয়, ১০-শুক্রবারে যার মৃত্যু হয়।"[৮২২]

এদের অনেককেই হাদীসে শহীদ বলা হয়েছে। তবে একমাত্র নবীগণ বা পয়গম্বরগণের দেহ মাটিতে পচবে না বলে সহীহ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্য নয় প্রকারের মৃতগণের মৃতদেহ না পচার বিষয়ে কোনো হাদীস আছে বলে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. ১৩. যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ বিষয়ক

২. ১৩. ১. যাকাত বিষয়ক

১. মুমিনের জমিতে খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না

একজন মুসলিমকে তার ভূসম্পদের উৎপাদনের ১০% বা ৫% অংশ যাকাত প্রদান করতে হয়। ফল ও ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলা হয়। অমুসলিমদেকে 'যাকাত' দিতে হয় না। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে তার ভূ-সম্পত্তির 'খারাজ' প্রদান করতে হয়। 'খারাজ' সাধারণত উশরের দ্বিগুণ হয়। কোনো অমুসলিমের জমি যদি কোনো মুসলিম ক্রয় করেন তাহলে তাকে খারাজ ও উশর উভয়ই প্রদান করতে হবে, নাকি শুধুমাত্র খারাজ প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে তাবেয়ীগণের যুগ থেকে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ তাবিয়ী ও ইমাম বলেছেন, তাকে খারাজ ও উশর উভয়ই প্রদান করতে হবে। তাবিয়ী ইকরিমাহ, ইবরাহীম নাখয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন, তাকে শুধুমাত্র খারাজ প্রদান করতে হবে।[৮২৩]

এ বিষয়ে একটি হাদীস আলিমদের মধ্যে প্রচলিত। ৫ম হিজরী শতক ও তার পরের কিছু ফকীহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটিতে ইবনু মাসঊদ (রা) এর সূত্রে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِيْ أَرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"একজন মুসলিমের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত হবে না।"[৮২৪]

কিন্তু ইমাম যাইলায়ী ও হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ-সহ সকল মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এ হাদীসটি বানোয়াট। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা ইবনু মাস'উদের (রা) কথা হিসাবে এ বাক্যটি বানোয়াট। প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যটি তাবিয়ী ইব্রাহীম নাখয়ীর (রাহ) কথা ও তাঁর মত। ইবরাহীম নাখয়ী ছাড়া আরো অন্যান্য তাবিয়ী থেকেও এ মতটি বর্ণিত হয়েছে।[৮২৫]

ইমাম আবু হানীফা (রাহ) এ কথাটি ইব্রাহীম নাখয়ী থেকে তাঁর নিজের মত হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান বলেছেন, ইব্রাহীম নাখয়ী বলেছেন: "একজন মুসলিমের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত হবে না।" এ পর্যন্ত কথাটি সহীহ। অর্থাৎ কথাটি 'মাকতু'য় হাদীস' বা তাবেয়ীর কথা হিসাবে সহীহ।

কিন্তু পরবর্তী যুগের একজন রাবী ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ ইমাম আবু হানীফার নামে বানোয়াটভাবে এই কথাটিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করে। ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ বলেন: আবু হানীফা আমাদেরকে বলেছেন: হাম্মাদ ইবনু আবী সুলাইমান ইব্রাহীম নাখয়ী হতে, তিনি 'আলকামাহ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "একজন মুসলিমের ভূমিতে উশর এবং খারাজ একত্রিত হবে না।"

এভাবে ইয়াহইয়া ইবনু আনবাসাহ একজন তাবেয়ীর বাণীকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী বলে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ খুব সহজেই তাঁর এই জালিয়াতি বা ভুল ধরে ফেলেছেন।

তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) অগণিত ছাত্রের কেউই এই হাদীসটি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন নি। তাঁর অন্যতম ছাত্র ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রাহ) তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে এই মাসআলাটির উপরে অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেন নি যে, ইমাম আবু হানীফা তাঁদেরকে এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন অথবা তিনি এই বিষয়ে কোনো হাদীসে নববীর উপর নির্ভর করেছেন।

এখানেই মুহাদ্দিসগণের সন্দেহের শুরু। যদি একজন হাদীস বর্ণনাকারী কোনো প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বা ফকীহ থেকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যা তাঁর অন্য কোনো ছাত্র, বিশেষত যারা আজীবন তাঁর সাথে থেকেছেন তাঁরা কেউ বর্ণনা না করেন, তাহলে তাঁরা হাদীসটির বিশুদ্ধতার বিষয়ে সন্দিহান হন। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা দেখেন, যে বর্ণনাকারী একাই এই হাদীসটি বলেছেন তাঁর বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ও তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের কী অবস্থা।

এখানে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, ইয়াহইয়া ইবনু 'আনবাসাহ জীবনে যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন সবই ভুল বা বানোয়াট। তিনি বিভিন্ন প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত আলিম ও মুহাদ্দিসের নামে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন যা অন্য কেউ করেননি। তিনি অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস এভাবে বিভিন্ন বানোয়াট সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত সকল হাদীসকে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীসের সাথে তুলানামূলক নিরীক্ষা করে এবং তাঁর ব্যক্তি জীবন পর্যালোচনা করে মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, এই হাদীসটিও তিনি ইমাম আবু হানীফার নামে বানিয়েছেন। এজন্যই ৩য় ও ৪র্থ হিজরী শতকের কোন হানাফী ইমাম বা ফকীহ এই হাদীসটিকে দলিল হিসাবে পেশ করেন নি।[৮২৬]

২. অলঙ্কারের যাকাত নেই

ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতে হবে কি না সে বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকে মতভেদ রয়েছে। জাবির (রা) ও অন্য

কয়েকজন সাহাবী বলতেন যে, অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতে হবে না। অপর দিকে অন্য অনেক সাহাবী বলতেন যে, অলঙ্কারের যাকাত প্রদান করতে হবে।[৮২৭]

এ ক্ষেত্রে যারা অলঙ্কারের যাকাত ফরয নয় বলে মত প্রকাশ করেন, তাদের পক্ষে একটি হাদীস বর্ণিত ও প্রচলিত। জাবির (রা)-এর নামে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَيْسَ فِى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

"অলঙ্কারের মধ্যে যাকাত নেই।"

এটি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কথা নয়। একে হাদীসে নববী হিসাবে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন বাইহাকী, ইবনু হাজার, আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস। এই বাক্যটি মূলত জাবির (রা.)- এর নিজের কথা।। একজন অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ভুলবশত একে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা বলে বর্ণনা করেছেন।[৮২৮]

২. ১৩. ২. সিয়াম বিষয়ক

সিয়াম বিষয়ক অনেক জাল হাদীস ও মনগড়া কথা ইতোপূর্বে সালাত অধ্যায়ে 'বার চান্দের ফযীলত' বিষয়ক আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সিয়ামের বিষয়ে আরো দুই একটি বানোয়াট বা ভিত্তিহীন কথা এখানে উল্লেখ করছি।

১. সিয়ামের নিয়্যত

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'নাওয়াইতু আন...' বলে যত প্রকার নিয়্যত বলা হয় সবই 'বানোয়াট' কথা। কোনো ইবাদতের এরূপ নিয়্যত পাঠ করার কথা কোনো হাদীসে বলা হয় নি।

২. ৩০ দিন সিয়াম ফরয হওয়ার কারণ

বিভিন্ন ইবাদতের কারণ নির্ণয় করা একটি বিশেষ বাতুল আগ্রহ। ফলে জালিয়াতগণ এ বিষয়ে অনেক কথা বানিয়েছে। রামাদানের ফরয সিয়ামের বিষয়ে জালিয়াতগণ বানিয়েছে:

اِفْتَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِيْ الصَّوْمَ ثَلاَثِيْنَ يَوْماً ... وَذَلِكَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ الشَّجَرَةَ بَقِيَ فِيْ جَوْفِهِ مِقْدَارَ ثَلاَثِيْنَ يَوْماً، فَلَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَمَرَهُ بِصِيَامِ ثَلاَثِيْنَ يَوْماً بِلَيَالِيْهِنَّ، وَافْتَرَضَ عَلَى أُمَّتِيْ بِالنَّهَارِ.

"আমার উম্মতের উপরে ৩০ দিনের সিয়াম ফরয করা হয়েছে। কারণ আদম যখন ফল খেয়েছিলেন তখন তা তাঁর পেটের মধ্যে ৩০ দিন বিদ্যমান থাকে। যখন আল্লাহ আদমের তাওবা কবুল করলেন তখন তাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত একটানা সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। আমার উম্মতের উপরে শুধু দিবসে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। ..."[৮২৯]

৩. ইফতার, সাহরী ইত্যাদি খানার হিসাব না হওয়া

সমাজে প্রচলিত আছে যে, ইফতার, সাহরী ইত্যাদি খাওয়ার হিসাব নেই। এই অর্থের বানোয়াট হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُوْنَ عَنْ نَعِيْمِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ: الْمُفْطِرُ، وَالْمُتَسَحِّرُ، وَصَاحِبُ الضَّيْفِ.

"তিন ব্যক্তির পানাহারের নেয়ামতের হিসাব গ্রহণ করা হবে না: ইফতার-কারী, সাহরীর খাদ্যগ্রহণকারী ও মেহমান-সহ খাদ্য গ্রহণকারী।"[৮৩০]

এ সকল ভিত্তিহীন কথাবার্তার কারণে রামাদান মাসকে আমরা 'নিজে খাওয়ার' মাসে পরিণত করেছি। অথচ রামাদান হলো অন্যকে খাওয়ানোর ও সহমর্মিতার মাস। এছাড়া আমাদের 'হিসাব হবে কিনা' তা বিবেচনা না করে 'সাওয়াব বেশি হবে কিনা' তা বিবেচনা করা উচিত।

৪. আইয়াম বীযের নামকরণ

চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে 'আইয়ামুল বিদ' বা শুভ্র রাতের দিনগুলি' বলা হয়। কারণ এ তারিখগুলিতে পূর্ণ চাঁদের কারণে প্রায় সারারতই শুভ্রতা বা আলো বিরাজমান থাকে।[৮৩১] কিন্তু জালিয়াতগণ 'আইয়াম বিয'-এর নামকরণ বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। যেমন:

"নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের পরে যখন আদম (আ) পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁর দেহ কাল হয়ে গিয়েছিল। ফলে ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য কাঁদতে থাকেন। ...তখন আল্লাহ আদমকে বলেন, তুমি আমার জন্য ১৩ তারিখ সিয়াম পালন কর। তিনি ১৩ তারিখ সিয়াম পালন করেন এবং এতে তাঁর একতৃতীয়াংশ শুভ্র হয়ে যায়। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন, তুমি আজকের দিন ১৪ তারিখও সিয়াম পালন কর। তখন তিনি ১৪ তারিখ সিয়াম পালন করেন এবং তাঁর দুই তৃতীয়াংশ শুভ্র হয়ে যায়। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে বলেন, তুমি আজকের দিন ১৫ তারিখও সিয়াম পালন কর। তখন তিনি ১৫ তারিখ সিয়াম পালন করেন এবং তাঁর পুরো দেহ শুভ্র

হয়ে যায়। এজন্য এই দিনগুলিকে 'আইয়ামুল বীয' বা "শুভ্রতার দিনগুলি" নাম রাখা হয়।"[৮৩২]

৫. আইয়াম বীযের সিয়াম পালনের ফযীলত

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনগণকে সকল নফল ইবাদত অল্প হলেও নিয়মিত পালন করার উৎসাহ দিয়েছেন। নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে প্রতি চান্দ্র বা আরবী মাসে অন্তত তিন দিন সিয়াম পালনের উৎসাহ দিয়েছেন। কোনো কোনো হাদীসে বিশেষ করে প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ নফল সিয়াম পালনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।[৮৩৩]

এ দিনগুলিতে সিয়াম পালনের বিশেষত্ব তিনটি: প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন হাদীসে এই তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৩৪] দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে সর্বদা এই তিন দিন সিয়াম পালন করতেন।[৮৩৫] তৃতীয়ত, এই তিন দিন সিয়াম পালন করলে বা প্রতি মাসে অন্তত তিন দিন সিয়াম পালন করলে সারা বৎসর সিয়াম পালনের সাওয়াব হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।[৮৩৬]

মুমিনের জন্য এগুলিই যথেষ্ট। কিন্তু জালিয়াতগণ 'আইয়াম বিয'-এর ফযীলতের বিষয়ে অনেক জাল হাদীস প্রচার করেছে। যেমন, "যদি কেউ আইয়াম বিযের সিয়াম পালন করে তবে ১ম দিনে (তের তারিখ) তাকে ১০ হাজার বৎসরের পুরস্কার প্রদান করা হবে, দ্বিতীয় দিনে (১৪ তারিখ) তাকে ১ লক্ষ বৎসরের পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং তৃতীয় দিনে (১৫ তারিখে) তাকে তিন লক্ষ বৎসরের সাওয়াব প্রদান করা হবে।" কোনো কোনো জালিয়াত একটু কমিয়ে বলেছে: "১ম দিনে ৩ হাজার বৎসরের সাওয়াব, দ্বিতীয় দিনে ১০ হাজার বৎসরের এবং তৃতীয় দিনে ২০ হাজার বৎসরের সাওয়াব পাবে...।"[৮৩৭]

এইরূপ আরো অনেক বানোয়াট কথা তারা প্রচার করেছে।

২. ১৩. ৩. হজ্জ বিষয়ক

১. সাধ্য হলেও হজ্জ না করলে ইহূদী বা খৃস্টান হয়ে মরা

আমাদের সমাজে অতি পরিচিত একটি হাদীস, হজ্জ বিষয়ক যে কোনো ওয়ায, আলোচনা বা লেখালেখিতে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

"যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ পৌঁছার মত পাথেয় ও বাহনের মালিক হলো, অথচ হজ্জ করল না, সে ইহূদী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে অথবা খৃস্টান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তার কোনো অসুবিধা হবে না।"

হাদীসটির প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ হলো, প্রসিদ্ধ ৬টি হাদীস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ সুনানুত তিরমিযীতে এই হাদীসটি সংকলিত। ইমাম তিরমিযী বলেন: আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া বলেন, আমাদেরকে মুসলিম ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, আমাদেরকে হেলাল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমাদেরকে আবূ ইসহাক হামদানী বলেছেন, হারিস থেকে, তিনি আলী থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন....। হাদীসটি উদ্ধৃত করার পরে ইমাম তিরমিযী বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ

"এটি একটি গরীব হাদীস। হাদীসটি একমাত্র এ সনদ ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে আমার জানতে পারি নি। এর সনদে আপত্তি রয়েছে। হেলাল ইবনু আব্দুল্লাহ অজ্ঞাত পরিচয়। আর হারিস হাদীস বর্ণনায় দুর্বল"[৮৩৮]

হারিস নামক এ রাবীর পূর্ণ নাম 'হারিস ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল-হামাদানী। তিনি কূফার একজন কট্টরপন্থী শিয়া ছিলেন। তিনি আলী (রা) এর সহচর ছিলেন এবং ৬৫ হিজরীর দিকে ইন্তিকাল করেন। আলী (রা) ও আহলু বাইতদের বিষয়ে অনেক জঘন্য মিথ্যা কথা তিনি বলতেন। এজন্য সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ প্রায় সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী ও জাল হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

আমির ইবনু শারাহীল শা'বী বলেন, হারিস আমাকে হাদীস বলেন এবং তিনি একজন বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন। আবূ ইসহাক সুবাইয়ী বলেন, হারিস একজন বড় মিথ্যাবাদী ছিলেন। যে সকল মুহাদ্দিস হারিসকে মিথ্যবাদী বলে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইবরাহীম নাখয়ী, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ, আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু হিব্বান প্রমুখ। পক্ষান্তরে ইমাম নাসাঈ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন প্রমুখ মুহাদ্দিস হারিসকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।[৮৩৯]

এছাড়াও এই হাদীসটির সনদে আরো দুটি কঠিন দুর্বলতা রয়েছে:

প্রথমত, আবূ ইসহাক মুদাল্লিস ছিলেন। এখানে তিনি বলেন নি যে, হারিস তাকে হাদীসটি বলেছেন বা তিনি তার নিকট

থেকে হাদীস শুনেছেন। তার বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় তিনি সরাসরি হারিস থেকে শুনেন নি।

দ্বিতীয়ত, হাদীসের পরবর্তী বর্ণনাকারী হিলাল ইবনু আব্দুল্লাহ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি। হাদীসটি আদৌ আবূ ইসহাক বলেছেন, নাকি এই লোকটি বানিয়ে বলছে, তা কিছুই জানার উপায় নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই অর্থে আরো কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে সকল সনদের অবস্থা এই সনদের চেয়েও খারাপ। এ সকল কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ একে যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সকল সনদ আলোচনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এই কথাটি কোনো গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। সবগুলি সনদই অত্যন্ত দুর্বল বা বাতিল। তবে সহীহ সনদে তা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮৪০]

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কবর যিয়ারত বিষয়ক হাদীসসমূহ

যিয়ারত শব্দের অর্থ সাক্ষাত করা, দেখা করা, বেড়ান (visit, call) ইত্যাদি। জীবিত মানুষদের, বিশেষত আত্মীয় স্বজন ও নেককার মানুষদের যিয়ারত করা বা সাক্ষাত করা একটি হাদীস নির্দেশিত নেক কাজ। বিভিন্ন হাদীসে মুমিনদেরকে 'তাযাউর ফিল্লাহ' (التزاور في الله) বা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরের যিয়ারত বা দেখা সাক্ষাত করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।[৮৪১]

অনুরূপভাবে মৃত মানুষদের 'কবর' যিয়ারত করা, অর্থাৎ সাক্ষাত করা বা বেড়ানোও হাদীস সম্মত একটি মুস্তাহাব ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাওযা শরীফ যিয়ারত নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যিয়ারত। এছাড়া তাঁকে ভালবাসা ঈমানের অংশ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর সুন্নাত সম্মত যিয়ারতের মাধ্যমে এই মহব্বত বৃদ্ধি পায়। এছাড়া তাঁর পবিত্র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ-সালাম প্রদানের মর্যাদা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, রাওযা শরীফ যিয়ারত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

তবে এ ইবাদতের জন্য বিশেষ কোনো হাদীস আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ এ বিষয়ক সকল হাদীস জাল ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ সেগুলিকে দুর্বল বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে সে বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

এ বিষয়ক হাদীসগুলিকে অর্থের দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিয়ারতকারী অথবা তাঁর বরকতময় কবর যিয়ারতকারীর জন্য শাফা'আত বা রাহমাতের সুসংবাদ। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে তাঁর পবিত্র কবর যিয়ারতকারীকে তার জীবদ্দশাতেই তার সাথে সাক্ষাতকারীর মর্যাদার সুসংবাদ প্রদান। তৃতীয়ত, যিয়ারত পরিত্যাগকারীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ।

ক. যিয়ারতকারীর জন্য সুসংবাদঃ

১ম হাদীসঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"যে আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার শাফা'আত তার প্রাপ্য হবে।"

হাদীসটি ইবনু খুযাইমা, বায্যার, দারাকুতনী, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। হাদীসটির ২টি সনদ রয়েছেঃ

১ম সনদঃ বায্যার বলেন, আমাকে কুতাইবা বলেছেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, আমাকে আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম বলেছেন, তার পিতা থেকে, ইবনু উমার থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন..।[৮৪২]

আমরা অন্যত্র 'আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, মুহাদ্দিসগণ তাকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এই সনদে তার ছাত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম' নামক এই ব্যক্তিও অত্যন্ত দুর্বল। তিনি আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ও অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিসের নামে এমন অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেগুলি সে সকল মুহাদ্দিসের অন্য কোনো ছাত্র বর্ণনা করেন না বা অন্য কোনো সূত্রে পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবী। ইবনু হিব্বান তাকে হাদীস জালিয়াতকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৪৩]

আমরা দেখেছি যে, আব্দুর রাহমান বর্ণিত হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল বা জাল বলে গণ্য। এই সনদে তার ছাত্রের অবস্থা তাঁর চেয়েও খারাপ।

দ্বিতীয় সনদঃ ইমাম দারাকুতনী বলেন, আমাদেরকে কাযী মুহামিলী বলেন, আমাদেরকে উবাইদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওয়ার্‌রাক বলেছেন, আমাদেরকে মূসা ইবনু হিলাল বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ্ (অথবা উবাইদুল্লাহ) ইবনু উমার আল-উমারী বলেছেন, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ...।"[৮৪৪]

ইমাম বাইহাকীও একই সনদে মূসা ইবনু হিলাল থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আল-উমারী থেকে নাফি' থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে এই হাদীসটি সংকলিত করেছেন। হাদীসটি উদ্ধৃত করে বাইহাকী বলেনঃ হাদীসটি নাফি' থেকে ইবনু উমার থেকে

একটি মুনকার বা অত্যন্ত আপত্তিকর হাদীস। এই ব্যক্তি (মূসা ইবনু হিলাল) ছাড়া অন্য কেউই এই হাদীসটি বর্ণনা করেনি।"[৮৪৫]

ইমাম ইবনু খুযাইমাও একই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং বলেছেন, 'হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।... হাদীসটি মুনকার, অর্থাৎ আপত্তিকর বা অত্যন্ত দুর্বল।'[৮৪৬]

এ সনদেও দুজন বর্ণনাকারী দুর্বল। মূসা ইবনু হিলাল নামক একজন অজ্ঞাত পরিচয় বা স্বল্প পরিচিত রাবী। আবূ হাতিম রাযী তাকে অজ্ঞাত পরিচয় বলেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, আশা করি তার হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। যাহাবী বলেন, এ ব্যক্তির হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। ... তার বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে সবেচেয়ে আপত্তিকর বা দুর্বল হলো এ হাদীসটি।[৮৪৭]

মূসা নামক এই রাবীর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু হাফস আল-উমারী (১৭১ হি) দ্বিতীয় শতকের একজন তাবি-তাবিয়ী রাবী। তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল হলেও পরিত্যক্ত ছিলেন না। তাঁর ভাই 'উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার' খুবই নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আর তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন তাকে দুর্বল বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আহমদ ইবনু হাম্বাল, ইবনু আদী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন। নাসাঈ ও অন্য কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আসকালানী সকল মতামতের সমম্বয় করে বলেন "তিনি দুর্বল রাবী। ইমাম মুসলিম তার বর্ণনাকে সহায়ক বর্ণনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দায়ূদ ও ইবনু মাজাহ তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।"[৮৪৮]

কোনো কোনো বর্ণনায় মূসা ইবনু হিলাল তার উস্তাদ হিসাবে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু উমারের' নাম উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু খুযাইমা, বাইহাকী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন, এখানে 'উবাইদুল্লাহর উল্লেখ ভুল। হাদীসটি আব্দুল্লাহর বর্ণনা।[৮৪৯]

সর্বাবস্থায় এই সনদটি দুর্বল হলেও এতে কোনো মিথ্যাবাদি বা মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত রাবী নেই।

২য় হাদীসঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ أَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِيْ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعاً أَوْ شَهِيْداً

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে, কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফা'আত-কারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব।"

হাদীসটি আবূ দায়ূদ তায়ালিসী ও বাইহাকী সংকলন করেছেন। তাঁরা সিওয়ার ইবনু মাইমূন নামক এক ব্যক্তির সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই সিওয়ার ইবনু মাইমূন বলেন, তাকে উমার ইবনুল খাত্তাবের বংশের একব্যক্তি বলেছেন, উমার থেকে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ...।[৮৫০]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী সিওয়ার ইবনু মাইমূন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী। রিজাল শাস্ত্রের কোনো গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তার উস্তাদ 'উমরের বংশের এক ব্যক্তি' সম্পূর্ণ পরিচয়হীন। এজন্য ইমাম বাইহাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, (هذا إسناد مجهول) "এ সনদটি অজ্ঞাত"।[৮৫১]

৩য় হাদীসঃ

مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّداً كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার যিয়ারত করবে; কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হয়ে বা আমার আশ্রয়ে থাকবে।"[৮৫২]

হাদীসটি বাইহাকী, যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস উদ্ধৃত করেছেন। তারা হাদীসটি ৩য় শতকের মুহাদ্দিস আব্দুল মালিক ইবনু ইবরাহীম আল-জুদ্দী (২০৫ হি)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল মালিক বলেন, আমাদেরকে শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (১৬২ হি) বলেছেন, সিওয়ার ইবনু মাইমূন থেকে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হারূন ইবনু কুযা'আহ বলেছেন, খাত্তাবের বংশের জনৈক ব্যক্তি থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, তিনি বলেছেন...।

এ হাদীসটির সনদ পূর্বের হাদীসের চেয়েও দুর্বল। উপরের সনদের দুইটি দুর্বলতা ছাড়াও এই সনদে আরো দুটি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমত, এই সনদে সিওয়ার-এর উস্তাদ হারূন আবূ কুযা'আহর সঠিক পরিচয় জানা যায় না। একে হারূন আবূ কুযা'আহ বা হারূন ইবনু কুযা'আহ বলা হয়। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, এই ব্যক্তির হাদীস ভিত্তিহীন, অন্য কেউ তা বলে না। আযদী বলেন, এই ব্যক্তি পরিত্যক্ত।[৮৫৩] দ্বিতীয়ত, এই সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয় নি, ফলে সনদটি মুরসাল বা বিচ্ছিন্ন।

৪র্থ হাদীসঃ

مَنْ جَاءَنِيْ زَائِراً لاَ تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি আমার কাছে যিয়ারতকারী হিসাবে আগমন করবে, আমার যিয়ারত ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন তাকে ধাবিত করবে না, তার জন্য আমার দায়িত্ব হবে যে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফা'আত করব।"

হাদীসটি, দারাকুতনী, তাবারানী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আব্বাদীর সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে মুসলিম (মাসলামা) ইবনু সালিম আল-জুহানী বলেছেন, আমাকে আব্দুল্লাহ (অথবা উবাইদুল্লাহ) ইবনু উমার বলেছেন, তিনি নাফি থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ....”[৮৫৪]

এই হাদীসের বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনু সালিম আল-জুহানী দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম ‘মাসলামা’ বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ দায়ূদ সিজিসতানী বলেন, এই লোকটি ‘সিকাহ’ বা বিশ্বস্ত নয়। ইমাম হাইসামী বলেন, এই ব্যক্তি দুর্বল।”[৮৫৫]

৫ম হাদীসঃ

مَنْ زَارَنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِباً كُنْتُ لَهُ شَهِيْداً وَشَفِيْعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মদীনায় আমার সাথে সাক্ষাত করবে, কেয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়তকারী হব।”

হাদীসটি ইবনু আবি দুনিয়া, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তারা একাধিক সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু আবী ফুদাইক-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবুল মুসান্না সুলাইমান ইবনু ইয়াযিদ আল-কা’বী বলেছেন, আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ....।”[৮৫৬]

এ সনদে আবুল মুসান্না সুলাইমান ইবনু ইয়াযিদ নামক এই রাবীকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম রাযী বলেন, লোকটি শক্তিশালী ছিলেন না, আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করতেন। দারাকুতনীও তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইবনু হিব্বান তাকে ‘সিকাহ’ বা বিশ্বস্ত রাবীদের তালিকাভুক্ত করছেন। ইমাম তিরমিযীও তাকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণের মতামতের সমন্বয় করে ইবনু হাজার তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, আবুল মুসান্না তাবিয়ী ছিলেন না, তাবি-তাবিয়ী ছিলেন। ইবনু হিব্বান, ইবনু হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কোনো সাহাবী থেকে হাদীস শিক্ষা করেন নি। বরং তাবিয়ীগণ থেকে হাদীস শুনেছেন। এজন্য হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন বা মুনকাতি’।[৮৫৭]

৬ষ্ঠ হাদীসঃ

رَحِمَ اللهُ مَنْ زَارَنِيْ وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ

“আল্লাহ রহমত করুন সেই ব্যক্তিকে, যে তার উটের রশি তার হাতে নিয়ে আমার যিয়ারত করেছে।”

এই বাক্যটির বিষয়ে ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, সুয়ূতী, ইবনু ইরাক, মোল্লা আলী কারী, শাওকানী, দরবেশ হূত প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, বাক্যটি ভিত্তিহীন বানোয়াট।[৮৫৮]

উপরের ৬টি হাদীসের মধ্যে ৬ষ্ঠ হাদীস সর্বসম্মতিক্রমে ভিত্তিহীন বানোয়াট বাক্য। বাকী পাঁচটি হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যিয়ারত করা বা তাঁর সাথে সাক্ষাত করার ফযীলত অবগত হওয়া যায়। প্রথম হাদীসে ‘কবর’ যিয়ারতের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে যিয়ারত করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হাদীসে উভয়ের যে কোনো একটি কথা বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে তার পবিত্র কবর যিয়ারতও তাঁরই যিয়ারত বলে গণ্য হতে পারে।

আমরা দেখছি যে, এই অর্থের হাদীসগুলির সবগুলির সনদই দুর্বল। ইবনু তাইমিয়া, ইবনু আব্দুল হাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ অর্থের হাদীসগুলিকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। আলবানী একে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৫৯] তবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম হাদীসের দ্বিতীয় সনদ, ৪র্থ হাদীস এবং ৫ম হাদীসের সনদে কোনো মিথ্যাবাদী বা একেবারে ‘মাজহূল’ বা অজ্ঞাতনামা কেউ নেই। কাজেই এই সনদগুলি পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং একাধিক সনদের কারণে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

খ. ওফাত-পরবর্তী যিয়ারতকে জীবদ্দশার যিয়ারতের মর্যাদা দান

৭ম হাদীসঃ

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ فِيْ مَمَاتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

“যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার মৃত্যুর পরে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশাতেই আমার যিয়ারত করল।”

হাদীসটি দারাকুতনী, তাবারানী, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তাঁরা সকলেই হাদীসটি হাফস ইবনু সুলাইমান নামক রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হাফস বলেন, তাকে লাইস ইবনু আবী সুলাইম বলেছেন, তাকে মুজাহিদ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...।[৮৬০] বাইহাকী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, “একমাত্র হাফসই এই হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন। তিনি দুর্বল।"[৮৬১]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনু সুলাইমান (১৮০হি) প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কারী ছিলেন। তবে তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। কুরআনের কিরা'আত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে, হাদীস মুখস্থ, পুনরালোচনা ও বিশুদ্ধ বর্ণনায় তিনি মোটেও সময় দিতেন না। ফলে তার বর্ণিত হাদীসে এত বেশি ভুল পাওয়া যায় যে, ইমাম আহমদ ছাড়া অন্য সকল মুহাদ্দিস তাকে অত্যন্ত দুর্বল ও পরিত্যক্ত বলে গণ্য করেছেন। ইমাম আহমদ তাকে মোটামুটি চলনসই বলে মনে করতেন। যাহাবী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, তিনি নিজে সত্যবাদী ছিলেন, তবে হাদীস বলতে অত্যন্ত বেশি ভুল করতেন, সনদ উল্টে ফেলতেন, রাবীর নাম বদলে দিতেন, মতন পাল্টে দিতেন... এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পারতেন না; এজন্য তিনি পরিত্যক্ত রাবী হিসাবে গণ্য। ইমাম বুখারী তাঁকে পরিত্যক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি মিথ্যায় অভিযুক্তদেরকেই পরিত্যক্ত বলেন। আবূ হাতিম রাযী, ইবনু আদী, ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইবনু খিরাশ তাকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৬২]

এই সনদে হাফসের উস্তাদ লাইস ইবনু আবী সুলাইমও কিছুটা দুর্বল রাবী ছিলেন। তিনি একজন বড় আলিম, আবিদ ও সত্যপরায়ন রাবী ছিলেন। তবে শেষ জীবনে তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইমাম মুসলিম তার বর্ণনা সহায়ক বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুনান চতুষ্টয়ের সংকলকগণ: তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দায়ূদ ও ইবনু মাজাহ তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[৮৬৩]

৮ম হাদীসঃ

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"আমার মৃত্যুর পরে আমার কবর যে ব্যক্তি যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল।"[৮৬৪]

ইমাম তাবারানী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, আমাকে আহমদ ইবনু রিশদীন বলেছেন, আমাদেরকে আলী ইবনুল হাসান ইবনু হারূন আনসারী বলেছেন, আমাকে লাইস ইবনু আবী সুলাইমের মেয়ের পুত্র লাইস বলেছেন, আমাকে লাইস ইবনু আবী সুলাইমের স্ত্রী আয়েশা বিনতু ইউনূস বলেছেন, তাকে মুজাহিদ বলেছেন, ইবনু উমার থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...।

এ সনদের প্রায় সকল রাবীই অজ্ঞাত পরিচয় বা দুর্বল। তাবারানীর উস্তাদ আহমদ ইবনু রিশদীন (২৯২হি) দুর্বল ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৬৫] তাঁর উস্তাদ "আলী ইবনুল হাসান" নামক এ ব্যক্তির কোনোরূপ পরিচয় জানা যায় না। অনুরূপভাবে তার উস্তাদ লাইস নামক এই ব্যক্তি, তার উস্তাদ আয়েশা নামক এ মহিলা এরাও একেবারেই অপরিচিত। এ জন্য সনদটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।[৮৬৬]

৯ম হাদীসঃ

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশাতেই আমার যিয়ারত করল।"

হাদীসটি ইমাম দারাকুতনী, বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। এই হাদীসের সনদ বর্ণনায় মুহাদ্দিসগণ বৈপরীত্য ও বিক্ষিপ্ততা দেখতে পেয়েছেন। দুই ভাবে এই হাদীসটির সনদ ও মতন বলা হয়েছে:

প্রথম সনদঃ ২য় হিজরী শতকের মুহাদ্দিস ওকী' ইবনুল জার্রাহ (১৯৭ হি) বলেছেন, আমাদেরক বলেছেন খালিদ ইবনু আবূ খালিদ ও আবূ আউন উভয়ে শা'বী ও আসওয়াদ ইবনু মাইমূন থেকে, তিনি হারূন আবূ কুযা'আহ থেকে, তিনি হাতিব-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি থেকে, তিনি হাতিব (রা) থেকে, হাতিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ....।"[৮৬৭]

ইতোপূর্বে ৩ নং হাদীসের সনদ আলোচনার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হারূন আবূ কুযা'আহ অপরিচিত, অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত রাবী। এ সনদে হারূন-এর উস্তাদ 'হাতিব-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি' শুধু অজ্ঞাত পরিচয়ই নন, তিনি অজ্ঞাতনামাও বটে।

দ্বিতীয় সনদঃ ৩য় শতকের মুহাদ্দিস ইউসূফ ইবনু মূসা বলেন, আমাদেরকে ওকী' বলেছেন, আমাদেরকে মাইমূন ইবনু সিওয়ার (সিওয়ার ইবনু মাইমূন) বলেছেন, আমকে হারূন আবূ কুযা'আহ বলেছেন...।[৮৬৮]

এ সনদটি প্রথম সনদের চেয়েও দুর্বল। কারণ উপরে ৩ নং হাদীসের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, সিওয়ার ইবনু মাইমূন অজ্ঞাত পরিচয়।

উপরের তিনটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের পরেও যে মুমিন তাঁর কবর যিয়ারত করবে, সে জীবদ্দশায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের মর্যাদা লাভ করবে। আমরা দেখেছি যে, তিনটি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। প্রথম ও দ্বিতীয় সনদে 'মিথ্যায় অভিযুক্ত' রাবী রয়েছেন। তৃতীয় সনদের পরিত্যাক্ত রাবী রয়েছে। এছাড়া সনদগুলিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী

রয়েছে। এ কারণে ইবনু তাইমিয়া, ইবনু আব্দুল হাদী, আলবানী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসগুলিকে 'মাউদূ' বা জাল বলে গণ্য করেছেন।

সনদগত অগ্রহণযোগ্যতা ছাড়াও অর্থগতভাবেও হাদীসগুলি ইসলামের মূল চেতনার বিরোধী বলে তাঁরা দাবী করেছেন। ইবনু তাইমিয়া বলেন, এ কথা যে মিথ্যা তা স্পষ্ট। এ কথা মুসলিমদের ধর্মের বিরোধী। কারণ যে মুমিন ব্যক্তি জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর যিয়ারত বা সাক্ষাত করবেন তিনি তাঁর সাহাবী বলে গণ্য হবেন। .... পরবর্তী যুগের একজন মুমিন বড় বড় ফরয ওয়াজিব আমলগুলি বেশি বেশি পালন করেও কখনোই একজন সাহাবীর সমমর্যাদা-সম্পন্ন হতে পারেন না। তাহলে একটি মুস্তাহাব ইবাদত পালনের মাধ্যমে কিভাবে তিনি একজন সাহাবীর সমমর্যাদা লাভ করবেন?![৮৬৯]

গ. যিয়ারত পরিত্যাগকারীরর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ

১০ম হাদীসঃ

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ ... مَنْ لَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"যে ব্যক্তি হজ্জ করল, কিন্তু আমার যিয়ারত করল না, সে আমার সাথে আন্তরিকতাবিহীন আচরণ করল।" অন্য ভাষায়: "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত বা সাক্ষাত করল না সে আমার সাথে অসৌহার্দপূর্ণ আচরণ করল।"

হাদীসটি কোনো হাদীস সংকলক কোনো হাদীস গ্রন্থে সংকলন করেন নি। দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবীদের জীবনীগ্রন্থসমূহে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটি সংকলন করেছেন। তারা হাদীসটি একটি মাত্র সনদে সংকলিত করেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আন-নু'মান নামক এক ব্যক্তি বলেন, আমাকে আমার দাদা আন-নু'মান ইবনু শিব্ল বলেছেন, মালিক ইবনু আনাস আমাকে বলেছেন, তিনি নাফি' থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ....।"

এ সনদের দুইজন রাবী অত্যন্ত দুর্বল ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনায় অভিযুক্ত। প্রথমত ইমাম মালিক থেকে বর্ণনাকারী আন-নু'মান ইবনু শিবল নামক এই ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল রাবী ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত তার পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদও মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জাওযী, সাগানী, যাহাবী, ইবনু হাজার, দরবেশ হূত, শাওকানী, আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, এর জালিয়াতির জন্য দায়ী মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আন-নু'মান, তার দাদা নুমান ইবনু শিবল নন।[৮৭০]

১১শ হাদীসঃ

مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِيْ إِلاَّ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ

"আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির যদি সচ্ছলতা বা সুযোগ থাকে, তা সত্ত্বেও সে আমার সাথে সাক্ষাত বা যিয়ারত না করে, তাহলে তার কোনো ওযর থাকে না।"

হাদীসটি ইবনু নাজ্জার তার 'তারীখুল মাদীনা' নামক গ্রন্থে সংকলিত করেছেন।[৮৭১] তার সনদটি নিম্নরূপ: "মহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল থেকে, তিনি জা'ফর ইবনু হারূন থেকে, তিনি সাম'আন ইবনু মাহদী থেকে, তিনি আনাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন...।"[৮৭২]

এ সনদটি মাউদূ সনদ হিসাবে প্রসিদ্ধ। মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল রাযী (২৪৮হি) কিছুটা দুর্বল হলেও পরিত্যক্ত ছিলেন না।[৮৭৩] এ সনদে তিনি যার নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন, জা'ফর ইবনু হারূন নামক এ ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী ও জাল হাদীস প্রচারকারী হিসাবে পরিচিত।[৮৭৪] তার উস্তাদ হিসাবে উল্লিখিত 'সাম'আন ইবনু মাহদী' সম্পর্কে যাহাবী ও ইবনু হাজার বলেছেন, এ লোকটি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না বললে চলে। তার নামে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি প্রচারিত। এতে প্রায় ৩০০ হাদীস আছে। মুহাম্মাদ ইবনু মুকাতিল রাযী, জা'ফর ইবনু হারূন আল-ওয়াসিতীর মাধ্যমে এই সাম'আন থেকে সেই হাদীসগুলি বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসগুলির জালিয়াতকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন।[৮৭৫]

বাহ্যত এই হাদীসটিও উপর্যুক্ত জাল পাণ্ডুলিপির অংশ। সর্বাবস্থায় হাদীসটির সনদে একাধিক মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।

১২শ হাদীসঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَغْدُ إِلَيَّ فَقَدْ جَفَانِيْ

"যে ব্যক্তি প্রশস্ততা বা সচ্ছলতা পেল, কিন্তু আমার নিকট আগমন করল না, সে আমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ বা বেয়াদবী করল।"

হাদীসটি হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী তার 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে সনদ বিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। কোথাও

কোনো গ্রন্থেই তা সনদ-সহ পাওয়া যায় না। আল্লামা সুবকী, ইরাকী, সাখাবী, আজলূনী, শাওকানী প্রমুখ মুহাদ্দিস নিশ্চিত করেছেন যে, এই বাক্যটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।[৮৭৬]

উপরের তিনটি হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে -তাঁর জীবদ্দশায় বা ইন্তিকালের পরে- যিয়ারত বা সাক্ষাত না করার অপরাধ বুঝা যায়। তবে আমরা দেখেছি যে, ৩য় হাদীসটি একেবারেই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসের সনদের একাধিক মিথ্যাবাদী রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বরকতময় কবর যিয়ারতের ফযীলত বিষয়ক সকল হাদীসই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের লেখকগণ, অন্যান্য সহীহ গ্রন্থের সংকলকগণ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ প্রমুখ মুহাদ্দিস এ সকল হাদীস তাঁদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করেন নি। এ সকল হাদীসের সনদগত দুর্বলতার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ঢালাওভাবে এ সকল হাদীসকে জাল বা অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এগুলির সবগুলিকে একত্রিত ভাবে সহীহ বা হাসান বলে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল জাওযী, ইবনু আব্দুল হাদী প্রমুখ মুহাদ্দিস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র কবর যিয়ারত বিষয়ক সকল হাদীসকেই জাল অথবা একেবারেই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা আবূ আলী ইবনুস সাকান, আব্দুল হক ইশবিলী, সুবকী, সাখাবী, ইবনু হাজার মাক্কী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ অর্থের হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[৮৭৭]

তবে উপরের আলোচনার মত অর্থগত পার্থক্য করে কেউ সনদগুলি আলোচনা করেছেন বলে জানতে পারি নি। একজন নগন্য তালিব ইলম হিসেবে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তৃতীয় অর্থে, অর্থাৎ যিয়ারত পরিত্যাগকারীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই জাল ও ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় অর্থে, অর্থাৎ ওফাতের পরে কবর যিয়ারতকারীকে জীবদ্দশায় যিয়ারতকারীর মর্যাদা প্রদান বিষয়ক হাদীসগুলি অত্যন্ত দুর্বল বা জাল।

প্রথম অর্থে, অর্থাৎ যিয়ারতকারীর জন্য শাফায়াতের সুসংবাদ প্রদানমূলক হাদীসগুলি হাসান পর্যায়ের বলে গণ্য করা উচিত। কারণ একই অর্থে ৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে তিনটির সনদের দুর্বলতা সম্পূরণযোগ্য। ১ম হাদীসের ২য় সনদ, ৪র্থ হাদীস এবং ৫ম হাদীসের সনদে কোনো মিথ্যায় অভিযুক্ত বা পরিত্যক্ত রাবী নেই। কাজেই একাধিক সনদের কারণে তা 'হাসান লি গাইরিহী' বলে গণ্য হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. বিবাহের আগে হজ্জ আদায়ের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে 'হজ্জ রাখতে পারবে কিনা', 'হজ্জের আগে ছেলেমেয়ে বিবাহ দিতে হবে', 'হজ্জের আগে পিতামাতার হজ্জ করাতে হবে', বা 'পিতামাতার অনুমতি লাগবে'... ইত্যাদি কিছু ভিত্তিহীন ধারণা ও কুসংস্কারের কারণে সাধারণত মুসলমানেরা বার্ধক্যের আগে হজ্জ করেন না, যদিও হজ্জ ফরয হওয়ার পরে দেরি করা মোটেও উচিত নয়। ইন্দোনেশিয়ায় বিষয়টি উল্টো। যৌবনের শুরুতে, বিবাহের পূর্বে হজ্জ আদায় না করলে মনে হয় হজ্জ হলো না। একটি জাল হাদীস এর কারণ। এই জাল হাদীসটিতে বলা হয়েছে:

مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ

"যে ব্যক্তি হজ্জ পালনের আগে বিবাহ করল, সে পাপ দিয়ে শুরু করল।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এই কথাটি জাল।[৮৭৮]

৪. হজ্জের কারণে বান্দার হক্কও ক্ষমা হওয়া

হজ্জ বিষয়ক প্রচলিত কিছু হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জের সময় হাজীদের সকল পাপের মার্জনার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। মহান আল্লাহ প্রথমে জানান যে বান্দার হক ছাড়া হাজীর সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। বারংবার দোয়ার পর আল্লাহ জানান যে, হাজীর সকল পাপ, এমনকি বান্দার হক্ক বিষয়ক পাপও ক্ষমা করা হবে ...।

এই মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি হাদীসের সনদই অত্যন্ত দুর্বল। প্রত্যেক সনদেই মিথ্যাবাদী অথবা অত্যন্ত দুর্বল রাবী অথবা অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে সেগুলিকে 'দুর্বল' হলেও সরাসরি 'জাল' নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো মুহাদ্দিস এই অর্থের সকল হাদীসই জাল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। কারণ প্রত্যেক সনদেই মিথ্যাবাদী বা পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। এছাড়া তা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সত্যের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার বা প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এমনকি জিহাদ ও শাহাদতের দ্বারাও তার ক্ষমা হয় না।[৮৭৯]

২. ১৪. যিক্‌র, দোয়া, দরুদ, সালাম ইত্যাদি

২. ১৪. ১. কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক

কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ফযীলতের বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলির বিষয়ে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এ সকল বিষয়ে অনেক মিথ্যা কথাও হাদীস নামে চালানো হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক অনির্ভরযোগ্য ও বানোয়াট কথা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা বা আয়াত বিষয়ক দুই প্রকারের কথা প্রচলিত। এক প্রকারের কথা ফযীলত বা আখিরাতের মর্যাদা, সাওয়াব, আল্লাহর দয়া ইত্যাদি বিষয়ক। দ্বিতীয় প্রকারের কথা 'তদবীর' বা দুনিয়ায় বিভিন্ন ফলাফল লাভ বিষয়ক।

উমার আল-মাউসিলীর আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের ফযীলতে কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত বাকি হাদীসগুলি অধিকাংশই যয়ীফ অথবা বানোয়াট। বিশেষত, তাফসীরে কাশ্শাফ ও তাফসীরে বায়যাবীর প্রতিটি সূরার শেষে সেই সূরার ফযীলত বিষয়ক যে সকল কথা বলা হয়েছে তা মূলত এ বিষয়ক দীর্ঘ জাল হাদীসটি থেকে নেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত পাঞ্জ-সূরার ফযীলত বিষয়ক অধিকাংশ কথাই যয়ীফ অথবা জাল। এই বিষয়ক যয়ীফ ও মাউযূ হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি এবং এগুলির বিস্তারিত আলোচনার জন্য পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। এই বইয়ের কলেবর ইতোমধ্যেই অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এজন্য আমরা এই বইয়ে ফযীলত বিষয়ক যয়ীফ ও জাল হাদীসগুলি আর আলোচনা করছি না। বরং এখানে আমল-তদবীর বিষয়ক কিছু কথা উল্লেখ করছি।

২. ১৪. ২. আমল-তদবীর ও খতম বিষয়ক

কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বা এগুলির পাঠ করে রোগব্যাধি বা বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য 'আমল' করা বৈধ। হাদীস শরীফে 'কুরআন' দ্বারা 'রুক্ইয়া' বা ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাদীসের দোয়া বা যে কোনো ভাল অর্থের বাক্য দ্বারা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈধ।

ঝাড়ফুঁক বা তদবীর দুই প্রকারের। কিছু ঝাড়ফুঁক বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রকারের ঝাড়ফুঁক ও আমল সীমিত। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ঝাড়ফুঁক, আমল ইত্যাদি পরবর্তী যুগের বুযুর্গদের অভিজ্ঞতার আলোকে বানানো। যেমন, অমুক সূরা বা অমুক আয়াতটি এত বার বা এত দিন বা অমুক সময়ে পাঠ করলে অমুক ফল লাভ হয় বা অমুক রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ সকল আমল বা তদবীরই বিভিন্ন বুযুর্গের অভিজ্ঞতা প্রসূত।

কেউ ব্যক্তিগত আমল বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 'তদবীর' বা 'রুকইয়া শরঈয়্যা' হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তবে এগুলির কোনো খাস ফযীলত আছে বা এগুলি হাদীস-সম্মত এরূপ ধারণা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্যা বলা হবে। এছাড়া তদবীর বা আমল হিসেবেও আমাদের উচিত সহীহ হাদীসে উল্লিখিত তদবীর, দোয়া ও আমলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

হাদীসের নামে যে সকল বানোয়াট 'আমল' বা 'তদবীর' আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা .... দারিদ্র্য বিমোচনের আমল

(লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) এই যিক্রটির ফযীলতে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এই বাক্যটিকে বেশিবেশি করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বাক্যটি জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডার, গোনাহ মাফের ও অফুরন্ত সাওয়াব লাভের অসীলা বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। এ বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস আমি 'রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে হাদীস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি এই বাক্যটি প্রত্যহ ১০০ বার পাঠ করবে সে কখনো দরিদ্র থাকবে না।' কথাটি বানোয়াট বলেই প্রতীয়মান হয়।

২. ঋণমুক্তির আমল

আলী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিম্নের বাক্যটি বললে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা পরিশোধ করাবেন:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন।" হাদীসটি সহীহ।[৮৮০]

কিন্তু কোনো বিশেষ দিনে বা বিশেষ সংখ্যায় দোয়াটি পাঠ করার বিষয়ে কোনো নির্দেশ কোনো হাদীসে দেওয়া হয়নি। প্রচলিত কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে: "হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে ৭০ বার এই দোয়া পড়বে, অল্প দিনের মধ্যে আল্লাহ তাকে ধনী ও সৌভাগ্যশালী করে দিবেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন: শুক্রবার দিন জুমুয়ার নামাযের পূর্বে ও পরে ১০০ বার করে দরুদ পড়ে এই দোয়া ৫৭০ বার পাঠ করলে পাহাড় পরিমান ঋণ থাকলেও তাহা অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ হয়ে যাবে...।" এই বর্ণনাগুলি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে প্রতীয়মান হয়।

৩. সূরা ফাতিহার আমল

সূরা ফাতিহার ফযীলতে বলা হয় :

اَلْفَاتِحَةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ

"ফাতিহা যে নিয়েতে পাঠ করা হবে তা পুরণ হবে।"

এই কথাটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। আরেকটি কথা বলা হয়:

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"সূরা ফাতিহা সকল রোগের আরোগ্য বা শেফা।"
এই কথাটি একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৮৮১]

৪. বিভিন্ন প্রকারের খতম

বিভিন্ন প্রকারের 'খতম' প্রচলিত আছে। সাধারণত, দুটি কারণে 'খতম' পাঠ করা হয়: (১) বিভিন্ন বিপদাপদ কাটানো বা জাগতিক ফল লাভ ও (২) মৃতের জন্য সাওয়াব পাঠানো। উভয় প্রকারের খতমই 'বানোয়াট' ও ভিত্তিহীন। এ সকল খতমের জন্য পঠিত বাক্যগুলি অধিকাংশই খুবই ভাল বাক্য। এগুলি কুরআনের আয়াত বা সুন্নাত সম্মত দোয়া ও যিক্র। কিন্তু এগুলি এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠের কোনো নির্ধারিত ফযীলত, গুরুত্ব বা নির্দেশনা কিছুই কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে বলা হয় নি। এ সকল 'খতম' সবই বানোয়াট। উপরন্তু এগুলিকে কেন্দ্র করে কিছু হাদীসও বানানো হয়েছে।

'বিসমিল্লাহ' খতম, দোয়া ইউনুস খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের। বলা হয় 'সোয়া লাখ বার 'বিসমিল্লাহ' পড়লে অমুক ফল লাভ করা যায়' বা 'সোয়া লাখ বার দোয়া ইউনূস পাঠ করলে অমুক ফল পাওয়া যায়' ইত্যাদি। এগুলি সবই বুযুর্গদের অভিজ্ঞতার আলোকে বানানো এবং কোনোটিই হাদীস নয়। তাসমিয়া বা (বিসমিল্লাহ), তাহলীল বা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও দোয়া ইউনুস-এর ফযীলত ও সাওয়াবের বিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে।[৮৮২] তবে এগুলি ১ লক্ষ, সোয়া লক্ষ ইত্যাদি নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করার বিষয়ে কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। খতমে খাজেগানের মধ্যে পঠিত কিছু দোয়া সুন্নাত সম্মত ও কিছু দোয়া বানানো। তবে পদ্ধিতিটি পুরোটাই বানানো।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, এ সকল খতমের কারণে সমাজে এ ধরণের "পুরোহিততন্ত্র" চালু হয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা হলো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ইউনূস (আ)-এর মতই নিজে "দুআ ইউনূস" বা অন্যান্য সুন্নাত সম্মত দুআ পড়ে মনের আবেগে আল্লাহর কাছে কাঁদবেন এবং বিপদমুক্তি প্রার্থনা করবেন। একজনের বিপদে অন্যজন কাঁদবেন, এমনটি নয়। বিপদগ্রস্ত মানুষ অন্য কোনো নেককার আলিম বা বুজুর্গের নিকট দুআ চাইতে পারেন। তবে এখানে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

(১) অনেকে মনে করেন, জাগতিক রাজা বা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে যেমন মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেও অনুরূপ কিছুর প্রয়োজন। আলিম-বুজুর্গের সুপারিশ বা মধ্যস্ততা ছাড়া আল্লাহর নিকট দুআ বোধহয় কবুল হবে না। এ ধরনের চিন্তা সুস্পষ্ট শিরক। আমি "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা" গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জাগতিক সম্রাট, মন্ত্রী, বিচারক বা নেতা আমাকে ভালভাবে চিনেন না বা আমার প্রতি তার মমতা কম এ কারণে তিনি হয়ত আমার আবেদন রাখবেন না বা পক্ষপাতিত্ব করবেন। কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে কি এরূপ চিন্তা করা যায়? ইসলামের বিধিবিধান শিখতে, আত্মশুদ্ধির কর্ম শিখতে, কর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা পেতে বা আল্লাহর জন্য ভালভাসা নিয়ে আলেম ও বুজুর্গগণের নিকট যেতে হয়। প্রার্থনা, বিপদমুক্তি ইত্যাদির জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়।

(২) কুরআন কারীম ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, যে কোনো মুমিন নারী বা পুরুষ যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করে দুআ করলে ইবাদত করার সাওয়াব লাভ করবেন। এছাড়া আল্লাহ তার দুআ কবুল করবেন। তিনি তাকে তার প্রার্থিত বিষয় দান করবেন, অথবা এ প্রার্থনার বিনিময়ে তার কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন অথবা তার জন্য জান্নাতে কোনো বড় নিয়ামত জমা করবেন। "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থে আমি এ বিষয়ক হাদীসগুলি সনদ-সহ আলোচনা করেছি।

(৩) নিজে দুআ করার পাশাপাশি জীবিত কোনো আলিম-বুজুর্গের কাছে দুআ চাওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের জন্য নিজের দুআই সর্বোত্তম দুআ। এছাড়া দুআর ক্ষেত্রে মনের আবেগ ও অসহায়ত্বই দুআ কবুলের সবচেয়ে বড় অসীলা। আর বিপদগ্রস্ত মানুষ যতটুকু আবেগ নিয়ে নিজের জন্য কাঁদতে পারেন, অন্য কেউ তা পারে না।

(৪) অনেকে মনে করেন, আমি পাপী মানুষ আমার দুআ হয়ত আল্লাহ শুনবেন না। এ চিন্তা খুবই আপত্তিকর ও আল্লাহর রহমত থেকে হতাশার মত পাপের পথ। কুরআনে একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকগণও যখন অসহায় হয়ে মনের আবেগে আল্লাহর কাছে দুআ করত, তখন আল্লাহ তাদের দুআ কবুল করতেন। কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, পাপ-অন্যায়ের কারণেই মানুষ বিপদগ্রস্ত হয় এবং বিপদগ্রস্ত পাপী ব্যক্তির মনের আবেগময় দুআর কারণেই আল্লাহ বিপদ কাটিয়ে দেন।

(৫) হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, "দুআ ইউনূস" পাঠ করে দুআ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। (লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যালিমীন) অর্থ- আপনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, আপনি মহা-পবিত্র, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্ত ভূক্ত হয়েছি। এর মর্মার্থ হলো: "বিপদে ডাকার মত, বিপদ থেকে উদ্ধার করার মত বা বিপদে আমার ডাক শুনার মত আপনি ছাড়া কেউ নেই। আমি অপরাধ করে ফেলেছি, যে কারণে এ বিপদ। আপনি এ অপরাধ ক্ষমা করে বিপদ কাটিয়ে দিন।" আল্লাহর একত্বের ও নিজের অপরাধের এ আন্তরিক স্বীকারোক্তি আল্লাহ এত পছন্দ করেন যে, এর কারণে আল্লাহ বিপদ কাটিয়ে দেন।

(৬) "খতম" ব্যবস্থা চালু করার কারণে এখন আর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে দুআ ইউনূস পাঠ বা খতম করে কাঁদেন না। বরং তিনি নির্দিষ্ট সংখ্যক আলিম-বুজুর্গকে দাওয়াত দেন। যারা সকলেই বলেন: "নিশ্চয় আমি যালিম বা অপরাধী"। আর যার অপরাধে আল্লাহ তাকে বিপদ দিয়েছেন তিনি কিছুই বলেন না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দাওয়াতকৃত আলিমগণ প্রত্যেকেই যালিম বা অপরাধী,

শুধু দাওয়াতকারী ব্যক্তিই নিরপরাধ!

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবনের তাওফীক প্রদান করুন।

২. ১৪. ৩. যিক্র, ওযীফা, দোয়া ইত্যাদি

১. মহান আল্লাহর বিভিন্ন পাক নামের ওযীফা বা আমল

মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করা হবে।"[৮৮৩]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয় আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০'র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৮৪]

এ হাদীসে নামগুলি বিবরণ দেওয়া হয়নি। ৯৯ টি নাম সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন।[৮৮৫] কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত বিবরণকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি সংকলন করে তার সনদের দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, ৯৯ টি নামের তালিকা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নয়। পরবর্তী রাবী এগুলি কুরআনের আলোকে বিভিন্ন আলিমের মুখ থেকে সংকলিত করে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কুরআন করীমে উল্লেখিত অনেক নামই এই তালিকায় নেই। কুরআন করীমে মহান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয়েছে 'রাব্ব' বা প্রভু নামে। এই নামটিও এই তালিকায় নেই।[৮৮৬]

এক্ষেত্রে আগ্রহী মুসলিম চিন্তা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯৯ টি নাম হিসাব রাখতে নির্দেশনা দিলেন কিন্তু নামগুলির নির্ধারিত তালিকা দিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আংশিক গোপন রাখা হয়, মুমিনের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য। যেমন, লাইলাতুল কাদ্‌র, জুম'আর দিনের দোয়া কবুলের সময়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নামের নির্ধারিত তালিকা না বলে আল্লাহর নাম সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন বান্দা আগ্রহের সাথে কুরআন কারীমে আল্লাহর যত নাম আছে সবই পাঠ করে, সংরক্ষণ করে এবং সে সকল নামে আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং সেগুলির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে।[৮৮৭]

কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী সংকলিত তালিকাটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।[৮৮৮] সর্বাবস্থায় আগ্রহী যাকির এই নামগুলি মুখস্থ করতে পারেন। এছাড়া কুরআন কারীমে উল্লেখিত আল্লাহর সকল মুবারাক নাম নিয়মিত কুরআন পাঠের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

আল্লাহ তা'লার বরকতময় নামের ওসীলা দিয়ে কিভাবে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে, মহিমাময় আল্লাহর 'ইসমু আ'যম' কি এবং এর মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ মহান দরবারে দোয়া করতে হবে সে বিষয়ক সহীহ হাদীসগুলি আমি 'রাহে বেলায়েত' গ্রন্থে সনদের আলোচনা সহ উল্লেখ করেছি।

আমাদের দেশের প্রচলিত অনেক বইয়ে এ সকল নামের আরো অনেক ফযীলত লেখা হয়েছে। যেমন প্রত্যহ এগুলি পাঠ করলে অন্নকষ্ট হবে না, রোগ ব্যাধি দূর হবে, স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যিয়ারত হবে, মনের আশা পূর্ণ হবে, দৈনিক এত বার অমুক নামটি এত দিন পর্যন্ত পড়লে, বা লিখলে অমুক ফল লাভ করা যাবে অথবা অমুক নাম প্রতিদিন এত বার এই পদ্ধতিতে করলে অমুক ফল পাওয়া যাবে, অথবা অমুক নাম এতবার পাঠ করতে হবে, ইত্যাদি। এই ধরনের কোনো কথাই কুরআন বা হাদীসের কথা নয়। কোনো কোনো বুযুর্গ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কোনো আমল বা তদবীর করেছেন বা শিখিয়েছেন। তবে এগুলিকে আল্লাহর কথা বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা মনে করলে বা হাদীস হিসেবে বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামে মিথ্য কথা বলা হবে।

এ বিষয়ক প্রচলিত জাল হাদীসগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

২. "আল্লাহর যিক্র সর্বোত্তম যিক্র।"

বিভিন্ন পুস্তকে হাদীস হিসেবে নিম্নের বাক্যটির উল্লেখ দেখা যায়:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ ذِكْرُ اللهِ

"আল্লাহর যিক্‌র সর্বোত্তম যিক্‌র।"

অর্থের দিক থেকে কথাটি ঠিক। আল্লাহর যিক্‌র তো সর্বোত্তম যিক্‌র হবেই। আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া আর কার যিকির সর্বোত্তম হবে? তবে কথাটি হাদীস নয়। কোনো সহীহ বা যায়ীফ সনদে তা বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

৩. "যে ব্যক্তি রাত্রিতে আল্লাহর নাম যিক্‌র করে তাহার অন্তরে এবং মৃত্যু হইলে তাহার কবরে নূর চমকাইতে থাকিবে।"[৮৮৯]

৪. যে ব্যক্তি ফজরের সময় 'আল্লাহ' নামটি ১০০ বার যিক্‌র করে নিম্নোক্ত ৬টি নাম (জাল্লা জালালুহু, ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু, ওয়া জাল্লা সানাউহু, ওয়া তাকাদ্দাসাত আসমাউহু, ওয়া আ'যামা শানুহু, ওয়া লা ইলাহা গাইরুহু) একবার করে পড়বে, সে ব্যক্তি গোনাহ হতে এমনভাবে মুক্ত হবে যেন সে এই মাত্র মাতৃগর্ভ হতে জন্মলাভ করল। তার আমলনামা পরিষ্কার থাকবে এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।'[৮৯০]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন কথা যা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নামে বলা হয়েছে।

৫. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার খাস যিকর

আল্লাহর যিক্‌র-এর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "সর্বোত্তম যিকির 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"[৮৯১]। আরো বলেন: "তোমরা বেশি বেশি করে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।"[৮৯২] অন্যত্র তিনি বলেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লা-হু আকবার'। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার।"[৮৯৩]

এ সকল যিক্‌র-এর গুরত্ব, ফযীলত, সংখ্যা ও সময় বিষয়ক অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস আমি 'রাহে বেলায়াত' পুস্তকে আলোচনা করেছি। আমরা সেখানে দেখেছি যে, এ সকল যিক্‌র যপ করার বা উচ্চারণ করার জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেখান নি। কোথাও কোনো একটি সহীহ বা যয়ীফ হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে টেনে টেনে, বা জোরে জোরে, বা ধাক্কা দিয়ে, বা কোনো 'লতীফা'র দিকে লক্ষ্য করে, বা অন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে যিক্‌র করতে শিক্ষা দিয়েছেন। মূল কথা হলো, মনোযোগের সাথে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্‌র করতে হবে এবং প্রত্যেকে তাঁর মনোযোগ ও আবেগ অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আলিম, পীর ও মুরশিদ মুরিদগণের মনোযোগ ও আবেগ তৈরির জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এগুলি তাঁদের উদ্ভাবন এবং মুরিদের মনোযোগের জন্য সাময়িক রিয়াযত বা অনুশীলন।

তবে জালিয়াতরা এ বিষয়েও কিছু কথা বানিয়েছে। এই জাতীয় একটি ভিত্তিহীন কথা ও জাল হাদীস নিম্নরূপ: "একদা হযরত আলী (রা) হুযুর (ﷺ)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য আমাকে সহজ সরল পন্থা বালিয়া দিন। হুযূর (ﷺ) বলিলেন- একটি যিকর করিতে থাক। হযরত আলী বলিলেন- কিভাবে করিব? এরশাদ করিলেন- চক্ষু বন্ধ কর এবং আমার সাথে তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল। হযরত আলী (রা) ইহা হযরত হাসান বসরীকে এবং হযরত হাসান বসরী হইতে মুরশিদ পরম্পরায় আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।"

এ গল্পটির আরেকটি 'ভার্সন' নিম্নরূপ: "আলী (রা) বলেন, খোদা-প্রাপ্তির অতি সহজ ও সরল পথ অবগত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওহীর অপেক্ষায় থাকেন। অঃপর জিবরাঈল (আ) আগমন করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কালেমা শরীফ তিনবার শিক্ষা দিলেন। জিবরাঈল (আ) যে ভাবে উচ্চারণ করলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)ও সেভাবে আবৃত্তি করলেন। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে তা শিখিয়ে দিলেন। আলী (রা) অন্যান্য সাহাবীকে তা শিখিয়ে দিলেন।"

এ হাদীসটি লোকমুখে প্রচলিত ভিত্তিহীন কথা মাত্র। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও হাদীসটি কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। এ জন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী উল্লেখ করেছেন যে, তরীকার বুযুর্গগণের মুখেই শুধু এই কথাটি শোনা যায়। এছাড়া এর কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না।[৮৯৪]

৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ওযীফা

অগণিত সহীহ হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌র, দোয়া বা ওযীফার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পালন করতেন বা সাহাবীগণকে ও উম্মতকে পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এগুলি ছাড়াও কিছু ওযীফা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত, যা পরবর্তী যুগের মানুষদের বানানো, কোনো হাদীসে তা পাওয়া যায় না। নিম্নের ওযীফাটি খুবই প্রসিদ্ধ:

ফজর নামাযের পরে ১০০ বার (هو الحي القيوم), যোহরের নামাযের পরে ১০০ বার (هو العلي العظيم), আসরের নামাযের পরে ১০০ বার (هو الرحمن الرحيم), মাগরিবের নামাযের পরে ১০০ বার (هو الغفور الرحيم) এবং ঈশার নামাযের পরে ১০০ বার (هو اللطيف الخبير) পাঠ করা।

এ বাক্যগুলি সুন্দর এবং এগুলির পাঠে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এগুলির কোনোরূপ ফযীলত, এগুলিকে এত সংখ্যায় বা

অমুক সময়ে পড়তে হবে এমন কোনো প্রকারের নির্দেশনা কুরআন বা হাদীসে নেই। আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো ওযীফাগুলি পালন করা।

৭. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত শেষে 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম...'

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে বলতেন:

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

"হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী, আপনি বরকতময়।"[৮৯৫]

অনেকে এই বাক্যগুলির মধ্যে কিছু বাক্য বৃদ্ধি করে বলেন:

إِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلاَمُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ، وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلاَمِ...

মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ তাহতাবী হানাফী (১২৩১ হি) প্রমুখ আলিম বলেছেন যে, এ অতিরিক্ত বাক্যগুলি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা। কিছু ওয়ায়েয এগুলি বানিয়েছেন।[৮৯৬]

৮. দোয়ায়ে গঞ্জল আরশ

প্রচলিত মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়াগুলির অন্যতম এই দোয়াটি। এর মধ্যে যে বাক্যগুলি বলা হয় তার অর্থ ভাল। তবে এভাবে এই বাক্যগুলি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এই বাক্যগুলির সম্মিলিতরূপ এভাবে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এই বাক্যগুলির ফযীলত ও সাওয়াবে যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা কথা।

৯. দোয়ায়ে আহাদ নামা

অনুরূপ একটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে আহাদ নামা'। প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তকে এই দোয়াটি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দোয়ার মূল বাক্যগুলি একাধিক যয়ীফ সনদে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। এ সকল হাদীসে এই দোয়াটি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ফযীলত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কেউ এই দোয়াটি সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করেন তবে কিয়ামতের দিন সে মুক্তি লাভ করবে...।[৮৯৭]

এছাড়া এ দোয়ার ফযীলত ও আমল সম্পর্কে প্রচলিত সব কথাই বানোয়াট। এরূপ বানোয়াট কথাবার্তার একটি নমুনা দেখুন: "তিরমিজী, শামী ও নাফেউল খালায়েক কিতাবে 'দোয়ায়ে আহাদনামা' সম্পর্কে বহু ফজীলতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে জীবনে আহাদনামা ১০০ বার পাঠ করবে সে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে এবং আমি তার জান্নাতের জামিন হব।... হজরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, মানব দেহে আল্লাহ তায়ালা তিন হাজার রোগব্যাধি দিয়েছেন। এক হাজার হাকিম ডাক্তারগণ জানেন এবং চিকিৎসা করেন। দু'হাজার রোগের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেন না। যদি কেহ আহাদনামা লিখে সাথে রাখে অথবা দু'বার পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে দু'হাজার ব্যাধি থেকে হিফাজত করবেন। ..."[৮৯৮]

এগুলি সবই ভিত্তিহীন ও জাল কথা। সুনানুত তিরমিযী বা অন্য কোনো হাদীস-গ্রন্থে এ সকল কথা সহীহ বা যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয় নি।

১০. দোয়ায়ে কাদাহ

প্রচলিত আরেকটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে কাদাহ'। এই দোয়াটির ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা।

১১. দোয়ায়ে জামীলা:

দোয়ায়ে জামীলা ও এর ফযীলত বিষয়ক যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট কথা।

১২. হাফতে হাইকাল

হাফতে হাইকাল নামক এ দোয়ায় মূলত কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলির এইরূপ বিভক্তি, বণ্টন ও ব্যবহার কোনো কোনো বুযুর্গের বানানো ও অভিজ্ঞতালব্ধ। এগুলির ব্যবহার ও ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বিভিন্ন মানুষের কথা, রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা বা হাদীস নয়।

১৩. দোয়ায়ে আমান

প্রচলিত আরেকটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন দোয়া 'দোয়ায়ে আমান। এ দোয়ার বাক্যগুলির অর্থ ভাল। তবে এভাবে কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি এবং এর ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট।

১৪. দোয়ায়ে হিযবুল বাহার

প্রচলিত একটি দোয়া ও আমল হলো 'দোয়ায়ে হিযবুল বাহার'। এ দোয়াটির মধ্যে ব্যবহৃত অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীস

থেকে নিয়ে জমা করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে এ দোয়াটি কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি। এর কোনোরূপ ফযীলত, গুরুত্ব বা ফায়দাও হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

অনেক বুযুর্গ এগুলির আমল করেছেন। অনেকে 'ফল' পেয়েছেন। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে, এসকল দোয়াকে হাদীস বা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা মনে করলে অন্যায় হবে। কিন্তু বুযুর্গদের বানানো দোয়া হিসাবে আমল করতে দোষ কি?

এ সকল দুআকে বুজুর্গদের বানানো হিসেবে আমল করা নিষিদ্ধ নয়। মুমিন যে কোনো ভাল বাক্য দিয়ে দোয়া করতে পারেন। তবে এ সকল দোয়ার কোনো সাওয়াব বা ফলাফল ঘোষণা করতে পারেন না। এছাড়া সহীহ হাদীসে অনেক সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলি পালন করলে এইরূপ বা এর চেয়েও ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন। এ সকল বানোয়াট 'সুন্দর সুন্দর' দোয়ার প্রচলনের ফলে সে সকল 'নববী' দোয়া অচল ও পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। এ সকল দোয়ায় বুযুর্গীর ছোয়া থাকলেও নবুওতের নূর নেই। আমাদের জন্য উত্তম হলো নবুওতের নূর থেকে উৎসারিত দোয়াগুলি পালন করা। এতে দোয়া করা ও ফল লাভ ছাড়াও আমরা সুন্নাতকে জীবিত করার এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় দোয়া করার অতিরিক্ত সাওয়াব ও বরকত লাভ করব। আমি **'রাহে বেলায়াত'** পুস্তকে সহীহ হাদীস থেকে অনেক দোয়া, মুনাজাত, যিক্‌র ও ওযীফা উল্লেখ করেছি। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।

২. ১৪. ৪. দরুদ-সালাম বিষয়ক

মহান আল্লাহ মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মহান নবীর (ﷺ) উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করতে। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও নেক কর্ম। সহীহ হাদীসের আলোকে দরুদ ও সালামের ফযীলতের বিষয়গুলি **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ সকল ফযীলতের মধ্যে রয়েছে:

(১). সালাত ও সালাম পাঠকারীর উপর আল্লাহ নিজে সালাত (রহমত) ও সালাম প্রেরণ করেন। একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করলে আল্লাহ আল্লাহ সালাতপাঠকারীকে ১০ বার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন, তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। একবার সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাম জানাবেন।

(২). সালাত বা দরুদ পাঠকারী যতক্ষণ দরুদ পাঠে রত থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন। একবার সালাত (দরুদ) পাঠ করলে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তাঁর উপর সত্তর বার সালাত (রহমত ও দোয়া) করবেন।

(৩). সালাত ও সালাম পাঠকারীর সালাত ও সালাম তার পরিচয়সহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছান হবে।

(৪). রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সালাত পাঠকারীর জন্য দোয়া করবেন।

(৫). দরুদ পাঠ কেয়ামতে নবী (ﷺ)-এর শাফায়াত লাভের ওসীলা।

(৬). মহান আল্লাহ সালাত (দরুদ) পাঠকারীর দোয়া কবুল করবেন এবং সকল দুনিয়াবী ও পারলৌকিক সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।

সালাতের এত সহীহ ফযীলত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় আবেগী মানুষ এর ফযীলতে আরো অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন।

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ' এটুকু কথা হলো দরুদের ন্যূনতম পর্যায়। এর সাথে 'সালাম' যোগ করলে সালামের ন্যূনতম পর্যায় পালিত হবে। যেমন, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও সাল্লিম'। অথবা 'সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিও ওয়া সাল্লামা।' সহীহ হাদীসে দরুদ পাঠের জন্য দরুদে ইবরাহিমী ও ছোট বাক্যের দুই একটি দরুদ পাওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত দরুদের বাক্যগুলি **'রাহে বেলায়াত'** ও **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদের সমাজে প্রচলিত দরুদের বিভিন্ন নির্ধারিত বাক্য সবই বানোয়াট।

দরুদ-সালাম বিষয়ক কিছু প্রচলিত বানোয়াট বা অনির্ভরযোগ্য কথা:

১. জুমু'আর দিনে নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরুদ পাঠের ফযীলত

জুমুআর দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে সহীহ হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এই দিনে নির্ধারিত সংখ্যক দরুদ পাঠের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। এই দিনে বা রাতে ৪০ বার, ৫০ বার, ১০০ বার, ১০০০ বার বা অনুরূপ কোনো সংখ্যায় দরুদ পাঠ করলে ৪০, ৫০ ১০০ বৎসরের গোনাহ মাফ হবে, বা বিশেষ পুরস্কার বা ফযীলত অর্জন হবে অর্থে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুমিন যথাসাধ্য বেশি বেশি দরুদ ও সালাম এই দিনে পাঠ করবেন। নিজের সুবিধা ও সাধ্যমত 'ওযীফা' তৈরি করতে পারেন। যেমন আমি প্রতি শুক্রবারে অথবা প্রতিদিন ১০০, ৩০০ বা ৫০০ বার দরুদ ও সালাম পাঠ করব।

২. দরুদে মাহি বা মাছের দরুদ

দরুদে মাহি 'মাছের দরুদ'-এর কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনাবলি সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। অনুরূপভাবে এই দরুদের ফযীলতে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট ও মিথ্যা কথা। এই বানোয়াট কাহিনীটিতে বলা হয়েছে, যে, রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যুগে একব্যক্তি নদীর তীরে বসে দরুদ পাঠ করতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মাছ শুনে শুনে দরুদটি শিখে ফেলে এবং পড়তে থাকে। ফলে মাছটি সুস্থ হয়ে যায়। পরে এক ইহূদীর জালে মাছটি আটকা পড়ে। ইহূদীর স্ত্রী মাছটিকে কাটতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে মাছটিকে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। মাছটি ফুটন্ত তেলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দরুদটি পাঠ করতে থাকে। এতে ঐ ইহূদী আশ্চার্যান্বিত হয়ে মাছটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) দরবারে উপস্থিত হয়। তাঁর দোয়ায় মাছটি বাকশক্তি লাভ করে এবং সকল বিষয় বর্ণনা করে। .... পুরো ঘটনাটিই ভিত্তিহীন মিথ্যা।

৩. দরুদে তাজ, তুনাজ্জিনা, ফুতুহাত, শিফা ইত্যাদি

দরুদে তাজ, দরুদে তুনাজ্জিনা, দরুদে ফুতুহাত, দরুদে রু'ইয়াতে নবী (ﷺ), দরুদে শিফা, দরুদে খাইর, দরুদে আকবার, দরুদে লাখী, দরুদে হাজারী, দরুদে রূহী, দরুদে বীর, দরুদে নারীয়া, দরুদে শাফেয়ী, দরুদে গাওসিয়া, দরুদে মুহাম্মাদী ..... ।

এ সকল দরুদ সবই পরবর্তী যুগের মানুষদের বানানো । এগুলির ফযীলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা ।

এ সকল দরুদের বাক্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাল কথার সমন্বয় । তবে এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশেষ ভাবে পড়ার জন্য কোনো নির্দেশনা নেই । এ সকল দরুদের বাক্যগুলি বিন্যাস পরবর্তী মানুষদের তৈরি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি পাঠ করলে দরুদ পাঠের সাধারণ ফযীলত লাভ হতে পারে । তবে এগুলির বিশেষ ফযীলতে বর্ণিত কথাগুলি বানোয়াট ।

যেমন, (আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) হাদীস সম্মত একটি দরুদ । আবার (আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন বি 'আদাদি কুল্লি দায়িওঁ ওয়া বি 'আদাদি কুল্লি ইল্লাতিওঁ ওয়া শিফা) কথাটির মধ্যে কোনো দোষ নেই । এ বাক্যের মাধ্যমে দরুদ পাঠ করলে দরুদ পাঠের সাধারণ সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় । তবে এগুলির জন্য কোনো বিশেষ ফযীলতের কথা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নয় । সকল বানানো দরুদেরই একই অবস্থা । কোনো কোনো বানানো দরুদের মধ্যে আপত্তিকর কথা রয়েছে ।

২. ১৫. শুভ, অশুভ, উন্নতি, অবনতি বিষয়ক

বিভিন্ন প্রচলিত ইসলামী গ্রন্থে এবং আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, অমুক দিন, বার, তিথি, সময় বা মাস অশুভ, অযাত্রা ইত্যাদি । অনুরূপভাবে মনে করা হয়, বিভিন্ন কাজের অশুভ ফল রয়েছে এবং এ সকল কাজের কারণে মানুষ দরিদ্র হয় বা মানুষের ক্ষতি হয় । এই বিশ্বাস বা ধারণা শুধু ইসলাম বিরোধী কুসংস্কারই নয়; উপরন্তু এইরূপ বিশ্বাসের ফলে ঈমান নষ্ট হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অশুভ, অযাত্রা, অমঙ্গল ইত্যাদি বিশ্বাস করতে এবং যে কোনো বিষয়ে আগাম হতাশা এবং নৈরাশ্যবাদ (ঢ়বংংরসরংস) অত্যন্ত অপছন্দ করতেন । পক্ষান্তরে তিনি সকল কাজে সকল অবস্থাতে শুভ চিন্তা, মঙ্গল-ধারণা ও ভাল আশা করা পছন্দ করতেন ।[৮৯৯] শুভ চিন্তা ও ভাল আশার অর্থ হলো আল্লাহর রহমতের আশা অব্যাহত রাখা । আর অশুভ ও অমঙ্গল চিন্তার অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক ।[৯০০]

এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে ।

আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন তাই অমঙ্গলের কারণ । বান্দার জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতির কারণ বলেই তো আল্লাহ বান্দার জন্য তা নিষিদ্ধ করেছেন । এ সকল কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ আল্লাহর রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় । আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম দুই প্রকারের: (১) হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ক সম্পর্কিত হারাম ও (২) হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার সম্পর্কিত হারাম । দ্বিতীয় প্রকারের হারামের জন্য মানুষকে আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতে পার্থিব ক্ষতির মাধ্যমে শাস্তি পেতে হবে বলে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায় । জুলুম করা, কারো সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে চাঁদাবাজি, যৌতুক বা অন্য কোনো মাধ্যমে গ্রহণ করা, ওজন, পরিমাপ বা মাপে কম দেওয়া, পিতামাতা, স্ত্রী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, অনাথ, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা, কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, আল্লাহর কোনো সৃষ্টির বা মানুষের ক্ষতি করা বা সাধারণ ভাবে 'হক্কুল ইবাদ' নষ্ট করা পার্থিব অবনতির কারণ ।

কিন্তু আল্লাহর কোনো সৃষ্টির মধ্যে, কোনো বার, তারিখ, তিথি, দিক ইত্যাদির মধ্যে অথবা কোনো মোবাহ কর্মের মধ্যে কোনো অশুভ প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায় ও ঈমান বিরোধী । আমাদের সমাজে এ জাতীয় অনেক কথা প্রচলিত আছে । এগুলিকে সবসময় হাদীস বলে বলা হয় না । কিন্তু পাঠক সাধারণভাবে মনে করেন যে, এগুলি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) কথা । তা না হলে কিভাবে আমরা জানলাম যে, এতে মঙ্গল হয় এবং এতে অমঙ্গল হয়? এগুলি বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী । আর এগুলিকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) বাণী মনে করা অতিরিক্ত আরেকটি কঠিন অন্যায় ।

২. ১৫. ১. সময়, স্থান বিষয়ক

১. শনি, মঙ্গল, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ইত্যাদি

শনিবার, মঙ্গলবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কোনো তিথি, স্থান বা সময়কে অমঙ্গল অযাত্রা বা অশুভ বলে বিশ্বাস করা জঘন্য মিথ্যা ও ঘোরতর ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস । অমুক দিনে বাঁশ কাঁটা যাবে না, চুল কাটা যাবে না, অমুক দিনে অমুক কাজ করতে নেই...ইত্যাদি সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার । এগুলি বিশ্বাস করলে শির্কের গোনাহ হবে ।

২. চন্দ্রগহণ, সূর্যগ্রহণ, রংধনু, ধুমকেতু ইত্যাদি

চন্দ্রগহণ, সূর্যগ্রহণ, রংধনু, ধুমকেতু ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলি বিশেষ কোনো ভাল বা খারাপ প্রভাব রেখে যায় বলে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও মিথ্যা কথা । অমুক চাঁদে গ্রহণ হলে অমুক হয়, বা অমুক সময়ে রঙধনু দেখা দিলে অমুক ফল

হয়,এই ধরনের কথাগুলি বানোয়াট ।[৯০১]

৩. বুধবার বা মাসের শেষ বুধবার

বুধবারকে বা মাসের শেষ বুধবারকে অমঙ্গল, অশুভ, অযাত্রা বা খারাপ বলে বা বুধবারের নিন্দায় কয়েকটি বানোয়াট হাদীস প্রচলিত আছে। এগুলি সবই মিথ্যা। আল্লাহর সৃষ্টি দিন, মাস, তিথি সবই ভাল। এর মধ্যে কোন কোন দিন বা সময় বেশি ভাল। যেমন শুক্রবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেশি বরকতময়। তবে অমঙ্গল, অশুভ বা অযাত্রা বলে কিছু নেই ।[৯০২]

২. ১৫. ২. অশুভ কর্ম বা অবনতির কারণ বিষয়ক

বিভিন্ন প্রচলিত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিম্নের কাজগুলিকে অশুভ, খারাপ ফলদায়ক বা দারিদ্র আনয়নকারী:

১. হাঁটতে হাঁটতে ও অযু ব্যতীত দরুদ শরীফ পাঠ করা।
২. বিনা ওযুতে কুরআন কিংবা কুরআনের কোনো আয়াত পাঠ করা।

এ কথা দুটি একদিকে যেমন বানোয়াট কথা, অপরদিকে এ কথা দ্বারা মুমিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত থেকে বিরত রাখা হয়। গোসল ফরয থাকলে কুরআন পাঠ করা যায় না। ওযু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ ওযু ছাড়াও মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ওযু অবস্থায় যিক্‌র, দোয়া, দরুদ-সালাম ইত্যাদি পাঠ করা ভাল। তবে আল্লাহর যিক্‌র, দোয়া ও দরুদ-সালাম পাঠের জন্য ওযু বা গোসল জরুরী নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো, হাঁটতে, চলতে, বসে, শুয়ে ওযুসহ ও ওযু ছাড়া পাক-নাপাক সর্বাবস্থায় নিজের মুখ ও মনকে আল্লাহর যিক্‌র, দোয়া ও দরুদ পাঠে রত রাখা।

৩. বসে মাথায় পাগড়ি পরিধান করা।
৪. দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করা।
৫. কাপড়ের আস্তিন ও আঁচল দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা।
৬. ভাঙ্গা বাসনে বা গ্লাসে পানাহার করা।
৭. রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খাওয়া।
৮. খালি মাথায় পায়খানায় যাওয়া।
৯. খালি মাথায় আহার করা।
১০. পরিধানে কাপড় রেখে সেলাই করা।
১১. ফুঁক দিয়ে প্রদীপ নেভানো।
১২. ভাঙ্গা চিরুনী ব্যবহার করা।
১৩. ভাঙ্গা কলম ব্যবহার করা।
১৪. দাঁত দ্বারা নখ কাটা।
১৫. রাত্রিকালে ঘর ঝাড়ু দেওয়া।
১৬. কাপড় দ্বারা ঘর ঝাড়ু দেওয়া।
১৭. রাত্রে আয়নায় মুখ দেখা।
১৮. হাঁটতে হাঁটতে দাত খেলাল করা।
১৯. কাপড় দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা।

এরূপ আরো অনেক কথা প্রচলিত। সবই বানোয়াট কথা। কোনো জায়েয কাজের জন্য কোনোরূপ ক্ষতি বা কুপ্রভাব হতে পারে বলে বিশ্বাস করা কঠিন অন্যায়। আর এগুলিকে হাদীস বলে মনে করা কঠিনতর অন্যায়।

২. ১৫. ৩. শুভ কর্ম বা উন্নতির কারণ বিষয়ক

মহান আল্লাহ বান্দাকে যে সকল কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন সবই তার জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও মঙ্গল বয়ে আনে। সকল প্রকার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল-মুস্তাহাব কর্ম মানুষের জন্য আখিরাতের সাওয়াবের পাশাপাশি জাগতিক বরকত বয়ে আনে। আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"যদি জনপদবাসীগণ ঈমান এবং তাকওয়া অর্জন করতো (আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করতো ও নির্দেশিত কাজ পালন করতো) তবে তাদের জন্য আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকত-কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[৯০৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান ও তাকওয়ার কর্মই বরকত আনয়ন করে। তবে সৃষ্টির সেবা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এরূপ কাজের জন্য মানুষকে আখিরাতের সাওয়াব ছাড়াও পৃথিবীতে বিশেষ বরকত প্রদান করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অনেক বানোয়াট কথাও বলা হয়। যেমন বলা হয় যে, নিম্নের কাজগুলি করলে মানুষ ধনী ও সৌভাগ্যশালী হতে

পারে:

১. আকীক পাথরের আংটি পরিধান করা।
২. বৃহস্পতিবারে নখ কাটা।
৩. সর্বদা জুতা বা খড়ম ব্যবহার করা।
৪. ঘরে সিরকা রাখা।
৫. হলদে রঙের জুতা পরা।
৬. যে ব্যক্তি জমরুদ পাথরের বা আকীক পাথরের আংটি পরবে বা সাথে রাখবে সে কখনো দরিদ্র হবে না এবং সর্বদা প্রফুল্ল থাকবে।

অনুরূপভাবে অমুক কাজে মানুষ স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, অমুক কাজে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বা স্মরণশক্তি নষ্ট হয়, অমুক কাজে দৃষ্টি শক্তি বাড়ে, অমুক কাজে দৃষ্টিশক্তি কমে, অমুক কাজে বার্ধক্য আনে, অমুক কাজে শরীর মোটা হয়, অমুক কাজে শরীর দুর্বল হয় ইত্যাদি সকল কথাই বানোয়াট।

২. ১৬. পোশাক ও সাজগোজ বিষয়ক

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক' ও **'পোশাক-পর্দা ও দেহসজ্জা'** নামক গ্রন্থদ্বয়ে পোশাক বিষয়ক সহীহ, যয়ীফ ও মাউদূ হাদীসগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এ বিষয়ক কিছু মাউযূ বা জাল হাদীস উল্লেখ করছি।

২. ১৬. ১. জামা- পাজামা বিষয়ক:

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটিমাত্র জামা ছিল:

আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

لم يكن لرسول الله ﷺ إلا قميص واحد

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটিমাত্র কামিস ছাড়া অন্য কোনো কামিস ছিল না।"[৯০৪]

হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু মাইসারাহ মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলতেন বলে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[৯০৫]

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মনে হয়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন প্রকারের জামা পরিধান করতেন। কোনোটির ঝুল ছিল টাখনু পর্যন্ত। কোনোটি কিছুটা খাট হাটুর নিম্ন পর্যন্ত ছিল। কোনোটির হাতা ছিল হাতের আঙ্গুলগুলির মাথা পর্যন্ত। কোনোটির হাতা কিছুটা ছোট এবং কব্জি পর্যন্ত ছিল।

২. জামার বোতাম ছিল না বা ঘুন্টি ছিল

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামার বোতাম ছিল, তবে তিনি সাধারণত বোতাম লাগাতেন না। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, **'তাঁর জামার বোতামগুলি'** খোলা ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামার তিন বা ততোধিক বোতাম ছিল। তিনি সাধারণত এ সকল বোতামের কোনো বোতামই লাগাতেন না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর জামার বোতাম ছিল না বা বোতামের স্থলে কাপড়ের তৈরি ঘুন্টি ছিল। এ বিষয়ক কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ইমাম গাযালী (৫০৫হি) লিখেছেন:

وَكَانَ قَمِيْصُهُ مَشْدُوْدَ الأَزْرَارِ، وَرُبَّمَا حَلَّ الأَزْرَارَ فِيْ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

"তাঁর কামিস বা জামার বোতামগুলি লাগানো থাকত। কখনো কখনো তিনি সালাতে ও সালাতের বাইরে বোতামগুলি খুলে রাখতেন।"[৯০৬]

৩. দাঁড়িয়ে বা বসে পাজামা পরিধান

কোনো কোনো গ্রন্থে 'বসে পাজামা পরিধান করা' সুন্নাত বা আদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার নজরে পড়ে নি। বিষয়টি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামত বলেই মনে হয়।[৯০৭]

২. ১৬. ২. টুপি বিষয়ক:

৪. টুপির উপর পাগড়ী মুসলিমের চিহ্ন

আবু দাউদ ও তিরমিযী উভয়ে তাঁদের উস্তাদ কুতাইবা ইবনু সাঈদের সুত্রে একটি হাদীস সংকলিত করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেন: কুতাইবা আমাদেরকে বলেছেন, তাকে মুহাম্মাদ ইবনু রাবীয়াহ হাদীসটি আবুল হাসান আসকালানী নামক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি আবু জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু রুকানাহ নামাক এক ব্যক্তি থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বলেছেন, রুকানার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুস্তি লড়েন এবং তিনি রুকানাকে পরাস্ত করেন। রুকানা আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنَّ فَــرْقَ مَا بَــيْــنَــنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَــائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

"আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য টুপির উপরে পাগড়ী।"[৯০৮]

তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করে এর সনদটি যে মোটেও নির্ভরযোগ্য নয় তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবুল হাসান আসকালানী। এ ব্যক্তিটির পরিচয় কেউ জানে না। শুধু তাই নয়। তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি রুকানার পুত্র থেকে হাদীসটি শুনেছেন। রুকানার কোনো পুত্র ছিল কিনা, তিনি কে ছিলেন, কিরূপ মানুষ ছিলেন তা কিছুই জানা যায় না। এজন্য হাদীসটির সনদ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ, ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারীও তার "আত-তারীখুল কাবীর" গ্রন্থে এ হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীসটির সনদ অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষদের সমন্বয়। এছাড়া এদের কেউ কারো থেকে কোন হাদীস শুনেছে বলেও জানা যায় না।[৯০৯] ইমাম যাহাবী, আজলূনী প্রমুখ একে মাউযূ বা বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন।[৯১০]

এছাড়া আব্দুর রাঊফ মুনাবী, মুল্লা আলী কারী, আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী, শামছুল হক আযীমাবাদী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আলোচনা করেছেন যে, এই হাদীসের অর্থ বাস্তবতার বিপরীত।[৯১১] হাদীসটির দুইটি অর্থ হতে পারে: এক- মুশরিকগণ শুধু টুপি পরিধান করে আর আমরা পাগড়ী সহ টুপি পরিধান করি। দুই- মুশরিকগণ শুধু পাগড়ী পরিধান করে আর আমরা টুপির উপরে পাগড়ী পরিধান করি। উভয় অর্থই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের বিপরীত। কারণ বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা কখনো শুধু টুপি পরতেন এবং কখনো শুধু পাগড়ী পরতেন।

ইমাম গাযালী (৫০৫হি) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করতেন। কখনো পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপি পরতেন। কখনো কখনো তিনি মাথা থেকে টুপি খুলে নিজের সামনে টুপিটিকে সুতরা বা আড়াল হিসাবে রেখে সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন।"[৯১২]

শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়িম (৭৫১হি:) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ পাগড়ী পরিধান করতেন এবং তার নিচে টুপি পরতেন। তিনি পাগড়ী ছাড়া শুধু টুপিও পরতেন। আবার টুপি ছাড়া শুধু পাগড়ীও পরতেন।"[৯১৩]

৫. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাঁচকল্লি টুপি:

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত

رَأَيْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيْلَةً

"আমি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) মাথায় একটি লম্বা পাঁচভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি।"

হাদীসটি আল্লামা আবু নুআইম ইসপাহানী তাঁর সংকলন 'মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর ও আবু আহমদ জুরজানী বলেছেন, আমাদেরকে আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ বলেছেন, আমাদেরকে আবু উসামাহ বলেছেন, আমাদেরকে দাহহাক ইবনু হাজার বলেছেন, আমাদেরকে আবু কাতাদাহ হাররানী বলেছেন যে, আমাদেরকে আবু হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ হাদীস বলেছেন।[৯১৪]

এ হাদীসটি জাল। ইমাম আবু হানীফা থেকে শুধুমাত্র আবু কাতাদাহ হাররানী (মৃ: ২০৭হি:) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাররানী ছাড়া অন্য কেউ এ শব্দ বলেন নি। ইমাম আবু হানীফার (রাহ) অগণিত ছাত্রের কেউ এ হাদীসটি এ শব্দে বলেন নি। বরং তাঁরা এর বিপরীত শব্দ বলছেন। অন্যান্য ছাত্রদের বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, তাঁকে আতা' আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাদা শামি টুপি ছিল।[৯১৫]

তাহলে আমরা দেখছি যে, অন্যান্যদের বর্ণনা মতে হাদীসটি (قلنسوة شامية) বা 'শামী টুপি' এবং আবু কাতাদার বর্ণনায় (قلنسوة خماسية) বা 'খুমাসী টুপি'। এথেকে আমরা বুঝতে পরি যে, আবু হানীফা বলেছিলেন শামী টুপি, যা তাঁর সকল ছাত্র বলেছেন, আবু কাতাদাহ ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ভুল বলেছে। অথবা সে (شامية) শব্দটিকে বিকৃতভাবে (خماسية) রূপে পড়েছে।

সর্বোপরি আবূ কাতাদা পরিত্যক্ত রাবী। ইমাম বুখারী বলেছেন, আবু কাতাদাহ হাররানী 'মুনকারুল হাদীস'। ইমাম বুখারী কাউকে "মুনকারুল হাদীস" বা "আপত্তিকর বর্ণনাকারী" বলার অর্থ সে লোকটি মিথ্যাবাদী বলে তিনি জেনেছেন। তবে তিনি কাউকে সরাসরি মিথ্যাবাদী না বলে তাকে "মুনকারুল হাদীস" বা অনুরূপ শব্দাবলি ব্যবহার করতেন।

এছাড়া হাদীসটি আবু কাতাদাহ হাররানীর থেকে শুধুমাত্র দাহহাক ইবনু হুজর বর্ণনা করেছেন। দাহহাক ইবনু হুজরের কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ মানবিজী। তিনিও অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি মিথ্যা হাদীস বানাতেন বলে ইমাম দারাকুতনী ও

অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন।[৯১৬]

এজন্য আল্লামা আবু নু'আইম ইসপাহানী হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন "এ হাদীসটি শুধুমাত্র দাহহাক আবু কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউই আবু হানীফা থেকে বা আবু কাতাদাহ থেকে তা বর্ণনা করেন নি।"[৯১৭]

২. ১৬. ৩. পাগড়ী বিষয়ক

৬. পাগড়ীর দৈর্ঘ্য

পাগড়ী কত হাত লম্বা হবে বা পাগড়ীর দৈর্ঘ্যের বিষয়ে সুন্নাত কী? এ বিষয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। সবই ভিত্তিহীন বা আন্দায কথা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাগড়ীর দৈর্ঘ্য কত ছিল তা কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি।[৯১৮]

৭. দাঁড়িয়ে পাগড়ী পরিধান করা

কোনো কোনো গ্রন্থে 'দাঁড়িয়ে পাগড়ী পরিধান করা' সুন্নাত বা আদব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমার নযরে পড়ে নি। বিষয়টি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামত বলেই মনে হয়।[৯১৯]

৮. পাগড়ীর রঙঃ সাদা ও সবুজ পাগড়ী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় কাল রঙের পাগড়ী পরেছেন। হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মদীনায়, সফরে, যুদ্ধে সর্বত্র কাল পাগড়ী ব্যবহার করতেন।

৮/৯ম হিজরী শতকের কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় থাকা অবস্থায় কাল পাগড়ী পরতেন এবং সফর অবস্থায় সাদা পাগড়ী ব্যবহার করতেন। এই দাবীর পক্ষে কোনো প্রমাণ বা হাদীস তারা পেশ করেন নি। এজন্য হিজরী ৯ম শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম সাখাবী (৯০২ হি) এই কথাকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৯২০]

আমরা জানি 'পাগড়ী' পোশাক বা জাগতিক বিষয়। এ জন্য সাধারণ ভাবে হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা ব্যতিরেকে কোনো রঙকে আমরা নাজায়েয বলতে পারব না। তবে কোনো রঙ সুন্নাত কিনা তা বলতে প্রমাণের প্রয়োজন। বিভিন্ন হাদীসে সাধারণ ভাবে সবুজ পোশাক পরিধানে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো পাগড়ীর ক্ষেত্রে সবুজ রঙ ব্যবহার করেছেন বলে জানতে পারিনি। ফিরিশতাগণের পাগড়ীর বিষয়েও তাঁরা কখনো সবুজ পাগড়ী পরিধান করেছেন বলে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীস আমি দেখতে পাই নি। অনুরূপভাবে তিনি কখনো সাদা রঙের পাগড়ী পরিধান করেছেন বলেও জানতে পারি নি। কোন কোন সনদহীন ইসরায়েলীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাবেয়ী কা'ব আহবার বলেছেনঃ ঈসা (আ:) যখন পৃথীবিতে নেমে আসবেন তখন তাঁর মাথায় সবুজ পাগড়ী থাকবে।[৯২১]

৯. পাগড়ীর ফযীলত

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পাগড়ী ব্যবহার করতেন। কিন্তু পাগড়ী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান মূলক কোনো সহীহ হাদীস নেই। এ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত ও প্রচারিত সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট বা অত্যন্ত দুর্বল। এ বিষয়ক হাদীসগুলি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **প্রথমত,** সাধারণ পোশাক হিসাবে পাগড়ী পরিধানের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস। **দ্বিতীয়ত,** পাগড়ী পরিধান করে নামায আদায়ের উৎসাহ প্রদান বিষয়ক হাদীস। উভয় অর্থে বর্ণিত সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল ও বানোয়াট পর্যায়ের। বিশেষত দ্বিতীয় অথে বর্ণিত সকল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে জাল ও বানোয়াট।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহর (ﷺ) পোশাক' ও 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা' গ্রন্থদ্বয়ে এ সকল হাদীসের সনদের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রত্যেক সনদের মিথ্যাবাদী জালিয়াতের পরিচয়ও তুলে ধরেছি। এখানে সংক্ষেপে হাদীসগুলি উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক উপর্যুক্ত গ্রন্থদ্বয় থেকে বাকি আলোচনা জানতে পারবেন।

প্রথমত, সৌন্দয্য ও মর্যাদার জন্য পাগড়ী

সৌন্দর্য্য ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে পাগড়ী পরিধানের উৎসাহ দিয়ে বর্ণিত জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

৯. ১. পাগড়ীতে ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি ও পাগড়ী আরবদের তাজ

একটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

اِعْتَمُّوْا تَزْدَادُوْا حُلْماً، وَالْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ

"তোমরা পাগড়ী পরিধান করবে, এতে তোমাদের ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আর পাগড়ী হলো আরবদের তাজ বা রাজকীয় মুকুট।"[৯২২]

৯. ২. পাগড়ী আরবদের তাজ পাগড়ী খুললেই পরাজয়

অন্য একটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ فَإِذاَ وَضَعُوْا الْعَمَائِمَ وَضَعُوْا عِزَّهُمْ، أَوْ وَضَعَ اللهُ عِزَّهُمْ

"পাগড়ী আরব জাতির মুকুট। তারা যখন পাগড়ী ফেলে দেবে তখন তাদের মর্যাদাও চলে যাবে বা আল্লাহ তাদের মর্যাদা নষ্ট করে দেবেন।"[৯২৩]

৯. ৩. পাগড়ী মুসলিমের মুকুট, মসজিদে যাও পাগড়ী পরে ও খালি মাথায়

আরেকটি বানোয়াট হাদীসে বলা হয়েছে:

ايتوا المساجد حسرا ومقنعين [معصبين] فان العمائم تيجان المسلمين

"তোমরা মসজিদে একেবারে খালি মাথায় আসবে এবং পাগড়ী, পট্টি বা রুমাল মাথায় আসবে (অর্থাৎ সুযোগ ও সুবিধা থাকলে খালি মাথায় না এসে পাগড়ী মাথায় মসজিদে আসবে); কারণ পাগড়ী মুসলিমগণের মুকুট।"[৯২৪]

৯. ৪. পাগড়ী মুমিনের গাম্ভীর্য ও আরবের মর্যাদা

অন্য একটি অত্যন্ত দুর্বল বা জাল হাদীসে বলা হয়েছে:

اَلْعَمَائِمُ وَقَارُ الْمُؤْمِنِ وَعِزُّ الْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَائِمُهَا فَقَدْ خَلَعَتْ عِزَّهَا

"পাগড়ী মুমিনের গাম্ভীর্য ও আরবের মর্যাদা। যখন আরবগণ পাগড়ী ছেড়ে দেবে তখন তাদের মর্যাদা নষ্ট হবে।"[৯২৫]

৯. ৫. পাগড়ী আরবদের তাজ ও জাড়িয়ে বসা তাদের প্রাচীর

অন্য একটি বানোয়াট হাদীস:

اَلْعَمَائِمُ تِيْجَانُ الْعَرَبِ، وَالاِحْتِبَاءُ حِيْطَانُهَا.

"পাগড়ী আরবদের মুকুট, দুইপা ও পিঠ একটি কাপড় দ্বারা পেচিয়ে বসা তাদের প্রাচীর।"[৯২৬]

৯. ৬. পাগড়ীর প্রতি প্যাঁচে কেয়ামতে নূর

আরেকটি বানোয়াট হাদীস:

اَلْعِمَامَةُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ فَصلُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ، يُعْطَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يُدَوِّرُهَا عَلَى رَأْسِهِ نُوْراً

"মুশরিকগণ এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপরে পাগড়ী। কেয়ামতের দিন মাথার উপরে পাগড়ীর প্রতিটি আবর্তনের বা পেঁচের জন্য নূর প্রদান করা হবে।"[৯২৭]

৯. ৭. পাগড়ী পরে পূর্ববর্তী উম্মতদের বিরোধিতা কর

আরেকটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীস:

اِعْتَمُّوْا خَالِفُوْا عَلَى الأُمَمِ قَبْلَكُمْ

"তোমরা পাগড়ী পরিধান করবে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের বিরোধিতা করবে।"[৯২৮]

৯. ৮. পাগড়ী আর পতাকায় সম্মান

আরেকটি যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীস:

أَكْرَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الأُمَّةَ بِالْعَمَائِمِ وَالأَلْوِيَةِ

"আল্লাহ তা'লা এই উম্মতকে পাগড়ী ও পতাকা বা ঝান্ডা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।"[৯২৯]

৯. ৯. পাগড়ী ফিরিশতাগণের বেশ

আরেকটি বানোয়াট হাদীস:

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ

"তোমরা পাগড়ী পরবে; কারণ পাগড়ী ফিরিশতাগণের চিহ্ন বা বেশ। আর তোমরা পিছন থেকে পাগড়ীর প্রান্ত নামিয়ে দেবে।"[৯৩০]

৯. ১০. পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝে বাঁধা

আলীর (রা) নামে প্রচরিত একটি বানোয়াট হাদীস:

عَمَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ غَدِيْرِ خُمٍ بِعِمَامَةٍ سَدَلَهَا خَلْفِيْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَدَّنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ بِمَلاَئِكَةٍ يَعْتَمُّوْنَ هَذِهِ الْعِمَامَةَ، وَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيْمَانِ

"গাদীর খুমের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং পাগড়ীর প্রান্ত পিছন দিকে ঝুলিয়ে দেন। এরপর বলেন: বদর ও হুনাইনের দিনে আল্লাহ আমাকে এভাবে পাগড়ী পরা ফিরিশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছেন। আরো বলেন: পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝে বেড়া বা বাঁধা।"[৯৩১]

এগুলির অধিকাংশ হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, তা বানোয়াট কথা। দু-একটি হাদীসের বিষয়ে সামান্য মতভেদ আছে। কেউ সেগুলিকে মিথ্যা হাদীস বলে গণ্য করেছেন। কেউ সরাসরি মিথ্যা বলে উল্লেখ না করে সেগুলিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৩২]

দ্বিতীয়ত, পাগড়ী-সহ সালাতের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো শুধুমাত্র নামাযের জন্য পাগড়ী পরিধান করেছেন এরূপ কোন কথা কোথাও দেখা যায় না। তাঁরা সাধারণভাবে পাগড়ী পরে থাকতেন এবং পাগড়ী পরেই নামায আদায় করতেন। এখন প্রশ্ন হলো পাগড়ী-সহ সালাতের অতিরিক্ত কোন সাওয়াব আছে কিনা?

এবিষয়ে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সেগুলি সবই বানোয়াট। সুপরিচিত মিথ্যাবাদী রাবীগণ এগুলি বানিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে আমি হাদীসগুলি উল্লেখ করছি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পোশাক বিষয়ক পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

৯. ১১. জুমু'আর দিনে সাদা পাগড়ী পরিধানের ফযীলত

আনাস ইবনু মালিকের (রা) সূত্রে প্রচারিত একটি মিথ্যা কথা:

إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِأَبْوَابِ الْجَوَامِعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لأَصْحَابِ الْعَمَائِمِ الْبِيْضِ

"আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন, শুক্রবারের দিন জামে মসজিদের দরজায় তাদের নিয়োগ করা হয়, তারা সাদা পাগড়ী পরিধান কারীগণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"[৯৩৩]

৯. ১২. জুমু'আর দিনে পাগড়ী পরিধানের ফযীলত

হযরত আবু দারদার (রা:) নামে বর্ণিত মিথ্যা কথা:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ শুক্রবারে পাগড়ী পরিহিতদের উপর সালাত (দয়া ও দোয়া) প্রেরণ করেন।"[৯৩৪]

৯. ১৩. পাগড়ীর ২ রাক'আত বনাম পাগড়ী ছাড়া ৭০ রাকআত

হযরত জাবিরের (রা:) নামে বর্ণিত জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِلاَ عِمَامَةٍ [حَاسِراً]

"পাগড়ী সহ দু রাক'আত নামায পাগড়ী ছাড়া বা খালি মাথায় ৭০ রাক'আত নামাযের চেয়ে উত্তম।"[৯৩৫]

৯. ১৪. পাগড়ীর নামায ২৫ গুণ ও পাগড়ীর জুমু'আ ৭০ গুণ

ইবনু উমরের (রা:) সূত্রে প্রচারিত একটি জাল কথা:

صَلاَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ جُمُعَةً

"পাগড়ী সহ একটি নামায পচিশ নামাযের সমান এবং পাগড়ী সহ একটি জুমু'আ ৭০ টি জুমু'আর সমতুল্য।"[৯৩৬]

৯. ১৫. পাগড়ীর নামাযে ১০,০০০ নেকি

আনাস ইবনু মালিকের (রা:) সূত্রে প্রচার করেছে মিথ্যাবাদীরা:

اَلصَّلاَةُ فِيْ الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ

"পাগড়ীসহ নামাযে দশহাজার নেকী রয়েছে।"[৯৩৭]

এভাবে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, 'পাগড়ী পরে নামায আদায়ের ফযীলতে' যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই জাল ও বানোয়াট কথা।

২. ১৬. ৪. সাজগোজ ও পরিচ্ছন্নতা

১০. নতুন পোশাক পরিধানের সময়

রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন পোশাক পরিধানের জন্য কোনো সময়কে পছন্দ করতেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যাকে মুহাদ্দিসগণ জাল বলে গণ্য করেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন পোশাক পরলে শুক্রবারে তা পরতেন।"[৯৩৮]

১১. দাড়ি ছাঁটা

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে বলেন: আমাদেরকে হান্নাদ বলেছেন, আমাদেরকে উমার ইবনু হারূন বলেছেন, তিনি উসামা ইবনু যাইদ থেকে, তিনি আমর ইবনু শু'আইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তাঁর দাদা থেকে,

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের দাঁড়ির দৈর্ঘ ও প্রস্থ থেকে কাটতেন।"

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন: "এই হাদীসটি গরীব (দুর্বল)। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি, উমার ইবনু হারূন কোনোরকম চলনসই রাবী (مقارب الحديث)। তার বর্ণিত যত হাদীস আমি জেনেছি, সবগুলিরই কোনো না কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু এই হাদীসটির কোনোরূপ ভিত্তি পাওয়া যায় না। আর এই হাদীসটি উমার ইবনু হারূন ছাড়া আর কারো সূত্রে জানা যায় না।"[৯৩৯]

ইমাম তিরমিযীর আলোচনা থেকে আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারি: (১) এই হাদীসটি একমাত্র উমার ইবনু হারূন ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে বর্ণিত হয় নি। একমাত্র তিনিই দাবি করেছেন যে, উসামা ইবনু যাইদ আল-লাইসী তাকে এই হাদীসটি বলেছেন। (২) ইমাম বুখারীর মতে উমার ইবনু হারূন একেবারে পরিত্যক্ত রাবী নন। (৩) উমার ইবনু হারূন বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের ভিত্তি পাওয়া গেলেও এই হাদীসটি একেবারেই ভিত্তিহীন।

অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিস দ্বিতীয় বিষয়ে ইমাম বুখারীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদেরকে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতি এবং এ বিষয়ক মতভেদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবে।

উমার ইবনু হারূন ইবনু ইয়াযিদ বালখী (১৯৪ হি) দ্বিতীয় হিজরী শতকের একজন বেশ নামকরা মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর আরো একটি বিশেষ পরিচয় ছিল যে, তিনি মুহাদ্দিসগণের ও আহলুস সুন্নাতের আকীদার পক্ষে মুরজিয়াগণের বিপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখতেন। ফলে অনেক মুহাদ্দিসই তাঁকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, তিনি তাঁর কোনো কোনো উস্তাদের নামে এমন অনেক হাদীস বলেন, যেগুলি সে সকল উস্তাদের অন্য কোনো ছাত্র বলেন না। মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক নিরীক্ষায় এগুলি ধরা পড়ে।

এর কারণ নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তাঁর প্রসিদ্ধি ও বিদ'আত বিরোধী ভূমিকার ফলে অনেক মুহাদ্দিস তাঁর বিষয়ে ভাল ধারণা রাখতেন। তাঁরা তাঁর এই একক বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যায় বলেন যে, সম্ভবত তিনি অনেক হাদীস মুখস্থ করার ফলে কিছু হাদীসে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করতেন। এদের মতে তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলতেন না। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারী ও অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস।

অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের নিরীক্ষায় তাঁর মিথ্যা ধরা পড়েছে। এদের অন্যতম হলেন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি)। তিনি বলেন, আমি ইমাম জাফর সাদিকের (১৪৮ হি) নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করার জন্য মক্কায় গমন করি। কিন্তু আমার পৌঁছানোর আগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে আমি তাঁর নিকট থেকে কিছু শিখতে পারি নি। আর উমার ইবনু হারূন আমার পরে মক্কায় আগমন করে। এরপরও সে দাবি করে যে, সে ইমাম জাফর সাদিক থেকে অনেক হাদীস শুনেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে মিথ্যাবাদী।

আব্দুর রাহমান ইবনু মাহদী (১৯৪হি) বলেন, উমার ইবনু হারূন আমাদের নিকট এসে জাফর ইবনু মুহাম্মদ (ইমাম জাফর সাদিক)-এর সূত্রে অনেক হাদীস বলেন। তখন আমরা উমার ইবনু হারূনের জন্ম এবং তার হাদীস শিক্ষার জন্য মক্কায় গমনের তারিখ হিসাব করলাম। এতে আমরা দেখলাম যে, উমারের মক্কায় গমনের আগেই জা'ফর ইন্তিকাল করেন। (উমার ১২৫/১৩০ হিজরীর দিকে জন্মগ্রহণ করেন। জাফর সাদিক ১৪৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ সময়ে উমার হাদীস শিক্ষার জন্য বের হন নি।)

ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল বলেন, উমার ইবনু হারূন একবার কিছু হাদীস বলেন। পরবর্তী সময়ে সেই হাদীসগুলিই তিনি অন্য উস্তাদের নামে এবং অন্য সনদে বলেন। ফলে আমরা তার হাদীস পরিত্যাগ করি।

এ ধরনের বিভিন্ন নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, উমার ইবনু হারূন হাদীস বর্ণনায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেন। অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস উমার ইবনু হারূনকে মিথ্যাবাদী বা পরিত্যাক্ত বলেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, নাসাঈ, সালিহ জাযরাহ, আবূ নু'আইম, ইবনু হিব্বান ও ইবনু হাজার।[৯৪০] এ জন্য কোনো কোনো

মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৯৪১]

এখানে উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আবূ হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা হজ্জ বা উমরার পরে যখন মাথা টাক করতেন, তখন দাড়িকে মুষ্টি করে ধরে মুষ্টির বাইরের দাড়ি কেটে ফেলতেন।[৯৪২] এজন্য কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, এক মুষ্টি পরিমাণের বেশি দাড়ি কেটে ফেলা যাবে। অন্যান্য ফকীহ বলেছেন যে, দাড়ি যত বড়ই হোক ছাঁটা যাবে না, শুধুমাত্র অগোছালো দাড়িগুলি ছাঁটা যাবে।

১২. আংটি ও পাথরের গুণাগুণ

সমাজে প্রচলিত অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পাথরের গুণাগুণ বর্ণনার হাদীস। মুসলমানের ঈমান নষ্টকারী বিভিন্ন শয়তানী ওসীলার মধ্যে অন্যতম হলো জ্যোতিষী শাস্ত্র এবং সমাজের আনাচে কানাচে ছাড়িয়ে পড়া ভণ্ড জ্যোতিষীর দল। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন জ্যোতিষী বা ভাগ্য গণনাকারীর কাছে গেলে বা তার কথা বিশ্বাস করলে মুসলমান কাফির হয়ে যায় এবং তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। জ্যোতিষীদের অনেক ভণ্ডামীর মধ্যে রয়েছে পাথর নির্ধারণ। তারা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের পাথরের আংটি পরতে পরামর্শ দেন। কেউ কেউ আবার এ বিষয়ে হাদীসও উল্লেখ করেন। পাথরের মধ্যে কল্যাণ- অকল্যাণের শক্তি থাকার বিশ্বাস ঈমান বিরোধী বিশ্বাস। বিভিন্ন অমুসলিম সমাজ থেকে এই বিশ্বাস মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, পাথরের গুণাগুণ সম্পর্কিত সকল হাদীসই বানোয়াট। বিভিন্ন ধরণের পাথর, যেমন: যবরজদ পাথর, ইয়াকুত পাথর, যমররদ পাথর, আকীক পাথর ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত কোন হাদীসই নির্ভরযোগ্য নয়।[৯৪৩]

১৩. আঙটি পরে নামাযে ৭০ গুণ সাওয়াব

আঙটির ফযীলতে বানোয়াট একটি হাদীস

صَلاَةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ

"আঙটি পরে নামায আদায় করলে আঙটি ছাড়া নামায আদায়ের চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব হয়।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, হাদীসটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙটি ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। তবে আঙটি পরতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে কোন সহীহ হাদীস নেই।[৯৪৪]

১৪. নখ কাটার নিয়মকানুন

নিয়মিত নখ কাটা ইসলামের অন্যতম বিধান ও সুন্নাত। নখ কাটার জন্য কোন নির্ধারিত নিয়ম বা দিবস রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দেন নি। বিভিন্ন গ্রন্থে নখ কাটার বিভিন্ন নিয়ম, উল্টোভাবে নখ কাটা, অমুক নখ থেকে শুরু করা ও অমুক নখে শেষ করা, অমুক দিনে নখ কাটা বা না কাটা ইত্যাদির ফযীলত বা ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি সবই পরবর্তী যুগের প্রবর্তিত নিয়ম। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ বিষয়ে যা কিছু প্রচলিত সবই বাতিল ও বানোয়াট।

নখ কাটার জন্য এ সকল নিয়ম পালন করাও সুন্নাত বিরোধী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নখ কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোন বিশেষ নিয়ম বা দিন শিক্ষা দেন নি। কাজেই যে কোনভাবে যে কোন দিন নখ কাটলেই এই নির্দেশ পালিত হবে। কোন বিশেষ দিনে বা কোন বিশেষ পদ্ধতিতে নখ কাটার কোন ফযীলত কল্পনা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষাকে অপূর্ণ মনে করা এবং তার শিক্ষাকে পূর্ণতা দানের দু:সাহস দেখান। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ সুন্নাতের মধ্যে জীবন যাপনের তাওফীক প্রদান করেন।[৯৪৫]

২. ১৭. পানাহার বিষয়ক

১. খাদ্য গ্রহণের সময় কথা না বলা

খাদ্য গ্রহণের সময় কথা বলা নিষেধ বা কথা না বলা উচিত অর্থে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট। শুধু বানোয়াটই নয়, সহীহ হাদীসের বিপরীত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ খাদ্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বলতেন ও গল্প করতেন।[৯৪৬]

২. খাওয়ার সময় সালাম না দেওয়া

প্রচলিত ধারণা হলো খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া ঠিক না। বলা হয়:

لاَ سَلاَمَ عَلَى آكِلٍ

"খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেওয়া হবে না।"

সাখাবী, মুল্লা কারী ও আজলূনী বলেন, হাদীসের মধ্যে এ কথার কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে যদি কারো মুখের মধ্যে খাবার থাকে, তাহলে তাকে সালাম না দেওয়া ভাল। এ অবস্থায় কেউ তাকে সালাম দিলে তার জন্য উত্তর প্রদান ওয়াজিব হবে না।[৯৪৭]

৩. মুমিনের ঝুটায় রোগমুক্তি

আরেকটি প্রচলিত বানোয়াট কথা হলো:

سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ... رِيْقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ

"মুমিনের ঝুটায় রোগমুক্তি বা মুমিনের মুখের লালাতে রোগমুক্তি।"

কথাটি কখনোই হাদীস নয় বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়।[৯৪৮]

মুমিনের ঝুটা খাওয়া রোগমুক্তির কারণ নয়, তবে ইসলামী আদবের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ একত্রে একই পাত্রে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং একই পাত্রে পানি পান করেছেন। এখনো এই অভ্যাস আরবে ও ইউরোপে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে ভারতীয় বর্ণ প্রথা ও অচ্ছুত প্রথার কারণে একে অপরের ঝুটা খাওয়াকে ঘৃণা করা হয়। এগুলি ইসলাম বিরোধী মানসিকতা।

৪. খাওয়ার আগে-পরে লবণ খাওয়ায় রোগমুক্তি

আমাদের সমাজে প্রচলিত আরেকটি জাল হাদীস:

إِذَا أَكَلْتَ فَابْدَأْ بِالْمِلْحِ وَاخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ الْمِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءً

"তুমি যখন খাদ্যগ্রহণ করবে, তখন লবণ দিয়ে শুরু করবে এবং লবণ দিয়ে শেষ করবে; কারণ লবণ ৭০ প্রকারের রোগের প্রতিষেধক...।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এই কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট।[৯৪৯]

৫. লাল দস্তরখানের ফযীলত

আমাদের দেশের ধার্মিক মানুষদের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি 'সুন্নাত' 'লাল দস্তরখানে' খানা খাওয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো লাল দস্তরখান ব্যবহার করেছেন, অথবা এইরূপ দস্তরখান ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে দেখা যায় না। এ বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা প্রচলিত। এইরূপ একটি বানোয়াট কথা নিম্নরূপ:

"হযরত রাসূল মকবুল (ﷺ) ... লাল দস্তরখান ব্যবহার করা হতো। ... যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে আহার করে তার প্রতি লোকমার প্রতিদানে একশ' করে ছাওয়াব পাবে এবং বেহেস্তের ১০০ টি দরজা তার জন্য নির্ধারিত হবে। সে ব্যক্তি বেহেস্তের মধ্যে সব সময়ই ঈসা (আ) ও অন্য নবীদের হাজার হাজার সালাম ও আশীর্বাদ লাভ করবে....। এরপর হযরত কসম খেয়ে বর্ণনা করলেন, কসম সেই খোদার যার হাতে নিহিত আছে আমার প্রাণ; যে ব্যক্তি লাল দস্তরখানে রুটি খাবে সে এক ওমরা হজ্বের ছাওয়াব পাবে এবং এক হাজার ক্ষুধার্থকে পেট ভরে আহার করানোর ছাওয়াব পাবে। সে ব্যক্তি এত বেশী ছাওয়াব লাভ করবে যেন আমার উম্মতের মধ্যে হাজার বন্দীকে মুক্ত করালেন...।" এভাবে আরে অনেক আজগুবি, উদ্ভট ও বানোয়াট কাহিনী ও সাওয়াবের ফর্দ দেওয়া হয়েছে।[৯৫০]

এখানে উল্লেখ্য যে, 'দস্তরখান' সম্পর্কে আরো অনেক ভুল বা ভিত্তিহীন ধারণা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দস্ত রখান ব্যবহার করতেন। তবে তা ব্যবহার করার কোনো নির্দেশ বা উৎসাহ তাঁর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয় নি। দস্তরখান ছাড়া খাদ্যগ্রহণের বিষয়ে তিনি কোনো আপত্তিও করেন নি। কিন্তু আমরা সাধারণত দস্তরখানের বিষয়ে যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করি, কুরআন ও হাদীসে নির্দেশিত অনেক ফরয, বা নিষিদ্ধ অনেক হারামের বিষয়ে সেইরূপ গুরুত্ব প্রদান করি না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলতে আমরা বুঝি যে, তিনি আমাদের মত দস্তরখানের উপর থালা, বাটি ইত্যাদি রেখে খানা খেতেন। ধারণাটি সঠিক নয়। তাঁর সময়ে চামড়ার দস্তরখান বা 'সুফরা' ব্যবহার করা হতো এবং তার উপরেই সরাসরি -কোনোরূপ থালা, বাটি, গামলা ইত্যাদি ছাড়াই- খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি খাদ্য রাখা হতো। দস্তরখানের উপরেই প্রয়োজনে এগুলি মিশ্রিত করা হতো এবং সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করা হতো।[৯৫১]

২. ১৮. বিবাহ, পরিবার, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক

২. ১৮. ১. বিবাহ, পরিবার ও দাম্পত্য জীবন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবার। পরিবার গঠন, পরিবারের সদস্যগণের পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য, সহমর্মিতা, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব, দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তির ফযীলত ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনেক নির্দেশনা বিভিন্ন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির পাশাপাশি অগণিত বানোয়াট, ভিত্তিহীন, জাল বা যয়ীফ কথা হাদীস নামে সমাজে প্রচলিত। সবচেয়ে বেশি অবাক হতে হয় যে, প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থগুলির সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে অগণিত সূত্র বিহীন বানোয়াট কথা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে লিখছি বা মুখে বলছি।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিভিন্ন বিষয়ে সহীহ হাদীসের উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু সংক্ষেপে কিছু বানোয়াট কথা উল্লেখ করছি।

১. বিবাহিতের ২ রাক'আত অবিবাহিতের ৭০ রাক'আত

প্রচলিত একটি জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

"অবিবাহিতের ৭০ রাক'আত অপেক্ষা বিবাহিতের দুই রাক'আত উত্তম।"

২. বিবাহিতের ২ রাক'আত অবিবাহিতের ৮২ রাক'আত

আরেকটি প্রচলিত জাল হাদীস:

رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِن اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ

"অবিবাহিতের ৮২ রাক'আত অপেক্ষা বিবাহিতের দু রাক'আত উত্তম।"

কুরআন ও হাদীসে বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহের ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই হাদীস দুটি জাল ও বানোয়াট।[৯৫২]

৩. বিবাহ অনুষ্ঠানে খেজুর ছিটানো, কুড়ানো বা কাড়াকাড়ি করা

এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাদীসগুলির সনদ অত্যন্ত যয়ীফ এবং সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে। এজন্য মুহাদ্দিসগণ সেগুলিকে জাল বলে গণ্য করেছেন।[৯৫৩]

৪. দাম্পত্য মিলনের বিধিনিষেধ

ইসলাম যেমন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কঠিনভাবে নিষেধ করে, তেমনি বিবাহিত দম্পতিকে তাদের জীবন ও যৌবনের আনন্দ, উল্লাস, ফুর্তি, আবেগ সবকিছু উপভোগ করতে উৎসাহ দেয়। দম্পতির স্বাভাবিক আনন্দলাভের কোনো দিন, তারিখ, বার, তিথি, সময়, উপকরণ বা পদ্ধতি ইসলাম নিষিদ্ধ বা হারাম করে নি। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোনোরূপ পর্দা নেই বা কোনো কিছু দর্শন বা স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রচলিত অনেক জাল ও ভিত্তিহীন হাদীসে দাম্পত্য মিলন বিষয়ক বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। অমুক সময়ে, অমুক দিনে, অমুক বারে, অমুক রাতে, অমুক তিথিতে দাম্পত্য সম্পর্ক করবে না, তাতে অমুক প্রকারের ক্ষতি হবে, অথবা সন্তানের অমুক রোগ হবে.... ইত্যাদি। অথবা অমুক পদ্ধতিতে বা আসনে দাম্পত্য মিলন করবে না, তাহলে অমুক ক্ষতি হবে, বা সন্তানের অমুক খুত হবে... ইত্যাদি। অথবা দাম্পত্য মিলনের সময় কথা বলবে না, দৃষ্টিপাত করবে না...স্পর্শ করবে না...তাহলে অমুক রোগ হবে, বা অমুক ক্ষতি হবে... ইত্যাদি। অথবা অমুক সময়ে, বারে, তিথিতে দাম্পত্য মিলনে সন্তান সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হয়..। এগুলি সবই মিথ্যা, বানোয়াট ও জাল কথা।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনার ইহূদীগণের মধ্যে এইরূপ কিছু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তখন মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা বাকারার ২২৩ নং আয়াত নাযিল করে সে সকল কুসংস্কার খণ্ডন করেন।[৯৫৪]

৫. স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত

বহুল প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হযরত (ﷺ) বলিয়াছেন, স্ত্রীগণের বেহেশত স্বামীর পায়ের নিচে।"[৯৫৫]

এই কথাটি একটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও এই কথাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে জানা যায় না। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জান্নাত উভয়ের হাতে। উভয়ের প্রতি উভয়ের দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব।

৬. গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের পুরস্কার

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে মাতৃগণের মর্যাদার জন্য বিশেষভাবে সন্তানধারণ, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সাধারণভাবে সংসার-পালন, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদির সাধারণ সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জালিয়াতগণ তাদের অভ্যাস মত প্রত্যেক কর্ম বা অবস্থার জন্য পৃথক পৃথক আজগুবি ফযীলত ও সাওয়াবের বর্ণনা দিয়ে অনেক হাদীস বানিয়েছে। আমাদের সমাজে এগুলি প্রচলিত। এমনকি এ সকল ভিত্তিহীন কথা দিয়ে বিভিন্ন ছাপানো পোস্টার, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি ছাপা হয়।

প্রচলিত একটি পুস্তকে রয়েছে: "হুজুর (সাঃ) একদিন স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যখন কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামী কর্তৃক হামেলা (গর্ভবর্তী) হইয়া থাকে, তখন হইতে প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বদা সে স্ত্রীলোকটি দিনে রোযা রাখার ও রাত্রি বেলা নফল নামায পড়ার ছওয়াব পাইবে। আর যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তখন খোদা তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে এমন বস্তুসমূহ গচ্ছিত রাখিয়া দেন যে, তাহার সন্ধান পৃথিবী আকাশ বেহেশত, দোজখবাসী কেহই অবগত নহেন। আর যখন সন্তান প্রসব করে তখন হইতে দুগ্ধ ছাড়ান পর্যন্ত প্রতি ঢোক দুগ্ধের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তাহাকে একটি করিয়া নেকী দান করিয়া থাকেন। এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইলে শহীদের দরওয়াজা প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহাকে তাহার সন্তানের জন্য কোন রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ঐ রাত্রি জাগরণের পরিবর্তে ৭০টি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব

দিয়া থাকেন। তৎপর তিনি ইহাও বলিয়া ছিলেন যে, এই ছওয়াব সমূহ কেবল মাত্র ঐ সমস্ত স্ত্রী লোকদেরকে দেওয়া হইবে যাহারা সর্বদাই খোদার হুকুম ও আপন স্বামীর হুকুম পালন করিয়া আওরাতে হাছীনার অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিয়াছে। আল্লাহ ও স্বামীর নাফরমান স্ত্রীলোকদিগকে কখনও ঐ সমস্ত ছওয়াব দেওয়া হইবে না।"[৯৫৬]

এই 'কথাগুলি' একটি জাল হাদীসের 'ইচ্ছামাফিক' অনুবাদ।[৯৫৭] এছাড়া আরো অনেক আজগুবি, মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা হাদীসের নামে লিখে এ সকল পুস্তকের পৃষ্টার পর পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করা হয়েছে। এ সকল পুস্তকে 'হাদীস' নামে লেখা অধিকাংশ কথাই বানোয়াট ও জাল।

২. ১৮. ২. বয়সের ফযীলত ও বয়স্কের সম্মান

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, বয়স্কদের সম্মান করা। বিভিন্ন হাদীসে যার বয়স বেশি তাকে আগে কথা বলার সুযোগ দেওয়া, কোনো দ্রব্য তার হাতে আগে দেওয়া বা অনুরূপ সামাজিক কর্মে ও সম্মানে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে বয়স্ক ও বৃদ্ধদেরকে সম্মান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সহীহ হাদীসের মধ্যে রয়েছে:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا (وَلَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا)

"যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যকার ছোটদের মমতা না করবে এবং বড়দের অধিকার না জানবে (বড়দের সম্মান না করবে) সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৯৫৮]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ....

"আল্লাহকে মর্যাদা প্রদর্শনের অংশ হলো শুভ্রতাময় (সাদা চুল-দাড়ি ওয়ালা) বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা...।"[৯৫৯]

১. বৃদ্ধের সম্মান আল্লাহর সম্মান

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়েও জালিয়াতগণ জাল হাদীস তৈরি করেছে। এ বিষয়ক জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

بَجِّلُوْا الْمَشَايِخَ فَإِنَّ تَبْجِيْلَ الْمَشَايِخِ مِنْ تَبْجِيْلِ اللهِ

"তোমরা শাইখ বা বৃদ্ধ মানুষদেরকে সম্মান করবে; কারণ বৃদ্ধদের সম্মান করা আল্লাহর সম্মানের অংশ।"

এ হাদীসটির অর্থ উপরের নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলির কাছাকাছি। তবে এ শব্দে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। মুহাদ্দিসগণ একমত যে হাদীসটি জাল।[৯৬০]

২. বংশের মধ্যে বৃদ্ধ উম্মতের মধ্যে নবীর মত

এই বিষয়ে অন্য একটি জাল হাদীস:

اَلشَّيْخُ فِيْ قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِيْ أُمَّتِهِ

"কোনো কওম বা গোত্রের মধ্যে শাইখ বা বয়স্ক মুরব্বী ব্যক্তি উম্মাতের মধ্যে নবীর মত।"[৯৬১]

শাইখ বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগে বা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত দুইটি অর্থ বুঝানো হতো। প্রথম অর্থ হলো 'বৃদ্ধ ব্যক্তি'। এ হলো এই শব্দে মূল শাব্দিক ও ব্যবহারিক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হলো: "গোত্রপতি'। পরবর্তী যুগে সুফী বুযুর্গগণকেও 'শাইখ' বলা হতো। ফার্সী 'পীর' শব্দটিও এ অর্থের।

"শাইখ" শব্দটি এই তৃতীয় অর্থে ব্যবহার করা শুরু হওয়ার পরে এই হাদীসটির জালিয়াতি সম্পর্কে অসচেতন কেউ কেউ এই জাল হাদীটিকে তরীকতের শাইখ বা পীর মাশাইখদের মর্যাদার দলিল হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি যে, পীর-মাশাইখদের মর্যাদা রয়েছে নেককার বান্দা হিসাবে এবং আল্লাহর পথের উস্তাদ বা মুরশিদ হিসাবে। তবে এই জাল হাদীসটির সাথে তাদের মর্যাদার কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. পাকাচুল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শাস্তি মাফ

এই জাতীয় অন্য একটি বানোয়াট কথা: আল্লাহ বলেন,

إِنِّيْ لأَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ يَشِيْبُ رَأْسُهُمَا... فِيْ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا فِيْ النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ

"আমি লজ্জা পাই যে, ইসলামের মধ্যে আমার বান্দা বা বান্দির চুল-দাড়ি পেকে যাওয়ার পরেও আমি তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেব।"[৯৬২]

এই ধরনের অন্য একটি বানোয়াট কথা: "ইসলামের মধ্যে যার বয়স ৬০ বৎসর হলো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিলেন।"[৯৬৩]

৪. ৪০ বৎসর বয়সেও ভাল না হলে জাহান্নামের প্রস্তুতি

আরেকটি বানোয়াট কথা:

مَنْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً فَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ

"যার বয়স চল্লিশ হলো, অথচ তার মধ্যে খারাপের চেয়ে ভাল বেশি হলো না; সে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হোক।"[৯৬৪]

২. ১৯. ভাষা, পেশা ইত্যাদি বিষয়ক

ইসলাম সকল যুগের, সকল ভাষার, সকল সমাজের মানুষদের জন্য আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এখানে ভাষা, দেশ, বর্ণ, গোত্র, বংশ, যুগ ইত্যাদির কারণে কোনো মর্যাদার আধিক্য বা কমতি নেই। কুরআন ও হাদীসে একথা বারংবার বলা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে জাতিগত, ভাষাগত, পেশাগত ইত্যাদি বিভেদের সুযোগ নিয়ে অনেক জালিয়াত কারো পক্ষে ও কারো বিপক্ষে বিভিন্ন হাদীস বানিয়েছে। আরবী ভাষার পক্ষে ও ফার্সীর বিপক্ষে কেউ কথা বানিয়েছে। কেউ উল্টো করেছে। অনুরূপভাবে আরব, পার্সিয়ান, তুর্কি, নিগ্রো, রোমান, গ্রীক, আফ্রিকান... বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে। স্বর্ণকার, তাতি, জেলে, নাপিত... ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস বানানো হয়েছে।

সনদ বিচার ও নিরীক্ষায় এগুলির জালিয়াতি ধরা পড়েছে। এছাড়া এগুলি ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী। মানুষের মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি 'তাকওয়া' বা সততা। পেশা, ভাষা, বর্ণ, গোত্র, বংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে নিন্দা করা বা কাউকে কারো থেকে ছোট বলা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিরোধী। এ জাতীয় জাল হাদীসগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. আরবদেরকে তিনটি কারণে ভালবাসবে

আরবী কুরআনের ভাষা এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষা। এজন্য স্বভাবতই সকল মুমিন আরবী ভাষাকে ভালবাসেন। ভাষার প্রতি এই স্বাভাবিক ভালবাসাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতগণ আরবগণকে ভালবাসার ফযীলতে অনেক হাদীস বানিয়েছে। একটি প্রচলিত হাদীস:

أَحِبُّوْا الْعَرَبَ لِثَلاثٍ؛ لأَنِّيْ عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

"তিনটি কারণে আরবদেরকে ভাল বাসবে: আমি আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষা আরবী।" এই কথাকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কেউ কেউ যয়ীফ বা দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সনদ বিচারে কথাটি বানোয়াট বলেই বুঝা যায়।[৯৬৫]

২. ফার্সী ভাষায় কথা বলার কঠিন অপরাধ

ফাসী ভাষা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ভাষা অর্থে জাল হাদীসের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ফার্সী ভাষায় কথা বলার নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনেক হাদীস বানিয়েছে জালিয়াতগণ। হাকিম নাইসাপূরী তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন:

مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتْ فِيْ خُبْثِهِ وَنَقَصَتْ مِنْ مُرُوْءَتِهِ

"যদি কেউ ফার্সী ভাষায় কথা বলে, তবে তা তার নোংরামি-পাপ বৃদ্ধি করবে এবং তার মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব কমিয়ে দেবে।"

এই হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী তালহা ইবনু যাইদ রুক্কী। তিনি দাবি করেন যে, ইমাম আউযায়ী তাকে হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ পরিত্যক্ত ও অত্যন্ত আপত্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইবনুল জাওযী, যাহাবী প্রমুখ ইমাম হাদীসটিকে বানোয়াট ও মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। ইমাম সুয়ূতী একাধিক সমার্থক হাদীসের ভিত্তিতে হাদীসটিকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, সনদগত দুর্বলতার পাশাপাশি অর্থ ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী হওয়ায় হাদীসটি বাতিল বলেই গণ্য।[৯৬৬]

৩. বিভিন্ন পেশার নিন্দা

যে সকল জাল হাদীস আমাদের সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ঘৃণ্য প্রভাব রেখেছে সেগুলির অন্যতম হলো, তাঁতী, দর্জি, কর্মকার, নাপিত ইত্যাদি পেশার মানুষদের বিরুদ্ধে বানানো বিভিন্ন জাল হাদীস। ইসলামে শ্রম, কর্ম ও পেশাকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রকার পেশা ও কর্মকে প্রশংসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ সকল জালিয়াত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে বিভিন্ন পেশার নিন্দায়

হাদীস বানিয়েছে। যেমন, তাঁতীগণ বা নাপিতগণ অন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। কর্মকার বা স্বর্ণকারগণ সবচেয়ে বেশি মিথ্যাবাদি। তাঁতিরাই দাজ্জালের অনুসারী হবে। পশু-ব্যবসায়ী, কসাই বা শিকারীর নিন্দা।[৯৬৭]

এ সকল জাল হাদীসের প্রচলন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন পেশার প্রতি ঘৃণা, কর্মের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করেছে।

২. ১৮. অন্যান্য কিছু বানোয়াট হাদীস

১. দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র

আমরা জানি যে, আখিরাতের জন্য দুনিয়াতে কর্ম করতে হবে। তবে এ অর্থে একটি 'হাদীস' প্রচলিত, যা ভিত্তিহীন। 'হাদীসটিতে' বলা হয়েছে:

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ

"দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।"

কথাটির অর্থ সঠিক হলেও তা হাদীস নয়। কোনো সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদেও কথাটি কোথাও বর্ণিত হয় নি। শুধু জনশ্রুতির ভিত্তিতে অনেকে তা 'হাদীস' বলে লিখেছেন, বলেছেন ও বলছেন।[৯৬৮]

২. নেককারদের পুন্য নিকটবর্তীদের পাপ

প্রচলিত একটি বাক্য যা সাধারণত 'হাদীস' বলে উল্লেখ করা হয়:

حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

"নেককার মানুষদের নেক-আমলসমূহ নিকটবর্তীগণের (আল্লাহর ওলীদের) পাপ।"

মুহাদ্দিসগণ একমত যে বাক্যটি হাদীস নয়, বরং তৃতীয় শতকের একজন বুযুর্গ আবূ সাঈদ আল-খার্‌রার (২৮৬হি)-এর কথা।[৯৬৯]

৩. মনোযোগ ছাড়া সালাত হবে না

'হাদীস' বলে প্রচলিত আরেকটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা:

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

"অন্তরের উপস্থিতি (মনোযোগ) ছাড়া সালাত হবে না।"

সালাতের মধ্যে মনোযোগের গুরুত্ব কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে বুঝা যায়। তবে এই কথাটি হাদীস নয়; বরং সনদবিহীন বানোয়াট কথা।

৪. মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ কর

হাদীস নামে প্রচলিত একটি বানোয়াট বাক্য:

مُوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُواْ

"তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর।"

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস একমত যে, এই কথাটি ভিত্তিহীন একটি বানোয়াট কথা।[৯৭০]

৫. ধুমপানের মহাপাপ

প্রচলিত একটি পত্রিকা[৯৭১] থেকে জানা যায়, আমাদের দেশের কোনো কোনো এলাকায় ধুমপানের বিরুদ্ধে দুটি বানোয়াট হাদীস প্রচার করা হয়:

مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَأَنَّمَا شَرِبَ دَمَ الأَنْبِيَاءِ

"যে ব্যক্তি ধুমপান করল সে যেন নবীগণের রক্ত পান করল।"

مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَأَنَّمَا زَنَى بِأُمِّهِ فِيْ الْكَعْبَةِ

"যে ব্যক্তি ধুমপান করল, সে যেন কাবাঘরের মধ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করল।"

এ প্রকারের জঘন্য নোংরা ও ফালতু কথা কেউ হাদীস হিসেবে বলতে পারে বলে বিশ্বাস করা কষ্ট। সর্বাবস্থায় এগুলি মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।

৫. মাদ্রাসা নবীর ঘর

আমাদের দেশের অতি প্রচলিত ও ওয়ায়িযদের প্রিয় 'হাদীস':

اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِيْ

"মাসজিদ আল্লাহর বাড়ি এবং মাদ্রাসা আমার বাড়ি বা আমার ঘর।"

এ কথাটি হাদীসের নামে বলা একটি জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কথা, যা কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদ তো দূরের কথা কোনো জাল বা মাউযূ সনদেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয় নি।

বস্তুত 'মাদ্রাসা' শব্দটিরই কোনো ব্যবহারই ইসলামের প্রথম দু শতাব্দীতে ছিল না। এর অর্থ এ নয় যে, "মাদ্রাসা" ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না। "আকীদা", "তাসাউফ" ইত্যাদি পরিভাষা কুরআন-হাদীসে তো নেই, উপরন্তু সাহাবীগণের যুগেও ছিল না। প্রথম দু শতাব্দীর পরে এ সব পরিভাষার উদ্ভব। কুরআন-হাদীসে ঈমানের বিষয় বলা হয়েছে। পরবর্তী যুগে এ বিষয়ক আলোচনাকে "আকীদা" নাম দেওয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসে তাযকিয়ায়ে নাফসের নির্দেশ রয়েছে, পরবর্তী যুগে "তাসাউফ" পরিভাষার উদ্ভব। কুরআন-হাদীসে ইলম শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে মসজিদে বা নির্ধারিত ঘরে পাঠগ্রহণ ও প্রদানের রীতি ছিল। তবে পাঠদানকেন্দ্রকে "মাদ্রাসা" নামকরণের প্রচলন সে যুগে ছিল না।

শেষ কথা

হাদীসের নামে জালিয়াতির এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আমাদের চারিপাশে অগণিত জাল হাদীসের ছড়াছড়ি। ওয়াযে, আলোচনায়, লেখনিতে ও গবেষণায় সর্বত্রই এ সকল মিথ্যা ও বানোয়াট কথার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। হাদীসের নামে বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে প্রচলিত ও প্রচারিত এ সকল অগণিত জাল কথার মধ্য থেকে কিছু বিষয় এই পুস্তকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অনেক বিষয়েই আলোচনা করা সম্ভব হলো না। মহিমাময় আল্লাহর দয়া ও তাওফীক হলে পরবর্তী খণ্ডগুলিতে প্রচলিত অন্যান্য বানোয়াট, মিথ্যা ও অনির্ভরযোগ্য কথা আলোচনা করব।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাতকে জীবিত করা এবং মিথ্যা, জাল, ভিত্তিহীন বা অনির্ভরযোগ্য কথা আলোচনা, বর্ণনা, পালন বা বিশ্বাসের কঠিন পাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার আবেগে অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করলাম। স্বভাবতই এর মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আমি সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি।

এই নগন্য প্রচেষ্টার মধ্যে যা কিছু কল্যাণকার রয়েছে তা সবই মহিমাময় আল্লাহর দয়া ও তাওফীক। তাঁর পবিত্র দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন দয়া করে তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (ﷺ) সুন্নাতের খেতমতে এই নগন্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলির তালিকা ও তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো। আগ্রহী পাঠক ও গবেষক প্রয়োজনে এ গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্যাদির বিশুদ্ধতা যাচাই ও অতিরিক্ত গবেষণার জন্য এই তালিকার সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে তালিকাটি ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, উম্মাতের যে সকল ইমাম, মুহাদ্দিস, আলিম ও বুযুর্গের ইলমের ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং এই পুস্তকের তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি তাঁদের সকলকে আল্লাহ রহমত করুন এবং উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
৩. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৪. রাবীয় ইবনু হাবীব, আল-মুসনাদ (ওমান, দারুল হিকমা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৫. শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিন ইদরীস (২০৪হি), আল-উম্ম (বৈরুত, দার আল -মারিফা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৩ হি)
৬. শাফিয়ী, আর-রিসালাহ (কাইরো, আহমদ শাকির, ১৯৩৯)
৭. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩ হি)
৮. ইবনু হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাহ আন-নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮)
৯. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান (রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১ম প্র. ১৪১৪ হি)

১০. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১১. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মিশর, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮)
১২. আহমদ ইবনু হাম্বাল, আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৩. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৪. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
১৫. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আত-তারীখুস সাগীর (হালাব, সিরিয়া, দারুল ওয়াঈ, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৭)
১৬. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৭. বুখারী, আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৮. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি) কিতাবুত তাময়ীয (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯০)
১৯. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
২০. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
২১. আল-ফাকেহী, মুহাম্মদ বিন ইসহাক্ব (২৭৫হি), আখবারু মাক্কাহ (বৈরুত, দারু খিদির, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি)
২২. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল ফিকর)
২৩. বালাযুরী আহমদ ইবনু ইয়াহইয়া (২৭৯ হি), আনসাবুল আশরাফ (কাইরো, মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ, ১৯৫৯)
২৪. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি) ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, আবু তালিব কাযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯)
২৫. তিরমিযী, আস-সুনান (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
২৬. বাযযার, আবু বাকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, মুআসসাসাতু উলুমিল কুরআন, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯)
২৭. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি), মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইল (ফাইসাল আবাদ, পাকিস্তান, হাদীস একাডেমী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৪)
২৮. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩হি), আদ-দু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (সিরিয়া, হালাব, দারুল ওয়াঈ, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৯হি)
২৯. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১খৃ)
৩০. নাসাঈ, আস-সুনান, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২ ।
৩১. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭হি), আল-মুসনাদ (সিরিয়া, দেমাশক, দারুস সাকাফাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৩২. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৩৩. তাবারী, জামেউল বায়ান/তাফসীরে তাবারী (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮)
৩৪. খাল্লাল, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩১১হি) আস-সুন্নাহ (রিয়াদ, দারুর রাইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হি)
৩৫. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৩৬. ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৭)
৩৭. হাকীম তিরমিযী (৩২০হি), নাওয়াদিরুল উসূল (কাইরো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৮৮)
৩৮. আবূ জা'ফর তাহাবী (৩২১), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খ্রি.)
৩৯. ইবনু দুরাইদ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (৩২১ হি), জামহারাতুল লুগহ (হাইদারাবাদ, ভারত, দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৩৪৫ হি)
৪০. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল ইলাল (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হি)
৪১. ইবনু আবী হাতিম, আব্দুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ (৩২৭ হি), আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৫২)
৪২. নাহহাস, আবু জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ (৩৩৮ হি), মা'আনিল কুরআনির কারিম (মক্কা মুকাররমা, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)
৪৩. ইবনু হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৪৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৫)
৪৫. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন (হালাব, সিরিয়া, দার আল-ওয়াঈ)
৪৬. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০ হি), আল-মু'জামুল কাবীর (মাউসিল, ইরাক, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৩)
৪৭. তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৪৮. তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৪৯. রামহুরমুযী, হাসান ইবনু আব্দুর রাহমান (৩৬০ হি), আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৪ হি)
৫০. ইবনু আদী, আবু আহমদ আব্দুল্লাহ (৩৬৫ হি), আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, ইবনু হাইয়ান আল-ইসফাহানী (৩৬৯হি), আল-আযামাহ (রিয়াদ, দারুল আসিমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি:)
৫২. ইবনুল মুকরি', আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (৩৮১হি.), আর রুখসাতু ফী তাকবীলিল ইয়াদ, রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)
৫৩. জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস-সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলমি লিল-মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৫৪. ইবনু ফারিস, আহমাদ (৩৯৫ হি), মু'জাম মাকাঈসুল লুগাহ (কুম, ইরান, মাকতাবুল ই'লাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি)
৫৫. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫ হি), মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৭৭)
৫৬. হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র, ১৯৯০)
৫৭. হামযা ইবনু ইউসূফ জুরজানী (৪২৭হি), তারীখ জুরজান (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮১)
৫৮. আবূ নু'আইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫হি)
৫৯. আবু নু'আইম ইসপাহানী, মুসনাদুল ইমাম আবী হানীফা (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫হি)
৬০. খালীলী, খালীল ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৪৬ হি), আল-ইরশাদ (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯৩)
৬১. ইবনু হায্‌ম, আলী ইবনু আহমাদ (৪৫৬হি) আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি)

৬২. ইবনু হাযম, আসমাউস সাহাবাহ আর-রুআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৬৩. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আল-ই'তিকাদ (বৈরুত, দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)
৬৪. বাইহাকী, শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৬৫. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৯৯৪)
৬৬. বাইহাকী, হাইয়াতুল আম্বিয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
৬৭. বাইহাকী, কিতাবুয যুহদ আল-কাবীর (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬)
৬৮. ইবনু আব্দিল বার্‌র, ইউসূফ ইবনু মুহাম্মাদ (৪৬৩হি) আত-তামহীদ (মরোক্কো, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি)
৬৯. খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী ইবনু সাবিত (৪৬৩ হি), আল-কিফাইয়াতু ফী ইলমির রিওয়াইয়া (মদীনা মুনাওয়ারা, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ)
৭০. খতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৭১. খতীব বাগদাদী, আল-জামিয় লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি' (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪০৩হি)
৭২. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৭৩. ইবনুল কাইসূরানী, আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনু তাহির (৫০৭ হি), শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ হি)
৭৪. ইবনুল কাইসুরানী, তাযকিরাতুল হুফফায (রিয়াদ, দারুস সুমাইয়ী, ১মপ্রকাশ, ১৪১৫হি)
৭৫. দায়লামী, শীরওয়াইহি ইবনু শাহারদার (৫০৯হি) আল-ফিরদাউস (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৭৬. ইবনুল আরাবী, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (৫৩৪ হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারু ইহয়িয়াউত তুরাসিল আরাবী)
৭৭. যামাখশারী, আবুল ক্বাসেম মাহমুদ বিন উমর (৫৩৮ হি), আল-কাশশাফ (বৈরুত, দার আল-মারেফা)
৭৮. ইবনু আতিয়্যাহ, আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক (৫৪৬ হি), আল- মুহাররার আল ওয়াজীয (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩)
৭৯. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)
৮০. আব্দুল কাদের জীলানী, সিররুল আসরার (অনুবাদ মাও. আব্দুল জলীল, ঢাকা, হক লাইব্রেরী, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৭ ।
৮১. আলী ইবনু আবী বাক্‌র মারগীনানী (৫৯২ হি), হেদায়া (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৮২. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৮৩. ইবনুল জাউযী, আল-মাউদূআত (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫হি)
৮৪. ইবনুল জাওযী, আদ-দুয়াফা ওয়াল মাতরূকুন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি)
৮৫. ইবনুল আসীর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক (৬০৬ হি), আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস (বৈরত, দারুল ফিকর)
৮৬. শাইখ মুঈন উদ্দীন চিশতী (৬৩৩ হি), আনিসুল আরওয়াহ, দলিলুল আরেফীন ও ফাওয়ায়েদুস সালেকীন সহ (অনুবাদ কফিল উদ্দীন চিশতী, ঢাকা, চিশতিয়া পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি)
৮৭. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি) আল-আহাদীস আল-মুখতারা (মাক্কা মুকার্‌রামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০হি)
৮৮. সাগানী, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ (৬৫০ হি) আল-মাউদূ'আত (দামেশক, দারুল মামূন, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৫)
৮৯. আল-মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আব্দুল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবলি ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি)
৯০. কুরতুবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ (৬৭১ হি), আল- জামে'লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, দার আল-ফিকর, তা.বি.)
৯১. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬হি), শারহু সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২হি)
৯২. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনু মাকরাম (৭১১ হি) লিসানুল আরাব (বৈরুত, দারু সাদির)
৯৩. নিযামুদ্দিন আউলিয়া (৭২৫ হি), রাহাতুল মুহিব্বীন (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৯৪. নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫হি), রাহাতিল কুলুব (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪)
৯৫. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮ হি), আল-ইসতিগাসাহ ফির রাদ্দি আলাল বাকরী (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯৬. ইবনু তাইমিয়া, আহাদীসুল কুসসাস (বৈরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় প্র., ১৯৮৫)
৯৭. ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উ ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
৯৮. ইবনু তাইমিয়া, কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল আখনাঈ (রিয়াদ, দারুল ইফতা)
৯৯. ইবনু জামা'আ, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (৭৩৩ হি), আল-মানহালুর রাবী (দামেশক, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি)
১০০. মুযযী, ইউসূফ ইবনুয যাকী (৭৪২ হি), তাহযীবুল কামাল (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮০)
১০১. ইবনু আব্দুল হাদী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৪ হি) আস-সারিম আল-মানকী (রিয়াদ, দারুল ইফতা, ১৯৮৩)
১০২. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৭৪৮ হি) মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
১০৩. যাহাবী, মুগনী ফীদ দুআফা' বৈরুতু, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১০৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম মুদ্রণ, ১৪১৩হি)
১০৫. যাহাবী, তারবীবু মাউযূআত ইবনিল জাউযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
১০৬. ইবনুল ক্বাইয়েম, মুহাম্মদ বিন আবি বকর, নাক্বদুল মানকুল (বৈরুত, দার আল-ক্বাদেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০)
১০৭. ইবনুল কাইয়েম, আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০),
১০৮. ইবনুল কাইয়েম, হাশিয়াত সুনানি আবী দাউদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৫)
১০৯. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ (বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
১১০. ইবনুল কাইয়িম, আর-রূহ (জর্ডান, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১১১. আবু হাইয়্যান, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (৭৫৪ হি), আল-বাহর আল-মুহীত (বৈরুত, দার আল-ফিকর, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)
১১২. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), নাসবুর রাইয়াহ (কাইরো, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি)

১১৩. ইবনু কাসীর ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি), তুহফাতুল তালিব (মক্কা মুকাররামা, দারু হিরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি)
১১৪. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র, ১৯৯৬)
১১৫. ইবনু কাসীর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম (কায়রো, দার আল-হাদীস, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০)
১১৬. ইবনু কাসীর, কাসাসুল আম্বিয়া (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১১৭. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ভারত, দেউবন্দ)
১১৮. ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.), শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খ্রি.)
১১৯. ইবনু রাজাব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২০. ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্র, ১৪০৮ হি)
১২১. ইবনু রাজাব, শারহু ইলালিত তিরমিযী (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৫)
১২২. ইবনুল মুলাক্কিন, উমার ইবনু আলী (৮০৪হি), খুলাসাতুল বাদরিল মুনীর (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
১২৩. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), আত-তাকয়ীদ ওয়াল ঈদাহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২৪. ইরাকী, তাখরীজ এহইয়াউ উলূমিদ্দীন, এহইয়া-সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১২৫. ইরাকী, যাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন (৮০৬হি), ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মিশর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯০)
১২৬. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭ হি), মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১২৭. হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
১২৮. জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৮১৬হি), তা'রীফাত (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১২৯. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি.) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.)
১৩০. বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ২য় মুদ্রণ, ১৪০৩ হি)
১৩১. বুসীরী, যাওয়াইদ ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৩২. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), লিসানুল মীযান (বৈরুত, মুআস্সাসাতু আল-আ'লামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৬)
১৩৩. ইবনু হাজার আসকালানী, আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১৩৪. ইবনু হাজার আসকালানী, আদ-দিরাইয়াহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১৩৫. ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি)
১৩৬. ইবনু হাজার আসকালানী, নুখবাতুল ফিকর (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী)
১৩৭. ইবনু হাজার আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযীস সাহাবা (বৈরুত, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২)
১৩৮. ইবনু হাজার আসকালানী, তালখীসুল হাবীর (মদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)
১৩৯. ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
১৪০. ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র, ১৯৮৪)
১৪১. ইবনু হাজার আসকালানী, আল-কাওলুল মুসাদ্দাদ (কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪০১হি)
১৪২. ইবনু কাতলূবগা, যাইনুদ্দীন কাসিম (৮৭৯), তাজুত তারাজিম ফী মান সান্নাফা মিনাল হানাফিয়্যাহ (দেমাশক, দারুল মামুন, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১৪৩. সাখাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রাহমান (৯০২ হি) আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭)
১৪৪. সাখাবী, আল-মাকাসিদুল হাসানাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র, ১৯৮৭)
১৪৫. সাখাবী, ফাতহুল মুগীস (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
১৪৬. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন (৯১১ হি) আদদুররুল মানছুর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০)
১৪৭. সুয়ূতী, আল-জামি'য়ুস সাগীর (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১)
১৪৮. সুয়ূতী, যাইলুল লাআলী (ভারত, আল-মাতবাউল আলাবী, ১৩০৩ হি)
১৪৯. সুয়ূতী, আন-নুকাতুল বাদী'আত (কাইরো, দারুল জানান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)
১৫০. সুয়ূতী, জালাল উদ্দীন, আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
১৫১. সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ)
১৫২. সুয়ূতী, আল-লাআলী আল-মাসনু'আ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ)
১৫৩. সুয়ূতী, শরাহুস সুদূর (বৈরুত, দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৫৪. জালাল উদ্দীন মাহাল্লী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৮৬৪হি) ও জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরুল জালালাইন (কাইরো, দারুল্ল হাদীস, ১ম প্রকাশ)
১৫৫. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আশ শামী (৯৪২হি), সীরাহ শামীয়াহ: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৫৬. আবুস সু'উদ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল ইমাদী (৯৫১ হি), তাফসীর-ই-আবিস সু'উদ (বৈরুত, দারু ইহয়িয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.)
১৫৭. ইবনু ইরাক, তানযীহুশ শারীয়াহ বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্র, ১৯৮১)
১৫৮. মুহাম্মাদ তাহের ফাতানী (৯৮৬ হি) তাযকিরাতুল মাউযূ'আত (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
১৫৯. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
১৬০. মোল্লা আলী কারী, আল মাসনু' (হালব, সিরিয়া, মাকতাব আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯)
১৬১. মোল্লা 'আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৪)
১৬২. মোল্লা আলী কারী, শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
১৬৩. মুল্লা আলী কারী, শারহু মুসনাদি আবী হানীফা, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৬৪. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১৬৫. মুনাবী, তা'আরীফ (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)

১৬৬. মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী, আহমদ ইবনু আব্দুল আহাদ সারহিন্দী (১০৪৩হি), মাকতুবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০হি)
১৬৭. মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী, মাকতুবাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমদ, (ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৬৮. হালাবী, আলী ইবনু বুরহান উদ্দীন (১০৪৪ হি), আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৪০০ হি)
১৬৯. আব্দুল হক্ক দেহলবী (১০৫২ হি), মুকাদ্দিমা ফী উসূলিল হাদীস (বৈরুত, দারুল বাশাইর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬)
১৭০. মুল্লা চালপী হাজী খালীফা, মুসতাফা ইবনু আব্দুল্লাহ (১০৬৭ হি), কাশফুয যুনূন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৯৯২)
১৭১. যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি), মুখতাসারুল মাকাসিদ আল-হাসানাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
১৭২. যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
১৭৩. আল-আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১৭৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু ইহয়ায়িল উলূম, ২য় প্রকাশ ১৯৯২)
১৭৫. শাহ ওয়লীউল্লাহ দেহলবী, আল-কাউলূল জামিল (অনুবাদ, হাফেয মাওলানা আব্দুল জলীল, ঢাকা, হক লাইব্রেরী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০০)
১৭৬. মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ ইয়ামানী (১১৮১ হি), আন-নাওয়াফিহুল আতিরাহ (বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৭৭. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.), আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুআ (মক্কা মুকাররমা, মাকতাবাতু মুস্তাফা নিযার আল-বায)
১৭৮. শাওকানী, নাইলুল আউতার, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩)
১৭৯. শাওকানী, ফাতহুল ক্বাদীর (বৈরুত, দার আল-ফিকর, ১৯৮৩)
১৮০. আলুসী, সাইয়্যেদ মাহমুদ (১২৭০ হি), রূহুল মা'আনী বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪)
১৮১. দরবেশ হূত, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইয়িদ (১২৭৬ হি), আসনাল মাতালিব (সিরিয়া, হালাব, আল-মাকতাবা আল-আদাবিয়্যাহ)
১৮২. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফূয়া ফীল আখবারিল মাউযূয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
১৮৩. আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশারাতিল কামিলা (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ৯৯৮৪)
১৮৪. আব্দুল হাই লাখনবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (দুবাই, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
১৮৫. আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর লিমান উতালিউল জামিয়িস সাগীর (ভারত, লাখনৌ, মাতবাআতুল ইউসূফী, ১ম প্রকাশ)
১৮৬. সিদ্দীক হাসান কান্নূজী (১৩০৭ হি), আবজাদুল উলূম (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮)
১৮৭. রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮হি), ইযহারুল হক (রিয়াদ, দারুল ইফতা, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৯)
১৮৮. মুহাম্মাদ ইবনুল বাশীর আল-মাদানী (১৩২৯ হি), তাহযীরুল মুসলিমীন (দামেশক, দারু ইবনি কাসীর, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১৮৯. আল-কাত্তানী, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার (১৩৪৫ হি), আর-রিসালাতুল মুসতাত্‌রাফা (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৪ র্থ প্রকাশ ১৯৮৬)
১৯০. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৯১. থানবী, আশরাফ আলী (১৩৬২হি), তাফসীর-ই আশরাফী (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ)
১৯২. আল-মা'লামী, আব্দুর রাহমান ইবনু ইয়াহইয়া আল-ইয়ামানী (১৩৮৬ হি), মুকাদ্দিমাতুল ফাওয়াইদিল মাজমূ'আ লিশ-শাওকানী (বৈরুত, মাতবা'আতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬০)
১৯৩. শানক্বীতী, মুহাম্মদ আমীন, (১৩৯৩ হি), আদওয়া আল- বায়ান (রিয়াদ, দারুল ইফতা, তা.বি.)
১৯৪. যিরিকলী, খাইরুদ্দীন (১৩৯৬হি), আল-আ'লাম (বৈরুত, দারুল ইলমি লিল মালাঈন, ৯ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৯৫. শামসুল হক আযীমাবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি)
১৯৬. মুফতী শফী, মা'আরেফ আল-কুরআন (ঢাকা, ইফাবা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩),
১৯৭. মাওলানা মুহা. যাকারিয়্যঅ কান্ধলবী, ফাযায়েলে আমাল (অনুবাদ মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ, ঢাকা, দারুল কিতাব, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
১৯৮. আহমদ শাকির, মুসনাদু আহমদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮)
১৯৯. মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খাতীব, আস-সুন্নাতু কাবলাত তাদবীন (কাইরো, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৩)
২০০. মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাউদূ'আত (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
২০১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহ জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
২০২. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯০)
২০৩. আলবানী, সাহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)
২০৪. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯৭)
২০৫. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২-২০০১)
২০৬. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)
২০৭. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৮)
২০৮. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম প্র, ১৯৭৯)
২০৯. আলবানী, মাকালাতুল আলবানী (রিয়াদ, দারু আতলাস, ২য় মুদ্রণ, ২০০১)
২১০. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, আরবাউ রাসাইল ফী উলুমিল হাদীস (হালাব, সিরিয়া, মাকতাবুল মাতবু'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯০)
২১১. মুহাম্মাদ সালিহ উসাইমীন, শারহুল বাইকূনিয়্যাহ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫)
২১২. আবু ইসহাক আল হুয়াইনী, জুন্নাতুল মুরতাব (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
২১৩. আবু তালিব কাযী, ইলালুত তিরমিযী আল-কাবীর (বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯)
২১৪. বাকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যাইদ, আল-তাহদীস (রিয়াদ, দারুল হিজরাহ, ১ম প্র, ১৯৯১)
২১৫. মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আযামী, মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাউসার, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯০)
২১৬. সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, সাফওয়াতুত তাফাসীর (বৈরুত, দার আল- কুরআন আল কারীম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮১)
২১৭. ড. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
২১৮. ড: খালদূন আল-আ'হদাব, যাওয়াইদু তারীখি বাগদাদ (দিমাশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)

২১৯. ড. ফাল্লাতা, উমার ইবনু হাসান, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস (বৈরুত, মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১)
২২০. ড. আমীন আবু লাবী, ইলমু উসূলিল জারহি ওয়াত তা'দীল (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
২২১. অধ্যাপিকা কামরুন নেসা দুলাল, নেক আমল (চট্টগ্রাম, হাফেজ কামরুল হাসান, ২য় প্রকাশ, ২০০০)
২২২. আলহাজ্জ কাজী মো. গোলাম রহমান, মকছুদোল মো'মেনীন (ঢাকা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ৪৮তম সংস্করণ, ২০০১)
২২৩. মৌলবী মো. শামছুল হুদা, নেয়ামুল কোরআন (ঢাকা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ২৬তম সংস্করণ, ২০০১)
২২৪. মুফতী হাবীব ছামদানী, বার চান্দের ফযীলত (ঢাকা, মীনা বুক হাউস, ১ম প্র, ২০০১)
২২৫. শাহ মুহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ, পীর সাহেব ছারছিনা শরীফ, খুতবায়ে ছালেহীয়া (ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯)
২২৬. মুস্তফা হামীদী, মুফতীয়ে আযম আল্লামা, মীলাদ ও কিয়াম, কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে, (ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ২য় প্রকাশ, ২০০৫)
২২৭. মাও. মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন; অজীফায়ে ছালেহীন (ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ৩য় প্রকাশ ২০০২)
২২৮. মো. বসির উদ্দীন আহমদ, নেক আমল (ঢাকা, উমেরুন্নেছা খানম, আব্বাছিয়া লাইব্রেরী, ৮ম প্রকাশ, ১৯৯১)
২২৯. আব্দুল খালেক, এম. এ., সাইয়েদুল মুরসালীন (ঢাকা, ই. ফা. বা. ৪র্থ সংস্ক. ১৯৯০)
২৩০. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, রাসূলে রহমত (সা), (অনুবাদ, মাওলানা আব্দুল মতীন জালালাবাদী , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২)
২৩১. এম এন. এম ইমদাদুল্লাহ, আদি ও আসল কাছাছুল আম্বিয়া (ঢাকা, তাজ কোম্পানী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০১ বাংলা)
২৩২. মাও. মো. আশরাফুজ্জামান, ছহী কাসাসুল আম্বিয়া (ঢাকা, সুলেখা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৪)
২৩৩. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০০)
২৩৪. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর (ঢাকা, বাইতুল হিকমা পাবলিকেশনস, ১ম প্রকাশ, ২০০৩)
২৩৫. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াতঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওযীফা, যিকির ও দোয়া-মুনাজাত (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০৩)
২৩৬. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ৩য় প্রকাশ, ২০০৪)
২৩৭. আঞ্জুমানে আহমাদিয়া রাহমানিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম, মাসিক তরজুমান (২৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে-জুন ২০০৫)
২৩৮. বাংলা বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি
239. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
২৪০. Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, USA, Michigan, Baker Book House, 13th printing 1987
২৪১. The Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990
242. Dr. Muhammad Ali Alkhuli, The Truth About Jesus Christ (Jordan, ALFALAH House for Publication, 2nd ed. 1996)
243. Muhammad Ridha Shushtary, The Claim of Jesus (Tehran, Iran, Chehel-Sotoon Madrasah & Library)
244. 1 T. H. Horne, An Introduction to The Critical Study And Knowledge of The Holy Scriptures (London, 3rd Edition, 1822)